প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩
[জুন, ১৯৭৬]

বাএ ৭৩২

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা—২

মুদ্রণে
মতি আর্ট প্রেস
৬, গোবিন্দ দাস লেন
আরমানিটোলা, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ
হাশেম খান

মূল্য : ষাট টাকা।

PRACHIN JYOTIRVIDYA (Ancient Astronomy in Bengali) by Mohammad Abdul Jabbar, Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. First edition 1976.
Price : Taka 60·00

PRACINA JYOTIRVIDYA.

Muhammad Abdul Jabbār.

BANGLA AKADEMI DACCA

(1976)

ভূমিকা

মহাকাশ গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ 'প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা' অবশেষে প্রকাশিত হলো। এ বইখানার উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। ১৯৬৯ সনে এ বইখানার পাণ্ডুলিপি তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের নিকট দেওয়া হয়। পরে বইখানা ছাপাখানায় যায়। ছাপাখানায় অনেকদিন পড়ে থাকবার পরে এক ফর্মা কি দুই ফর্মা ছাপাও হয়। তার পরেই সারা দেশের সঙ্গে এ বইখানাও স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ছাপাখানার সঙ্গে বইখানার প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের দাপটে ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তনের ফলে অনেক বৎসরে নানা জায়গা থেকে অনেক পরিশ্রমে সংগ্রহ করা বই-পুস্তক কোথায় যে কোন্‌খানা ছিটকে পড়ে তার অনেকগুলির আর কোন হদিসই পাওয়া যায় না। দেড় শত পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি পুনরায় লেখা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যাই হোক, কোনমতে শূন্যস্থান পূর্ণ করা গেল। কিন্তু পূর্বেকার লেখার সঙ্গে অনেক গরমিল, অনেক অসামঞ্জস্য রয়ে গেল। আগের লেখাতে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম, যে আত্মতুষ্টি লাভ করেছিলাম, পরে তার অনেক অংশ থেকে বঞ্চিত হলাম। এরপরে দেখা গেল, বইয়ের ছবির ব্লকগুলোও সব পাওয়া যাচ্ছে না; এ নিয়েও অনেকদিন কেটে গেল।

বইএর পাণ্ডুলিপি যখন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের হাতে দেই, তখন একটা ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলাম বলে মনে হয়। কিন্তু সে ভূমিকারও আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাই আবার ভূমিকা লিখতে হচ্ছে। এ কাজটাও এখন বেশ কঠিন বলে মনে হচ্ছে। পূর্বে লিখবার সময় যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সে দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলেছি; যে সমস্ত বই-পুস্তক তখন হাতের কাছে ছিল, সেগুলোও এখন নাই; সুতরাং সেই ভূমিকা আর পুনরায় লেখা সম্ভব নয়।

এই বই লিখবার অদ্ভুত ইতিহাস এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ 'খগোল-পরিচয়ে' বলা হয়েছে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের তৎকালীন ডিরেক্টর ডক্টর এনামুল হক সাহেবের উৎসাহেই এই মহাকাশ গ্রন্থমালা লেখার কাজ হাতে নেই এবং তিনখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতেই সমর্পণ করি। বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কলেবর আরো বড় ছিল; ভারতীয় জ্যোতি-বিদ্যা, বিশেষ করে আল-বেরুনীর মতামত আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। তখনকার পরিবেশ বিবেচনা করে ডক্টর এনামুল হক সাহেব তার অধিকাংশই বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর উপদেশ মতই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার উপর অস্ত্রোপচার করা হয়।

জ্যোতির্বিদ্যার প্রাচীন কাহিনী শুধুমাত্র মৃতই নয়, একেবারে ধূলীভূত আবর্জনা। সেই আবর্জনা বিশ্লেষণ করে মরা দেহের অনুসন্ধান করবার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি নিজেই মনে করি না। বর্তমান যুগে চলতে গিয়ে হাজার হাজার বছর পিছনের দিকে ফিরে তাকানো বৃথা কালক্ষয় তো বটেই, এতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাহত হওবার আশঙ্কাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। তবু কেন যে এই আবর্জনা ঘাটবার দিকে মন গেল, তার একটা কৈফিয়ত দাঁড় করানো যেতে পারে।

ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামে কুলীন-প্রথা অত্যন্ত প্রকট। ছেলেমেয়ের বিয়েতে সাতপুরুষের কুষ্ঠি ঘাটতে অনেক দেখেছি। পরে দেখতে পেলাম এ কুলীন-প্রথা শুধু সামাজিক নয়, একেবারে আন্তর্জাতিক। কোন্ দেশের বনেদীয়ানা কত প্রাচীন, এ নিয়ে বেশ একটা প্রতিযোগিতা চলছে। ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন; ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চশিখরে সমাসীন, ইউরোপের বর্তমান সভ্য দেশসমূহের পূর্বপুরুষগণ তখন জঙ্গলবাসী, ইত্যাকার নানা কাহিনী শুনতে পেতাম, এবং সে জন্য বেশ গর্বও বোধ করতাম। কবে কোন্ মান্ধাতার আমলে বাদশাহী খোয়া গেছে, কিন্তু তার খোয়াব দেখে বাদশাহী মেজাজে চলতে আমরা পিছপা নই। যখন জ্যোতির্বিদ্যা পড়তে আরম্ভ করি, তখন এই প্রাচীনতা আর বনেদীয়ানার দাবীর প্রতিযোগিতা চোখে

পড়ে। আর সেই দাবী প্রতিষ্ঠিত করবার সে কি প্রচণ্ড প্রয়াস! "চেষ্টা করিলে আধুনিক মতের সহিত এই পৌরাণিক মত মিলাইতে পারা যায়" (যোগেশচন্দ্র রায়: 'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী', পৃষ্ঠা ১১)। আর বেপরোয়াভাবে এই চেষ্টা চলেছে সর্বত্র, সর্বদেশে। পূর্বপুরুষগণ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ; তাঁরা ছিলেন সর্বকালদর্শী; তাঁদের কথার ভিতরে অতি আধুনিক মত ও তত্ত্ব নিহিত আছে; আমরা সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারি না বলেই আমাদের এই অধঃপতন। এ সব কথা মেনে নিতে মন সায় দিত না; তাই প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করি।

কোন্ দেশের সভ্যতা প্রাচীনতম, এর সঠিক উত্তর দিতে গেলে মানুষের বিবর্তনের কোন্ স্তরকে সভ্যতার প্রথম স্তর বলা হবে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অনেক লোক একত্রে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা, অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহর প্রতিষ্ঠাই যদি সভ্যতার প্রথম স্তর বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হ'লে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম। খ্রীস্টপূর্ব ৮০০০ অব্দে প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে মরু সাগরের তীরে জেরিকো নামক জায়গাতে মানুষ বাড়ীঘর তৈরী ক'রে একত্রে বসবাস করতো। একে যদি শহর বলা যায়, তা হলে এর পূর্বে স্থাপিত কোন শহরের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যাকে আমরা সুমেরীয় বা প্রাচীন বেবিলনীয় সভ্যতা বলি, তার বিকাশলাভ ঘটে খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে। এরপরে এখানে রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে বটে, কিন্তু কোন রাজাই বেশী দিন সমগ্র সুমেরকে একত্রে শাসন করতে পারেন নাই। কোন সময় কিশ প্রাধান্য লাভ করেছে, কোন সময় এরেকের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছে, আবার কোন সময় বা এলামাইটদের হাতে প্রাধান্য গেছে। খ্রীস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে রাজা সারগন সর্বপ্রথম সমগ্র সুমের এবং মেসোপটেমিয়ার উত্তর অংশ আক্কাদকে একত্রিত ক'রে রাজত্ব করেন।

মিসরে কৃষিকার্য আরম্ভ হয় খ্রীস্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দে এবং সেখানে শহর গড়ে ওঠে খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের দিকে। কিন্তু মেসোপটেমিয়ায় যখন প্রাধান্য নিয়ে বিভিন্ন শহরের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, সে সময়ে

খ্রীস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে মেনেস দুই মিসর একত্রিত ক'রে রাজত্ব করেন। আর সারগন যখন সমগ্র মেসোপটেমিয়া একত্রিত করেন, তার অনেক আগেই মিসরের বড় পিরামিড নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ মিসরের জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা মিসরের সভ্যতা তখন অনেক উন্নত। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মিসরীয় সভ্যতাই প্রাচীনতম। সেজন্য এই গ্রন্থে প্রথমে মিসরীয় এবং তারপরে সুমেরীয় জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করা হয়েছে। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা নিঃসন্দেহে বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গ্রীক জ্যোতির্বিদগণের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী হচ্ছেন মুসলিম জ্যোতির্বিদ-গণ। খলিফা আল-মামুন সর্বপ্রথম ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অনুবাদ করান—সিন্দহিন্দ নাম দিয়ে। কিন্তু এর-পরে আর ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। তাঁরা অনেক গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করেন, এবং সম্পূর্ণ গ্রীক পদ্ধতিতে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করেন। গ্রীক জ্যোতির্বিদ ইউডকসাস যেভাবে গোলকের ভিতরে গোলক কল্পনা ক'রে গ্রহগতির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, মুসলিম জ্যোতির্বিদগণও অনেকটা সেইরূপই করেন। তবে ইউডকসাসের গোলকসমূহ ছিল পৃথিবীর সাথে সম-কেন্দ্রিক, আর অধিকাংশ মুসলিম জ্যোতির্বিদের গোলকসমূহ ছিল পৃথিবীর সাথে বিকেন্দ্রিক। তাঁরা মনে করতেন যে, এক একটি গ্রহ, এক একটি গোলকের সাথে সংযুক্ত। 'সাত আকাশ ও সমান সংখ্যক পৃথিবী' আল-কোরআনের এই উক্তির সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই হয়তো তাঁরা এরূপ গোলক ও সংযুক্ত গ্রহের কল্পনা করেছিলেন। ইউডকসাসের মতবাদ যে এখানে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে, এটা স্বীকার ক'রে নেওয়া যেতে পারে। মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ-তালিকা পরবর্তী যুগের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করে। এদিক দিয়ে মুসলিম যুগের জ্যোতির্বিদ্যাকে গ্রীক ও আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সেতু বলা যেতে পারে। এ জন্যই গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার পরেই মুসলিম যুগের জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করা হয়েছে।

খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে মাঞ্চুরিয়াতে যে শত শত, এমনকি হাজার হাজার গ্রাম ছিল, এবং এই সমস্ত গ্রামে চাষবাস করা হতো, এবং কাঠের জিনিসপত্র ও পবিধেয় বস্ত্রাদি তৈরী করা হতো, তাব যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে ইয়াংশাও জাতি কর্তৃক নির্মিত ও নানাভাবে চিত্রিত মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতবাং মনে কবা যেতে পাবে, তার পূর্বেই চীনা সভ্যতা গড়ে ওঠে। অবশ্য মিসবের মত অতটা উন্নত হয় নাই, এবং সাবগনেব বাজত্বকালে মেসোপটেমিয়াও চীনের চেয়ে উন্নত ছিল। কিন্ত চীনেব একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, চীনেব যে সমস্ত ঘটনাবলী জানা যায়, সেগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট; তাদের সন, মাস এমনকি তাবিখ পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। খ্রীস্টপূর্ব ১৪৫ অব্দে চীনা ইতিহাসেব জনক স্ মুমা ছিযেন তাঁব বিখ্যাত গ্রন্থ 'শিহ্ চি'-তে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ কবেছেন। এর সঙ্গে ভাবতবর্ষের অবস্থাব তুলনা কবা যেতে পাবে। ভাবতবর্ষেব বেদ, বেদাঙ্গ, ব্রাহ্মণ, পুবাণ ইত্যাদিতে যে সমস্ত উপাখ্যান আছে, সেগুলিব নানা-প্রকাব ব্যাখ্যা দেওযাব জন্য অনেক কষ্টকল্পনা কবাব চেষ্টা করা হয়। এইভাবে চেষ্টার ফলে ঐ সমস্ত উপাখ্যানের সংঘটনকাল এবং তা থেকে ভারতীয় সভ্যতার কাল যত প্রাচীন বলেই প্রচাব করা যাক না কেন, নিরপেক্ষ ব্যাখ্যাকাবদেব মতে ঘটনাগুলো ততটা প্রাচীন নয়। বিশেষ ক'বে পুবাণ বচনাব কাল তো কোনক্রমেই খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে নয়। মোযেন-জো-দাবো ও হারাপ্পার প্রাচীন লিপিব পাঠোদ্ধাব কবতে না পাবা পর্যন্ত আর্যপূর্ব ভারতীয় সভ্যতার কোন সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মোযেন জো-দারোতে সুমেবীয় কুনিফর্ম লিপি পাওযা গেছে বলে জানা যায়। এতে মনে হয় আর্যপূর্ব ভাবতবর্ষ ও মেসোপটেমিয়ার ভিতরে যোগাযোগ ছিল। দুইটি সভ্যতা সমসাময়িকও হতে পারে।

একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, চীনা জ্যোতির্বিদ্যা অন্যান্য দেশের জ্যোতির্বিদ্যা থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে বিকাশলাভ করেছে। অন্যান্য

দেশের জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি হ'লো সূর্যপথ। কিন্তু চীনা জ্যোতির্বিদ্যার সূর্যপথের কোন স্থান ছিল না। যে ২৮টি হ্‌সিউ-এর উপরে চীনা জ্যোতির্বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে ২৭ বা ২৮টি চন্দ্রনিবাস, মানাজেলোল কামার বা নক্ষত্রের তুলনা করা হয়ে থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। নক্ষত্র বা চন্দ্রনিবাসসমূহ আকাশে চন্দ্রপথের বিভক্তিসমূহ মাত্র। সূর্যপথ থেকে এদের দূরত্ব খুব বেশী নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি হ্‌সিউ খ-বিষুবের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সম্পূর্ণ খ-গোলকের এক একটি কোষ। সুতরাং নক্ষত্র ও হ্‌সিউ এক নয়। এ ছাড়া যে সমস্ত তারা দিয়ে অন্যান্য দেশে তারামণ্ডলসমূহ গঠিত, চীনের তারামণ্ডলসমূহ ঠিক সেই সমস্ত তারা দিয়ে গঠিত নয়। চীনা তারাচিত্রের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তারাচিত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। এতে সহজেই বোঝা যায় যে, চীনের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে। অন্য সমস্ত দেশের ভিতরে হয় যোগাযোগ ছিল, না হয় এক দেশ থেকে অন্য সমস্ত দেশ এগুলি গ্রহণ করেছে।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা থেকে গৃহীত। শীঘ্রবৃত্ত, মন্দবৃত্ত, অর্থাৎ সেই গ্রীক এপিসাইকেল ও ডেফারেন্টের সাহায্যেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার গণনাকার্য করা হ'তো। গ্রীক জ্যামিতি এখানে প্রকটভাবে কার্যকরী। চীনা জ্যোতির্বিদ্যা জ্যামিতি-ভিত্তিক নয়। হ্‌সিউ পদ্ধতির সাহায্যেই সেখানে সমস্ত গণনা করা হ'তো। পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা আক্রান্ত ও পরাভূত না হলে, চীনা জ্যোতির্বিদ্যা কিভাবে কতটা উন্নতি লাভ করতো, তা অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। জ্যামিতি ছাড়া বিশ্ব-রহস্য জানা সম্ভব নয়, তারই বা প্রমাণ কি? জ্ঞান-বিজ্ঞান যেভাবে গড়ে উঠেছে, সেভাবে গড়ে না উঠে অন্যভাবেও গড়ে উঠতে পারতো কিনা, এবং তা হ'লে প্রকৃতির রহস্য ঠিকমত ধরা পড়তো কিনা, তাই বা কে জানে? ঘটনাপ্রবাহ অন্যভাবে প্রবাহিত হলে, পৃথিবীর ইতিহাস যে পরিবর্তিত হ'তো, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবাহও অন্যভাবে প্রবাহিত হতে পারতো

কিনা, এবং তাতে বর্তমান পৃথিবীর চেহারার কতটা পরিবর্তন হ'তো তার সন্ধান কে দেবে ?

এই বইয়ের মাল-মসলা যোগাড় করতে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, অনেকের সাহায্য নিতে হয়েছে। আমি এ সম্বন্ধে আগ্রহশীল বা এ সম্বন্ধে পড়াশুনা করি, এ কথা জানতে পেরে অনেকে অযাচিতভাবে অপ্রত্যাশিত বই পুস্তক দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে দুইজনের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরীয়ান জনাব আবু বকর সিদ্দিক কেবলমাত্র আমার কথা মনে করেই Joseph Needham-এর Science and Civilisation in China-এর বারো খণ্ড বই-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিনে ফেলেন। চীনের সভ্যতার উপরে এর চেয়ে প্রামাণ্য বই আর আছে বলে আমার জানা নাই। সিদ্দিক সাহেবের নিকট এজন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী। দ্বিতীয় যে ব্যক্তির নিকট থেকে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে বই পেয়েছি, তিনি আমার জামাতা শ্রীমান ফজলুল আলম। ('শ্রীমান' কথাটা সম্পূর্ণরূপে বাংলা; এর দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করা যায়, অন্য কোন শব্দ দ্বারা সে ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা)। আমি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে পড়াশুনা করছি জানতে পেরে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে Edward Ball Knoble-এর Star Catalogue of Ulug Beg বইখানা আমাকে পাঠিয়ে দেন। এই বইখানা পেয়ে আমি এত উল্লসিত হয়েছিলাম, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সম্রাট জ্যোতির্বিদের এই বইখানার নাম আমি অনেক জায়গায় পেয়েছি। কিন্তু এর আগে বইখানা চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এ দেশের নানা জায়গায় এ বইখানার সন্ধান করে বেড়িয়েছি, কিন্তু কোথাও পাই নাই। অবশেষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই বইখানা পেয়ে যাই। সম্রাট উলুগ বেগের এই তারা-তালিকায় যে সমস্ত তথ্য দেওয়া আছে, এ গ্রন্থে তার সমস্ত কিছুর উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। তিনি কি ভাবে তারাগুলোর বর্ণনা

দিয়েছেন, এ গ্রন্থে কেবলমাত্র তারই আভাস দেওয়া হয়েছে। শ্রীমান ফজলুল আলমকে আমার সস্নেহ ধন্যবাদ।

'ভ-গোল চিত্রম্' নামে একখানা অতি পুরাণো বই থেকে সংস্কৃত নাম, অনেক শ্লোক এবং ভারতীয় তারাচিত্রসমূহ নেওয়া হয়েছে। বইখানা এত পুরানো যে পাতা উল্টাতে গেলে ভেঙে যায়। গ্রন্থকারের নামটাও ভেঙে গেছে। অনেক সংস্কৃত শ্লোক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার দুই একটা ছবি 'আকাশের ঠিকানা' গ্রন্থখানা থেকে নেওয়া হয়েছে।

উৎসর্গপত্রে যে তিনটি জাপানী অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির উচ্চারণ 'চিচি তো হাহা'; অর্থ সুস্পষ্ট। এই তিনটি অক্ষরের জন্য আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌ-স্থাপত্য ও নৌযান কৌশল বিভাগের প্রধান ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ।

বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগ আমার এই বইখানার প্রতি যে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়েছেন, সে জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। প্রকাশনার ব্যাপারে ঐ বিভাগের কর্মচারী জনাব সৈয়দ আলী যে দরদ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। বানান বা বাক্যগঠনে যখনই তাঁর মনে কোন প্রকার দ্বিধা জেগেছে, তখনই সেটা তিনি আমার গোচরীভূত করেছেন। এভাবে অনেক ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। সৈয়দ আলী সাহেবের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার অজ্ঞানতার সীমা নাই, অসাবধানতাও আকাশচুম্বি; সুতরাং আশা করা যায় যে, ভুলত্রুটিও সেই অনুপাতেই হয়েছে। সাধ্যের অতীত এই ধৃষ্টতাপূর্ণ সাধের জন্য পাঠকবর্গের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নাই।

ঢাকা
৮ই জুন, ১৯৭৬

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

বিষয়-সূচী

দ্বিতীয় ভাগ : মুসলিম যুগে জ্যোতির্বিদ্যা

তৃতীয় ভাগ : ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা

চতুর্থ ভাগ : চীন দেশের জ্যোতির্বিদ্যা

চিত্রসূচী

সূচনা

মানুষ কখন প্রথম জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ করে, সে ইতিহাস সময়ের অন্তরালে রহস্যাবৃত। তবে ৫০০০ বৎসরেরও পূর্বের যে সমস্ত ফলক, কিংবদন্তী বা চিত্র আমরা দেখতে পাই, সে সমস্ত থেকে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদ্যার স্থান অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের হলেও, তার মধ্যে সঙ্গতির কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। আরো প্রাচীনকালের দিকে লক্ষ্য করলে গুহা-মানুষের গুহাগাত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারার বিশেষ অবস্থান আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। এতে মনে হয়, পশু স্তর থেকে বিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দোবদ্ধ গতি, চাঁদের নিয়মিত পরিবর্তন, তারাসমূহের কোন কোন অবস্থান ইত্যাদি লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, সেই আদিম যুগের মানুষ কিসের প্রেরণায় আকাশের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল? রাত্রির আকাশ তারায় তারায় ভরে যে অতুলনীয় শোভার সৃষ্টি করে, আদিম মানুষ কি সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত আর তা থেকেই আকাশের বিভিন্ন ঘটনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে? নাকি, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, শীতের পর গ্রীষ্ম, তারপরে আবার বর্ষা, প্রকৃতির এই নিয়মিত পরিবর্তনই তার কৌতূহল জাগিয়ে তোলে? আদিম মানুষের জীবনযাত্রা এত বেশী সঙ্কটময় ও সংগ্রামপূর্ণ ছিল যে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের শোভা আর তারার সৌন্দর্য দেখবার মত অবসর তার ছিল বলে মনে হয় না। হিংস্র পশু আর অনিয়মিত প্রকৃতির সঙ্গে তাকে বাস করতে হতো। সে জন্য তার দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত ঘটনা

ঘটে, সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সে পারেনি। এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তার সঙ্গে তার জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করে, সে তার দৈনন্দিন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে যে যত বেশী পরিচিত হতে আরম্ভ করলো, পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সে তত বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে শুরু করলো। মনে হয় যে, এই ভাবেই জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে আদিম মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে।

দিনের পর রাত্রি হয়। দিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে রাত্রির জীবনযাত্রার পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। চারদিক অন্ধকার হ'য়ে যায়, খাদ্য দেখা যায় না, শত্রুকে দেখা যায় না। হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন হয়? এর সঙ্গে যে সূর্যের যোগাযোগ আছে, মানুষ বোধ হয়, সর্বপ্রথম এই জ্যোতির্বিদ্যায় সেই তথ্যই আবিষ্কার করে। এই তথ্য কোন পশুর জানা নেই। দুপুরের প্রখর রৌদ্রের পরে আস্তে আস্তে রৌদ্রের তেজ কমতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দিনের উজ্জ্বলতাও কমে যায়, আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। পশুপ্রাণী বুঝতে পারে, এইবার তাদের জীবন-ধারা বদলে যাবে, অন্ধকারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হবে, সারাদিনের ছুটাছুটির পরে ক্লান্তি আসবে, দু'চোখ ভরে ঘুম আসবে। পশুর এই ধারণা সহজাত; সূর্যের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে, তা'রা তা জানে না। কিন্তু আদিম মানুষ এই সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিল। আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখেই মানুষ সময় সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে সক্ষম হয়। পাড়াগাঁয়ে এখনো সময় নির্দেশ করবার একমাত্র উপায় সূর্য। বেশী সূক্ষ্মভাবে সময় জানতে হলে ছায়ার সাহায্য নেওয়া হয়। ঘরের চালের ছায়া দাওয়ার কত দূরে পড়েছে সেইটা দেখেই আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়ে এখনও স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়।

দিন রাত্রির পরিবর্তনের পরেই ঋতুর পরিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এক সময়ে গরমে টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ে, আবার অন্য সময় শীতের জন্যে নানা প্রকার আচ্ছাদন দিয়ে শরীরকে ঢাকতে

হয়, রোদ বা আগুন দিয়ে শীত তাড়াতে হয়। কোন সময় শস্যে, ফুলে, ফলে চারিদিক ভরে ওঠে, আবার কোন সময় বৃষ্টির জন্য সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হ'য়ে যায়। প্রাকৃতিক অবস্থার এই পরিবর্তনও যে অনিয়মিত নয়, বিশেষ সময় পর পর এই সমস্ত অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে, এ বিষয়ও মানুষ পরে লক্ষ্য করে। কোন্ ঋতুর পরে কোন্ ঋতুর আগমন হবে, অনেকদিনের অভিজ্ঞতার ফলে সে ধারণাও মানুষের আপনা আপনি গড়ে ওঠে। আর সেই অনুসারেই সে শস্য রোপন, ফসল আহরণ ও দুর্দিনের জন্য খাদ্য সঞ্চয় ইত্যাদি করতে আরম্ভ করে।

জীবনযাত্রা যত বেশী জটিল হ'তে আরম্ভ করলো, মানুষ তত বেশী প্রকৃতির সাথে পরিচিত হ'তে ও তার সাহায্য নিতে থাকলো। জীবনযাত্রার তাগিদে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়ত করবার প্রয়োজন হলো, আর সেই প্রয়োজনেই দিকনির্ণয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। সূর্য ও চন্দ্রের সাহায্যেই প্রথমে এই প্রয়োজন মিটানো হ'তো। চাঁদের সাথে সাথে রাত্রিতে তারাদের দিকেই নজর দিতে হতো। লোকে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলো ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারাসমষ্টির পরিবর্তন হয় এবং আকাশের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন তারামণ্ডলী আছে। ঋতু ও দিনের সঙ্গে তারার সম্বন্ধ লক্ষ্য করবার পরে, এই জ্ঞানের সাহায্যে তা'রা প্রকৃতির সঙ্গে নতুন উদ্যমে সংগ্রাম চালাতে থাকে।

এরপরে মানুষ দিনের সঙ্গে ঋতুর সম্বন্ধ নির্ণয় করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ঠিক কতদিন পরে শস্য বোনার ঋতু ফিরে আসবে বা শীত ঋতুর আগমন হবে, এ জানবার তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ জন্য তারা চন্দ্রের সাহায্য নেয়। দিনে দিনে চন্দ্রের কলার বৃদ্ধি হয় আবার অন্য সময়ে দিনে দিনে তার ক্ষয় হ'তে থাকে। এত স্পষ্ট একটা ঘটনা মানুষের দৃষ্টি এড়ায়নি। ঋতুর পরিবর্তন ও পুনরাবর্তনের চেয়ে চন্দ্রের পরিবর্তন ও পূর্বাবস্থায় পুনরাবর্তন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ঘটে। ২৯ কিংবা ৩০ দিন পর পর আকাশে নতুন চাঁদ দেখা দেয়। এইভাবে চাঁদের কলার সাহায্যে দিন

গণনা আরম্ভ হয়। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে আছে "দিন গণনার জন্যই চাঁদের সৃষ্টি হয়েছে।" এজন্য বিভিন্ন ধর্মে চাঁদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। চাঁদের পূজাও নানা দেশে আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের সোমনাথ মন্দির চন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল। সূর্য ও চন্দ্র আকাশে বিভিন্ন সময়ে প্রভুত্ব করে। এজন্য ভারতবর্ষে দুইটি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। একদল নিজেদের সূর্যবংশীয় এবং অন্যদল চন্দ্রবংশীয় ব'লে পরিচয় দিত। চন্দ্রের গুরুত্ব এখানেই শেষ হয়নি। ধর্ম-অনুষ্ঠানাদি চন্দ্রের তিথি অনুযায়ীই করা হয়ে থাকে। চাঁদ প্রথম দেখা যাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন তারাগোষ্ঠীর ভিতরে অবস্থান করে, এ ঘটনাও মানুষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবার পরে সহজেই বুঝতে পারা যায় ২৭ বা ২৮ দিন পরে চাঁদ পুনরায় একই তারাগোষ্ঠীর ভিতরে প্রত্যাবর্তন করে। এজন্য বিভিন্ন দেশে চাঁদের গতিপথের তারাসমূহকে ২৭ বা ২৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন দেশে এদের বিভিন্ন নাম আছে। চন্দ্রপথের এই ২৭ বা ২৮ ভাগের এক এক ভাগকে নক্ষত্র বলা হয়; চীনে এদের নাম হসিউ, আরবীতে এদের বলে মানাজিলুল-কামার আর মিসরীয় ভাষায় এদের বলা হয় চন্দ্রনিবাস। অনেকে মনে করেন, কোন একটি মাত্র দেশে এই চন্দ্রনিবাসসমূহের উৎপত্তি হয়, অন্যান্য দেশ সেই দেশ থেকেই এই ধারণা গ্রহণ করে। মেসোপটেমিয়ার সমভূমি আদি সভ্যতার জন্মভূমি। বেবিলনীয়, আসিরীয় এবং ক্যালডীয় যুগে জ্যোতির্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়। অনেকে মনে করেন, এখান থেকেই চন্দ্রনিবাসসমূহেরও প্রথম উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই ধারণা চীন দেশে কি ভাবে এলো, এর উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, ভারতবর্ষের নক্ষত্র এবং চীনা হসিউ-এর ভিতরে পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। চীনা হসিউ যে কেবল চন্দ্রের গতি ও অবস্থান নির্ণয়ের জন্যই ব্যবহৃত হত তা নয়। চীনা জ্যোতির্বিদ্যার মূল ভিত্তিই ছিল, হসিউ পদ্ধতি। এতে মনে হয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবেই চীনা হসিউ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং দেখা যায় যে, বৎসর ও দিনের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য অর্থাৎ পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য, সর্বপ্রথম চন্দ্রকেই ব্যবহার করা হয়। এক পূর্ণিমা থেকে অন্য পূর্ণিমা অথবা একটা নতুন চাঁদ থেকে পরবর্তী নতুন চাঁদ পর্যন্ত সময়, এই ২৯ বা ৩০ দিনকে একটা একক হিসাবে ব্যবহার করে, তাকে মাস বলা হতো। মাস শব্দটি চন্দ্রের প্রতিশব্দ থেকেই উদ্ভূত। যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় বলেন, "মাস শব্দের একটি অর্থ চন্দ্র। সূর্যমাসা=সূর্য ও চন্দ্র।" ইংরেজী Month শব্দটি যে moon থেকে উদ্ভূত এটা সহজে বুঝা যায়। কিন্তু চন্দ্রের সাহায্যে মাস গণনা করা হলেও, দেখা যায় যে, পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঋতুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে মাসের নাম রাখা হতো। যেমন বৃষ্টির মাস, পশুর বাচ্চা দেওয়ার মাস, শস্য বোনার মাস, ফসল কাটার মাস ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায় যে, বারোটা মাস পরে অর্থাৎ ১২×৩০=৩৬০ দিন পরে যদিও ঋতুর পুনরাবৃত্তি ঘটে, তবু কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই পুনরাবৃত্তি ঠিক হয় না। বারো বৎসরের মধ্যে ঋতুর আগমন প্রায় দুই মাস পিছিয়ে যায়। সেজন্য এরপরে, ঋতু ও মাসের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ের অর্থাৎ সৌর ও চান্দ্র বৎসরের ভিতরে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলতে থাকে।

যে সমস্ত দেশের লোক প্রধানতঃ কৃষি নির্ভরশীল, তারা স্বভাবতঃই সৌরবর্ষ গণনার প্রতি আগ্রহশীল। পৃথিবীর উত্তর অংশের প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্য তাদের বর্ষগণনাও অন্যরূপে করা হয়। লাব্রাডোরের এস্কিমোগণ শীতের দীর্ঘ রাত্রিতে বিশেষ কোন কাজকর্ম করে না। সেজন্য রাত্রির এই দীর্ঘ সময়কে কোন অংশে বিভক্তও করা হয় না বা তার জন্য পৃথক কোন নামকরণও করা হয় না। কিন্তু দিনের বেলাকে তারা চৌদ্দ অংশে ভাগ করে এবং প্রত্যেক ভাগের বিভিন্ন নামও আছে। প্রাচীনকালে অনেক দেশেই বৎসরের যে সময় কৃষিকর্ম বন্ধ থাকতো, সে সময়ের কোন নাম দেওয়া হতো না। রোমানরাও বারো চান্দ্রমাসের জন্য বৎসরকে বারো মাসে বিভক্ত না করে দশ মাসে বিভক্ত করতো। সেপ্টেম্বর থেকে

ডিসেম্বর মাসগুলো এখনো সেই দশ মাসের বৎসরই নির্দেশ করে। অনেক পরে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস যোগ করা হয়।

পৃথিবীর অনেক কৃষি-প্রধান দেশেই সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার বৎসরই ব্যবহার করা হতো। কৃষিকার্যের জন্য অর্থাৎ শস্য বোনা বা কাটার জন্য তা'রা সৌর বৎসর ব্যবহার করতো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য চান্দ্র বৎসরের ব্যবহার করতো। অনেক সময় উভয় প্রকার বৎসরের একটি সমন্বয় সাধন করা হতো এবং এজন্য কোন কোন বৎসরকে তেরো মাসে গণনা করা হতো। এই অধিক মাসকে অধিমাস বা মলমাস বলা হতো। এইভাবে সৌর ও চান্দ্র বৎসরের ভিতরে সম্বন্ধ বজায় রাখা হতো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি ঋতু ও তিথি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হতো। যেমন মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে হিন্দুরা শিবরাত্রি অনুষ্ঠান পালন করেন বা আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমীতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সৌর মাস ও চান্দ্র মাসকে সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করা হয়। এমনিভাবে পলিনেশিয়া ও আফ্রিকার নিগ্রোরা পূর্ণিমাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে, কিন্তু ফসল-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি ঋতু অনুযায়ী পালন করে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের দিন ঠিক করবার জন্য, কোন্ বৎসরে কতটি পূর্ণিমা বিবেচনা করতে হবে, সে সম্বন্ধে তা'রা আগে থেকেই সাবধান থাকে।

এতেও ক্রমে অসুবিধা দেখা দিতে থাকে। কেননা ঋতুর সঙ্গে পূর্ণিমার কোন সম্বন্ধ নেই। ঠিক একই সংখ্যক পূর্ণিমার পরে বা একই সংখ্যক নতুন চাঁদ দেখার পরে সব সময়ে একই ঋতুর পুনরাবির্ভাব হয় না অর্থাৎ শস্য বুনবার বা ফসল কাটার সময় হয় না। এজন্য মানুষ সূর্যকে ভালভাবে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত লক্ষ্য করতে যেয়ে তাঁরা দেখতে পান যে, সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে কতকগুলি তারাকে পুব আকাশে উদিত হতে দেখা যায়, আবার সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরেই পুব আকাশে কতকগুলি তারাকে উদিত হতে দেখা যায়। কিছুদিন পর্যবেক্ষণের পরেই তাঁরা বুঝতে পারেন যে, প্রত্যেক দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে ঠিক একই তারার উদয় হয় না বা সূর্যাস্তের সময়ও একই তারার উদয়

হয় না। অনেককাল এইরূপ পর্যবেক্ষণের পরে তাঁরা দেখতে পান যে, সূর্যোদয়ের বা সূর্যাস্তের সময় যে সমস্ত তারার উদয় হয়, তাদের সঙ্গে ঋতুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একই ঋতুতে ঠিক একই তারাগোষ্ঠী সূর্যোদয়ের বা সূর্যাস্তের সঙ্গে উদিত হয়। এইভাবে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, চন্দ্র-পথের চাইতে সূর্য-পথ নির্দেশ করা এবং চন্দ্রনিবাসের চাইতে সূর্যনিবাসই ঋতু-বৎসর নির্ণয়ের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এইভাবেই অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ বুঝতে পারতো যে, সূর্যাস্তের সময় পূব আকাশে কৃত্তিকার উদয় হলে বসন্তকালের শুরু হয়। জাভাদ্বীপের অধিবাসীরা কালপুরুষের কোমরবন্ধের তিন তারা দেখেই ঋতু ঠিক করতো। সূর্যোদয়ের সঙ্গে এই তিনটি তারা উদয় হলেই তাদের কৃষিবর্ষ আরম্ভ হতো। সূর্যোদয়ের সঙ্গে লুব্ধকের উদয় হলেই মিসরবাসীরা বুঝতে পারতো এইবার নীলনদে বন্যা আরম্ভ হবে এবং তখন সেইভাবে তারা প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করতো।

দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিশেষ চারটি অংশে সর্বপ্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই চারটি দেশই নদী-বিধৌত। হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং-এর সমভূমি চীনদেশ, গঙ্গা-যমুনার সমভূমি ভারতবর্ষ, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া এবং নীলনদের তীরবর্তী মিসর। যতদূর জানা যায়, তা'তে মনে হয় যে, এই চারটি দেশে প্রায় একই সময়ে সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। প্রত্যেকটি দেশেই বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য, তার সঙ্গে শহর, বন্দর গড়ে ওঠে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাও হয়। জ্যোতির্বিদ্যাও এই সময় থেকে একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে। খ্রীস্ট-পূর্ব ৪০০০ অব্দ থেকে খ্রীস্ট-পূর্ব ১০০০ অব্দের ভিতরেই এই চারটি দেশে সভ্যতার বিকাশ লাভ ঘটে। এই দীর্ঘ ৩০০০ বৎসরের মধ্যে, এই সমস্ত উন্নত দেশের ভিতরে যাতায়াত প্রথা গড়ে উঠেছিল কি-না এবং এ দেশসমূহের ভিতরে জ্ঞানের ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল কি না, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে মিসর ও মেসোপটেমিয়ার (প্রাচীনকালের বেবিলনিয়া, আসিরিয়া ও ক্যালডিয়া) ভিতরে যোগাযোগ ছিল ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না এবং ভারতবর্ষ

ও চীন এই দুই দেশের ভিতরেও কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, সে সম্বন্ধে সঠিক কোন কিছু জানা যায় না। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন।

প্রথম ভাগ

মিসর ● বেবিলনিয়া ● গ্রীস

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিসর

সাহারা-মরুভূমির পূর্বাঞ্চলে মিসর অবস্থিত। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর। এই মরুভূমির দেশে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। শীতকালে উত্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টি হয়। তবুও মিসর উর্বর ও শস্য-শ্যামল। নীলনদ মিসরের জীবন। এই নদীর দুই তীর অত্যন্ত উর্বর। এই নদীর বার্ষিক বন্যা ও সুনিয়ন্ত্রিত সেচ-পদ্ধতি মিসরকে শস্য-শ্যামল করে রেখেছে।

মিসরের আকাশে মেঘ হয় না। সূর্যকিরণ অকৃপণভাবে ও অপরিমিতভাবে মিসরের উপরে বর্ষিত হয়। রাত্রির আকাশ নির্মল। চাঁদ-তারায় শোভিত আকাশ পর্যবেক্ষণে মিসরে কোন সময়েই অসুবিধা হয় না। সুতরাং এমন দেশে জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আবিসিনিয়ার পাহাড়ের বরফ গলে নীলনদে বন্যার সৃষ্টি করে, এর দুই তীর প্লাবিত হয়। বন্যা সরে গেলে যে পলিমাটি পড়ে, তা'তে সমস্ত দেশ উর্বর হয়। বৎসরের অন্য সময়ে সেচ-পদ্ধতির সাহায্যে দেশের সমস্ত জমিতে পানি সরবরাহ করা হয়। সে জন্য অসুবিধা হয় না। অতি প্রাচীন যুগে মিসরের সম্রাটগণ পরিকল্পনামত নীলনদের পানি নিয়ন্ত্রণ করতেন। অনেক রাজবংশের ইতিহাস জানা যায়। প্রথম রাজবংশ খ্রীস্ট-পূর্ব ৩০০০ অব্দে, হয়তো বা খ্রীস্ট-পূর্ব ৪০০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে অনেকের ধারণা।

নীলনদের পানি সদ্ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জমিতে বাঁধ দেওয়ার প্রচলন

ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারে বন্যার পরে বাঁধ নষ্ট হয়ে যেত। প্রত্যেক লোকের জমি নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়ার প্রয়োজনেই মিসরে জ্যামিতির উদ্ভব হয়। প্রাচীন মিসরে যে জ্যামিতির চরম উন্নতি হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিরাট বিরাট পিরামিড, স্ফিংক্স, ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তিসমূহে। পিরামিডের বিভিন্ন পার্শ্বের নতি, সিঁড়ি ও গবাক্ষের অবস্থান, দিকস্থিতি ইত্যাদি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, মিসরীয় সভ্যতার যুগে জ্যামিতির ও কারিগরিবিদ্যার কত বেশী উন্নতি হয়েছিল।

প্রাচীন মিসরে বৎসরকে তিনভাগে ভাগ করা হ'তো। বন্যাকাল, শস্য বোনার কাল ও শস্য কাটার কাল। প্রথমে চান্দ্রমাসের হিসাবেই এই কাল তিনটি হিসাব করা হ'তো। বারোটি চান্দ্রমাসে ১ বৎসর গণনা করে, ৩৬০ দিনে ১ বৎসর ধরা হতো। পরে দেখা যায় যে, এতে ঠিকমত বৎসরের পুনরাবৃত্তি হয় না; প্রায় ৫ দিন পরে প্রত্যেকটি কালের পুনরাবৃত্তি হয়। সেজন্য পরবর্তী যুগে প্রত্যেক বৎসরের শেষ মাসকে অর্থাৎ দ্বাদশ মাসকে ৫ দিন বাড়িয়ে দেওয়া হতো। প্রথম প্রথম এতে বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা যায়নি। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে পুরোহিতগণ লক্ষ্য করেন যে, বন্যাকাল ঠিক সময়ে দেখা না দিয়ে বেশ কয়েক মাস পরে দেখা দেয়; এবং এটাও লক্ষ্য করেন যে, এই পরিবর্তন ধীরগতিতে হয়েছে, বৎসরের প্রায় প্রত্যেক মাসেই বন্যাকাল দেখা গেছে।

মিসরের পুরোহিতগণ লক্ষ্য করেন যে, নীলনদের বন্যা ও কৃষিবর্ষ আরম্ভের সঙ্গে আকাশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তখন মিসরের রাজধানী ছিল মেম্‌ফিসে। মেম্‌ফিসের পুরোহিতগণ লক্ষ্য করেন যে, আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধক যখন সূর্যোদয়ের সঙ্গে পূর্ব আকাশে উদিত হয়, তখন থেকেই নীলনদের পানি বাড়তে শুরু করে। এই ঘটনাকে তাঁরা আকস্মিক ঘটনা বলে মেনে নিতে পারেননি। কেননা, তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, বৎসরের যে মাসে বা যে সময়েই নীলনদের পানি বাড়তে আরম্ভ করুক না কেন, সে সময় সূর্যোদয়ের সঙ্গে লুব্ধকের উদয় হবেই। এজন্য মিসরবাসিগণ মনে করতো যে, এই তারাটির অধিষ্ঠিত দেবতাই

নীলনদের পানি নিয়ন্ত্রিত ক'রে মিসরকে রক্ষা করে। এ-তারাটির নাম ছিল স্বর্গীয় তারা 'সোথিস'। সূর্যের সঙ্গে সোথিসের উদয় একটি নিয়মিত ঘটনা। প্রতি ৩৬৫¼ দিনে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অতএব দেখা যায় যে, মিসরবাসীদের ৩৬৫ দিনের বৎসরে প্রতি ৪ বৎসরে এই ঘটনার ১ দিনের পার্থক্য হয়। এতে ৩৬৫ দিনের ৪×৩৬৫=১৪৬০ বৎসর পরে পুনরায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে লুব্ধকের উদয় হয়। এই সময়কে 'সোথিসকাল' বলা হতো। মিসরবাসীদের জীবনে এইভাবে লুব্ধকের স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য একে দেবতা বলে মনে করা হ'তো।

পিরামিডের অবস্থান লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, মিসরীয় জ্যোতির্বিদগণের পর্যবেক্ষণ কত সূক্ষ্ম ছিল। প্রতিদিন আকাশে সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তন হয়। সূর্যের উদয় প্রতিদিন আকাশের একই জায়গায় হয় না। সুতরাং ঠিক পূর্ব দিক কোন্ দিকে, এটা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু পিরামিডের গঠন অবস্থান দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে, প্রকৃত দিকসমূহ থেকে, প্রথম যুগের পিরামিডসমূহের দিকস্থিতির পার্থক্য মাত্র কয়েক ডিগ্রী। পরবর্তী যুগের পিরামিডগুলোর দিকস্থিতির এই পার্থক্য এক ডিগ্রীর কয়েক দশমাংশ মাত্র। এত সুষ্ঠুভাবে দিকস্থিতির একমাত্র কারণ এই হ'তে পারে যে, পিরামিডগুলো ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যবহার করা হতো। মৃত ফেরাউনদের আত্মাকে সঠিক পথ প্রদর্শনে এরা সাহায্য করে, এই উদ্দেশ্যেই হয়তো পিরামিডের দিকস্থিতির উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হ'তো। মিসরীয় পুরোহিতগণ পিরামিডকে মন্দির হিসাবে ব্যবহার করতেন, আবার এখান থেকেই আকাশের পর্যবেক্ষণ কাজও চালাতেন। মানমন্দির কথাটি বোধ-হয় এজন্যই ব্যবহৃত হ'তো। গির্জার সর্ববৃহৎ পিরামিডে আরোহণ করবার প্রধান সিঁড়িটি উত্তর দিকে অবস্থিত। মিসরীয়বিদদের ধারণা, যে সময় এই পিরামিডটি তৈরী করা হয়, তখন আলফা ড্রাকোনিস ছিল আকাশের ধ্রুবতারা। সেই তারাটির দিকে লক্ষ্য ক'রেই এই সিঁড়িটি তৈরী করা হয়।

মিসরীয়গণ বিশ্বকে একটি বাক্সের মত বলে মনে করতেন। এই বাক্সটির

তলগুলো আয়তাকারের এবং উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিস্তৃত। মিসর দেশটির আকারও অনেকটা এমনি এবং নিজেদের দেশের আকার থেকেই যে মিসরীয়গণ বিশ্বের আকারের কল্পনা করেন, সে কথা সহজেই বোঝা যায়। এই বাক্সের তলদেশে পৃথিবী অবস্থিত। আয়তাকার এই তলদেশটি সরু এবং এর মেজে অনেকটা অবতল। মিসর এই মেঝের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর উপরে লোহার ছাদের মত আকাশ। কেউ বলতেন, এই আকাশ চ্যাপ্টা (?) আবার কেউ বলতেন, গোলাকার। আকাশের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে আছে, সেই দিকটাতে বড় বড় দড়ি দিয়ে প্রদীপ ঝুলানো আছে। আবার কেউ কেউ বলতেন, কতকগুলো দৈত্য এই সমস্ত প্রদীপ বয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই সমস্ত প্রদীপ দিনের বেলায় নিভে যায় আবার রাত্রিতে জ্বালানো হয়। প্রথম যুগে মনে করা হ'তো যে, এই ছাদ চারটি থামের উপর স্থাপিত। কিন্তু পরবর্তী যুগে বলা হ'তে যে চারটি দিগ্‌বিন্দুতে চারটি বড় বড় পাহাড় আছে আর মাঝখানে আরো অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড়গুলোর চূড়ার সামান্য নীচ দিয়ে একটি বিরাট নদী পৃথিবীর চারদিকে বয়ে যায়। পাহাড়ের আড়ালে আছে বলে মানুষ এই নদীর উত্তর অংশ দেখতে পায় না। পাহাড়ের আড়ালের নদীর এই অংশটির নাম উর-নেস; এটি দাইত অধিত্যকায় গিয়ে পড়েছে। এই অধিত্যকাটি অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই নদী দক্ষিণ দিকে যেখানে বেঁকে গেছে, সেখান থেকে এর একটি শাখা মিসরের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। এরই নাম নীলনদ। উর-নেস নদীতে এখনো নৌকা আছে; এই নৌকাতে চড়ে সূর্য-দেবতা 'রা' আকাশপথে যাতায়াত করেন। 'রা' দেবতা প্রতিদিন সকালে নতুন করে জন্মগ্রহণ করেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত বড় ও শক্তিশালী হ'তে থাকেন। দুপুরে আকাশের মাঝখানে তিনি অন্য একখানা নৌকাতে আরোহণ করেন। এই নৌকাতে তিনি দাইত অধিত্যকা পর্যন্ত চলে যান। সেখান থেকে আবার অন্য আর একখানা নৌকাতে করে তিনি পূর্ব দুয়ারে যেয়ে পৌঁছান। রাত্রির অনন্ত অন্ধকারে তাঁর যাত্রাপথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পরবর্তী যুগে 'আম দুয়াৎ' বা অন্য জগৎ

নামে বইখানাতে 'রা' দেবতার রাত্রির যাত্রাপথের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হয়। এই সময়ে তিনি অন্য জগতের বাবোটি শহরকে আলোকিত করতে করতে পূর্ব দুয়ারে উপস্থিত হন। আবার অন্য অনেকের মতে (Ernst Zenner) আকাশকে সূর্যের দেবী 'নাত' বলে কল্পনা করা হয় এবং এই দেবীর শরীরের উপর দিয়ে নৌকাতে করে সূর্যকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম যুগের পিরামিড-গাত্রে সূর্যের এই যাত্রাপথের ছবি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়।

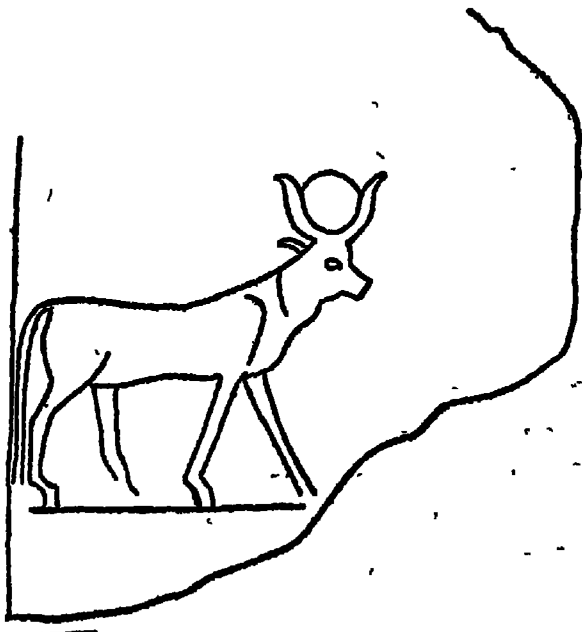


রেখাচিত্র ১ঃ সূর্য-দেবতা আমন রা-এর নৌকায় যাত্রা

সূর্যের বাহন এই নৌকাকে মাঝে মাঝে বিরাট একটা সাপে আক্রমণ করে, আর সেই জন্যই সূর্যগ্রহণ হয়। গ্রীষ্মকালে 'রা' দেবতার গতিপথের তির্যকতা কমে যায় এবং তিনি প্রায় মিসরের কাছে এসে পড়েন। শীতকালে এই পথের তির্যকতা বেড়ে যায় এবং তিনি মিসর থেকে দূরে সরে যান। সূর্যের এই কাছে আসা ও দূরে সরে যাওয়ার কারণও তাঁরা দিয়েছেন। মানুষের উপকারের জন্য সূর্যের নৌকা সব সময় উর-নেস নদীর তীর দিয়ে যায়। কিন্তু বন্যার সময় নদীর পানি যখন কূল ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সূর্যের নৌকা কূল থেকে দূরে স'রে যায়। চন্দ্রের (ইয়াহ, আউহ, কোন

কোন কোন জায়গায় চন্দ্রকে হোরাসের বাম চক্ষু বলে) নৌকা ও এই একই নদীতে যাতায়াত করে। সূর্য সকালে পূর্ব দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে, আর চন্দ্র সন্ধ্যায় পূর্ব দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে। সূর্যের মত চন্দ্রেরও শত্রু আছে। এই শত্রু একটি শূকরী। প্রতিমাসের ১৫ তারিখে এই শূকরী চন্দ্রকে আক্রমণ করে এবং ১৫ দিন যন্ত্রণাভোগের পর একটু একটু করে ক্ষয় হ'তে হ'তে অবশেষে চন্দ্র মারা যায় এবং আবার তার জন্ম হয়। কোন কোন সময় মাসের ১৫ তারিখে সেই শূকরী চন্দ্রকে একেবারে গিলে ফেলে, তখন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়।

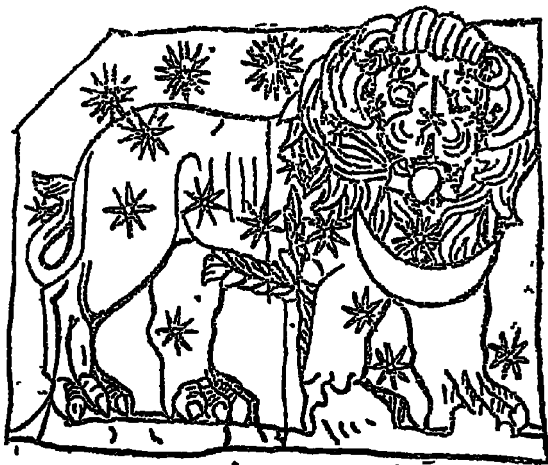
আকাশের তারাদের সম্বন্ধেও মিসরীয়গণ নানাবিধ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁ'রা দেখতে পান যে, কতকগুলো তারাপ্রদীপ সব সময় আকাশে থাকে, আকাশ ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। ইয়াপশেতাতুই (বৃহস্পতি)



রেখাচিত্র ২: সূর্য প্রতীকসহ বৃষ

কাহিবী (শনি) এবং ছাকু (বুধ) এই তিনটি গ্রহেব নৌকা, রা এবং ইয়াহুআউহুব নৌকাব মত সামনেব দিকে চলে। কিন্তু লাল গ্রহ দোশিবির (মঙ্গল) নৌকা পিছনেব দিকে চলে। এতে বোঝা যায় যে, মঙ্গলেব অধিকদিন স্থাষী বক্রগতি মিসবীষগণেব দৃষ্টি এড়ায়নি। বোনু (শুক্র) গ্রহকে যে দুই ভাবে দেখা যায়, মিসবীয়গণ সে কথা জানতেন। সন্ধ্যাতারা রূপে যখন একে দেখা যায, তখন এব নাম উযাতি। উযাতি সকলের আগে আকাশে দেখা দেয। শুকতাবা হিসাবে এব নাম তুইনুতিবি, অর্থাৎ সূর্যকে উঠবাব জন্য যে আহ্বান জানায।

ছাযাপথকে মিসবীযগণ আকাশেব নীলনদ বলে মনে কবতেন। হিন্দু-পুবাণেব সাথে এখানে যথেষ্ট মিল দেখা যায। হিন্দু-পুবাণেও ছায়াপথকে স্বর্গঙ্গা বলা হয। আকাশেব এই নীলনদ মৃতেব বাজ্য দিযে বযে যায় এবং মৃত ব্যক্তিগণ অসিবিসেব বাজত্বে অনন্ত সুখে কাল কাটায।



রেখাচিত্র ৩ঃ তাবা, চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতিসহ সিংহবাশি; এন্টিওকাস কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তরমূর্তি

আকাশেব তাবা দিযে নানাবকম ছবিব কল্পনাও মিসবীযগণ কবেছিলেন। মিসবীয ইতিহাসে স্বপ্নেব যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায। হজরত মুসার

সময় মিসরীয়গণ বৃষের পূজা করতো। বৃষের শিং-এর মাঝে সূর্যের ছবি যথেষ্ট দেখতে পাওয়া (১৬ পৃঃ দ্রঃ) যায়। বৃষের মাথাকে রাজকীয় সম্মান দেওয়া হতো। কোন কোন রাজমুকুট বৃষের মাথার অনুকরণে তৈরী করা হতো। বৃষের নামের সঙ্গে জড়িয়ে অনেক পাহাড়, শহর এবং মানুষের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন মিনোটর, টরিসা, টরিলী, টরিসেলী ইত্যাদি। উত্তর গোলার্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নাইথাকে মেষ বলি দেওয়া হ'তো। সিংহের সন্ধান পাওয়া যায় মিসরের স্ফিংকসে। এইভাবেই রাশিচক্রের রাশিচিত্রসমূহ মিসরীয় সভ্যতায় নানাভাবে স্থান পেয়েছে। রাশিচক্র ছাড়া অন্যান্য তারাও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সূর্যের সঙ্গে লুব্ধকের উদয় মিসরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লুব্ধকের সঙ্গে সঙ্গে মিসরবাসিগণকে আরো অনেক তারা ও তারামণ্ডলকে চিনতে হয়েছিল। তাঁরা জানতেন যে, কালপুরুষের উদয়ের পরেই লুব্ধকের উদয় হয়। থোসিসের (লুব্ধক) তারাকে তাঁরা কৃষি ও উর্বরতার দেবী আইসিস বলে মনে করতেন। কালপুরুষের কোমরবন্ধের তিন তারা তাঁরা চিনতেন এবং কালপুরুষকে তাঁরা আইসিসের স্বামী অসিরিস বলে মনে করতেন। অসিরিস ছিলেন পাতালের দেবতা। সৃষ্টির দেবতা আতুমের মৃত্যুর পরে, তাঁর দুই সন্তান শু'র (বাতাসের দেবতা) এবং তেফনাতের (আর্দ্রতার দেবতা) উপর বিভিন্ন বিষয়ের ভার পড়ে। এঁদের পরের দেবতা হলেন জেব (পৃথিবীর দেবতা) এবং 'নাত' (আকাশের দেবতা)। এর পরেই আইসিস ও তাঁর স্বামী অসিরিস দেবত্ব লাভ করেন। আইসিসের ভগ্নী নেফথিসের বিয়ে হয় অসিরিসের ভাই 'সেত'-এর সাথে। পৃথিবীর দেবতা জেবের মৃত্যুর পরে অসিরিস পৃথিবীর দেবতা হন; এইভাবে তিনি কৃষি ও উর্বরতারও ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁর ভাই 'সেত' নিজেকে অধিকতর যোগ্য মনে করে অসিরিসকে হত্যা করে। কিন্তু আইসিস নিজের স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং নিজে কৃষি ও উর্বরতার ভার গ্রহণ করেন। এজন্য দেখা যায়, পাতাল থেকে প্রতিরাত্রিতে আগেই আকাশে এসে অসিরিস স্ত্রী আইসিসের জন্য অপেক্ষা করেন।

সেকালে মিসরে যে ৩৬টি তাবামণ্ডল প্রচলিত ছিল, তাব মধ্যে আইসিস ও অসিবিস ছিল সর্বপ্রধান। মিসবীযদেব মধ্যে উত্তব আকাশেব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাবামণ্ডল হল তাইফুন বা সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রথম চাবটি তাবা সম্বন্ধে থিবসেব রাজসমাধিতে লেখা আছে যে, মানুষেব চাব দেবতাব আত্মা আকাশেব উত্তবদিকে আছে। এবা আকাশেব ভযাবহ তাইফুনকে যুদ্ধ থেকে সবিযে রাখে। উত্তবেব চাব দেবতার আত্মা আমুন-বা'এব নৌকাব সম্মুখেব ও পিছনেব বশি ধবে ঠিক পথে নিযে যায়। এদেব সঙ্গে চাবটি মণ্ডল আশেমুসেক চাবজন নাবিকও আমুন-বা-নৌকাতে কাজ কবে। মাশেটিমণ্ডল পাব হযে আমুন-বা-এর নৌকা শা কালপুরুষেব দক্ষিণে আকাশেব কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে। তাইফুন এই সময মাশেটিমণ্ডলকে স্পর্শ কবে। এই সমযে একে উত্তর-আকাশে দুইটি খুঁটিব সঙ্গে বেঁধে রাখা হয। জলহস্তীব আকাবে আইসিস একে পাহাবা দেন।

প্রাচীন মিসব সম্বন্ধে বলতে গেলেই পিবামিড সম্বন্ধে কিছু বলা প্রযোজন। পিবামিড নির্মাণেব উদ্দেশ্য কি ছিল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবলে মিসবেব প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেতে পাবে। ঐতিহাসিকগণ এবিষযে নানা প্রকাব ব্যাখ্যা দিযেছেন। কিন্তু সবই অনুমান মাত্র। আধুনিককালেব অনেকে মনে কবেন, এগুলি তদানীন্তন মিসবেব ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আবাব অন্য অনেকে মনে কবেন, এগুলি মিসবেব রাজাদেব সমাধি। এ ছাড়া নিম্নে প্রদত্ত ব্যাখ্যাও অনেকে দিযে থাকেন :

১। পিবামিডগুলোকে সমাধি ও মন্দিব উভযভাবেই ব্যবহাব করা হতো।

২। সাহাবা মরুভূমিব বালুবাশিব আক্রমণেব বিরুদ্ধে প্রতিবক্ষারূপে এগুলিকে ব্যবহাব কবা হতো।

৩। মানমন্দিবরূপে ব্যবহার কবা হতো।

৪। দুর্ভিক্ষের সময ব্যবহাব করবাব জন্য শস্যভাণ্ডাব হিসাবে এগুলিকে নির্মাণ কবা হয।

৫। নীলনদের বন্যার হাত হতে মিসরবাসীকে রক্ষা করবার জন্য এগুলিকে আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহার করা হতো।

এইরূপ আরো অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু এদের কোনটাকেই সন্তোষজনক বলে স্বীকার করা হয়নি। বড় তিনটি পিরামিড সম্বন্ধে এই ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এদের একটির উপকারিতা ও কার্যক্ষমতা শেষ হয়ে গেলেই অন্যটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পিরামিডগুলিকে সমাধিক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু বলে স্বীকার করা যায় না।

গিজার বড় পিরামিডটি সেমিটিক রাজা মেলকিজেদেকের আদেশে নির্মিত হয় বলেই অনেকে মনে করেন। পিরামিডটি ঠিক ত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে অবস্থিত। এর ভূমি একটি বর্গক্ষেত্র এবং চারটি কোণা ঠিক পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ দিকে স্থাপিত। এই সময়ে মিসরে 'পবিত্র হাত'কে দৈর্ঘ্যের একক রূপে ব্যবহার করা হতো। পৃথিবীর মেরু-অক্ষের দুই কোটি-ভাগের এক ভাগকে এক 'পবিত্র হাত' বলে মনে করা হতো। এক বৎসরের যত দিন আছে, পিরমিডের ভূমির প্রতিটি বাহু তত পবিত্র হাত দীর্ঘ। পিরামিডের ভূমির পরিসীমা ও তার উচ্চতার অনুপাত, একটি বৃত্তের ব্যাস ও তার পরিধির অনুপাতের সমান। পিরামিডবিদগণ বলে-থাকেন যে, বৃহৎ পিরামিডে এমন অনেক তথ্য নিহিত আছে যেগুলি সে যুগের কোন মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না। যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের সূক্ষ্ম পরিমাণ, অয়ণ-চলনের কাল, পৃথিবীর গড় ঘনত্বের প্রকৃত মান, পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপের গড় মান, পৃথিবীর প্রকৃত আকার, তার জল ও স্থলভাগের সূক্ষ্ম অনুপাত ইত্যাদি নানা বিষয় নাকি বৃহৎ পিরামিডে নানাভাবে উল্লেখ করা আছে। এ সমস্ত থেকে এঁরা বলতে চান যে, কোন স্বর্গীয় নির্দেশেই নাকি পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ

বেবিলনিয়া

ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিসেব মধ্যবর্তী স্থলভূমি মেসোপটেমিয়াকে মানব-সভ্যতাব আদিভূমি বলা যেতে পাবে। বাইবেলে এই জায়গাকে শিনার বলা হয়েছে। এব উত্তর অংশের নাম ছিল আক্কাদ আব দক্ষিণ অংশের নাম ছিল সুমেব। দুইটি অংশে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতিব লোকেব বাস ছিল। আক্কাদে বাস কবতো সেমিটিক জাতির লোক আব সুমেবেব অধিবাসীরা ছিল সুমেরীয় জাতিব। এই দুই জাতিব আচাব, ব্যবহাব, বীতি-নীতি এমন কি ভাষা পর্যন্ত আলাদা ছিল। এই দুই জাতির লোকেব চেহাবাতেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সুমেবীয়গণই ছিল এদেশেব আদিম অধিবাসী; আব সেমেটিকগণেব আদি বাসভূমি ছিল আবো পশ্চিমে; তাবা কোন কাবণে বিপুল সংখ্যায় এদেশে এসে বাস কবতে আবম্ভ কবে। সুমেবীয় ভাষাব সঙ্গে সেমিটিক বা ইন্দো-ইউবোপীয় ভাষাব কোন সম্বন্ধ নেই। সুমেরীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, খ্রীস্ট পূর্ব ৩০০০ অব্দেব নিকটবর্তী সময়ে, সুমেবেব দক্ষিণেব শহবগুলিতে অত্যন্ত উঁচুস্তবেব সভ্যতা বিবাজ কবতো। এই সমস্ত শহবেব মধ্যে সমুদ্রেব ধাবে এবিদু, মরুভূমিব ধাবে উব, উরুক, লাগাশ, নিপ্‌পুব, লাবসা প্রভৃতি শহব বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ কবেছিল। এই সমস্ত শহবেব মধ্যে একটিকে প্রধান শহব বলে বিবেচনা কবা হতো। উত্তরে সেমিটিকগণ যে সমস্ত শহবে বাস কবতো, সেগুলিব মধ্যে আগাদে, সিপ্‌পার, ববসিপ্‌পা ও বেবিলনেব নামেব উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত শহবেব লোকেবা সুমেরীয়দেব সভ্যতা ও কৃষ্টিব অনুসবণ বা অনুকবণ

করতে আরম্ভ করে। পশ্চিম দিক থেকে আরো অধিক পরিমাণে সেমিটিক জাতির লোক এদেশে অনুপ্রবেশ করার ফলে, এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে এবং সমস্ত দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। খ্রীস্ট পূর্ব ২৫০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে সমস্ত মেসোপটেমিয়া আগাদের শাসনকর্তা সারগনের শাসনাধীনে চলে যায়। এর পরে সারগনের ছেলে নারাম-সিনও সমস্ত মেসোপটেমিয়ার উপরে রাজত্ব করেন। এই সময়ে সেমিটিকগণকে সেনা-বিভাগে এবং সুমেরীয়গণকে শাসনকার্যের অন্যান্য বিভাগে নিয়োগ করা হতো। পরবর্তী শতাব্দীতে সমস্ত দেশের শাসনভার দক্ষিণ অংশের উপর এবং লাগাশের শাসনকর্তাদের হাতে যায়। তাঁরা নিজেদেরকে 'সুমের ও আক্কাদের সম্রাট্' বলে অভিহিত করতেন। খ্রীস্ট পূর্ব ২০০০ অব্দের পরে পশ্চিমদিক থেকে আমোরাইট বংশীয় লোকের আগমনের ফলে, সেমিটিকগণ আরো অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সমস্ত মেসোপটেমিয়া আবার তাদের অধীনে চলে যায়। এই সময়ে এখানে যে একটি বিরাট রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন হামুরাবী। এই বিরাট সাম্রাজ্য তখন ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিল্পে, সাহিত্যে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠে; আর সমস্ত কিছুর প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে বেবিলন।

সুমেরীয় জাতি কুনিফর্ম অক্ষর আবিষ্কার করেন। এর এক একটি চিহ্ন দ্বারা এক একটি শব্দ নির্দেশ করা হতো। সাধারণতঃ এই এক চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত শব্দটি দুইটি বা একটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি স্বরবর্ণ দ্বারা গঠিত। ধাতু দিয়ে তৈরী একটি কলম দিয়ে কাঁচা মাটির ফলকের উপর এই চিহ্নগুলি খোদাই করা হতো এবং তারপরে সেই মাটির ফলক পুড়িয়ে নেওয়া হতো। এই কুনিফর্ম অক্ষরগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের একদিকে সরু এবং অন্যদিকে চওড়া। এই অক্ষর বা চিহ্নগুলি সুমেরীয় ভাষার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ছিল। সেমিটিকদের ভাষার পক্ষে যদিও এই চিহ্নগুলি বিশেষ উপযোগী ছিল না, তবুও তারা তাদের ভাষার জন্যও এই চিহ্নই গ্রহণ করেছিল। বেবিলন যখন সভ্যতা, কৃষ্টি এবং সম্পদের চরমশীর্ষে অবস্থিত, তখন অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে মিসর এবং এশিয়া মাইনরেও

এই চিহ্ন বা অক্ষরের প্রচলন হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে কুনিফর্ম লিপিচিহ্নের ও ভাষার পাঠোদ্ধারের ফলে একটি লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। এর পূর্বে গ্রীক উৎস থেকে এই জাতির যে ইতিহাস জানা গিয়েছিল, তা' খ্রীস্ট পূর্ব ৭০০ অব্দের বেশী প্রাচীন নয়। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে হেনরী লায়ার্ড প্রাচীন নিনেভা অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য করতে গিয়ে অনেক স্থাপত্য, শিল্প, শিকারের দৃশ্যের খোদাই করা ছবি, এবং পাখাওয়ালা ষাঁড় ও ড্রাগনের ছবি উদ্ধার করেন। এর সঙ্গে কুনিফর্ম লিপিতে লেখা অনেক মাটির ফলকও আবিষ্কার করেন। এগুলো সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা না থাকলেও, এদের প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য বুঝতে পেরে তিনি এগুলোকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেন। অনেক বৎসর পরে জর্জ স্মিথ এদের পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন। প্রথম যে কুনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়, তাতে একটি বন্যার বিবরণ ছিল। এই সমস্ত মাটির ফলকের কুনিফর্ম লিপির প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরে, এইরূপ ফলক আরো অধিক পরিমাণে সংগ্রহের জন্য অভিযান চালানো হয়। পরে দেখা যায় যে, এই সমস্ত পোড়ামাটির ফলক সম্রাট আসুরবানিপালের লাইব্রেরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই লাইব্রেরীতে যে সমস্ত ফলক পাওয়া যায়, তার ভিতরে বিভিন্ন সময়ের বিবরণ সম্বলিত ফলক ছিল। কতকগুলি ছিল সম্রাট আসুরবানিপালের সময়ের বিবরণী, আবার কতকগুলি ছিল আরো অনেক প্রাচীন কালের। এগুলো পাওয়ার ফলে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার বিবরণ জানবার সুযোগ হয় এবং অনেকেই এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। যাঁরা এ কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন, তাঁদের আসিরিওবিদ বলা হয়। যে সমস্ত ফলক পাওয়া যায়, তার ভিতরে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষার সংমিশ্রণ দেখে আসিরিওবিদগণ প্রথম দিকে বেশ অসুবিধায় পড়েন এবং তাঁদের পাঠোদ্ধার ঠিক হচ্ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে প্রথম দিকে তাঁরা নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। পরে দেখা যায়, সেমিটিক এবং সুমেরীয় দুইটি ভাষাই একই কুনিফর্ম অক্ষরে লেখা হতো। তবে এই দুইটি ভাষার লিখবার ধরন যে সম্পূর্ণ পৃথক, পরে এ বিষয়টা

তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নানাপ্রকার গবেষণার পর, দুইটি ভাষারই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং আরো পূর্তকার্যের ফলে অধিকতর সংখ্যায় ফলক পাওয়া যায়। এর ফলে এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানা যায়।

প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও যথেষ্ট পরিমাণে জানা যায়। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যদেশের মত এই দেশেও আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো, দেখা যায়। অবশ্য এ সম্বন্ধে এক জায়গাতে বা একই জাতীয় ফলকে সুসংবদ্ধভাবে কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণী ফলকের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে হয়তো-বা মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। এই সমস্ত বিভিন্ন টুকরা টুকরা বিবরণ একত্রিত করে এই সময়ের জ্যোতির্বিদ্যার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। একই বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া গেছে। একই ফলকের বিভিন্ন প্রকার পাঠোদ্ধার এবং বিভিন্ন অর্থও করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য পরে অনেক গবেষণা করে একটি সর্বসম্মত পাঠ ও অর্থ করা হয়েছে এবং তা থেকে একটি তত্ত্বও গ্রহণ করা হয়েছে। হিউগো উইঙ্কলারের প্যান-বেবিলনীয় তত্ত্ব অনেকদিন পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের ভিতরে এই অঞ্চলে একটি অত্যন্ত উন্নত জাতির বাস ছিল। তাদের জ্যোতির্বিদ্যাও যথেষ্ট উন্নত ছিল। এই সময়ের জ্যোতির্বিদগণ বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের পরিভ্রমণকাল, এমন কি বিষুবনের অগ্রগতির ব্যাপারেও অবগত ছিলেন। এ থেকে এমন একটা মতবাদ গড়ে ওঠে, যাতে বলা হতো যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত জ্যোতির্বিদ্যার উৎসই ছিল বেবিলন। এই মতবাদ অনুসারে রাশিচক্রের ও অন্যান্য তারামণ্ডলের ছবি ও গল্প কাহিনীও এদেশেই প্রথম প্রচলিত হয়। পরে আরো অনেক ফলক পাঠের ফলে জানা গেছে যে, এ মতবাদ ঠিক নয়।

বেবিলনীয় রাজত্বের প্রথম যুগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম বিকাশলাভ ঘটে। শিল্প ও ব্যবসায়ে এদেশ অত্যন্ত উন্নত হয়।

বেবিলন তখন কেবলমাত্র মেসোপটেমিয়ার রাজধানী নয়, সমস্ত পশ্চিম-এশিয়ার কেন্দ্রভূমি। পূর্ববর্তী শতাব্দীসমূহের সুমেরীয় সভ্যতা এই সময়ে পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। সমাজের গঠন-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদির লিখিত বিবরণ এই সময়ে প্রচলিত হয়। এই বিবরণী এখনও 'হামুরাবীর নীতি' বলে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুসার নামে একটি জায়গা খননকালে একটি মৃৎ-ফলকে হামুরাবীর এই নীতি লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর যে সমস্ত ফলক পাওয়া গেছে, তাতে টাকা ধার করবার দলিল, জমি বেচা-কেনার দলিল, চাকুরীর নিয়োগপত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিবরণী পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে, এই সমস্ত দলিলপত্র বা নিয়োগপত্র সর্বদা মন্দিরে রাখা হতো; এতে মনে হয়, এ সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাও জড়িত ছিল। এই সমস্ত ফলক থেকে অনেক রাজার নাম, অনেক সময়ের ঘটনাবলী, অনেক তালিকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে এবং এগুলি থেকেই সেই সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

উরের রাজা ডুঙ্গির সময়ে সুমেরীয়তে যে বারো মাসের প্রচলন ছিল, সেগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এ সমস্ত নামের মধ্যেই দেখা যায় যে, চতুর্থ মাসের নামের সঙ্গে বীজ ও হাতের সম্বন্ধ আছে এবং একাদশ মাসের সঙ্গে শস্য ও কাটার সম্বন্ধ আছে। দ্বাদশ মাসের চিহ্নে শস্য ও ঘরের সম্বন্ধ দেখা যায়। মাসের নামসমূহ যে শস্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে বা ঋতুর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে করা হয়েছিল তা' এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই জন্যেই অনেক সময়ে দেখা যায় অধিমাস বা একটি ত্রয়োদশ মাসের প্রচলন ছিল। বেবিলনের প্রাধান্য লাভের পরে মাসসমূহের নাম সেমিটিক রূপ ধারণ করে। এই বারো মাসের নাম ছিল: নিসান্নু, এয়ারু, সিমানু, দুজু, আবু, উলুলু, তিশরিতু, আরাখসাম্না, কিসলিমু, তেবিতু, সাবাতু এবং আদারু। জ্যোতির্বিদ্যা ফলকসমূহে এই সমস্ত মাসের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। আর এই নামগুলি

প্রধানতঃ সুমেরীয় নামের প্রথম শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছিল।

প্রাচীন বেবিলনীয় সাম্রাজ্যে বৎসরের শেষে দ্বাদশ মাস আদারুকে অনেক সময় ত্রয়োদশ মাস হিসাবে গণনা করা হতো। ঋতুর সঙ্গে মাসের সম্বন্ধ ঠিক রাখার জন্য এরূপ দরকার হতো। এইরূপ ত্রয়োদশ মাসকে আমরা অধিমাস বলতে পারি। অবশ্য হিন্দু পঞ্জিকাতে অধিমাসের অন্য অর্থ করা হয়। যে মাসে একটিও অমাবস্যা হয় না তাকে অধিমাস বলে। সাধারণতঃ এই মাসকে অতিরিক্ত মাস মনে করে বৎসর গণনা থেকে এ মাসকে বাদ দেওয়া হতো। ঋতুর সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক রাখার জন্য যে মাসকে পুনরায় গণনা করা হয়, তাকে আমরা এখানে অধিমাস বলব। প্রাচীন বেবিলনীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত মৃৎ-ফলক পাওয়া গেছে, সে সমস্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিমাস নির্ণয় করার কোন নিয়ম-কানুন ছিল না। কোন্ মাসকে অধিমাস বলে ঘোষণা করা হবে, সেটা সম্পূর্ণ রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো। তিনি কোন সময় শস্যের অবস্থা দেখে, কোন সময় দেশের সাধারণ অবস্থা দেখে, আবার কোন সময় বা নেহায়েত ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে, যে-কোন একটা মাসকে অধিমাস বলে ঘোষণা করতেন। এমনও অনেক উদাহরণ আছে যে পর পর দুই বৎসরেই অধিমাস ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক সময়ে দেখা গেছে যে, কোন কারণে হয়তো অতি তাড়াতাড়ি পঞ্জিকা সংশোধনের প্রয়োজন দেখা গেছে, তখন দ্বাদশ মাসকে অধিমাস ঘোষণা না করে ষষ্ঠ মাসকেই অধিমাস ঘোষণা করা হয়েছে। এমন একটি দৃষ্টান্ত একটি ফলকে পাওয়া যায়। এই ফলকে বলা হয়েছে যে, "হামুরাবী ঘোষণা করলেন, যেহেতু এই বৎসর শুভ নয়, অতএব এর পরের মাসকে দ্বিতীয় উলুলু বলে ঘোষণা করা হবে। শস্য-খাজনা বেবিলনে ২৫শে তিশরিতুতে জমা না দিয়ে দ্বিতীয় উলুলুর ২৫ তারিখে জমা দিতে হবে।" এখানে দেখা যায় যে, যদিও বৎসরের একটি মাসকে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু রাজদরবারে শস্য-খাজনা পৌঁছানোর তারিখ পিছানো হয়নি।

পঞ্জিকা ঠিক করবার জন্য আকাশের কতকগুলি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হতো। অমাবস্যার পরে প্রথম চাঁদ দেখে মাসের প্রথম দিন ঠিক করা হতো। অবশ্য বেবিলনে প্রথম চাঁদ দেখার বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না। আবহাওয়া প্রায়ই শুষ্ক ও অত্যন্ত সুন্দর থাকতো। বিশাল উন্মুক্ত মাঠে দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখবার কোন অসুবিধাই হতো না। নানা প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ঠিক করবার জন্য পূর্ণিমার চাঁদ এবং অন্যান্য তিথির চাঁদ পর্যবেক্ষণ করা হতো। অনেকেই মনে করেন যে, চাঁদের এরূপ বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যেয়ে তারামণ্ডলের দিকে লক্ষ্য না করে বেবিলনের জ্যোতির্বিদগণ পারেননি। এই সময়েই হয়তো তাঁরা খামখেয়ালী গ্রহসমূহকেও লক্ষ্য করে থাকবেন। কোন কোন মৃৎ-ফলকে দুই একটি তারারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে মনে হয় যে, এই সময় থেকেই তারা সম্বন্ধেও তাঁরা উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

বেবিলনের জ্যোতির্বিদগণ চাঁদ দেখতে যেয়েই প্রথম লক্ষ্য করেন যে, একই তারাসমষ্টি সব সময়ে আকাশে থাকে না। পুরানো তারা পশ্চিমে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার নূতন নূতন তারা পূর্ব আকাশে দেখা দেয়। এই নূতন নূতন তারার আগমনের সঙ্গে যে ঋতুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এ-বিষয় তাঁরা বুঝতে পারেন। এই সমস্ত তারার সাহায্যেই তাঁরা পঞ্জিকা সংশোধন ও অধিমাস নির্ণয় করতেন। এই সময় থেকেই সূর্যাস্তের সঙ্গে বিশেষ তারার অস্ত বা সূর্যোদয়ের সঙ্গে বিশেষ তারার উদয় লক্ষ্য করে ঋতু ঠিক করার প্রথা প্রচলিত হয়। একটি মৃৎ ফলকে ৩৬টি তারার নাম পাওয়া যায়। প্রত্যেক মাসের জন্য তিনটি করে তারার নাম আছে। অনেকে বলেন যে, এই তিনটি তারার প্রথমটি সেই মাসের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এইভাবে দেখা যায় যে, নিসানু মাসের সঙ্গে 'দিলগান' (মেষ ও তিমি), এয়ারু মাসের সঙ্গে 'মুলমুল' (কৃত্তিকা; মূল অর্থ তারা), সিমানু মাসের সঙ্গে সিবজিয়ানু (কাল-পুরুষ) ইত্যাদি নাম জড়িত আছে। আর একটি মৃৎ-ফলক পাওয়া

গেছে; এটি অত্যন্ত ভাঙা এবং অনেক জায়গায় চিহ্নই নষ্ট হয়ে গেছে। এই ফলকটিতে লেখা আছে, "নিসানু মাসে দিলগান তারা দেখা যায়; তারাটি যতদিন অদৃশ্য থাকে ততদিন· মুলমুল তারাটি এয়ারু মাসে দেখা যায়· " ইত্যাদি। এইরূপ তারা দেখা যাওয়া বা অদৃশ্য হওয়ার সময় কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করবার নির্দেশও দেওয়া আছে।

প্রথম বেবিলনীয় সাম্রাজ্যের সময়েই সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি মহাকাব্য রচিত হয়। এতে বলা হয়েছে যে, বেবিলনের দেবতা মারদুক অন্য সমস্ত দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে এবং তিয়ামাত দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিহত করে এবং তার শরীর দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করে। এই সমস্ত যুদ্ধের বিবরণ, বিভিন্ন দেবতা ও দৈত্যের গল্প-কাহিনী ইত্যাদি দিয়ে মহাভারতের মত একখানা মহাকাব্য রচনা করা হয়েছিল। এই মহাকাব্যের এক জায়গায় আছে:

> "তিনি দেবতাদের নিবাস ঠিক করলেন;
> তারাসমূহ, তারাদের অবয়ব এবং মণ্ডলের আকার দিলেন;
> তিনি বৎসর নির্দিষ্ট করলেন; তাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করলেন।
> বারো মাসের প্রত্যেকটির জন্য তিনটি করে তারা ঠিক করলেন।
> ... ...
> চন্দ্র দেবতাকে আলো দিতে বললেন; তার উপর রাত্রির ভার দেওয়া হলো;
> তিনি তাকে নিযুক্ত করলেন; রাত্রির দেবতাকে; দিন নির্দিষ্ট করতে।"

এতে মনে হয় যে, এই সময়ের আগে থেকেই অনেক তারা ও তারামণ্ডলের নাম প্রচলিত ছিল। রাশিচক্রের বারোটি রাশির আকারই যে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নামকরণ করা হয়, এমন কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। গিলগামেশ মহাকাব্যে রাশিচক্রের কিছুটা উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাকাব্যে স্বর্গ সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। এতে রাশিচক্রের বারোটি রাশি সম্বন্ধে বারোটি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, এই মহাকাব্যখানা অনেক পরবর্তী যুগের রচনা। গ্রহ সম্বন্ধে এতে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। স্থির তারার সাহায্যে ঋতু ঠিক করা হতো বলে মনে হয়।

পরবর্তী শতাব্দীসমূহে বেবিলনের পতন হতে থাকে। পূর্বদেশসমূহ থেকে ক্যাসাইটগণ এসে বেবিলন অধিকার করে এবং পশ্চিম অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিন্তু এত বিপর্যের মধ্যেও বেবিলনে তারা সম্বন্ধে আলোচনা অব্যাহত থাকে। জমির সীমা ঠিক করবার জন্য যে সমস্ত পাথর ব্যবহার করা হতো, সেই সমস্ত পাথরে আকাশের দেবতাসমূহ ও তারামণ্ডলসমূহ আঁকা থাকতো। এই সমস্ত পাথরকে 'কুদুরুস' বলা হতো। বেবিলনের পতনের পরেও এই সমস্ত পাথরকে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে, হয়তো বা দেবতাদের কোপে পড়বার ভয়ে। এই সমস্ত পাথরে সূর্য, চন্দ্র এবং বোধ হয় শুক্র গ্রহের দেবতাও আঁকা দেখা যায়; এ ছাড়া বিভিন্ন তারামণ্ডলের ছবিও এ সমস্ত পাথরে খোদাই করা আছে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে ষাঁড়, শস্যগুচ্ছ, কুকুর, সাপ, বৃশ্চিক, মাছের লেজওয়ালা ছাগলের ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ছবিটি মকর রাশির। এশিয়া মাইনরের বোগাজকয় এক সময়ে হিতাইতদের রাজধানী ছিল। এই শহরে খনন কার্যের ফলে অনেক ইট পাওয়া গেছে। এই সমস্ত ইটে বেবিলন সম্বন্ধে নানাপ্রকার শ্লোক লেখা আছে। এই শ্লোকসমূহে অনেক তারা এবং তারামণ্ডলের নাম পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কৃত্তিকা, আলদিবরণ, কালপুরুষ, লুব্ধক, ফোমালহট, ঈগল, মীন এবং বৃশ্চিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃশ্চিককে 'গিরতার' বলা হতো। এর মধ্যে 'গির' চিহ্ন দ্বারা হুল এবং 'তার' চিহ্ন দ্বারা চিনটা নির্দেশ করা হতো। এবং এই দুইটি তারা দিয়ে তাঁরা বৃশ্চিকের হুল নির্দেশ করতেন। পরবর্তী যুগে গ্রীকগণও ঠিক একইভাবে এই দুটো তারার ব্যবহার করেছেন। নিপ্‌পুরে প্রাপ্ত মৃৎ-ফলকে দেখা যায় যে, বৃশ্চিকের হুল ও মাথা থেকে স্বাতি তারাটির দূরত্ব কোন একটি বিশেষ সংখ্যার ৯ ও ৭ গুণ। এতে মনে করা হয় যে, এই সময়েও আকাশের তারাদের ভিতরে দূরত্ব সূক্ষ্মভাবেই

নির্ণয় করা হতো। পরে এইরূপ আরো অনেক মৃৎ-ফলক পাওয়া গেছে। এই সমস্ত ফলকে ৯-এর সঙ্গে ১১, ১৫, ১৭, ১৯ প্রভৃতি অনুপাত ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমস্ত সংখ্যার সঙ্গে তারাসমূহের দূরত্বের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, ঠিক জানা যায় না।

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আরো একটি ফলক পাওয়া গেছে। এই ফলকটি প্রথম রাজবংশের সময়ের বলেই অনেকে মনে করেন। এই ফলকটি আসুরবানিপালের লাইব্রেরীতে ছিল এবং বর্তমানে এটিকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। এতে শুক্র গ্রহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। এই গ্রহটিকে 'নিন-দার-আন্না' বা আকাশের কর্ত্রী বলা হতো। গ্রহটির বিভিন্ন অবস্থানের জন্য কি কি ঘটনা ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। এই ফলকের এক জায়গায় লেখা আছে—

"আবু মাসের ষষ্ঠদিনে নিন-দার-আন্না পূর্ব-আকাশে উদিত হন; আকাশে বৃষ্টি হবে এবং নানা প্রকার বিপর্যয় ঘটবে। নিসানুর দশম দিন পর্যন্ত তিনি পূর্বদিকেই অবস্থান করেন; একাদশ দিনে তিনি অদৃশ্য হন। তিন মাস তিনি আকাশে থাকেন না। দুজুর একাদশ দিনে নিন-দার-আন্না হঠাৎ পশ্চিম দিকে দেখা দেন। দেশে শত্রুতা হবে; প্রচুর শস্য হবে।...

উলুলু মাসের সপ্তম দিনে নিন-দার-আন্না পশ্চিমে দেখা দেন।..."

পূর্বদিকে প্রথম দেখা দেওয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময় ৮ মাস ৫ দিন। তার পরে তিন মাস অদৃশ্য থাকবার পর শুক্র গ্রহকে আবার পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। তার পরে ৮ মাস ৫ দিন পরে আবার অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মাত্র ৭ দিন পরে পূর্বদিকে দেখা দেয়। অর্থাৎ পূর্বদিকে প্রথম দেখা দেওয়ার ঠিক ৯ মাস ১৭ দিন পরে শুক্র গ্রহকে আবার পূর্ব আকাশে দেখা যায়। এই হলো শুক্রের আবর্তনকাল। ঐ মৃৎ-ফলকের অন্যান্য অংশে যে সমস্ত ঘটনা ও তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সে সমস্ত বিষয় নানাভাবে বিবেচনা করে এই আবর্তনকাল নির্ণয় করা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে অনেক ভুল তথ্যও আছে এবং লিপিবদ্ধ

করবার সময় ভুল চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই সমস্ত ভুল তথ্য থেকে গ্রহের গড় আবর্তনকাল বের করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। নকল করতে ভুল করবার ফলে, শুক্রের অদৃশ্যকাল কোন কোন জায়গায় ২ মাস থেকে ৫ মাস ১৬ দিন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেজন্য গড় অদৃশ্যকাল ৩ মাস ধরা হয়েছে। এতে মনে হয় যে, পরবর্তী যুগে যে সমস্ত নকল-নবিশ এই সমস্ত ফলক নকল করেছিল, জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল এবং নকল করবার সময় তা'রা এদিকে বিশেষ মনোযোগও দেয়নি। আধুনিককালে এই সমস্ত ফলক সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে।

শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দেওয়া আছে, তার মধ্যে অনেক-গুলিই অন্য গ্রহের বা অন্য ঘটনার। এদের সঙ্গে শুক্রগ্রহের কোন সম্বন্ধই নেই। এর মধ্যে অষ্টম বৎসরের একটি লাইনে "স্বর্ণ সিংহাসনের বৎসরের" উল্লেখ আছে। ঠিক একই কথা অন্যত্রও দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম বেবিলনীয় বংশের শেষ রাজা আম্মিজদুগার ২১ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষের অনেক সরকারী দলিলে 'স্বর্ণ সিংহাসনের বৎসর' কথাটি দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে অনেকেই মনে করেন যে, পূর্বের ফলকে শুক্র গ্রহের যে ২১ বৎসরের কথা বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে রাজা আম্মিজদুগার রাজত্বের ২১ বৎসর সময়। শুক্রের ফলকে যে সমস্ত ১৩ মাসের বৎসরের উল্লেখ দেখা যায়, রাজার সরকারী দলিলসমূহেও সেই সব বৎসরকে ১৩ মাসের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে শুক্রগ্রহের ঘটনাবলী নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে। এইভাবে ঐ সমস্ত লিপিবদ্ধ ঘটনা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্ট পূর্ব ২০০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে ঐ সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল। এ থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, প্রথম বেবিলনীয় বংশের শেষ রাজার রাজত্বকাল খ্রীস্ট পূর্ব ২০০০ অব্দের কাছা-কাছি সময়। এই গণনাকার্যে নিম্নলিখিত বিবরণ বিশেষভাবে কাজে লাগানো হয়। "ষষ্ঠ বর্ষের আরাখসাম্না মাসের ২৬শ দিনে শুক্র পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হয়ে

যায় এবং পরের কিসলিমু মাসের তৃতীয় দিনে পূর্বদিকে উদিত হয়।" অর্থাৎ ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে সূর্যের সঙ্গে শুক্রের সংযোগ এবং সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রের সংযোগ অনেকটা এক সঙ্গে হয়ে থাকে। গণনা করে দেখা গেছে যে, খ্রীস্ট পূর্ব ১৯৭১ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী এইরূপ সংযোগ সংঘটিত হওয়ার বেশী সম্ভাবনা ছিল। এ থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্ট পূর্ব ২২২৫ অব্দ থেকে খ্রীস্ট পূর্ব ১৯২৬ অব্দ পর্যন্ত প্রথম বেবিলনীয় রাজবংশ রাজত্ব করে এবং হামুরাবীর শাসনকাল ছিল খ্রীস্টপূর্ব ২১২৩ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ২০৮১ অব্দ পর্যন্ত। নিসানুর প্রথম তারিখে আমাদের পঞ্জিকার প্রায় ২৬শে এপ্রিলের মত হয়।

এত প্রাচীন কালের ঘটনার এমন সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা হয়েছে, এতে সন্দেহ জাগে। সন্দেহ অবশ্য নেহায়েৎ অমূলক নয়। পরবর্তী যুগে দেখা যায় যে, এই সমস্ত সূক্ষ্ম গণনাতে যথেষ্ট ভুল ছিল। যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে, তার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার তারিখ পাওয়া যেতে পারে। সূর্যের ও শুক্রের সংযোগ প্রতি আট বৎসরে একই অবস্থায় সংঘটিত হয়, এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই সময়ের ২ ৪ দিন আগেই এইরূপ সংযোগ ঘটে থাকে। আবার সূর্য ও চন্দ্রের সংযোগের পুনরাবৃত্তিও ঠিক ৮ বৎসরে ঘটে না, তার ১'৬ দিন পরে ঘটে। সুতরাং ৮ বৎসর পরের দুইটি ঘটনা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সংযোগ দুইটি প্রায় ঐ সময়ের নিকটবর্তী সময়েই ঘটে। কিন্তু ৭টি আট বৎসর পরে, সূর্যের সঙ্গে শুক্রের সংযোগ ঘটে ১৭ দিন আগে এবং সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রের সংযোগ ঘটে ১১ দিন পরে। অতএব দেখা যায় যে, দুইটি সংযোগকালের মধ্যে পার্থক্য ২৮ দিনের। এতে প্রতি ৫৬ বা ৬৪ বৎসর পরপর এরূপ দুইটি পৃথক তারিখ পাওয়া যায়। সুতরাং জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে সূক্ষ্ম ভাবে প্রকৃত সময় নির্ণয় করা সব সময়ে সম্ভব নয়। এজন্য ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনা বিবেচনা করবার প্রয়োজন হয়। জ্যোতির্বিদ্যা গণনায় প্রথমে যে সময় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিকগণ বেবিলনীয় প্রথম রাজ বংশের শাসনকাল খ্রীস্ট পূর্ব ২০০০ অব্দের নিকটবর্তী সময় বলে মেনে নিতে রাজী হন। পরবর্তী যুগের গবেষণাতে যে সময় পাওয়া গেছে, তা উপরের নির্ণীত সময়ের বড় জোর ১২০ বৎসর পরে বলে

মেনে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে স্বীকার করা হয় যে, খ্রীস্টপূর্ব ১৬৪১ অব্দের ২৫শে ডিসেম্বর ঐ দুইটি সংযোগ একত্রে সংঘটিত হয়েছিল। আরো স্বীকার করা হয় যে, হাম্মুরাবীর শাসনকাল ছিল খ্রীস্টপূর্ব ১৭৯২ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত এবং ঐ বংশের রাজত্বকাল ছিল খ্রীস্টপূর্ব ১৮৯৪ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ১৫৯৫ অব্দ পর্যন্ত।

ঐতিহাসিক তারিখ যাই হোক না কেন, এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বেবিলনীয় রাজ্যের প্রথম দিকে এবং হয়তো বা তার আগে থেকেই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুক্রগ্রহ পর্যবেক্ষণ করা হতো। অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রেও যদি একইরূপ আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হতো, তাহলে পরবর্তী আসিরীয় যুগের মৃৎ-ফলকে তার সন্ধান পাওয়া যেত। কিন্তু এক শুক্রগ্রহ ছাড়া অন্য কোন গ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, অমাবস্যার পরে বা আগে চাঁদ দেখবার জন্য পুরোহিতগণ যেভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন তাতে অতি উজ্জ্বল শুক্রগ্রহ তাঁদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি এবং এই জ্যোতিষ্কটিকেও তাঁরা একটি প্রধান দেবতা বলেই মনে করতেন। পরবর্তী যুগেও দেখা যায় যে সূর্য, চন্দ্র ও শুক্রগ্রহকে এক পর্যায়ে এবং অন্য চারটি গ্রহকে অন্য পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন, শুক্রের কলার বিষয়ও বেবিলনের জ্যোতির্বিদগণ অবগত ছিলেন। একটি মৃৎ-ফলকের বিবরণীর অর্থ নিয়ে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। অনেকে এই ফলকটির এইরূপ পাঠ করেন: 'যখন ইশতার দক্ষিণ শিং-এর দিকে কোন তারার দিকে যায়, তখন দেশে প্রাচুর্য দেখা দেবে। আর ইশতার যখন বাম শিং-এর দিকে কোন তারার দিকে এগিয়ে যায় তখন দেশে অভাব দেখা দেবে।' এতে অনেকে মনে করেন যে, সেই দেশের সুন্দর আবহাওয়াতে শুক্রের কলা দেখা হয়তো অসম্ভব ছিল না। আধুনিককালেও খালি চোখেই নাকি অনেকেই শুক্রের কলা এবং বৃহস্পতির উপগ্রহ দেখতে পান। কয়েকজন আমেরিকান পাদ্রী এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে দাবী করেন। এ সমস্ত দাবী যতই উদ্ভট হোক না কেন এবং প্রাচীন বেবিলনীয়-গণের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার যতই প্রচার করা হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার

করা যায় না যে, সে সময়ে চাঁদের সহোদরা শুক্রকে অত্যন্ত মনোযোগের সাথেই পর্যবেক্ষণ করা হতো। এই গ্রহটি কখন প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় আর কখন থেকে অদৃশ্য হয়, এই ঘটনাগুলি ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হতো। এ ছাড়া পুরোহিতগণ এর আবর্তনকাল নির্ণয় করে, তার সাহায্যে নানাপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণীও করতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসিরিয়া

খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ অব্দেব প্রথম দিকে তাইগ্রিস নদীব উপব দিকে উত্তব অঞ্চলে একটি সেমিটিক জাতিব অভ্যুত্থান হয। তাদেব সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা যে স্থানে বাজত্ব কবতেন। তাঁব নাম ছিল আস্সুব (অসুব?)। কালক্রমে আস্সুব অত্যন্ত পরাক্রমশালী দেশে পবিণত হয এবং যুদ্ধবিগ্রহ কবে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ জয কবে নেয। বেবিলনীয়া এইভাবে আস্সুবেব নিকট পরাজিত হয। আস্সুব বাজ্য বা আসিবিয়া ক্রমেই বিস্তাব লাভ কবে এবং কালক্রমে মেসোপটেমিয়ার সমতল ভূমিতে একটি শক্তিশালী বাজ্যে পরিণত হয। খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে আসিবিয়া পশ্চিম এশিয়াব সর্বাপেক্ষা পবাক্রমশালী বাজ্য বলে পবিগণিত হতো। এই বাজ্যের কযেকজন রাজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদেব মধ্যে তিগলাথ-ফিলেসাব (খ্রীঃ পূঃ ৭৪৫—৭২৭), শালমানেসাব (খ্রীঃ পূঃ ৭২৬—৭২২), সাবগন (খ্রীঃ পূঃ ৭২২—৭০৫), সেনাচেবিব (খ্রীঃ পূঃ ৭০৫—৬৮২), আসাবহেদন (খ্রীঃ পূঃ ৬৮২—৬৬৮) এবং আস্সুববানিপাল (খ্রীঃ পূঃ ৬৬৮—৬২৬) বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এঁদেব সমবে সিবিয়া, প্যালেস্টাইন, ফিনিসিযা এমন কি মিসব পর্যন্ত আসিরিয়াব অধীনে আসে। এই সমস্ত দেশ জয় কবতে অনেক বড় বড় এবং ভযাবহ যুদ্ধ সংঘটিত হযেছে। পবে এশিযা মাইনব, আর্মেনিযা এবং মিডিযা পর্যন্ত এঁদেব বাজ্য বিস্তাব লাভ কবে। আধুনিক আসিবীযবিদগণেব মতে, এঁদের এইরূপ বিরাট জযের একমাত্র কাবণ, এঁবা লৌহেব অস্ত্র ব্যবহাব কবতেন। যতদূর জানা যায, আসিবীযগণই সর্বপ্রথম লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেন। এই রাজ্যের

নতুন রাজধানী ছিল নিনেভা। এই বিরাট রাজ্যের সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক কার্যের কেন্দ্রস্থল ছিল এই নিনেভা শহর। এই সমস্ত কারণে এখানে বিরাট বিরাট সৌধ গড়ে ওঠে। অন্যদিকে বেবিলন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এখানকার অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত ধনী ও সভ্য। এজন্য বেবিলনীয়রা যদিও আসিরিয়ার অধীনে ছিল, কিন্তু এখানকার লোকেরা অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত ছিল এবং রাজধানী বেবিলন ছিল কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। আসিরীয় সম্রাটগণও বেবিলনের গুরুত্ব স্বীকার করতেন ; তাঁরা সেখানে যেয়ে 'মারদুকের করমর্দন করতেন', অর্থাৎ সেখানে যেয়ে, হয় শান্তভাবে শাসনভার গ্রহণ করতেন, আর না হয়, সেখানকার কোন লোককে তাদের অধীনস্থ রাজা মনোনীত করে, তাঁর হাতে শাসনভার ন্যস্ত করতেন।

ইতিহাসে যুগে যুগে দেখা গেছে যে, শক্তির বলে কোন সুসভ্য দেশ পরাজিত হলেও, কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিজিত দেশই বিজয়ী দেশকে পরাজিত করেছে এবং বিজয়ী দেশ বিজিত দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে। আসিরীয়দের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। শারীরিক শক্তির বলে আসিরীয়গণ বেবিলনীয়াকে পরাজিত করলেও, তারা সে দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার নিকট মাথা নত করতে বাধ্য হয় এবং অবশেষে সেই সভ্যতা ও কৃষ্টি গ্রহণ করে। বেবিলনের রীতিনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি এমন কি দেব-দেবতাকেও আসিরীয়গণ মেনে নেয় ; তবে তাদের নিজস্ব দেবতা আসুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলেই মানতে থাকে। পুরাতন পুরোহিতগণ তাঁদের নিজস্ব পুরাতন পদ্ধতিতে গণনার কাজ করতে থাকেন। একমাত্র পার্থক্য দেখা যায়, শাসনকর্তার পরিবর্তন। পূর্বে যেখানে বেবিলনীয় বংশের রাজাদের ভবিষ্যৎ গণনা করা হতো, পরে সেখানে গ্রহাদির অবস্থান দেখে আসিরীয় রাজাদের শুভাশুভ গণনা করা হতে থাকে। শিল্পী ও কারিগরগণ তাঁদের নিজ প্রথামতই কাজ করতে থাকেন ; বরং এখন তাঁদের কাজের আরো উন্নতি হতে থাকে। তার কারণ, নতুন রাজারা এ সমস্ত শিল্পীদের যথেষ্ট উৎসাহ তো দিতেনই, তা'ছাড়া

পুরানোকালের মাটির পরিবর্তে শিল্পীগণ এখন পাথর ব্যবহার করতে পারতেন। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহও আসিরীয় সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। আসিরীয় সম্রাটগণ এই সমস্ত দেশ থেকে পাথর আনিয়ে শিল্পীদের দিতে থাকেন; আর শিল্পীগণ এই উন্নততর পদার্থের সাহায্যে উন্নততর শিল্পকার্য করবার সুযোগ পান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মিউজিয়ামে এই সমস্ত পাথরের শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ীঘর এবং রাস্তা নির্মাণ কার্যেও পাথর ব্যবহার করা হতে থাকে। এইভাবে সভ্যতা ও কৃষ্টির বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট উন্নতি হয়। এ সমস্ত কাজের জন্য অর্থের অভাব কোনদিনই হয়নি। বিভিন্ন দেশ লুট করে আসিরীয় সম্রাটগণ যে সমস্ত ধনরত্ন আনতেন, তা থেকেই এই সমস্ত কাজে অর্থ ব্যয় করা হতো। কালক্রমে যোদ্ধার পরিবর্তে এই দেশে যখন সত্যিকার রাজারা রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁরা যুদ্ধের পরিবর্তে শিল্প ও বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেন এবং এই সমস্ত শিল্পকর্ম সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট যত্ন নেন। এই সময়েই আসিরীয় সভ্যতার চরম বিকাশ লাভ ঘটে। এই সময় সম্রাট আসুরবানিপাল তাঁর প্রাসাদে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা-করবার পরেই তিনি আদেশ দেন যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বেবিলনিয়ার বিভিন্ন মন্দিরে যে সমস্ত পুস্তক (মৃৎ-ফলক) আছে, সেগুলির প্রত্যেকটিকে নকল করে তাঁর পাঠাগারে রাখতে হবে। এইভাবে হাজার হাজার মৃৎ-ফলক অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও নিপুণতার সাথে তাঁর পাঠাগারে সংরক্ষিত হয়। ফলকগুলি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সাজানো হয়। প্রত্যেক ফলকের সারির আরম্ভে বিষয়ের নাম স্পষ্টভাবে লিখিত হয়। প্রত্যেক বিষয়ে পুস্তক তালিকা নির্মাণ করা হয় এবং তাতে প্রত্যেক পুস্তকের বিশদ বিবরণও দেওয়া হয়। নানা প্রকার অভিধান, বিভিন্ন পুস্তকের টীকা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয় এবং সে সমস্ত রাখবার জন্য নতুন নতুন ঘরও তৈরী করা হয়। একটি মাত্র জায়গা থেকে এরূপ ১৩,০০০ মৃৎ-ফলক পাওয়া গেছে; এগুলি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। আরো বিভিন্ন জায়গা থেকে এরূপ আরো হাজার হাজার ফলক উদ্ধার

করা হয়েছে। এই সমস্ত ফলক থেকে সে সময়ের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালী, ব্যবসায়-পদ্ধতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। মোটের উপর এই সমস্ত ফলকের সাহায্যে সে সময়ের সমাজের একটি স্পষ্ট রূপ আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে।

অসংখ্য মৃৎ-ফলকে সে যুগের এবং তার আগের যুগের পঞ্জিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। অমাবস্যার পরে প্রথম চাঁদ দেখা যাওয়ার দিন থেকে আরম্ভ করে, বারোটি চন্দ্রমাসের নাম এবং মাঝে মাঝে ত্রয়োদশ মাসের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত অধিমাস কিভাবে কোন বিশেষ বৎসরের অন্তর্ভুক্ত করা হ'তো, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে নানা প্রকার পাঠ দৃষ্টে মনে হয় যে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে কোন তারার উদয় লক্ষ্য করেই এরূপ করা হ'তো। পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, আস্থুরবানিপালের পাঠাগারে রক্ষিত মৃৎ-ফলকে ৩ × ১২টি তারার উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিমাস নির্ণয়ে এই সমস্ত তারার ব্যবহার করা হ'তো বলে মনে হয়। জর্জ স্মিথ একটি ফলকের এইরূপ অর্থ করেন: নিসানুর প্রথম দিনে চন্দ্র এবং মলমল (কৃত্তিকা) যদি একত্র থাকে, তা'হলে সে বৎসর সাধারণ বৎসর। কিন্তু নিসানুর তৃতীয় দিনে যদি চন্দ্র ও মলমল একত্র থাকে, তা'হলে সে বৎসর পরিপূর্ণ। ঐ বাক্যের শেষ অংশের অর্থে বলা হয়েছে, সূর্যাস্তের অনেক পরেও কৃত্তিকাকে দেখা যায় এবং যেহেতু এই সময়টা বসন্ত-কালের একেবারে প্রথম দিকে, অতএব একটি ত্রয়োদশ মাস সংযোজন করা দরকার। আকাশের তারা ও তারামণ্ডলসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই তিন অংশকে এনলিল, আনু এবং ইয়া বলে।

আসিরীয় সভ্যতা যখন চরম শিখরে উন্নীত হয়, তখন থেকে দেখা যায় যে পঞ্জিকা প্রণয়ন বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে তারা পর্যবেক্ষণ করা হতো না। এই সময় থেকে তারা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ হ'য়ে পড়ে। জ্যোতিষ চর্চা এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। আকাশের ঘটনাবলী দ্বারা

মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, এমনি একটা মনোভাব প্রচলিত হ'যে পড়ে। রাজার, রাজ্যের এবং রাজ্যের সমস্ত লোকের ভাগ্য আকাশের তারাসমূহ থেকে জানা যেতে পারে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'যে পড়ে। এজন্য আকাশের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা হ'তে থাকে এবং এগুলি লিপিবদ্ধও করা হ'তে থাকে। পঞ্জিকার সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। কোন্ বৎসর ১২ মাসে হবে, আর কোন্ বৎসর ১৩ মাসে হবে, এ নিয়ে সাধারণ মানুষের কোন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে, এ বিষয় জানবার উৎসাহ সাধারণ ও অসাধারণ উভয় প্রকার মানুষেরই সমান ছিল। আর তারার সাহায্যে ভবিষ্যৎ জানা যেতে পারে, এই বিশ্বাস যখন সমাজে প্রচলিত হ'যে পড়লো, তখন সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষই তারা দেখার জন্য একটি বিশেষ প্রেরণা অনুভব করতে থাকে। রাজা নিজের রাজ্যের ভবিষ্যৎ গণনার জন্য বড় বড় পুরোহিত নিয়োগ করতেন।

আদিম যুগের লোকেরা মনে করতো যে, তাদের চারিদিকে শত শত সতর্ক দেবতা সর্বদা সজাগ আছে এবং সর্বতোভাবে তারা মানুষের জীবন পরিচালিত করছে। এই সমস্ত দেবতা তুষ্ট থাকলে মানুষের শুভ হয়, আর রুষ্ট হলে এরা অমঙ্গল সাধন করে। তাই এই সমস্ত দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য নানা প্রকার পূজা-পার্বণ, যাগযজ্ঞের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত দেবতাকে আকাশের অধিবাসী ব'লে মনে করা হ'তো। আরো মনে করা হ'তো যে, আকাশের তারাসমূহ এদের আবাসস্থল। অনেক সময় আকাশের গ্রহ-তারাকেই দেবতা ব'লে মনে করা হ'তো। এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের গতিগতির উপরেই মানুষের ভবিষ্য নির্ভর করে। মঙ্গল-অমঙ্গল বিধানকারী গ্রহ ও তারাসমূহ আকাশের অধিবাসী হলেও, নানা প্রকার ইঙ্গিতের বা ঘটনার সাহায্যে তা'রা মানুষকে তাদের মনোভাব জানিয়ে দেয় এবং আশু বিপদের সম্ভাবনা থাকলে তার প্রতিকার বিধানেরও নির্দেশ দেয়। লাগাসের রাজা গুদিয়া (খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ) কিভাবে মন্দির তৈরী করবার নির্দেশ পান, একটি গোলাকার মৃৎ-ফলকে তার বিবরণ পাওয়া যায়। 'একদিন রাত্রিতে রাজা স্বপ্ন দেখেন

যে, ইয়ার-কন্যা দেবী নিসাবা রাজার সামনে উপস্থিত হয়েছেন ; তাঁর এক হাতে মৃৎ-ফলকে লিখবার একটি উজ্জ্বল কলম, এবং অন্য হাতে মঙ্গলসূচক আকাশের সঙ্কেত-যুক্ত একটি মৃৎ-ফলক। তিনি চিন্তা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবী মন্দির নির্মাণ করবার শুভ তারা ঘোষণা করলেন।'

নিনদারু-আনা মৃৎ ফলক থেকে একথা স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রথম বেবিলনীয় রাজবংশের সময় থেকেই, আকাশে যখনই গ্রহ সংক্রান্ত কোন ঘটনা ঘটেছে তার উপরে ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ, বিশেষ তারাসমূহের অবস্থান তথ্যাদির প্রয়োজন হ'তো, আর সেজন্য এই সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করা হ'তো এবং তালিকাভুক্ত ক'রে সংরক্ষণ করা হ'তো।

আকাশের ঘটনাবলী যে মানুষের শুভাশুভ নির্দেশ করে, এই বিশ্বাস, বেবিলনের ধর্মগুরু ও পুরোহিতদের, এবং রাজ-রাজড়া ও জনসাধারণের একপ্রকার জীবনের অঙ্গস্বরূপ ও জীবনশক্তি ছিল। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশ-সমূহেও এই বিশ্বাস বেবিলনীয়া থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। কোন যুদ্ধ বিগ্রহে যাওয়ার আগে, রাজা রাজ-জ্যোতির্বিদগণকে ডাকিয়ে এনে, আকাশের সমস্ত ঘটনাবলী বিচার ক'রে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলাফল জানতে চাইতেন। যে কোন বৃহৎ কাজ আরম্ভ করবার পূর্বে রাজ-জ্যোতির্বিদগণকে এ সম্বন্ধে আকাশ-সঙ্কেত নির্ণয় করতে হ'তো। শুধুমাত্র রাজধানীতে বা রাজদরবারে নয়, রাজ্যের সমস্ত জায়গার মন্দির থেকেই আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হ'তো এবং এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের তথ্যাদি, বিবরণাবলী ও তাদের ব্যাখ্যা অনবরত রাজদরবারে সরবরাহ করা হ'তো। ঐ তথ্যাদি ও বিবরণাবলী আসুরবানিপালের পাঠাগারে সংরক্ষিত হ'তো এবং ঐ পাঠাগার থেকে প্রাচীন তথ্যাদি এবং বিবরণাবলী পাঠ ও বিচার করে, সমস্ত ঘটনার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করা হ'তো। অবশ্য কেবলমাত্র আকাশের ঘটনা থেকেই যে ভবিষ্যতের সঙ্কেত পাওয়া যেত তা নয়। দেবতাগণ প্রকৃতির সর্বত্র এই সঙ্কেত ছড়িয়ে রাখতেন। বলির পশুর যকৃতের ও বিভিন্ন অংশের অবস্থাতেও

এই সঙ্কেত নিহিত থাকতো। উড়ে যাওয়া পাখীর ঝাঁকের দিক ও গতি, গর্ভপাত, ভূমিকম্প, মেঘ, রঙ-ধনু, সূর্যশোভা ইত্যাদি সমস্ত কিছু থেকেই ভবিষ্যতের সঙ্কেত পাঠ করা হ'তো এবং তাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হ'তো। উপকথার রাজা সারগণও এই সমস্ত সঙ্কেতের কোনটি ঘটলে ভবিষ্যতে কি ফল হবে, তার বিবরণী দিয়েছেন ব'লে অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবশ্য সমস্ত নৈসর্গিক ঘটনার ভিতরে আকাশের ঘটনাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, আকাশে কি ঘটনা ঘটলে বা কি অবস্থা হ'লে, পৃথিবীতে রাজার, রাজ্যের বা সাধারণ লোকের অবস্থা কি হবে বা ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তার বিবরণ দেওয়া আছে। সে বস্তু সমূহের মধ্যে সূর্য ও স্থির তারাসমূহের বিষয় অত্যন্ত বিরল। যে সমস্ত খ-বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন সহজে দেখা যায়, তাদের অবস্থা অনুসারে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে; এর মধ্যে চাঁদ ও গ্রহসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। গ্রহসমূহ স্থির তারাসমূহের ভিতরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান অধিকার করে এবং বিভিন্ন দিকে গতিশীল থাকে। আর চাঁদের পরিবর্তন তো আরো বেশী দর্শনীয়; তার কলার হ্রাস-বৃদ্ধি, তারাসমূহের মধ্যে চাঁদের অবস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হ'তো। সূর্যের দেবতাকে বলা হ'তো "শামাশ"। (আরবী 'শাম্‌স্‌' শব্দটির সঙ্গে ধ্বনিগত সামঞ্জস্য লক্ষণীয়।) শামাশ ছিল সর্বদর্শী ও ন্যায়ের প্রভু; দিনের পর দিন সে আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে যেয়ে অতি নিখুঁত-ভাবে নিজের কাজ করে। এর কোন ব্যতিক্রম হয় না। অবশ্য মেঘ বা গ্রহণের জন্য কোন কোন সময় এর উজ্জ্বলতা কমে যেতে পারে। চন্দ্রের দেবতাকে বলা হ'তো 'সিন'। এর গতি বিচিত্র এবং ব্যবহারও বিচিত্র। এক ফালি সরু চাঁদ আস্তে আস্তে ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরে আবার আস্তে আস্তে ক্ষয় পেতে থাকে। প্রত্যেক রাত্রিতে সে ভিন্ন ভিন্ন তারা গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করে। গ্রহসমূহের গতিও বিচিত্র। তাদের গতির কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। কোন সময়ে সামনে যায়, কোন সময়ে পিছনে যায়, আবার কোন সময়ে-বা স্থির হয়ে থাকে। এরা যেন জীবন্ত

দেবতা; যখন যেখানে খুশী বেড়িয়ে বেড়ায়; বিভিন্ন তারা গোষ্ঠীর মধ্যে এদের যাতায়াত। এদের এই অনিয়মিত গতিই বেবিলনীয় পুরোহিতদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে। তাঁরা মনে করতেন, এই সমস্ত গ্রহ প্রকৃতপক্ষে এক একজন বড় বড় দেবতা। এরা সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করে এবং পৃথিবীর সমস্ত কাজকর্ম এদের ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। এই দেবতাসমূহ নিজ নিজ প্রতিভা (বা প্রভা)-তেই উজ্জ্বল দেখায়। বিভিন্ন দেবতার নামের সঙ্গে এই সমস্ত গ্রহ জড়িত ছিল। 'দিলবাত' নামে অভিহিত শুক্রগ্রহ ছিল দেবতা ইশতারের তারা; বৃহস্পতিকে প্রথম দিকে বলা হ'তো 'উমানপা-উদ্দা', পরে একে প্রায়ই 'স্যাগমেগার' বলা হ'তো। এই গ্রহটি ছিল মারদুক দেবতার তারা। শনি গ্রহ ছিল নিনিব দেবতার তারা; মঙ্গল ছিল নারগাল দেবতার তারা। ইনি ছিলেন দুঃখ-কষ্টের দেবতা। সেজন্য লাল মঙ্গল গ্রহটিকে দুর্ভাগ্যের তারা বলে মনে করা হ'তো। বৃহস্পতি ছিল সৌভাগ্যের তারা। কিন্তু এই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কার জন্য সেটা নির্ভর করতো স্থান, কাল ও পাত্রের উপরে।

আসিরিয়ার চারটি দেশকে চারটি মাস ও চারটি দিক দিয়ে নির্দেশ করা হ'তো। আক্কাদ (বেবিলনিয়া), এলাম (পূর্বাঞ্চলের পাহাড়), আমুর (পশ্চিমের মালভূমি, অর্থাৎ সিরিয়া), এবং সুবার্তু (উত্তর)। একজন আসিরীয় জ্যোতিষী নিজেকে সুবার্তু বলে পরিচয় দিতেন। বিভিন্ন রাশিতে গ্রহসমূহের আবির্ভাব ও স্থিতিকাল, রাশিতে গতি, অন্য গ্রহের বা চন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনা জ্যোতিষীগণ পর্যবেক্ষণ করতেন; এবং সেই সমস্ত ঘটনাবলী থেকে গ্রহের দেবতাগণের মনোভাব ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতেন। আকাশের এই সমস্ত ঘটনার ফলে, পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলের বা কোন্ প্রকার মানুষের কি অবস্থা ঘটবে, তাও তাঁরা গণনা করে বের করতেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি ঘটনা ও সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী লিপিবদ্ধ করা গেল। (খালি জায়গাসমূহের লিপি নষ্ট হয়ে গেছে।)

"যদি কোন বৎসরের আরম্ভে মারদুক দেবতার তারা দেখা যায়, তা হ'লে সে বৎসর প্রচুর শস্য হবে। যখন একটি গ্রহ (বুধ) লি তারার

(আল দাববান, বোহিণী) নিকটবর্তী হবে, তখন এলামের বাজার মৃত্যু হবে।.... বৃষ রাশিতে বুধেব আবির্ভাব ঘটে এবং শুগী (কৃত্তিকা অথবা পাবসিযাস) পর্যন্ত নেমে আসে।"

"শুক্র পশ্চিমে অদৃশ্য হযে যায়। ম্লান হযে শুক্র যখন আবুতে অদৃশ্য হবে, তখন এলামে ধ্বংস লীলা চলবে। প্রথম থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে আবুতে শুক্র দেখা গেলে, বৃষ্টি হবে এবং প্রচুব শস্য হবে। মাসেব মাঝখানে পূর্ব দিকে সিংহবাশিতে শুক্রেব আবির্ভাব হয .....।"

"শুক্র যখন এক জাযগায স্থিতিলাভ করে, তখন রাজার দিন দীর্ঘ হয এবং দেশে ন্যায বিচাব প্রতিষ্ঠিত হয়। শুক্র যখন ইযা এর পথে থাকে ..।"

"মঙ্গল দুজুতে দেখা যায। অত্যন্ত মলিন...মঙ্গলের সংক্রমণ যদি স্পষ্টভাবে ঘটে এবং উজ্জ্বল হয, তা'হলে এলামেব রাজাব মৃত্যু ঘটবে। অদৃশ্য হওযাব সময় নাবগাল দেবতা যদি আকাশের তারা যেমন স্পষ্ট সেইরূপ ছোট হযে যায, তিনি আক্কাদেব উপব কৃপা কববেন। মঙ্গল স্পষ্ট হ'লে, সৌভাগ্য লাভ হয, আব উজ্জ্বল হ'লে দুর্ভাগ্য ঘটে। মঙ্গল যদি বৃহস্পতির অনুগমন করে, তা হ'লে সেই বৎসব শুভ হয।"

"মঙ্গল আল্লুনেব (কর্কটেব) প্রাসাদে ঢুকেছে। একে কোন সঙ্কেত বলা যায় না। সে সেই প্রাসাদে দাঁড়াযনি, থামেনি বা বিশ্রাম করেনি ; অতি দ্রুত সেখান থেকে চলে যায।"

"বৃহস্পতি যখন পশ্চিমে যায, তখন দেশেব নিরাপত্তা ঘটে এবং শান্তি নেমে আসে। আল্লুনেব সামনে এর আবির্ভাব ঘটে।"

"বৃহস্পতি যখন বেল বা নিবিরুর মত উজ্জ্বল হয, দেশে তখন প্রাচুর্য উপচে ওঠে ; আক্কাদেব রাজা পবাক্রমশালী হয। ..যখন আগুনেব মত একটি বড় তাবা পূর্ব দিকে দেখা দিযে পশ্চিমে অদৃশ্য হ'যে যাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল পবিমাণ শত্রু সৈন্য নিহত হবে। বাজত্বেব প্রথমে বৃহস্পতির অবস্থান ঠিক জাযগাতেই ছিল ; দেবতাদেব প্রভু আপনাকে সুখী করুক এবং আপনার দিনগুলিকে দীর্ঘ করুক। (দামকাব ছেলে আশারিফু থেকে)।"

আগুনের মত বড় তারা দিয়ে এখানে উল্কা বুঝানো হয়েছে। নীচে আর একটি লিপিতে ঠিক একইরূপ কথা বলা হয়েছে :

mul Dilbat ina ilu Samsi sit ir,ti-bi Ana mul Dilbat musha irsi (si) la damiki sa umipl sa la u-sal-li-mu-ma ir-bu-u

রেখাচিত্র ৪ : একটি আসিরীয় চিত্রের প্রতিলিপি ও পঠন।

"রাত্রি এক কাস-বু (দুই ঘণ্টা) অতিবাহিত হলে দক্ষিণ দিক থেকে একটা বড় তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাজার অভিলাষের জন্য এর ইঙ্গিত অত্যন্ত শুভ। আক্কাদের রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে (রাজভৃত্য আশারিদু থেকে)।"

রাজা আসার হেড্‌ডনকে মার ইশতার যে চিঠি লেখেন (৬৬৮ খ্রীঃ পূঃ), তা'তে আছে—

"প্রথম মাসে...২৯শ দিনে বৃহস্পতিকে নিয়ে যাওয়া হয়।...এখন সে এক মাস পাঁচ দিন আকাশে ছিল না (অদৃশ্য ছিল); তৃতীয় মাসের ষষ্ঠ দিনে কালপুরুষ অঞ্চলে বৃহস্পতিকে দেখা যায়। তার সময়ের উপর সে পাঁচ দিন অতিক্রম করেছে। এতে সঙ্কেত পূর্ণ হয়েছে। বৃহস্পতি যখন তৃতীয় মাসে দেখা যায়, দেশে দুঃখ কষ্ট হয়, শস্য দুর্লভ হয়। বৃহস্পতি যখন

কালপুরুষে প্রবেশ করে, দেবতাগণ দেশকে গ্রাস করেন।"

এই প্রকার আরো অনেক লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। সমস্ত লিপির প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না। কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষের যখন ধারণা জন্মালো যে, তার জীবনের প্রত্যেকটি কাজ আকাশের গ্রহদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই তা'রা গ্রহসমূহ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠে। তাদের প্রত্যেকটির গতি, উজ্জ্বলতার তারতম্য, স্থিতি, স্থিতিকাল, ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে ও লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করে। জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার জন্য এত বিশদভাবে আলোচনা করা তখন হয়নি। বৃহস্পতি পশ্চিমে গেল, মঙ্গল বৃশ্চিকে অবস্থান করতে করতে পিছনের দিকে চলতে শুরু করে আর তার উজ্জ্বলতা কমে যায়, শুক্র একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে, শনি সিংহরাশিতে প্রবেশ করে, ইত্যাকার প্রতিটি ঘটনা তা'রা লিপিবদ্ধ করে গেছে। কিন্তু এই সমস্ত গ্রহের আবর্তনকাল সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য তার কারণ এই নয় যে, আসিরীয় পুরোহিতগণ এ ব্যাপারে লক্ষ্য করেননি; অনেক লিপিতেই বৎসর এবং তারিখ নষ্ট হয়ে গেছে, অনেক লিপির অনেক জায়গা ভেঙ্গে গেছে। এজন্য গ্রহসমূহের আবর্তনকাল সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা ছিল কিনা, বোঝা মুশ্‌কিল।

গ্রহের পরেই আসিরীয় জ্যোতিষীগণ চন্দ্রের অবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এর কলার হ্রাস-বৃদ্ধির জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা দেওয়া হ'তে থাকে। ঠিক সময়ে ঠিক কলা না দেখা গেলে, সেটাকে একটা অশুভ সঙ্কেত বলে মনে করা হ'তো। মেঘের জন্য বা দেশের অশান্তির সময়ে মনোযোগের অভাবের জন্য দ্বিতীয়বার চাঁদ হয়তোবা ২৮ বা ২৯ দিনে দেখা যেতো। ঠিক একই কারণে ১৪ দিন পরে যে পূর্ণিমা ঘটবার কথা, সেই পূর্ণিমা অনেক সময় ১৩, ১৫ বা ১৬ দিনেও ঘটতে দেখা যেত।

"প্রথম দিনে চাঁদ দেখা গেলে, নীরবতা বিরাজ করবে, দেশ সন্তুষ্ট হবে।... ... ..."

"নিসানুব ৩০ তাবিখে চাঁদ দেখা গেলে, সুবাতু আকলামুকে ধ্বংস কববে ; আমুরুতে একটি বিদেশী ভাষা প্রাধান্য লাভ কববে। আমবা সুবাতু। ৩০ তাবিখে চাঁদ দেখা গেলে, দেশে ঠাণ্ডা পড়বে। তেবিতুর ১৪ তাবিখে সূর্য ছাড়াই চাঁদ দেখা যায ; সাবাতুতে চাঁদ দিন পূর্ণ কবে।"

"ত্রয়োদশ দিনে চাঁদ ও সূর্য একত্রে দেখা গেলে, নীববতা বিরাজ কববে না ; দেশেব যানবাহন ব্যর্থ হবে। শত্রু এসে দেশ দখল করবে। (আপ্‌লা থেকে)।"

"চাঁদ যখন সূর্যেব কাছে এসে অস্পষ্ট হতে হতে অদৃশ্য হযে যায, দেশে সত্য বিবাজ কবে ; পিতাপুত্র এক সঙ্গে সত্য কথা বলবে। ১৪ তাবিখে দেবতাব সঙ্গে দেবতাব দেখা যায ······ ·১৪ তাবিখে যখন চন্দ্র ও সূর্যকে একত্র দেখা যায, দেশে নীববতা বিবাজ কবে, দেশ সন্তুষ্ট হয। দেবতাগণ আক্কাদেব সুখ কামনা কবে।"

"চাঁদ যখন সূর্যেব জন্য অপেক্ষা কবে না, আগেই অদৃশ্য হযে যায, দেশে বাঘ ও সিংহেব আক্রমণ দেখা দেয। ··· ··· ১৫ তাবিখে একে সূর্যেব সঙ্গে দেখা যায় ; পবে তিশবিতুতে চাঁদ দিন সম্পূর্ণ কবে (বালাসু থেকে)।"

"প্রথম দিন আমি বাজাকে এইরূপ লিপি পাঠাই ; ১৪ তাবিখে চাঁদ সূর্যেব সঙ্গে দেখা যাবে ······ ১৪ তাবিখে চাঁদকে সূর্যেব সাথে দেখা গিয়েছিল।"

"যখন ১৬ তাবিখে চাঁদ ও সূর্যকে একত্র দেখা যায, তখন বাজা বাজাব নিকট শত্রুতা পাঠায। এক মাসেব জন্য বাজা তাঁব প্রাসাদে আবদ্ধ থাকবেন। দেশেব বিরুদ্ধে শত্রুব পা পড়বে ; শত্রু জযোল্লাসে অভিযান চালাবে। দুজুব ১৪ বা ১৫ তাবিখে চাঁদকে যদি সূর্যেব সঙ্গে দেখা না যায, তা'হলে বাজা নিজ প্রাসাদে বন্দী হবেন। ১৬ তাবিখে দেখা গেলে, সুবাতুর্ব পক্ষে শুভ, আক্কাদ ও আমুবাব জন্য অশুভ। (আকেল্লানু থেকে)।"

উপবেব বক্তব্য ও মন্তব্যসমূহ ভালভাবে বুঝতে হলে, পূর্ণিমাব সমযেব ঘটনা বিশেষ ভাবে বিবেচনা কবা দবকার। যদি স্বাভাবিকভাবে মাস

আরম্ভ হয়, অর্থাৎ প্রথম যেদিন আকাশে চাঁদ দেখা যায় (দ্বিতীয় দিন) সেদিনকে প্রথম দিন মনে করে গণনা করলে, চতুর্দশ দিনে পূর্ণিমা হয়। অবশ্য এটা গড় নিয়ম ; ১ দিন কম বা বেশী হতে পারে। ত্রয়োদশ তারিখেও চাঁদ পূর্ণ হয় না ; সূর্যাস্তের আগেই পূর্বদিগন্তে চাঁদ দেখা যায় ; এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই চাঁদ অস্ত যায়, সূর্যের জন্য অপেক্ষা করে না। চতুর্দশ দিনেও সূর্যাস্তের পূর্বেই পূর্বদিগন্তে চাঁদ দেখা যায়, কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় সে অস্ত যায় না ; পশ্চিম আকাশে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। এই ঘটনাকেই আসিরীয় জ্যোতিষীগণ বলেছেন, "চাঁদকে সূর্যের সঙ্গে দেখা গেছে," অথবা "দেবতার (সিন) সঙ্গে দেবতার (শামাশ) আবির্ভাব হয়," অথবা "চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত পৌঁছায়।" এইরূপ স্বাভাবিক অবস্থাকে সমস্ত প্রকার শুভ কর্মজ্ঞাপক সঙ্কেত বলে মনে করা হ'তো। কিন্তু চাঁদ যদি সূর্যের জন্য অপেক্ষা না করে সূর্যোদয়ের আগেই অস্ত যায়, তা'হলে বুঝতে হবে দেরীতে পূর্ণিমা সংঘটিত হয়েছে, এবং পরের রাত্রির অর্থাৎ পঞ্চদশ দিনের আগে সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে চাঁদকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

এই সমস্ত পর্যবেক্ষণে জ্যোতিষ ও ধারাবাহিকতা এক সঙ্গে মিশে গেছে। জ্যোতির্বিদ পুরোহিতগণ যখন লক্ষ্য করতেন যে, আকাশে সমস্ত কিছু ঠিক ভাবে চলছে, তখন তাঁরা বলতেন পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে। আর তাঁরা যদি কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করতেন, তা'হলে তাঁরা সেটাকে অশুভ সঙ্কেত বলে মনে করতেন এবং সেটা সংশোধনের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতেন। চাঁদ প্রথম যেদিন দেখা যায়, সেদিন থেকে চতুর্দশ দিনে পূর্ণিমা হওয়াই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার জন্য ঠিক এমন নাও হ'তে পারে। যদি ত্রয়োদশ দিনে পূর্ণিমা হয়, তা'হলে বোঝা যেতে পারে যে, সে মাস ২৯ দিনে শেষ হবে। আর যদি চতুর্দশ দিনের পরে পূর্ণিমা হয়, তা'হলে ৩০ দিনে মাস শেষ হবে ; তখন বলা হয়, 'চাঁদ দিন পূর্ণ করেছে।' চতুর্দশ দিনে চন্দ্র ও সূর্য একত্রে দেখা গেলে, পূর্ববর্তী মাস ৩০ দিনে এবং পরবর্তী মাস ২৯ দিনে হয়।

"চাঁদ আদাম্-তে দিন পূর্ণ করলো ; চতুর্দশ দিনে চাঁদকে সূর্যের সাথে দেখা যাবে ; নিসানুতে চাঁদ দিনকে পিছনে ধরে রাখবে।"

জ্যোতিষ চর্চার জন্য অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার ফলে চাঁদের পূর্ণিমার ধারাবাহিকতা অধিকতর সূক্ষ্মভাবে রক্ষিত হয়েছে। প্রত্যেকটি পূর্ণিমা ও নতুন চাঁদ ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করা হয়েছে ; ফলে ভবিষ্যৎবাণী করবার পক্ষেও সুবিধা হয়েছে।

চাঁদের আরো অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। তার রং, উজ্জ্বলতা, শিং-এর আকার, মহী-আলো (earthshine) (চাঁদ একটি 'আগু' অর্থাৎ টানরা বা রাজমুকুট ধরে নেয়), চন্দ্রশোভা, ইত্যাদি নানাপ্রকার ঘটনা লক্ষ্য করা যেতে পারে। চন্দ্রশোভার বলয়কে একটা বেড়া মনে করা হতো। চাঁদের ভিতরের মেষ-পালক মাঠে মেষ চরাচ্ছে আর চন্দ্রশোভা দিয়ে সেই মাঠে বেড়া দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হতো। গ্রহ কথাটি নির্দেশ করতে বেবিলনীয়গণ যে চিহ্ন ব্যবহার করতো, তাকে বলা হতো লুবাত, অর্থাৎ ছেড়ে দেওয়া ভেড়া। অনেক সময় এই চন্দ্রশোভাকে নদী বলেও মনে করা হতো ; আবার অনেকে একে অবরোধ বলেও মনে করতো। এই বলয়ের ভিতরে যে গ্রহ বা তারা দেখা যেতো সে গুলোকে অবরোধ করা হয়েছে বলে মনে করা হতো। বলয় বদ্ধ না হলে, অবরোধ সফল হয়নি, ভিতরের বন্দী পালিয়ে গেছে বলে অর্থ করা হতো।

"বৃহস্পতি যদি চন্দ্রশোভার ভিতরে থাকে, তাহলে রাজা বন্দী হবেন চন্দ্রশোভা যদি ভাঙ্গা হয়, তাতে অশুভ কিছু ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই। (নাবুশুমাই শকুন থেকে)।"

"চাঁদের চারদিকে যখন বলয় ঘিরে থাকে, আর তার মাঝখানে সুকুন অবস্থান করে, তখন একজন রাজার মৃত্যু ঘটে এবং রাজ্যের হানি হয়। এলামের রাজার মৃত্যু হবে ; সুকুন হ'লো মঙ্গল, আর মঙ্গল আমুরারুর তারা। এ সঙ্কেত আমুরারু ও এলামের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ। শনি আক্কাদের তারা। হে প্রভু, এই সঙ্কেত রাজার জন্য শুভ (রাজভৃত্য ইরাশি ইলু থেকে)।"

গ্রহণকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত বলে মনে কবা হতো। স্বাভাবিক ঘটনাসমূহের সামান্য অনিয়মকেই যখন এতটা গুরুত্ব দেওয়া হতো, তখন এই অস্বাভাবিক ঘটনা যে মানুষকে অত্যন্ত বিচলিত করবে, এতে তাব আশ্চর্যের কিছু নেই। এই গ্রহণেব জন্য নানা প্রকাব ভবিষ্যৎবাণী কবা হতো। সূর্য-গ্রহণ সংঘটিত হলে, সেই মাস, আকাশে যে স্থানে গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে, সেই স্থান, আব 'সূর্য যখন চাঁদেব আকাব ধাবণ কবে' তখন তাব শিং-এব আকাব ও অবস্থান ইত্যাদি লক্ষ্য কবা হতো। ২৭ বা ২৮ তাবিখ ছাড়াও সূর্য গ্রহণেব উল্লেখ পাওয়া যায় ; এই সমস্ত দিনে, কোন পার্থিব ঘটনা, যেমন ধূলি-ঝড় ইত্যাদিব জন্য সূর্য অন্ধকার হয়েছিল বলে মনে হয়।

'যখন চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন মাস, দিন, সময়, বাতাসেব বেগ, দিক এবং যে সমস্ত তাবাব অঞ্চলে গ্রহণ সংঘঠিত হয়েছে, তাদেব অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্য কব। মাস, দিন, বাতাসেব দিক, বেগ এবং তাবাসমূহ অনুসাবে সঙ্কেত নির্দেশ কর।'

সিমানু মাসেব শেষ বাত্রিতে একটি গ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিববণ লিপিবদ্ধ আছে ঃ

'প্রাতঃকালে গ্রহণেব অর্থ বোগ, ... প্রাতঃকাল এলাম, চতুর্দশ দিন এলাম, সিমানুই আমুবাব, দ্বিতীয় দিন আককাদ· · ···যখন প্রাতঃকালে গ্রহণ সংঘটিত হয় এবং সময় সম্পূর্ণ হয়, উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়, আককা-দেব অসুস্থ লোকেবা সুস্থ হয়ে উঠবে। যখন প্রথম দিনে গ্রহণ আবম্ভ হয় ; এবং দ্বিতীয় দিনে যেয়ে দাঁড়ায়, তখন এলামে ধ্বংস লীলা চলবে ; গুতি আককাদেব কাছে এগোবে না। .... যখন দ্বিতীয় দিনে গ্রহণ হয় এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, দেবতাবা দেশেব উপব দয়া বর্ষণ কবেন। চন্দ্র যখন সিমানুতে অন্ধকাব হয়ে যায় ; এক বৎসব পব বাখানু (ঝড়েব দেবতা) ভাসিয়ে দেবে। যখন সিমানুতে চন্দ্রগ্রহণ ঘটে তখন বন্যা হয় এবং বন্যাব জন্য দেশে প্রচুব শস্য উৎপন্ন হয়।".. ...."

সঙ্কেতে পবিপূর্ণ প্রত্যেকটি বিববণেব ব্যাখ্যা আছে। এই সমস্ত বিববণে সহজেই বোঝা যায় যে, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ পর্যবেক্ষণ কবা হ'তো।

এই সময়ের অনেক শতাব্দী পরে চন্দ্রের আবর্তনকাল নির্ণয়ের জন্য, টলেমী এই সমস্ত বিবরণ থেকে চন্দ্র গ্রহণের তারিখ সংগ্রহ করেন: খ্রীস্টপূর্ব ৭২১ অব্দের ১৯ শে মার্চ, খ্রীস্টপূর্ব ৭২০ অব্দের ৮ই মার্চ, খ্রীস্টপূর্ব ৭২০ অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর।

এই সমস্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, বেবিলনের জ্যোতির্বিদগণ গ্রহণ সংঘটনের নিয়মিত ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন না। অনেক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা অনেক সময় বুঝতে পারতেন কোন্ সময় গ্রহণ সংঘটিত হবে এবং এই সম্বন্ধে তাঁ'রা ভবিষ্যৎবাণীও করতেন।

"চতুর্দশ দিনে একটি গ্রহণ সংঘটিত হবে। এই গ্রহণ এলাম ও আমুরুর জন্য অত্যন্ত অশুভ; হে প্রভু, কিন্তু রাজার জন্য শুভ। একটি গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু রাজধানীতে তা দেখা যায় নাই। সেই গ্রহণ, রাজা যেখানে বাস করেন, সেই রাজধানীর নিকটে আসে, তখন সমস্ত জায়গায় মেঘ ছিল। গ্রহণ ঘটেছে কিনা, সে কথা আমরা জানি না। রাজাদের প্রভু আসুরে এবং অন্যান্য শহরে, বেবিলনে, নিপ্‌পুরে, উরুকে এবং বরসিপ্‌পায় লোক পাঠায়। ঐ সমস্ত শহরে কি ঘটেছে, রাজা নিশ্চয়ই সে কথা বলতে পারবেন। রাজার শহরে যে বিরাট দেবতা বাস করেন, হে প্রভু, তিনি আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন এবং গ্রহণ ঘটতে দেন নাই। অতএব হে প্রভু, রাজা এই কথা জেনে রাখুন যে, এই গ্রহণ তাঁর বা তাঁর দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নাই। অতএব রাজা আনন্দ করতে পারেন। ..."

পুরোহিতদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয় বৈ কি। গ্রহণ ঘটেছে, কিন্তু সেই গ্রহণ দেখে রাজা যা'তে ভয় না পান, সে জন্য দেবতা আসুর রাজধানীর উপরে মেঘ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন, আসিরীয় রাজত্বের একটি সন্ধিকালে এই বিবরণ লিখিত হয়। এই সময়ে মিসর অভিযানে ব্যর্থ রাজা ভীত হয়ে দেশে ফিরছিলেন। অনেকে মনে করেন এই সময় থেকেই গ্রহণের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা হ'তে আরম্ভ হয়।

"হে প্রভু, আমার রাজাকে লিখলাম, 'একটি গ্রহণ সংঘটিত হবে।'

এখন এই গ্রহণ ঘটেছে। এই ঘটনাতে রাজার শাস্তি ইঙ্গিত করে।"

গ্রহণ সম্বন্ধে পুরোহিতগণ কিভাবে এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী করতেন, সে বিষয়ে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে দীর্ঘকাল ধরে গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চয়ই তাঁ'রা গ্রহণের পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁ'রা সহজেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, একটি গ্রহণ ঘটবার ছয় মাসের মধ্যে কোনদিনই দ্বিতীয় গ্রহণ ঘটে নাই এবং পরের ছয় মাস পরে তৃতীয় একটি গ্রহণ ঘটেছে। অনেক সময় ছয় মাস পরপর চারটা বা পাঁচটা গ্রহণ পরপর ঘটতে দেখা গেছে। এই অবিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে মাঝে মাঝে বিরতিও দেখা যায়। এই বিরতির কারণ ঐ সময়ে দিনের বেলায় গ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল, তাই সে সমস্ত গ্রহণ দেখা যায় নাই। পুরোহিতগণ যখন এই কারণ বুঝতে পারেন, তখন এই বিরতি-পূর্ণ করতে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিও-বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যা

বিজ্ঞানের পদধ্বনি

জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে আলোচিত হওয়ার পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন ছিল, আসিরীয় যুগে তার প্রায় সমস্তই প্রস্তুত ছিল। আকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের অসংখ্য ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, আর এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়েছিল। আকাশের ঘটনাবলী যে একটা বিশেষ নিয়মে সংঘটিত হয়, এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান না হলেও, আসিরীয় পুরোহিতগণের এ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল; তাঁ'রা গ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এগুলি প্রকৃত বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে দানা বেঁধে উঠতে পারে নাই। তার পূর্বেই আসিরীয় শক্তির পতন ঘটে। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-গরিমা ও ধন-সম্পদে বেবিলন ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। আসিরীয় প্রভুদের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তা'রা যথেষ্ট চেষ্টা করছিল। অবশেষে ইউরোপের চিমবিওন বর্বর জাতির আক্রমণে আসিরীয়া যখন বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো, তখন বেবিলনীয় ও মেড্‌স্‌গণের সংযুক্ত বিদ্রোহের মুখে আসিরীয়ার পতন ঘটলো। রাজধানী নিনেভা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'লো। বেবিলন আবার একটি নতুন শক্তিশালী সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে গড়ে উঠলো। বেবিলনীয়ার রাজা নেবুচাদ নেজার (খ্রীস্টপূর্ব ৬০৪—৫৬১) সে সময়ের তাঁর সাম্রাজ্য এশিয়ার নানাদিকে বিস্তার করেছেন। এই সময় প্রাচীন বেবিলনীয়ার সমস্ত রীতি-নীতির পুনঃপ্রচলন করা হয়; শহরে অসংখ্য মন্দির গড়ে উঠে; এবং পুরোহিতগণ

আবার সেই বিশাল সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি বলে বিবেচিত হ'তে থাকে। বিভিন্ন দেবতার পুরোহিতদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হ'তে থাকে। মার্দকক দেবতার পুরোহিতগণ যখন দেখতে পেলেন যে, অন্য দেবতার পুরোহিতগণকে রাজা বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন, তখন তাঁদের দেবতার প্রাধান্য কায়েম করবার জন্য তাঁরা পারস্যের রাজা কাইরাসকে আহ্বান করেন। খ্রীস্টপূর্ব ৫৩৯ অব্দে কাইরাস বেবিলন দখল করেন। তিনি এবং তাঁর পরবর্তী রাজা ক্যামবিস, মার্দকক দেবতার প্রতিনিধি হয়ে প্রাচীন রাজধানীতে, প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে রাজত্ব করতে থাকেন। রাজা দারিয়ুসের সময় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি বেবিলনের রাজাদের পরাজিত করেন, এবং বেবিলনকে পারস্যের অধীনস্থ অন্যান্য প্রদেশের রাজধানীর পর্যায়ে আনয়ন করেন। আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেন, তখন বেবিলন আবার পুরাতন আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেবিলনের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রীক জাতিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। আসুরবানিপাল থেকে আলেকজাণ্ডার পর্যন্ত অনেক বংশের অনেক রাজা রাজত্ব করে গেছেন; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃষ্টি ও সভ্যতায় বেবিলন সব সময় প্রাধান্য লাভ করে এসেছে।

এই অবস্থায় জ্যোতির্বিদ্যাতেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে, এবং এই সময়ই একে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলে। পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে এসে পূর্বেকার সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে শান্তি বিরাজ করছিল। একের সঙ্গে অন্যের যুদ্ধের প্রস্তুতি আর ছিল না; সুতরাং আকাশের কোন্ অবস্থাতে কোন্ দেশের রাজা মারা যাবে, এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীরও আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আকাশ পর্যবেক্ষণ করা, এবং সেখানকার ঘটনাবলীর তথ্যাদি সংগ্রহ করার কাজ ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গেই চলতে থাকে। গতানুগতিক-ভাবে ধর্মীয় কারণেই তাঁরা এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করেন। রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কর্মনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। রাজার তুষ্টি বিধান করবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এর ফলে তাঁরা আকাশের ঘটনাবলীর নিয়মানুবর্তিতা অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং তা থেকে পরে বিভিন্ন

ঘটনার ভবিষ্যৎবাণী করতেও আরম্ভ করেন। গ্রহসমূহের গতি পথে বিভিন্ন উজ্জ্বল তারাসমূহ থেকে তাদের দূরত্ব নির্ণয় করা হতে থাকে, এবং এ সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা সুরু হতে থাকে। কিভাবে এই দূরত্ব পরিমাপ করা হতো, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে নানা জায়গায় এই দূরত্বসমূহের পরিমাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এ গুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়। অবশ্য সমস্ত মৃৎলিপির এখনও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। অধিকতর গবেষণা করলে হয়তো এসম্বন্ধে আরো তথ্য পাওয়া যাবে।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে স্থির তারাসমূহ ও বিভিন্ন মণ্ডলের আপেক্ষিক অবস্থানের ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া যায়। এই তারা ও মণ্ডলগুলোকে এখন সম্পূর্ণভাবে চেনা যেতে পারে। এদের অনেকগুলি অবশ্য আগে থেকেই জানা ছিল এবং সে সমস্ত তারার কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বর্তমানে আমরা তারা-মণ্ডলসমূহের যে নাম ব্যবহার করি, তার অনেকগুলি নাম সেই সময় থেকেই প্রচলিত ছিল। বৃষ, মিথুন, শস্যগুচ্ছ, বৃশ্চিক, ধনুর্ধর, ছাগমৎস্য (Capricorn), ঈগল, সিংহ হুদসর্প, ইয়ারমাছ (দক্ষিণ মীন), বায়স (Corvus), নেকড়ে বাঘ (Lynx) ইত্যাদি নামগুলি বেবিলনীয় পুরোহিত জ্যোতির্বিদ-গণের দেওয়া। এগুলি ছাড়া আরো এমন অনেকগুলি নামের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি আজকাল প্রচলিত নাই। যেমন বর্তমানে যেখানে বকের (Cygnus) কল্পনা করা হয়, বেবিলনে সে জায়গায় চিতা বাঘের (Panther) কল্পনা করা হতো ; তেমনি বর্তমানের বীণা ছিল সে সময়ের ছাগল, এবং বর্তমানের অরিগা (রশ্মি) ছিল সে সময়ে গামলা। আমাদের লুব্ধক তখন তীর-তারা নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য বর্তমানে যে সমস্ত তারা দিয়ে এক একটি মণ্ডল গঠিত, সে সময়ে ঠিক সেই তারাগুলি দিয়েই মণ্ডল গঠন করা হতো না। সে সময়ের চিতা বাঘের মধ্যে আমাদের বক (Cygnus) ছাড়া সেফালীর (Cepheus) কিছুটা অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। আমাদের মৃগব্যাধের (Canis Major) তারাসমূহকে তীর-ধনুক বলে অভিহিত করা হতো। আবার এমন কতকগুলি নাম পাওয়া যায় যেগুলি এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

এ ছাড়া আরো প্রায় ত্রিশটা তারার নাম পাওয়া যায়; বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল। বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের উদয় হতো বলে উল্লেখ আছে। বেবিলনীয় পঞ্জিকাতে অধিমাসের প্রচলন ছিল না; সে জন্য তারার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দিনগুলির মধ্যে ১০ থেকে ২০ দিনের পার্থক্য দেখা যায়।

প্রভাতে উদিত তারার সঙ্গে অন্য তারার সংক্রমণের তালিকাও পাওয়া যায়। "আদার মাসের প্রথম দিনে সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমার পর্যবেক্ষণ দণ্ড যদি এমনভাবে স্থাপন কর যে, ডান হাতের দিকে পশ্চিম, বাম হাতের দিকে পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে তোমার চোখ থাকে, তা হলে চিতাবাঘের বুক (Epsilon-Cygni) আকাশের মাঝখানে তোমার সামনের দিকে থাকে এবং কৃত্তিকার উদয় হয়।" আসিরীয় মৃৎ-লিপিতে এক চন্দ্র গ্রহণের বিবরণীতেও এইরূপ একটি কথা দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে একটি দণ্ডের ও 'কুমাক-তারা (Gamma-Cygni) তোমার সামনে" এই কথার উল্লেখ আছে। প্রত্যেক মাসের জন্য উপরের বাক্যের মত একটি করে বাক্য পাওয়া যায়। আরো একটি তালিকা পাওয়া যায়, এতে তারাসমূহের ভিতরে শত্রুতার উল্লেখ আছে। একটি তারার উদয়ের সময় অন্য তারা অস্ত যায়। যেমন "কৃত্তিকার উদয়ের সময় বৃশ্চিক অস্ত যায়", "রোহিণীর উদয়ের সময় স্বাতী অস্ত যায়" "কালপুরুষের উদয় হয় আর ধনু অস্ত যায়" ইত্যাদি বিবরণ পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় যে, বেবিলনের জ্যোতির্বিদগণ দিগন্তকে একটি বৃহৎ বৃত্ত বলে বিবেচনা করতেন; এবং এই দিগন্ত যে খ-গোলককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে এ ধারণাও তাঁদের ছিল।

এ সমস্ত তালিকাতে কোন পরিমাপ দেখা যায় না। কিন্তু সমস্ত আকাশের তারার উল্লেখ এতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত তারার সংগে সংখ্যার উল্লেখ আছে। এই সংখ্যাগুলি ক্রমিক দূরত্ব নির্দেশ করে বলেই বর্তমানে মনে করা হয়। এই সংখ্যাগুলি তিনটি কলামে একই অনুপাতে দেওয়া আছে। এতে মনে হয়, তিন কলামের সংখ্যা দ্বারা একই ব্যাপার বোঝানো হয়েছে; তবে বিভিন্ন কলামে বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে

ষষ্ঠক পদ্ধতিতে ওজনের এককে (বিলটু, মানা, শিকলু) এবং পরে সময়ের এককে দেওয়া আছে। আমাদের দুই ঘণ্টাকে এক বেরু বলা হতো; এবং প্রত্যেক বেরুকে ৩০ উশে বিভক্ত করা হতো (১উশে=৪মিনিট)। গ্রীক সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, বেবিলনীয় পণ্ডিতগণ পানি-ঘড়ি ব্যবহার করতেন। পানির প্রবাহ থেকে সময়ের প্রবাহের পরিমাপ করা হতো। এতে মনে হয় যে, প্রত্যেক তারার সঙ্গে যে সংখ্যা দেওয়া আছে, সে গুলি ঐ তারার মধ্যরেখা অতিক্রম করবার সময়। এই সংখ্যাগুলি অনেকটা তারাগুলির বিষুবাংশের পার্থক্যের অনুপাতের সমান। হয়তো এই সমস্ত সংখ্যা দিয়ে রাত্রিতে সময় নির্দেশ করা হতো।

এই সমস্ত তালিকার তারার সঙ্গে সূর্যোদয়ের সম্বন্ধ দেখে বোঝা যায় যে, এই সময়ে পঞ্জিকা প্রণয়নে কিছুটা শৃঙ্খলা এসেছিল। এতদিনে বেবিলনের পণ্ডিতগণ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে একই তারার পুনরায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে উদয় হয়। এ থেকে অধিমাস নির্ণয় বিষয়ে তাঁরা নিয়মও আবিষ্কার করেন বলে মনে হয়। প্রথমে একটি আট বৎসরের চক্র দেখা যায়। এতে প্রথম দুইটি তিন বৎসর কাল পরে একটি ১৩ মাসের বৎসর যোগ করা হ'তো, এবং তার দুই বৎসর পরে আর একটি ১৩ মাসের বৎসর যোগ করা হ'তো। এ সমস্ত অধিমাসকেই সাধারণতঃ একটি দ্বিতীয় আদারু মাস বলে বিবেচনা করা হ'তো। কিন্তু দ্বিতীয় তিন বৎসরকাল পরে ষষ্ঠ মাস উলুলুকে পুনরায় গণনা করে দ্বিতীয় উলুলু বলা হ'তো। এর কারণ হয়তো এই যে, এই আট বৎসরে পঞ্জিকার তারিখ ঋতুর মধ্যে অনেক দূরে এগিয়ে যাওয়াতে হেমন্ত উৎসব ঠিক সময়ে করবার জন্য উলুলুকেই পুনরায় গণনা করা হ'তো। এখানেও একই কারণে তিনটি ক্রমিক তিন বৎসরকাল পরে, একটি দ্বিতীয় উলুলু যোগ করা হ'তো। আমরা দেখেছি যে, আসিরীয় যুগেও পঞ্জিকার তারিখ বৎসরে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার ফলে যে জরুরী অবস্থার উৎপত্তি হয়, তার মোকাবিলা করার জন্য একটি দ্বিতীয় উলুলু মাস যোগ করার প্রয়োজন হয়েছিল। সরকারী দলিলপত্র এবং

জ্যোতির্বিদগণের তালিকাসমূহ থেকে, কোন্ কোন্ বৎসরের কোন্ কোন্ মাস অধিমাস ছিল, তা বের করা যেতে পারে। অবশ্য সব সময় সেটা সম্ভব হয় না। দেখা যায় যে রাজা ক্যাম্বিসের ও রাজা দারিয়ুসের সময় আট বৎসর চক্র প্রচলিত ছিল। বৎসরের সংখ্যাকে ৮ দিয়ে ভাগ করলে দেখা যায় যে অবশিষ্ট ঠিক একই হয়। নীচে একটি তালিকা দেওয়া গেল। এতে কোন্ কোন্ বৎসরে অধিমাস সংযোগ করা হয়েছিল তার উল্লেখ আছে। প্রথম লাইনে রাজার রাজত্বের বৎসর, দ্বিতীয় লাইনে বর্তমানে প্রচলিত বৎসর অনুযায়ী গণনাকৃত বৎসর, এবং তৃতীয় লাইনে ৮ দিয়ে ভাগ করলে যে অবশিষ্ট থাকে সেই সংখ্যা দেওয়া আছে। তারা চিহ্নিত বৎসরগুলিতে একটি করে দ্বিতীয় উলুলু মাস যোগ করা হয়েছিল।

রাজা	সাইরাস					ক্যাম্বিস			
রাজার রাজত্ব বর্ষ	২*	৩	৪	৭	৯*	৩*	৫	৮	১১*
খ্রীঃ পূঃ	৫৩৭*	৫৩৬	৫৩৫	৫৩২	৫৩০*	৫২৭*	৫২৫	৫২২	৫১৯*
৮ দিয়ে ভাগের অবশিষ্ট	১	০	৭	৪	২	৭	৫	২	৭

দারিয়ুস

৫	৮	১১*	১৩	১৬	১৯	২২
৫১৭	৫১৪	৫১১*	৫০৯	৫০৬	৫০৩	৫০০
৫	২	৭	২	২	৭	৪

প্রথম দিকে কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই; কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব ৫৩০ অব্দ থেকে নিয়মিত আট বৎসরের একটি চক্র দেখা যায়। কিন্তু

এইরূপ তিনটি চক্রের পরে দেখা যায় যে, ঠিক গণনামত অধিমাস নেওয়া হয় নাই; এবং খ্রীস্টপূর্ব ৫০৩ অব্দে একেবারে আদারু মাসেই অধিমাস সংযোগ করা হয়। এক শতাব্দী পরে আর একটি ধারাবাহিক তালিকা দেখা যায় এবং এতে ১৯-বর্ষ চক্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাজা	আরতা জেরেক্সেস									
রাজার রাজত্ব বর্ষ	১৮	২০	২৪	২৬	২৯	৪*	৩৭	৪০	৪৩	৪৫
খ্রীঃ পূঃ	৩৮৭	৩৮৫	৩৮১	৩৭৯	৩৭৩	৩৭০*	৩৬৮	৩৬৫	৩৬২	৩৬০
১৯ দিয়ে ভাগের অবশিষ্ট	৭	৫	১	১৮	১২	৯	৭	৪	১	১৮

রাজা	অকাস					দারিয়ুস			আলেকজাণ্ডার		
রাজত্বের বর্ষ	২	৫	৮*	১০	১৩	১৬	১৮	১	৪*	১	৪
খ্রীঃ পূঃ	৩৫৭	৩৫৪	৩৫১†	৩৪৯	৩৪৬	৩৪৩	৩৪১	৩৩৫	৩৩২*	৩৩০	৩২৭
অবশিষ্ট	১৫	১২	৯	৭	৪	১	১৮	১২	৯	৭	১

রাজা	ফিলিপস		আন্টিগোনাস		সেলিউকাস						
রাজত্ববর্ষ	২	৫	২	৫*	১	৪	৭	৯	১২	১৫	১৮*
খ্রীঃ পূঃ	৩২২	৩১৯	৩১৬	৩১৩†	৩১১	৩০৮	৩০৫	৩০৩	৩০০	২৯৭	২৯৪*
অবশিষ্ট	১৮	১৫	১২	৯	৭	৪	১	১৮	১৫	১২	৯

১৯ দিয়ে ভাগ করবার পরে অবশিষ্ট থেকে দেখা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব ৩৮০ অব্দে উনিশ বৎসর চক্র প্রচলিত ছিল। সেলিউকাসের পর রাজার রাজত্ব বর্ষ গণনা না করে, রাজবংশের অভ্যুত্থান থেকে বর্ষ গণনা করা হতে থাকে। এই বর্ষ সংখ্যাসমূহকে সেলিউসিড যুগ (Seleucid Era)

বলা হয়। খ্রীস্টপূর্ব ৩১১ অব্দে এই যুগের আরম্ভ হয়। এই যুগের বর্ষ সংখ্যাসমূহকে ১৯ দিয়ে ভাগ করলে যে সমস্ত বৎসরে ১, ৪, ৭, ৯, ১২, ১৫, ১৮ অবশিষ্ট থাকে, সে সমস্ত বৎসরে একটি ত্রয়োদশ মাস যোগ করা হতো।

চাঁদ সম্বন্ধে এত বেশী পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ তথ্য দিয়ে নানা প্রকার তত্ত্বীয় গবেষণা করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আসিরীয় যুগের তালিকাও পাওয়া যায়। আসুরবানিপালের লাইব্রেরীতে অনেক মৃৎলিপি পাওয়া গেছে, যেখানে অমাবস্যার পরে প্রথম চাঁদ দেখার পর-দিন থেকে প্রতিদিন ধারাবাহিক ভাবে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রাস্তের ভিতরের অন্তবর্তী সময়ের তালিকা দেওয়া আছে; অনুরূপভাবে পূর্ণিমার পর-থেকে প্রতিদিন সূর্যাস্তও চন্দ্রোদয়ের সময়ের পার্থক্যও দেওয়া আছে। আরো কতকগুলি মৃৎলিপি পাওয়া গেছে, যেখানে খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ অব্দেরও আগে থেকে প্রতি ঋতুতে, প্রথম চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রাস্তের অন্তর্বর্তী সময়ের হ্রাস বৃদ্ধির তালিকা দেওয়া আছে। দেখা যায় যে, সূর্যাস্তের পরে প্রথম চাঁদ দেখার সময়ের অন্তর্বর্তীকাল ৮ উশে থেকে ১৬ উশে পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পরবর্তী শতাব্দীসমূহে তত্ত্বীয় জ্ঞান যে আকার ধারণ করতে থাকে তা বর্তমান আকার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ থেকে দেখা যায় যে, আকাশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য যে পর্যবেক্ষণ করা হতো, সেই সমস্ত পর্যবেক্ষণ তালিকা থেকেই এই তত্ত্বীয় কাঠামোর সৃষ্টি হয়। সর্বপ্রাচীন যে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানা রাজা ক্যামবিসের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে (খ্রীঃ পূঃ ৫২৩ অব্দ) নকল করা হয়। এতে প্রথম ও শেষ অর্ধ চন্দ্র (crescent, অমাবস্যার আগে ও পরে যে শেষ ও প্রথম চন্দ্র দেখা যায়) সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া আছে। এ ছাড়া পূর্ণিমার সময়ের বিভিন্ন ঘটনাও এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার সময় উশে এককে প্রকাশ করা আছে। প্রত্যেক মাসে ধারাবাহিকভাবে এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত তালিকাতে কেবলমাত্র কতকগুলো সংখ্যা

ও সংক্ষিপ্ত চিহ্ন দেওয়া আছে। নীচে একটি দ্বিতীয় মাসের তালিকা দেওয়া গেল।

এযাক	৩০	২৩	
	১৩৮		২০শূ অস্ত
রাত্রি	১৪	১	লাল (প্রতিযোগ)
	১৪	১	৪০ না (উজ্জ্বল)
রাত্রি	১৫	১৪	৩০ গি (রাত্রি)
	২৭	২১	
সিমানু	৩০	১৮	৩০শূ

উপরের তালিকার অর্থ এইরূপ: "পূর্ববর্তী মাস ২৯ দিনে ছিল; সে জন্য এযাক ১ কে ৩০ বলা হয়েছে; সূর্যাস্তের ২৩ উশে (৯২ মিনিট) পরে চন্দ্র অস্ত যায়। এযাক মাসের ১৩ তারিখে সূর্যোদয়ের ৮½ উশে (৩৩½ মিনিট) পরে চন্দ্র অস্ত যায়। ১৪ তারিখে সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের ১ উশে পূর্বে চন্দ্রোদয় হয়; সেজন্য তাদের প্রতিযোগ দেখা যায়। ১৪ তারিখে সূর্যোদয়ের সময়েও চাঁদ উজ্জ্বল থাকে এবং সূর্যোদয়ের ১½ উশে পরে চাঁদ অস্ত যায়। ১৫ তারিখে সূর্যাস্তের ১৪½ উশে পরে চন্দ্রের উদয় হয়। ২৭শে এযাকতে সূর্যোদয়ের ২১ উশে আগে অর্ধচন্দ্রের উদয় হয়। এযাক ২৯ দিনে শেষ হয়। পরের সিমানু মাসের ১ তারিখে সূর্যাস্তের ১৮½ উশে পরে চন্দ্র অস্ত যায়।

আসিরীয় যুগেও সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিযোগ ও সংযোগ সময়ের এই সমস্ত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করা হতো। তবে সে সমস্ত পর্যবেক্ষণ ফল সংখ্যায় প্রকাশ না করে বিভিন্নভাবে ভাষায় প্রকাশ করা হতো। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, সংখ্যা দিয়ে লেখার পদ্ধতি কি ভাবে এলো? পরবর্তী লিপিসমূহে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানেও একই রূপ তথ্য দেওয়া আছে। এতে গ্রহসমূহের ধারাবাহিক তথ্য, গ্রহণ, সূর্য ও চন্দ্র শোভা,

উৎসর্গীকৃত পশুর দাম, রাজনৈতিক ঘটনাবলী ইত্যাদি বিষয়ে নানাপ্রকার সংখ্যা দেওয়া আছে। প্রাচীন আসিরীয় যুগে যে সমস্ত তথ্য ভাষায় প্রকাশ করা হতো, এখানে সেইগুলোই সুচারুভাবে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। এই সমস্ত মৃৎলিপি ছাড়া, খ্রীঃ পূঃ ৫২৩ অব্দের মৃৎলিপির মত আরো অনেক মৃৎলিপি পাওয়া গেছে। জিশবীয়গণ ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে, ১৮৮, ১৮৯ এবং ২০১ সেলুসিড অব্দ থেকে এই সমস্ত লিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেন। একেই বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যার বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম স্তর বলা যেতে পারে। মনে হয় যে, লিপির বিবরণ থেকে ঐ সমস্ত সংখ্যা-তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

যে সময় পরে কোন একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, সেই আবর্তকাল সম্বন্ধে জ্ঞানই জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম বিজ্ঞানের প্রবেশ। আকাশের ঘটনা সমূহের নিয়মিত ও সযত্ন পর্যবেক্ষণের ফলে, তাদের পুনরাবৃত্তির কাল সম্বন্ধে মনে আপনা আপনি একটা ধারণা জন্মে। এ থেকে সেই ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী করা সম্ভব হয়। এর পরবর্তী স্তরই হচ্ছে, এ থেকে একটি তত্ত্ব প্রণয়নের প্রচেষ্টা। এখানেই বিজ্ঞানের আরম্ভ। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়নের এই হলো গোড়ার কথা। এই সময় থেকেই চন্দ্র ও গ্রহ সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা চলে।

গ্রহসমূহ যে সময়ে সূর্যের সঙ্গে সংযোগ ও প্রতিযোগ অবস্থায় ফিরে আসে, সেই সময়কে তাদের যুতিকাল বলে। সূর্যপথে সম্পূর্ণ একবার ঘুরে আসতে শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গলের যথাক্রমে প্রায় ৩০, ১২ ও ১$\frac{৪}{৮}$ বৎসর সময় দরকার হয়, এবং তাদের যুতিকাল যথাক্রমে ১$\frac{১}{২৮}$, ১$\frac{১}{১২}$ এবং $\frac{১}{৭}$ বৎসর। শুক্র ও বুধ সূর্যের এদিক ওদিক সঞ্চালিত হয়, এবং সূর্যপথ পরিভ্রমণ করতে এদের গড়ে এক বৎসর দরকার হয়। এদের যুতিকাল যথাক্রমে $\frac{১}{৮}$ এবং $\frac{১}{৬}$ বৎসর। সূর্যপথে সরল ও বক্রগতির পরিবর্তনও এই সময়েই হয়ে থাকে। এই জন্য এই পুনরাবৃত্তির প্রকৃত সময় নয়; কেননা সরল গতি ও বক্র গতি চাপের দৈর্ঘ্য অনুসারে পরিবর্তিত হয়। সেজন্য সূর্যপথের উপর পরিভ্রমণকাল সাধারণতঃ দীর্ঘতর। পরিভ্রমণকাল ঠিক পূর্ণ সংখ্যক

বৎসর নয়, সেজন্য যুতিকাল ও পরিভ্রমণ কালের একটি সাধারণ গুণিতক সাধারণতঃ অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়ে। এই দীর্ঘ সময় পরে একই তারার নিকটে সূর্য ও গ্রহসমূহের একই দ্রাঘিমাংশ হওয়া সম্ভব। এই সাধারণ গুণিতকও একেবারে সূক্ষ্ম নয়; সেজন্য এ দীর্ঘ সময়ও সূক্ষ্ম নয়, অনেক স্থূল। সেজন্য গণনা অনুযায়ী যে দিন বা সময় পাওয়া যায়, ঠিক সেইদিন বা সেই সময়ে একই তারামণ্ডলে কোন গ্রহের সূর্যের সঙ্গে সংযোগ বা প্রতিযোগ ঘটে না। কিছু দিন বা কিছু সময় আগে বা পরে ঘটে। নীচের তালিকাতে এই সমস্ত আবর্তকালের বিবরণ দেওয়া গেল:

গ্রহ	যুতিকাল	আবর্তন সংখ্যা	বৎসর	দিন
শনি	৫৭	২	৫৯	+২ (−৬ দিন)
বৃহস্পতি	৬৫	৬	৭১	−৬(−০ দিন)
বৃহস্পতি	৭৬	৭	৮৩	+০(−১৩ দিন বা+১৭ দিন)
মঙ্গল	২২	২৫	৪৭	−৭(+২ দিন)
মঙ্গল	৩৭	৪২	৭৯	+৪(৭ দিন)
শুক্র	৫	৮	৮	−২(−৪ দিন)
বুধ	১৯	৬	৬	+৮(+১৪ দিন বা−১৬ দিন)
বুধ	৪১	১৩	১৩	+২(−৪ দিন
বুধ	১৪৫	৪৬	৪৬	৪৬+০ ৩(−১ দিন

এই বৎসরগুলো সাধারণতঃ সৌর বৎসর। সূর্য প্রতিদিন প্রায় ১ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ অতিক্রম করে; অতএব আবর্তন সংখ্যার উপরে যত ডিগ্রী অবশিষ্ট থাকে, তা সমান সংখ্যক বৎসরের উপরে তত দিন বেশী। কিন্তু যদি বেবিলনীয় ১২ বা ১৩ চান্দ্রমাসে বৎসর গণনা করা যায়, তাহলে বন্ধনীর ভিতরের দিন সংখ্যাগুলি যোগ করতে হবে।

বেবিলনীয়গণ যে এই আবর্তন ও যুতিকালের বিষয় জানতেন, একটা মৃৎলিপি থেকে তা বোঝা যায়। মৃৎলিপিটি পারস্য-সাম্রাজ্যের সময়ের; এর নানা জায়গা নষ্ট হয়ে গেছে। যে পর্যন্ত উদ্ধার করা গেছে, পরের পৃষ্ঠায় তার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল:

"তোমার ৮ বৎসর পরে দিলবাত (শুক্র) ফিরে আসে; ...... ৪ দিন বিয়োগ করবে।...... তোমার ৬ বৎসর পরে গুদুদ (বুধ) ফিরে আসে, ... জালবাতানুব (মঙ্গল) ঘটনা ৪৭ বৎসর ...... ১২ দিন বেশী ...... পর্যবেক্ষণ করবে ...... সাগউশের (শনি) ঘটনা ৫৯ বৎসর ...... ফিরে আসে ...... দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করবে ...... কাকসিদ্ধির (লুব্ধক) ঘটনা ২৭ বৎসর ...... ফিরে আসে দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করবে ...... "

এখানে গ্রহের আবর্তনকাল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু লুব্ধকের সঙ্গে ২৭ বৎসর আবর্তনকালের অর্থ ঠিক বোঝা যায় না। অনেকে মনে করেন, এটি ৮+১৯ বৎসরের একটি পঞ্জিকা কাল।

ভবিষ্যৎবাণী করবার জন্য প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদগণ কি ভাবে এই দীর্ঘ আবর্তনকাল ব্যবহার করতেন? কোন গ্রহ সম্বন্ধে কোন ঘটনা জানতে হলে, ঐ দীর্ঘ সময় আগের ঘটনাসমূহ দেখতেন এবং সেখান থেকে নকল করে দিতেন, এবং দরকার মত দুই একদিন সংশোধনও করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৪০ সেলুসিড অব্দের পঞ্জিকা তৈরী করতে, বৃহস্পতির ঘটনাবলীর জন্য ৫৭ সেলুসিড অব্দের (১৪০−৮৩) তথ্য, শুক্রের জন্য ১৩২ সেলুসিড অব্দের (১৪০−৮) তথ্য, শনির জন্য ৮১ সেলুসিড অব্দের (১৪০−৫৯) তথ্য ইত্যাদি সংযোজন করতে হতো মাত্র। এই সমস্ত গণনাকার্য যে ভাবে করা হতো, মৃৎলিপিসমূহে সে পদ্ধতিও পাওয়া যায়; এবং দেখা যায় যে, ঠিক এই ভাবেই পঞ্জিকা তৈরী করা হতো। প্রতিদিনের পর্যবেক্ষণ ফল একটা দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করা হতো এবং এই দিনপঞ্জীই ছিল পঞ্জিকা প্রণয়নের ভিত্তি। ক্যামবিসের রাজত্বের সপ্তম বর্ষের (খ্রীস্টপূর্ব ৫২৩ অব্দ) একটি দিনপঞ্জীতে এইরূপ একটি প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। এতে গ্রহসমূহ যে সমস্ত তারামণ্ডলের যে যে অংশে (পশ্চিম, পূর্ব বা মধ্য অংশ) অবস্থিত থাকতো, তার বিবরণ দেওয়া আছে। এ ছাড়া চন্দ্র থেকে গ্রহসমূহের দূরত্ব, এবং গ্রহসমূহের পরস্পরের ভিতরে দূরত্বের বিবরণও

এতে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই দূরত্বের একক হিস আম্মাত ব্যবহার করা হয়েছে। ২৪ উবানীতে ১ আম্মাত। ১ আম্মাত প্রায় ২½ ডিগ্রীর সমান।

বর্ষ ৭ঃ	৫—২২	বৃহস্পতি,	কন্যার পশ্চিমাংশে,	সূর্যের সঙ্গে অস্ত
	৬—২২		কন্যার পূর্বাংশে	সূর্যের সঙ্গে উদয়
	১০—২৭		তুলার পশ্চিমাংশে	স্থির
বর্ষ ৮ঃ	২—২৫		কন্যার মধ্যাংশে	স্থির
	৬—৪		তুলার পূর্বাংশে	সূর্যের সঙ্গে অস্ত
বর্ষ ৭ঃ	৩—১০	শুক্র	সিংহের মাথায়	সন্ধ্যায় অস্ত
	৩—২৭		কর্কটে	প্রাতে উদয়
	১২—৭		মীনের মধ্যাংশে	প্রাতে অস্ত
বর্ষ ৮ঃ	১—১৩		বৃষে (বৃষের শিং)	সন্ধ্যায় উদয়
বর্ষ ৭ঃ	৬—৩	শনি	কন্যার মধ্যাংশে	সূর্যের সঙ্গে অস্ত
	৭—১৩		কন্যার পূর্বে	সূর্যের সঙ্গে উদয়
বর্ষ ৮ঃ	৫—২৯			অস্ত
বর্ষ ৭ঃ	২—২৮	মঙ্গল	মিথুনের মধ্যাংশে	অস্ত
	৬—১৩		সিংহের পায়ে	সূর্যের সঙ্গে উদয়
বর্ষ ৮ঃ	৫—১২			স্থির
বর্ষ ৯ঃ	২—৯		সিংহের পূর্বাংশে	সূর্যের সঙ্গে অস্ত
বর্ষ ৭ঃ	৬—২৪		শুক্র সর্বাধিক দ্রাঘণ (Elongation)	
	৭—২৩	বৃহঃ	উষাতে চাঁদের ৩ আম্মাত পূর্বে	
	৭—২৯	শুক্র	উষাতে বৃহস্পতির ২ উবানী উত্তরে	
	৭—১২	শনি	বৃহস্পতির ১ আম্মাত পশ্চিমে	
বর্ষ ৭ঃ	৪—১৭	রাত্রি আরম্ভ হওয়ার ১⅓ বেরু পরে গ্রহণ উত্তর অর্ধাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।		
	১০—১৪	সকালে ২½ বেরুতে চন্দ্র গ্রহণ; সম্পূর্ণরূপে দৃশ্য; উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত।		

খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৭৯ অব্দ হতে এইরূপ একটি ধারাবাহিক তথ্য সম্বলিত তালিকার মৃৎলিপি পাওয়া গেছে। এই লিপির নাম "আরটাজেরেক্‌স্‌ নামে যিনি পরিচিত, সেই আরসেসের ২৬ বৎসরে তিশরিতু মাস থেকে আদারুর শেষ পর্যন্ত পর্বাদির জন্য পর্যবেক্ষণসমূহ।" এইরূপ নাম থেকে বোঝা যায় যে, পর্যবেক্ষণসমূহ যদিও সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক, তবু এগুলোকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করা হতো। এইরূপ পর্যবেক্ষণকে ধর্মের অঙ্গ বলেই পুরোহিতগণ মনে করতেন। এই লিপিতে আছে—

৮—৩০ চন্দ্র ১৪ই (৫৮ মিনিট) কাস্তে দৃশ্য; রাত্রি ই। মঙ্গলের পশ্চিম দিকে বক্রগতি, β-এরিটিসের ২ আঙ্গুল ১° উবানী নীচে ..

রাত্রি ১২ পূর্ণ চন্দ্র, চন্দ্রশোভা দ্বারা আবৃত, মঙ্গল ভিতরে অবস্থিত; রাজা এবং রাজার ছেলে ... চন্দ্র Alfa-টরির ই আঙ্গুল পূর্বে।...

১৬ বৃহস্পতি বৃশ্চিকে, সূর্যের সঙ্গে উদয়; ১১ই (৪১ মিনিট) দৃশ্য।...

২২ ভোরের চাঁদ শনির উপরে ২ই আঙ্গুল বেশী পূর্বে;

২২ বুধ ভোরে ধনুতে; সূর্যের সঙ্গে উদয়,

২২ মঙ্গল পশ্চিম অংশে

জ্যোতির্বিদগণ তাঁদের সরকারী কাজ হিসাবে এইরূপ দিন-পঞ্জিতে নিয়মিতভাবে কোন কোন বিশেষ তারার তুলনায় চন্দ্র ও গ্রহসমূহের অবস্থান লিপিবদ্ধ করতেন।

পরে এই সমস্ত দিনপঞ্জি থেকে কয়েক বৎসরের জন্য গ্রহসমূহের অবস্থান তালিকা প্রণয়ন করা হয়। খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৮৭ অব্দ থেকে ৩৪৬ অব্দ পর্যন্ত এইরূপ একটি তালিকা রক্ষিত হয়েছে। এই তালিকাতে বৃহস্পতির প্রতিদিনের উদয়, অস্ত, অবস্থান এবং বিভিন্ন তারা থেকে দূরত্ব দেওয়া আছে। এ ছাড়া এই তালিকাতে প্রতি মাসের দিন সংখ্যাও সাধারণভাবে দেওয়া আছে। ...... দুজু ১, আবু ৩০, উলুলু ১ .... এতে কোন মাসের দিন সংখ্যা সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা থাকবার সম্ভাবনা নাই। এই তালিকা থেকে কোন বিশেষ বৎসরের জন্য একটি

'সহায়ক তালিকা' প্রণয়ন করা হতো। এইরূপ একটি সহায়ক তালিকার নাম "১৪০ বৎসরে যে সমস্ত প্রথম দিন, ঘটনা, গতি এবং গ্রহণসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে।" এতে ৬৯ এবং ৫৭ বর্ষের বৃহস্পতির তথ্যসমূহ, ১৩২ বর্ষের শুক্রের তথ্যসমূহ, ৯৪ বর্ষের বুধের তথ্যসমূহ, ৮১ বর্ষের শনির তথ্যসমূহ, ৬১ এবং ৯৩ বর্ষের মঙ্গলের তথ্যসমূহ দেওয়া আছে। এ সমস্ত বর্ষই সেলুসিড অব্দ। উপরে যে সমস্ত বিরাট বিরাট কালের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এই সমস্ত সংখ্যার সঙ্গে যোগ করলে ১৪০ বর্ষ পাওয়া যায়। সুতরাং, সামান্য সংশোধনের পর ঐ বর্ষসমূহের ঘটনা নকল করলেই ১৪০ বৎসরের ঘটনাসমূহ পাওয়া যায়।

এইভাবে গণনা করা ছোট-বড় নানা আকারের, কোণার দিকে ভাঙ্গা, নাম এবং সংখ্যা নষ্ট হয়ে যাওয়া অনেক বর্ষ-পঞ্জির মৃৎলিপি পাওয়া গেছে; এগুলোর মধ্যে ১০৫, ১২০, ১৯৪ সেলুসিড অব্দের এবং ১২৯, ১৭৮ ও ৩০১ সেলুসিড অব্দের বর্ষপঞ্জি লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিতে সূর্যের সঙ্গে উদয় ও অস্ত, অবস্থান, প্রতিযোগ, শুক্র ও বুধের সর্বাধিক দ্রাঘিমা এবং চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু উপরে দুইটি পৃথকভাবে যে বর্ষসমূহ দেখানো হয়েছে, এদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম যে তিনটি বর্ষের নাম করা হয়েছে, সেই তিনটি বর্ষ পঞ্জিতে মণ্ডলের নাম ও স্থির তারা-সমূহ থেকে গ্রহসমূহের কৌণিক দূরত্ব দেওয়া আছে। যেমন—

১২০ সেলুসিড অব্দে আছে—

২—৭ রাত্রি মঙ্গল Gama-জেমিনোরিয়ামের উপরে ৪ আয়াত

২৩ সন্ধ্যা বুধ β-জেমিনোরিয়ামের নীচে ২½ আয়াত

১২—২৪ সকাল মঙ্গল β-ক্যাপ্রির নীচে ২½ আয়াত

অন্য তিনটি লিপিতে তারাসমূহের দূরত্ব নাই, কেবল মণ্ডলের নাম আছে। যেমন ১৭৬ সেলুসিড অব্দে—

"৪-৩০ শুক্র ও মঙ্গল মিথুনে, বুধ কর্কটে; শনি ধনুতে।"

এই তথ্যগুলোকে বিশেষ সূক্ষ্ম বলা চলে না। তবে এর মাঝখানে

আরো কিছু তথ্য আছে। যেমন—

৪—১৩	বুধ	সিংহে উপস্থিত হয়,
৫	শুক্র	কর্কটে উপস্থিত হয়,
৫—৩	মঙ্গল	কর্কটে উপস্থিত হয়,
৫—১৫	শুক্র	সিংহে উপস্থিত হয়,
৫—৯	শুক্র	কন্যাতে উপস্থিত হয়।

একটা প্রশ্ন আসতে পারে, যে সমস্ত রাশিতে গ্রহ উপস্থিত হয় বলা হয়েছে, সেই রাশিসমূহের সীমারেখা কি? উল্লিখিত সময়ে গ্রহের অবস্থান কোথায় ছিল, সে বিষয়ে গণনা করলে দেখা যায়, ঐ সময়ে ঐ সমস্ত গ্রহের দ্রাঘিমাংশ ছিল ১১২°, ৮২°, ১৪২°, ৫২° . ....; এদের প্রত্যেকটি সংখ্যা ৩০ এর গুণীতকের ২২ বেশী। প্রত্যেক রাশি ৩০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। এতে মনে হয় যে, সূর্য-পথকে কৃত্রিম উপায়ে তত্ত্বীয়ভাবে ভাগ করে রাশি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এইরূপ নির্দিষ্ট দিনে গ্রহের দ্রাঘিমাংশ দিয়ে গ্রহ-পঞ্জী নির্ণয়ের জন্য গ্রহ-গতি সম্বন্ধে বেশ উঁচু তত্ত্বীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। দেখা যায়, যে সময় পর্যন্ত বিবরণী পাওয়া যায় তার শেষ অবধি এই প্রকার গ্রহ-পঞ্জী প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সমস্ত পঞ্জী যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ছিল; তার কারণ পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ থেকে সহজে গণনা দ্বারা এগুলো পাওয়া যেত। পরে পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই গণনা প্রমাণ করা হতো এবং অনেক যুগ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের ফলে, তত্ত্বীয় জ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

গ্রহ-গতির পরেই গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রেও তত্ত্বীয় জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। আসিরীয় যুগেও গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো। কিন্তু সে গণনার ভিত্তি ছিল ৬ মাস পর পর গ্রহণের পুনরাবৃত্তির ধারণা। অবশ্য এর কারণ, এই সময়ের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র ও চন্দ্র-পাত বিন্দুর দূরত্ব গ্রহণ সীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু এর পরে চন্দ্রের দূরত্ব যখন ১১ বা ১২ ডিগ্রির বেশী হয়, তখন আর ৬ মাস অন্তর্বর্তী কালের নিয়ম প্রয়োগ করা চলে না, অন্য নিয়মের প্রয়োজন হয়

হিসাব করে দেখা গেছে যে, ২২৩টি চান্দ্রমাস পরে চন্দ্রগ্রহণের প্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই সময়ে মোট ৬৫৮৫⅓ দিন, অর্থাৎ ১৮ বৎসর ১১⅓ দিন হয়। পরবর্তী যুগের লেখাতে এই কালকে 'সারোজ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য বেবিলনের কোন লিপিতে সারোজ শব্দটি পাওয়া যায় না।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি বিখ্যাত লিপিতে গ্রহণের পুনরাবৃত্তির এই কালের প্রয়োগ দেখা যায়। এই লিপির গবেষণাকারী একে 'সারোজ-কানুন' (Saros canon) বলে অভিহিত করেছেন। এই লিপিটি দুই দিকেই ভাঙ্গা একটা বৃহৎ লিপির টুকরা মাত্র। এই লিপিতে কেবল কতকগুলি বৎসর ও মাসের উল্লেখ আছে। এগুলি বিভিন্ন কলামে লিখিত। প্রত্যেক বৎসরের জন্য দুইটি মাস দেওয়া আছে। কোথাও কোন মন্তব্য করা হয় নাই বা কোন বিবরণ দেওয়া হয় নাই। বৎসরগুলি তদানীন্তন রাজার শাসনবর্ষ নির্দেশ করে এবং প্রত্যেক রাজাকে তাঁর নামের প্রথম অংশ দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। এই নামগুলি আরতারসেরেকসেস, দ্বিতীয় অকাস (উগাস্তু), আরসেস, দারিয়ুস, আলেকজাণ্ডার, ফিলিপ, এন্টিগোনাস, সেলিউকাস; শেষে ৩৫ সেলুসিড অব্দ পর্যন্ত একই রাজার নাম লেখা আছে। সুতরাং এতে খ্রীঃ-পূঃ ৩৭৩ অব্দ থেকে ২৭৭ অব্দ পর্যন্ত সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক কলামে মাসের ক্রমিক সংখ্যা রোমান অক্ষর I, II, XII এই ভাবে লেখা আছে। কোন সময় ৬ মাস পরের, কোন সময় বা পাঁচ মাস পরের মাস নেওয়া হয়েছে। যেখানে 'দির' কথাটি লেখা আছে, সেখানে ১৩ মাসের বৎসর ধরা হয়েছে এবং তার পরে মাত্র ৫ মাস পরের মাসকে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক কলামের ৩৮ লাইনে মোট ২২৩টি চান্দ্র মাস আছে। সুতরাং বোঝা যায় যে, এই লিপিটি গ্রহণ মাসের তালিকা। তবে প্রথম ও শেষ মাসটি গ্রহণ মাস নয়। অনুভূমিক রেখা দ্বারা বিভিন্ন ধারা নির্দেশ করা হয়েছে। যেখানে ৫ কথাটি লেখা আছে, সেখানে ৫ মাস অন্তর্বর্তী সময় বোঝানো হয়েছে।

এই লিপি কোন্ সময়ের লেখা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে

X ৩২ IV দীর X	X ৪ IV X	XI দীব IV ১৩আম X	XI ৫ V দীব XI	XI ১১ V XI	দীব XII ২১ V XI
৩৩ II এপ্রল VIII ৩৪ II দীব VIII ৩৫ I VII ৩৬ I VII	৫ III এপ্রল দীর IX ৬ II VIII ৭ II VIII ৮ II VI দীব VII	২ III এপ্রল IX ১দা III দীব IX ২ II VIII ৩ II VIII	৬ III এপ্রল IX ১৩আদ্ব III IX ২ III দীব IX ৩ II VIII	১২ IV এপ্রল (তীব্র) X ১৩ III IX ১৪ III IX ১৫ III দীব IX	৩০ IV এপ্রল X ৩১ IV দীব X ৩২ III IX ৩৩ III IX
XII এপ্রল ৩৭ VI দীর XII ৩৮ V XI ৩৯ V XI	XII এপ্রল ৯ VI XII ১০ VI দীব XII ১১ V XI	৪ I এপ্রল VIএ XII ৫ VI XII ১১ VI দীব XII	৪ I এপ্রল VII ৫ I VIএ XII ৬ VI XII	১৬ I এপ্রল VII ১৭ I VII ১৮ I VIএ XII	৩৪ II এপ্রল দীব VIII ২৫ I
৪০ IV এপ্রল দীর X ৪১ III IX ৪২ III IX ৪৩ III দীব IX	১২ IV এপ্রল X ১৩ IV দীব X ১৪ III IX ১৫ III IX	২ IV এপ্রল X ৩ IV X ৪ IV দীব X ৫ III IX	১ম্রি V এপ্রল দীব XI ২ IV X ৩ IV X ৪ IV দীব X	১৯ V এপ্রল XI ২০ V দীব XI ২১ IV X ২২ IV X	
৪৪ I এপ্রল VII ৪৫ I VII XIIএ ৪৬ VI ১৬ XII VI	১৬ II এপ্রল দীব VIII ১৭ I VII ১৮ I VII ১৯ XIIএ VI	৬ II এপ্রল VIII ৭ II দীব VIII ১স্রী I VII ২ I দীব VII	৫ II এপ্রল VIII ৬ II VIII ৭ II দীব VIII ৮ I VII	২৩ II এপ্রল দীব IX ২৪ II VIII ২৫ II VIII ২৬ II VIII	
XI এপ্রল ২ V দীব XI ৩ IV	XI এপ্রল ২০ V XI ২১ V	XII এপ্রল ৩ V XI ৪ V	XII এপ্রল ৯ VI দীব XII ১০ V	XIIএ এপ্রল ২৭ VI XII ২৮ VI	

বাবিলনিষাব সাবোজ কানুনেব প্রতিলিপি

চিত্র—৫

যেহেতু এতে সেলুসিড অব্দের উল্লেখ আছে, সুতরাং এব বচনাকাল নিশ্চযই খ্রীঃ-পূঃ ২৮০ অব্দেব পবে। অতএব দেখা যায যে, খ্রীঃ-পূঃ ৬০১ শতাব্দী থেকে ৩য শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাবসিক যুগ থেকেই

বেবিলনীয় বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়।

বেবিলনীয় বিজ্ঞানের একটা মস্ত বড় নিদর্শন হচ্ছে 'সারোজ কানুন'। এমন আরো অনেক লিপির মত, এটা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ তালিকা বা গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী নয়। অন্য সমস্ত তালিকা থেকে এ তালিকা অনেক বেশী মূল্যবান। একটি তালিকা আকারে এখানে একটি তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। অতীত ও ভবিষ্যতে যতদূর ইচ্ছা এর প্রয়োগ করা যায়। এতেই বোঝা যায় নিও বেবিলনীয় বিজ্ঞান কতটা উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্যালডিয়া

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেলুসিড বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকেই বেবিলনীয়ার পতন আরম্ভ হয়। পারসিক রাজত্বের সময়েই কৃষ্ণসাগরীয় দেশ এবং মিসরের সঙ্গে ব্যবসায় প্রায় সমস্তই গ্রীসের হাতে চলে যায়। পারস্যের রাজারা পশ্চিম ও পূর্ব দেশসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রীসের সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠতে পারেন নাই। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক শহর ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং লোহিতসাগরের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের ব্যবসা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ব্যবসায়ের পথ থেকে বেবিলন শহর অনেক দূরে পড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে সম্পদহীন হয়ে পড়তে থাকে। রাজধানী হিসাবে নতুন গ্রীক শহর সেলুসিয়া বেবিলনের স্থান দখল করে এবং অচিরেই সিরিয়াতে সেলুসিড রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। খ্রীঃ-পূঃ ১৮১ অব্দে পার্থিয়া কর্তৃক মেসোপটেমিয়া বিজয়ের পর ভূমধ্যসাগর থেকে বেবিলন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। খ্রীস্টপূর্ব যুগের শেষ শতাব্দী থেকে আর কোথাও বেবিলনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য এর পরেও অনেকদিন মেসোপটেমিয়া একটা উর্বর কৃষিপ্রধান দেশ বলে পরিগণিত হতো। পুরানো শহর-সম্পদ এবং এ সমস্ত জায়গার অধিবাসীদের প্রেরণার উৎস ছিল মেসোপটেমিয়া। এর বেশী আর কোন গুরুত্ব এর ছিল না।

এই গুরুত্ব পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞানের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। ব্যবসায়ী এবং রাজকর্মচারিগণ নতুন রাজধানীতে চলে গেলও,

পুরোহিতগণ বেবিলনে তাঁদের মন্দিরেই থেকে যান। খ্রীস্ট-পূর্ব যুগের শেষ তিন শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে সে যুগের চরম উন্নতিও এই সময়েই ঘটে। বিভিন্ন জায়গা খননের ফলে যে সমস্ত টুকরো টুকরো নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, এই সময়েই বেবিলনিয়াতে বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হয়।

এই সময় থেকেই জ্যোতির্বিদ্যার ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য পূর্বের মতই প্রতি বৎসর গ্রহ-পঞ্জী তৈরী করা হতো বটে, এ ছাড়াও এ সময় থেকে কতকগুলো বিশেষ ঘটনার অবগতির জন্য নতুন পদ্ধতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ভবিষ্যৎ ও অতীতের যে কোন সময়ের জন্য গ্রহসমূহের অবস্থান ও প্রতিযোগ-তালিকা প্রণয়ন করা হতে থাকে। এই তালিকা বিবরণী দ্বারা প্রকাশ না করে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হতে থাকে। মণ্ডলের উল্লেখ বা কোন তারা থেকে কত আগ্নাত, কত উবানী দূরে, এভাবে উল্লেখ না করে, সূর্যপথের স্থানাঙ্কে অর্থাৎ দ্রাঘিমাংশে ও অক্ষাংশে এই সমস্ত গ্রহের অবস্থান দেওয়া হতে থাকে। দ্রাঘিমাংশের একক ছিল রাশিচক্রের এক একটি ৩০ ডিগ্রীর রাশি এবং এর ত্রিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক ডিগ্রী এবং তারপরে ষাট ভাগের এক ভাগ।

এই সমস্ত স্থানাঙ্ক তালিকা কি ভাবে গঠিত হতো, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অনেকে মনে করেন, ক্যালডিয়ার জ্যোতির্বিদগণ এমন কতকগুলো যন্ত্র ব্যবহার করতেন, যাতে অনেকগুলো বৃত্ত থাকতো। এই সমস্ত বৃত্তকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হতো। হয়তো এ-গুলোর সাহায্যে গ্রহের বা চন্দ্রের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা হতো অথবা কোন তারা থেকে তাদের দ্রাঘিমাংশের অন্তর নির্ণয় করা হতো। কিন্তু কোন মৃৎলিপির কোথাও কোন যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সাধারণতঃ দুই প্রকার তালিকা দেখতে পাওয়া যায়ঃ একটি চন্দ্রের তালিকা এবং অন্যটি গ্রহসমূহের তালিকা। গ্রহের তালিকাতে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ আছেঃ সূর্যের সঙ্গে উদয়, প্রথম অবস্থান, প্রতিযোগ, দ্বিতীয় অবস্থান ও সূর্যের সঙ্গে অস্ত। ক্রমিক বৎসরসমূহে প্রত্যেক গ্রহের এই

সমস্ত বিষয়ের দিন ও দ্রাঘিমাংশ দেওয়া আছে ; এ ছাড়া দুই একটি সহকারী কলামও দেওয়া আছে। চন্দ্রের তালিকাতে প্রথম দেখা চাঁদের ও পূর্ণিমার সময় ও স্থান দেওয়া আছে। অনেকগুলি সহকারী কলামের সাহায্যে এ সমস্ত নির্ণয় করা হয়েছে। চন্দ্রের তালিকাতে অনেকগুলো জটিল গণনা পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। এর সব কিছু বোঝাও যায় না। চন্দ্রের তালিকার তুলনায় গ্রহের তালিকা অনেক সহজ।

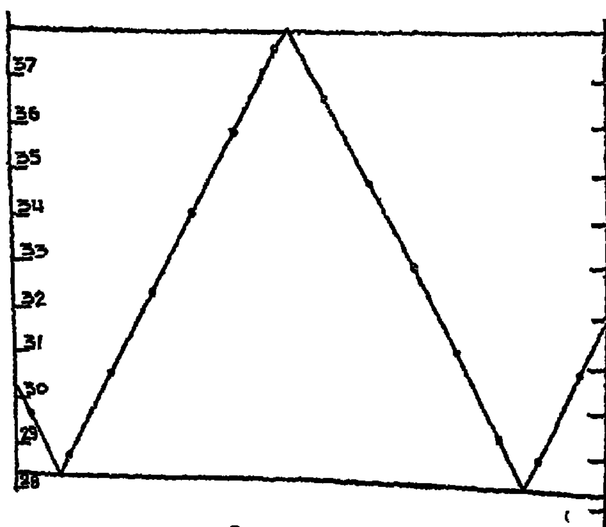
এই সমস্ত সংখ্যা তথ্যের অধিক ও অল্প স্থানান্তরের জন্য গতির যে বিষমতা দেখা যায়, সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। সূর্যপথের একদিকে বেশী সময় ও বেশী দ্রাঘিমাংশ পর পর এবং অন্যদিকে কম সময় ও কম দ্রাঘিমাংশ পর পর, একটির পর অন্য গ্রহের সংযোগ সংঘটিত হয়। অন্যান্য ঘটনাও ঠিক এই একই-ভাবে সংঘটিত হয়। এইরূপ পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন তরঙ্গায়িত রেখা দ্বারা ভাল-ভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে। গ্রীক গণিতবিদগণ মহাশূন্যে গতির সাহায্যে বিকেন্দ্রিক বৃত্ত দ্বারাই একাজ করতেন। বেবিলনীয়দের একরূপ মহাশূন্য গতির কোন ধারণা ছিল না। আকাশের ঘটনাসমূহ তিন আয়তনের মহা-শূন্যে বৃত্তীয় কক্ষে হয় বলে, তাঁরা মনে করতেন না। তাঁদের আকাশ ছিল দুই আয়তনের এবং আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী রহস্যময় কক্ষে পরিভ্রমণ করতো। পৃথিবীর গঠন সম্বন্ধে তাঁরা নতুন কোন জ্যামিতি সৃষ্টি করেন নাই। তাঁরা দার্শনিক বা চিন্তাবিদ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন পুরোহিত। তাঁদের কাজ ছিল ধর্মগ্রন্থ মতে ও প্রচলিত প্রথায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা এবং সে সম্বন্ধে প্রয়োজন মত অবহিত হওয়া। সুতরাং তাঁদের ধর্মশাস্ত্রে নাই, এমন কোন মতবাদ মানতে তাঁরা মোটেই রাজি ছিলেন না। তাঁদের কাছে গ্রহসমূহ মহাশূন্যের কোন বস্তু নয়, জ্যোতির্ময় দেবতা। মানুষ যেমন পৃথিবীতে নানাপথে ঘুরে বেড়ায়, আকাশের এই দেবতাসমূহও আকাশ-পথে তাঁদের খুশিমত ঘুরে বেড়ান। তাঁদের রচিত শেষ তালিকাতেও এই বলে আরম্ভ করা হয়েছে "দেবতা বেল এবং দেবী বেলটিস, আমার প্রভু পত্নীর নামে একটি সঙ্কেত।" ক্যালডিয়ার বিজ্ঞানও তদানীন্তন পুরোহিত-দের বিজ্ঞান ছিল। সে জন্য সে বিজ্ঞান তদানীন্তন প্রচলিত বিশ্বতত্ত্বের

বাইরে যেতে পারে নাই। কিন্তু তাঁদের পরিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিরাট পর্যবেক্ষণ তালিকা থেকেই এ তত্ত্বের উদ্ভব সহজ হয়।

এইভাবে এই সমস্ত পুরোহিত জ্যোতির্বিদগণ যখন গ্রহের গতির বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হলেন, তখন ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ গাণিতিকভাবে বিবেচনা করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। প্রথমে তাঁরা একটি সহজ ও স্থূল পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁরা মনে করতেন, গ্রহসমূহ যখন সূর্যপথের একদিকে থাকে, তখন তাদের গতির পরিমাণ সর্বদা একই থাকে এবং যখন অন্যদিকে যায়, তখন গতির পরিমাণ অন্যরূপ হয়। একদিকের গতির পরিমাণ অন্যদিকের গতির পরিমাণের চেয়ে বেশী। এরপরে তাঁরা এই পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করেন। এই বিরূপ গতিকে তাঁরা এক একটি আঁকাবাঁকা রেখা দিয়ে নির্দেশ করেন। এতে দুইটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই গতি পর্যায়ক্রমে একবার বাড়ে আর একবার কমে। এই দুই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আসলেই আবার যেন প্রতিহত হয়ে বিপরীত দিকে চলতে থাকে। আসিরীয় যুগের প্রথম দিকেও ঠিক একই প্রকারের তালিকা দেখতে পাওয়া যায়। গতি আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে যে এক সময়ে চরমে পৌঁছে আর বাড়ে না এবং তারপরে আস্তে আস্তে কমতে কমতে যে একেবারে অবমে পৌঁছে আর কমে না, এই অবিচ্ছিন্ন ভাবের ধারণা এখানে নাই। এখানে যেন গতি হঠাৎ লাফ দিয়ে বেড়ে যায় আবার ধপাস করে কমে যায়। এর মধ্যে কোন যোগা-যোগই লক্ষ্য করা যায় না।

বৃহস্পতির তালিকার একটা ভাঙ্গা অংশ থেকে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া গেল। বৃহস্পতির দ্বিতীয় অবস্থানের ক্রমিক দ্রাঘিমাংশসমূহ এখানে রাশি, ডিগ্রী ও মিনিটে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী কলামে যুতিকালের গতির পার্থক্য দেখানো হয়েছে। এর পরের কলামে এদের বিয়োগফল লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই গতি সর্বদা ১°৪৮′ মিনিট পরিমাণ বাড়ে বা কমে। চরম ও অবম পরিমাণের নিকটবর্তী স্থানে কিছুটা গণনার প্রয়োজন হয়। অবম পরিমাণ ২৮°২৫½′ এবং তার আগের পরিমাণ

২৯°৪১′ ; এখানে পার্থক্য ১°৪৮′ না হয়ে ১°২৫½′ হয়েছে অর্থাৎ ০°২২½′ কম পার্থক্য হয়েছে। সাধারণভাবে যে পরিমাণ কম হওয়া উচিত, সে পরিমাণ কম হবে আবার ০° ২২½′ বেশী হয়েছে। সে জন্য পরবর্তী পরিমাণ হয়েছে ২৮°১৫½′+০°২২½′=২৮°৩৮′। চরম সীমার ৩৮°২′, এর বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। প্রথমে ০°২৪′ বৃদ্ধি পেয়ে পরে ১°২৪′ মিনিট (০°২৪′+১°২৪′=১°৪৮′) হ্রাস পেয়েছে। এজন্য আগের মানের চাইতে ১° ডিগ্রী কম হয়েছে। এই মানগুলো একটি আঁকাবাঁকা রেখা দ্বারা নির্দেশ করা যেতে পারে।



বৃহস্পতির গতি নির্দেশক রেখা

চিত্র—৬

কতকগুলো সরল রেখার সমষ্টি দিয়ে একটি বক্র রেখাকে সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। উপরের তালিকার শেষ তিন কলামে এই অশুদ্ধি লক্ষ্য করা যেতে পারে। পঞ্চম কলামে সরল রেখার সমষ্টিকে ৪° ডিগ্রী অর্ধ-আবর্তন সীমা বিশিষ্ট একটি রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এইরূপ মান দিয়ে হিসেব করলে যে দ্রাঘিমাংশ পাওয়া যায়, পঞ্চম কলামে

সেই দ্রাঘিমাংশ দেখানো হয়েছে। পরবর্তী কলামে বেবিলনের মানের সঙ্গে এই মানের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই এই পার্থক্য ২০ মিনিটের বেশী নয়। সে যুগে এর চাইতে বেশী সূক্ষ্মতা আশা করা যায় না। তত্ত্বীয়ভাবে প্রাচীনকালে অন্য যে সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো সে গুলোর চাইতে বেবিলনীয় পদ্ধতি নিকৃষ্ট নয়।

যে সমস্ত মৃৎলিপি থেকে আমরা গ্রহসমূহের ঐই সমস্ত তালিকা পাই, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা এবং অক্ষরগুলো নষ্ট। অনেক জায়গাতেই পড়া যায় না। এই সমস্ত লিপির সামান্য মাত্র অংশ ব্যবহার করা যায়। যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তারমধ্যে বৃহস্পতি সম্বন্ধে তথ্যাদিই সবচেয়ে বেশী। দেখা যায় যে, প্রতি ১ বৎসর ১ মাস (১৩ চান্দ্র মাস এবং ১০ বা ২০ দিন) পর পর এই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি বৃহস্পতির যুতিকাল। কুগলার সর্বপ্রথম এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। তিনি তিনপ্রকার তথ্য পান। প্রথম ও আদিম প্রকারে যুতিচাপকে (এক যুতিকালে যে পরিমাণ চাপ অতিক্রম করে) সূর্যপথের উপরে একটি অংশ বলে মনে হয়। এই অংশটি ৮৫° দ্রাঘিমাংশ থেকে ২৪০° দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ; অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য ১৫৫° ডিগ্রী। এর ধ্রুবকমান ৩০° ডিগ্রী। অন্য অংশ ২৪০° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৫° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ অর্থাৎ এই অংশের দৈর্ঘ্য ২০৫° ডিগ্রী। এই অংশের ধ্রুবক ৩৬°। সূর্যপথের সম্পূর্ণ আবর্তনের জন্য প্রকৃত গড়মান ৩৩°৮′৪৫″ হতে হলে এই দুই অংশ অসমান হওয়া প্রয়োজন। যে চাপের কিছুটা অংশ একদিকে এবং কিছুটা অংশ অন্যদিকে অবস্থিত, তার জন্য একটি মধ্যবর্তীমান নির্ণয় করা হতো।

তিনটি ভাঙ্গা মৃৎলিপিতে বৃহস্পতির তৃতীয় প্রকার তালিকা পাওয়া যায়। পরবর্তী চিত্রে এরূপ একটি লিপির একটি পৃষ্ঠার ছবি দেওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে তার অনুলিপিও দেওয়া গেল। রোমান সংখ্যায় মাস দেওয়া হয়েছে। প্রথম সারিতে প্রথম কলামে ৩, ১০ সংখ্যা দ্বারা ষষ্টিক পদ্ধতিতে ১৯০ সেলুসিড অব্দ নির্দেশ করা হয়েছে। তারপরে আদারুর ১১ তারিখ দেওয়া আছে। পরের কলামে সরলরেখার সমষ্টি হিসাবে গণনা করে

৩১°২১´ বৃত্তিচাপ দেওয়া আছে। তারপরে কর্কটের দ্রাঘিমাংশ ২১°৪৯´ দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী লাইনের দ্রাঘিমাংশের (দেখানো হয় নাই) সঙ্গে এই চাপ যোগ করলে এই দ্রাঘিমাংশ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে পরবর্তী চাপ ২৯°৪১´ যোগ করলে পাওয়া যায়, কর্কট ২১°৪৯´+২৯°৪১´=সিংহ

বৃহস্পতির তালিকার কুনিফর্ম প্রতিলিপি

চিত্র—৭

২১°৩০´। পরবর্তী কলামে 'উশ' চিহ্ন দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ের শেষ কলামে 'শু' চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ঐ অধ্যায়ে সূর্যের সঙ্গে অস্তের তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রথম কলামে ষষ্ঠিক পদ্ধতি ৪৩,৪৫ ৩০ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মত তারিখ নির্ণয়ের জন্যই এই সংখ্যাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এর পরবর্তী কলামসমূহে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মতই বৎসর, মাস, দিন, বৃত্তিচাপ ও দ্রাঘিমাংশ দেওয়া আছে।

তৃতীয় প্রকার তালিকাসমূহে অধিকতর উচ্চস্তরের সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করা

৭নং চিত্রের অনুবাদ

চিত্র—৮

যায়। এখানে বৃত্তিচাপ ও সময় অবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চ ও নিম্নসীমার মধ্যে নেওয়া হয়েছে। চাপের জন্য এই সীমা ৩৮°২´ ও ২৮°:৫ই´ ; এদের গড ৩৩°৮´৪৫", এই গড়মান সমস্ত পৃথক পৃথক চাপের গড়মানের সমান। প্রথম প্রকার তালিকাতে এই গড় মানই ব্যবহার করা হয়েছে। সে সময়ের জ্যোতির্বিদগণ যে মূল কল্পনা ব্যবহার করতেন, এই সমস্ত তালিকা থেকে সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। সরল রেখার সমষ্টির একবার উন্নতি ও একবার অবনতির পরে পুনরায় যখন আগের মানে ফিরে আসে, তখন বোঝা যায় যে, গ্রহের একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে। এরা এক সঙ্গে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটি উচ্চ ও নিম্ন সীমার পার্থক্যের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২×৯°৪৬ই´=১৯°৩১´। ১°৪৮´ মিনিটের এক হবের অর্থ এক বৃত্তিকাল, অতএব এক আবর্তনে ১৯°৩৩´—১°৪৮´=১০উউ বৃত্তিকাল পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৩৯১ বৃত্তিকাল ১ আবর্তনের সমান ; এ জন্য ৩৯১÷৩৬=৪২৭ বৎসরের প্রয়োজন হয়। পূর্বে গ্রহের আবর্তনের যে সময় দেওয়া হয়েছে তা থেকে এ অনেক বেশী পরিমাণে শুদ্ধ। ৩৬০° ডিগ্রীকে বৃত্তিকাল সংখ্যা ৺উউ দিয়ে ভাগ করলে বৃত্তিচাপের পরিমাণ পাওয়া যায় ৩৩°৮´ ৪৪ ৮"। এর জায়গায় উপরে ৩৩°৮´৪৫" ব্যবহার করা হয়েছে। এই আসন্ন মানকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলা যেতে পারে।

বৃহস্পতির যে দ্বিতীয় প্রকার তালিকা পাওয়া যায়, বিশুদ্ধতায় সেগুলো প্রথম ও তৃতীয় প্রকার তালিকার মধ্যবর্তী। সূর্যপথের বিপরীত অংশের বৃত্তিচাপ ৩০° ও ৩৬°, সূর্যপথের ১২০° থেকে ১৩৫° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ অন্তর নেওয়া হয়েছে। মধ্যবর্তী অংশসমূহে ৫৩° ও ৫২° বিস্তৃত দ্রাঘিমাংশে ৩৩°৪৫´ নেওয়া হয়েছে। এতে প্রথম তালিকার অশুদ্ধির পরিমাণের আধিক্য, বিশেষ করে প্রান্ত অংশের দিকে অনেকটা কমে এসেছে। আরো একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সমস্ত তালিকা ছাড়াও এই দ্বিতীয় প্রকার তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতির বিবরণও পাওয়া গেছে। এই সমস্ত বর্ণনালিপি সম্ভবতঃ শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছিল।

অন্যান্য গ্রহের জন্যও এইরূপ তালিকা পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সমস্ত

তালিকা অসম্পূর্ণ। শনির জন্য একটি অতিক্ষুদ্র মৃৎলিপি পাওয়া গেছে। এই লিপিতে ১৫৫ সেলুসিড অব্দ থেকে ১৬৭ সেলুসিড অব্দ পর্যন্ত শনির প্রতিযোগ অবস্থান দেওয়া আছে। ৯ আবর্তন = ২৫৬ যুতিকাল = ২৬৫ বৎসর। এই ভিত্তির উপর এই তালিকা প্রণীত হয়েছে। মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে উরুকে একটি মৃৎলিপি পাওয়া গেছে। এই লিপিটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বিতীয় তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি অধিকতরভাবে প্রয়োগ করে এই গ্রহের বিষম গতি নির্ণয় করা হয়েছে। সূর্যপথকে ছয় অংশে ভাগ করায় প্রত্যেকটি অংশে দুইটি করে রাশি পড়েছে। প্রত্যেক অংশের মধ্যে যুতিচাপ ধ্রুবক; কিন্তু কোন অংশের সীমাতে আসলেই এই চাপের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন-মকর-কুম্ভ অংশে ছিল ৯০° ডিগ্রী, কিন্তু মীন-বৃষ অংশে হয়েছে ৬৭½° ডিগ্রী। আবার সেখান থেকে বৃষ-মিথুন অংশে হয়েছে ৪৫°; তারপরে কর্কট-সিংহে ৩০°, কন্যা-তুলাতে ৪০°, বৃশ্চিক ধনুতে ৬০° ডিগ্রী এবং পুনরায় মকর-কুম্ভে ৯০ ডিগ্রী হয়েছে।

শুক্রের ক্ষেত্রেও কতকগুলি লিপির টুকরা পাওয়া গেছে। এই সমস্ত লিপিতে এই গ্রহের দৃশ্যকাল, অদৃশ্য-কাল এবং সন্ধ্যা ও উষার সময়ে এর অবস্থান লিপিবদ্ধ করা আছে। আট বৎসর-পরে শুক্রের প্রত্যেকটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং এই সময়ে দ্রাঘিমাংশ মাত্র ২°৪২′ পরিমাণ হ্রাস পায়। এই সমস্ত বিবরণী থেকে তার যুতি-চাপের কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। বুধ সর্বাপেক্ষা অসুবিধাজনক গ্রহ। গোধূলি-লগ্নেই এই গ্রহ অদৃশ্য হয়ে যায় বলে একে দেখতে পাওয়া অত্যন্ত মুস্কিল; তাছাড়া এর গতিও অত্যন্ত অনিয়মিত। এ সত্ত্বেও বুধ সম্বন্ধেও কিছু কিছু মৃৎলিপি পাওয়া যায়। এতে ১৪৫ সেলুসিড অব্দ থেকে ১৫৩ অব্দ পর্যন্ত এবং ১৭০ অব্দ থেকে ১৮৫ অব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সন্ধ্যায় ও উষাতে শুক্রের দৃশ্য ও অদৃশ্য হওয়ার সময় দেওয়া আছে। অন্যান্য গ্রহের বেলায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, বুধের বেলাতেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সূর্য পথের তিনটি অংশের যুতিচাপের জন্য তিনটি পৃথক ধ্রুবক গ্রহণ করা হয়েছে। ১২১° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ থেকে

২৮৬ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত ১০৬ ; ২৮৬ ডিগ্রী থেকে ৬০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত ১৪১ঠু এবং ৬০ ডিগ্রী থেকে ১২১ ডিগ্রী পর্যন্ত ৯৪ঠু ডিগ্রী। দৃশ্যকালের সময়ের সঙ্গে বিভিন্ন রাশিতে বিভিন্ন পরিমাণ সংখ্যা যোগ করে অদৃশ্যকালের সময় নির্ণয় করা হতো। এই সংখ্যার পরিমাণ ৪৪ ডিগ্রী থেকে ১২ ডিগ্রী পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।

গ্রহসমূহ সম্বন্ধে এই সমস্ত তালিকা বেবিলনের একটি মাত্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হতে পাওয়া গেছে। পরে উরুকে প্রাপ্ত মৃৎ-লিপিতেও এ সম্বন্ধে বিবরণী পাওয়া গেছে। উভয় লিপি থেকে একই প্রকার তথ্য পাওয়া যায়।

চন্দ্রের তালিকাসমূহ দেখলে তাদের জটিলতায় আশ্চর্য হতে হয়। চন্দ্রের গতির জটিল বিষমতা এবং সেই জটিলতা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে বিবরণী দেওয়া ও তালিকা প্রণয়ন করা অত্যন্ত উচ্চ জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় দেয়। চন্দ্র সম্বন্ধে দুইটি পৃথক পদ্ধতিতে গণনা করা হতো। ১৮০ সেলুসিড অব্দের কয়েকটি ছোট এবং একটি বড় মৃৎলিপি পাওয়া যায়। এতে গণনা পদ্ধতিতে ১৮টি কলাম ব্যবহার করা হয়েছে। আরো কতকগুলি টুকরা টুকরা মৃৎলিপি পাওয়া গেছে। এগুলি ১৪০ সেলুসিড অব্দের। এর কোনটিতেই গণনা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দেখানো হয় নাই। সূর্য ও চন্দ্রের প্রকৃত সংযোগের স্থান ও সময় এবং বিপরীত দিকে প্রতিযোগের অবস্থান দেওয়া আছে। সংযোগের সময় থেকে প্রথম চাঁদ দেখার সময় নির্ণয় করা হতো। চন্দ্রের অক্ষাংশের পরিবর্তনের সাহায্যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ নির্ণয় করা হতো।

এ ব্যাপারটি যথেষ্ট জটিল। কেননা দুইটি খ-বস্তু পৃথক ও পরিবর্তনশীল গতিতে পরিভ্রমণ করে। এদের গতি থেকে এই গ্রহণের সময় নির্ণয় করতে হয়। এই দুইটি খ-বস্তুর একটির (চন্দ্রের) গতি দ্রুত এবং অন্যটির (সূর্যের) গতি মন্থর। দুইটির সংযোগ স্থান প্রধানতঃ মন্থর-গতি বস্তুর উপর নির্ভর করে; কিন্তু সংযোগের সময় নির্ভর করে প্রধানতঃ দ্রুত গতিসম্পন্ন বস্তুটির উপর। বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদগণ যে এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন,

তা তাঁদের সমাধান পদ্ধতি থেকেই জানা যায়। সূর্যের গতির বিষমতার সাহায্যে প্রথমে সংযোগ ও প্রতিযোগের স্থান নির্ণয় করা হতো। তার পরে চন্দ্রের গতির বিষমতা বিবেচনা করা হতো এবং তা থেকে ক্রমিক সংযোগ ও প্রতিযোগের অন্তর্বর্তী সময় নির্ণয় করা হতো।

এই তালিকাসমূহের প্রথম কলামে অমাবস্যার এবং পূর্ণিমার চাঁদের দ্রাঘিমাংশ দেওয়া আছে। এতে সূর্যের গতির বিষমতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। পূর্ববর্তী প্রথম প্রকার গ্রহ-তালিকা যে পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে সেই একই পদ্ধতিতে সূর্য-তালিকাও প্রণীত হয়েছে। সূর্যপথের একটি অংশের জন্য একটি বৃহত্তর ধ্রুবক-গতি প্রতিমাসে ৩০° এবং অন্য অংশের জন্য ক্ষুদ্রতর ধ্রুবক-গতি প্রতিমাসে ২৮$\frac{১}{৮}$° গ্রহণ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত গড়মান পাওয়ার জন্য দুইটি অংশের দৈর্ঘ্য অসমান লওয়া হয়। ১৬৩° ডিগ্রী থেকে ৩৫৭° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ, এই ১৯৪° ডিগ্রী পরিমিত বৃহত্তর অংশের জন্য বৃহত্তর গতি এবং ৩৫৭° ডিগ্রী থেকে ১৬৩° ডিগ্রী, এই ১৬৬° ডিগ্রী পরিমিত ক্ষুদ্রতর অংশের জন্য ক্ষুদ্রতর গতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসরে ১২[illegible]টি দ্যুতিমাস আছে।

এখানে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, এই সমস্ত জ্যোতির্বিদ কিভাবে সূর্যের বিষম গতি সম্বন্ধে জানতে পারেন। অনেকে মনে করেন, ঋতুর অসমান দৈর্ঘ্য থেকেই তাঁরা এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটি ধারণা করেন। ছায়ার দৈর্ঘ্যের জন্য বেবিলনীয়গণ একটা খাড়া দণ্ড ব্যবহার করতেন। এর সাহায্যে তাঁরা অয়ন মুহূর্ত নির্ণয় করতে পারতেন এবং দুই অয়ন মুহূর্তের মধ্যবর্তী বিষুবন মুহূর্তও নির্ণয় করতে পারতেন।

বেবিলনিয়ার দুইটি বিকল্প ধ্রুবক-তত্ত্ব দ্বারা বসন্ত এবং হেমন্তকালের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যেতে পারে। এই দুইটি ঋতু সম্পূর্ণভাবে মন্থর ও দ্রুত অংশের ভিতরে অবস্থিত; এবং এই ঋতু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৯৪.৫ দিন এবং ৮৮.৬ দিন। বিপরীতক্রমে একই সম্বন্ধ প্রয়োগ করে বিভিন্ন ঋতুর অসম দৈর্ঘ্য থেকেই তাঁরা বিষম গতির তত্ত্বীয় তথ্য প্রণয়ন করতে সক্ষম হন।

পরবর্তী তালিকাসমূহ অনেকটা তৃতীয় প্রকার গ্রহ-তালিকার মত। ক্রমিক অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায়, চাঁদের দ্রাঘিমাংশের অন্তর নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় এবং উচ্চ ও নিম্ন সীমার মধ্যে একটা আঁকাবাঁকা সরল রেখার সমষ্টিতে প্রকাশ করা যায়। এই সীমা দুইটি যথাক্রমে ৩০°১'৫৯" এবং ২৮°১০'৩৯¾", এদের অন্তর বা দোলন সীমা ১°৫১'১৯¾" এবং গড় ২৯°৬'১৯½"; এবং একটি স্তরের পরিমাণ ০°১৮'। এই সমস্ত তথ্য থেকে আবর্তনকাল নির্ণয় করা যায়।

ক্রমিক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্যের দ্রাঘিমাংশ দ্বারা অনেক বিষয় নির্ণয় করা হতো। দিবাভাগের দৈর্ঘ্য বা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ও এর সাহায্যেই নির্ণয় করা হতো। পূর্ববর্তী পদ্ধতির বর্ণনালিপি থেকে বোঝা যায়, ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য গ্রীষ্মকালের ১৪ ঘণ্টা ২৫ মিনিট থেকে শীতকালের ৯ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। এখানে কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বেবিলনের অক্ষাংশ ২°৩০'; এই অক্ষাংশে দিবাভাগের সর্ববৃহৎ দৈর্ঘ্য ১৪ ঘণ্টা ১১ মিনিট এবং সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য ৯ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট।

এই বিবরণীলিপিতে আরো একটা বর্ণনা দেওয়া আছে। "মেষের ১০ ডিগ্রীতে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টা; পরবর্তী প্রত্যেক ডিগ্রীর জন্য ১৬০ সেকেণ্ড যোগ করবে ‥ ।" এইভাবে প্রত্যেকটি রাশির জন্য একটি করে বর্ণনা দেওয়া আছে। এতে মনে হয় মেষের ১০ ডিগ্রীতে বিষুবন অবস্থিত ছিল। পরবর্তী দুইটি বিবরণীলিপিতে দেখা যায় যে, বিষুবন মেষের ৮° ও ৮° ১৫'-এ অবস্থিত। ক্যালডীয় জ্যোতির্বিদগণ বিষুবন থেকে দ্রাঘিমাংশ গণনা করতেন না। তাঁরা প্রথম রাশির আদিবিন্দু থেকে বা কোন বিশেষ তারা থেকে দ্রাঘিমাংশ গণনা করতেন। বিষুবনের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সময়ে এর দ্রাঘিমাংশ বিভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় জানতে হলে, চাঁদের বিষম গতি বিবেচনা

করা দরকার। চন্দ্রের অনুভূব অগ্রগতির জন্য সর্বোচ্চ গতিলাভের আবর্তন-কাল, প্রকৃত আবর্তনকাল (নাক্ষত্রিক আবর্তন) অপেক্ষা দীর্ঘতর। এই আবর্তনকাল গণনার জন্য উভয় পদ্ধতির তালিকাতেই কতকগুলি অতিরিক্ত কলাম সংযোজন করা হয়েছে। পরবর্তী যুগের বিশদ তালিকাতে ক্রমিক যুতিকালের দৈর্ঘ্যের একটি কলাম দেওয়া আছে। এগুলি ২৯ দিন ১৭ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট ৪৮⅓ সেকেণ্ড ও ২৯ দিন ৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ১৮⅓ সেকেণ্ড সীমার মধ্যে আঁকাবাঁকা সরল রেখার সমষ্টির উপরে অবস্থিত। এই দুই সীমার গড়মান, গড় যুতিকাল ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩⅓ সেকেণ্ডের সমান। অনেক শতাব্দী ধরে গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ফলে এই গড়মান নির্ণীত হয়েছে বলে এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

এই সমস্ত দীর্ঘ গণনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মাসের প্রথম দিন নির্ণয় করা; অর্থাৎ অমাবস্যার পরে প্রথম কখন চাঁদ দেখা যাবে, সেই সময় নির্ণয় করা। এ জন্য আরো পাঁচটি অতিরিক্ত কলাম সংযোজন করা হয়েছে। এর প্রথম কলামে অমাবস্যা থেকে পরদিন সূর্যাস্তের অন্তর্বর্তী সময় দেওয়া আছে। কেননা আশা করা যায় যে, পরদিন সূর্যাস্তের সময় চাঁদ দেখা যাবে। সূর্য এবং চন্দ্রের দৈনিক গতি থেকে সূর্যাস্তের সময়ে তাদের দ্রাঘিমাংশের অন্তর বের করা যেতে পারে। কিন্তু এর উপরেই চাঁদ দেখা যাওয়া বা না যাওয়া নির্ভর করে না। সবচেয়ে বেশী দরকার সূর্যাস্তের কত পরে চন্দ্র অস্ত যায়, সেই সময়ের। এটি আবার দিগন্তের সঙ্গে সূর্যপথের নতির উপর নির্ভর করে। এই নতি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন হয় এবং চন্দ্রের উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের উপরেও এই নতি নির্ভর করে। এই সমস্ত সংশুদ্ধি মিনিট পর্যন্ত দেওয়া আছে। এই সমস্ত সংশুদ্ধির ফলে সূর্যাস্তের পরে চন্দ্র কতক্ষণ দিগন্তের উপরে থাকে, তা মিনিট পর্যন্ত সময়ে নির্ণয় করা যেতে পারে।

সমস্ত তালিকারই এই হলো প্রধান উদ্দেশ্য। সমস্ত প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য চান্দ্রমাসের প্রথম দিন বা অমাবস্যার পরে প্রথম চাঁদ দেখার দিন নির্ণয় করা প্রয়োজন। এতদিন এই কাজ খালি চোখে করে আসা হচ্ছিল। কিন্তু গণনার সাহায্যে এ কাজটি করবার চেষ্টা সব

সময়েই করা হচ্ছিল। এতদিনে সে উদ্দেশ্য সফল হয় বলা যেতে পারে।

পুরাতন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দেওয়ার আর কোন প্রয়োজন নাই। তবে একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সবসময়ে কেবল তালিকা প্রণয়নই করা হয় নাই। অনেক জায়গায় পদ্ধতির বিবরণীও দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত বিবরণী খুবসম্ভব প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য দেওয়া হতো। তালিকাতে যে সমস্ত সংখ্যার কোন নাম দেওয়া হয় নাই, এই সমস্ত বিবরণীতে সে-গুলির নাম দেওয়া আছে। একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের দৈনিক গতিকে 'জি শা শামাস' এবং 'জি শা সিন' বলে উল্লেখ করা হতো; এর অর্থ 'সূর্য-দেবতার জীবন' ও 'চন্দ্র-দেবতার জীবন'। আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের গতিকে পুরোহিত জ্যোতির্বিদগণ তাদের জীবনের লক্ষণ বলে মনে করতেন এবং সেই জীবনকে ভালভাবে জানবার জন্য নিখুঁতভাবে গণনা করতেন।

চন্দ্র-তালিকার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, গ্রহণের সময় নির্ণয় করা। চন্দ্রের অক্ষাংশের উপর গ্রহণ নির্ভর করে। সেজন্য অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য চন্দ্র-তালিকাতে কয়েকটি কলাম সংযোজন করা হতো। বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদগণ জানতেন যে, আঁকাবাঁকা সরল রেখার সমষ্টি দিয়ে চন্দ্রের অক্ষাংশের পরিবর্তন নির্দেশ করা সুবিধাজনক নয়। প্রান্তের মান ঠিক হলে, পাতবিন্দুর নিকটে চন্দ্রের নতি ১২ গুণ বয়ে যায়। কিন্তু এই পাতবিন্দুর নিকটে প্রকৃত অক্ষাংশ নির্ণয় করাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। আবার আঁকাবাঁকা রেখাটিকে পাতবিন্দুর নিকটে ঠিক গতি দেওয়া গেলে, এতে সর্বাধিক যে অক্ষাংশ পাওয়া যায়, চন্দ্রের সর্বাধিক অক্ষাংশ থেকে সেটা অনেক বেশী। আর এতে অমাবস্যার পরে চাঁদ দেখার গণনাতে অনেক অসুবিধা হয়। এই দুই অসুবিধা দূর করবার জন্য একটি ভাঙ্গা আঁকাবাঁকা রেখার সাহায্য নেওয়া হয়। সূর্য-পথের সঙ্গে ছেদবিন্দুতে এর নতিকে দ্বিগুণ করা হয়। এই রেখাটি এমনভাবে আঁকা হয় যে, +৬ থেকে −৬ পর্যন্ত সাধারণ আঁকাবাঁকা রেখাতে ১২ এর নীচের সমস্ত মান দ্বিগুণ করা হয় এবং এর উপরের সমস্ত মানকে ১২ দিয়ে গুণ করা হয়। কি একক ব্যবহার করা

হতো তার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। এর পরে গ্রহণ সম্বন্ধে গণনা-পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, এবং অনেক জায়গাতেই বুঝতে পারা যায় না।

গ্রহণ গণনার পূর্বতন পদ্ধতি অনেকটা সহজ এবং শেষ ধাপ পর্যন্ত বুঝতে পারা যায়। চন্দ্র-তালিকা সম্বন্ধে যে সমস্ত মৃৎলিপির টুকরা পাওয়া গেছে, তার কোন কোন অংশে অক্ষাংশ কলামের পরে আরো একটি কলাম সংযোজন করা আছে। এই কলামের অধিকাংশ সারিই খালি থাকে; তবে ষষ্ঠ সারিতে একটি সংখ্যা দেখা যায়। এই জায়গাতে অক্ষাংশ সর্বাপেক্ষা ছোট এবং এখানে গ্রহণ সংঘটন সম্ভব। এই সংখ্যাটিকে 'গ্রহণ নির্দেশক সংখ্যা' বলা যেতে পারে। এই সংখ্যাটি বের করতে পাতবিন্দুর পূর্বে ষষ্টিক পদ্ধতিতে ১, ৪৪, ২৪ থেকে চন্দ্রের অক্ষাংশ বিয়োগ করতে হয় এবং পাত-বিন্দুর পরে এই দুইটি যোগ করতে হয়। দশগুণ ছোট এককে প্রকাশ করতে হলে একে ১০ দিয়ে গুণন করতে হয়। এতে ধ্রুবক অংশ ১০ × ১, ৪৪, ২৪= ১৭, ২৪, ০ হয়। এই ধ্রুবক অংশটি পৃথিবীর ছায়ার ও চন্দ্রের ব্যাসার্ধের যোগফলের চাইতে সামান্য বেশী। পাতবিন্দুর পূর্বে যখন চন্দ্রের অক্ষাংশ এই ধ্রুবকের সমান হয় তখন চন্দ্রবিম্ব পৃথিবীর ছায়াকে স্পর্শ করে এবং আংশিক গ্রহণ সম্ভব হতে পারে। এখানে গ্রহণ-নির্দেশক সংখ্যার মান ০ (শূন্য)। এর ফলে কোন প্রকার গ্রহণই গণনার বাইরে পড়ে না। চন্দ্রবিম্ব ছায়ার ভিতরে কতটা প্রবেশ করেছে, গ্রহণ-নির্দেশক তারই পরিমাণ নির্দেশ করে। গ্রহণ-নির্দেশকের মান যখন শূন্য, তখন কোন প্রকার গ্রহণই সংঘটিত হয় না। এই নির্দেশকে চন্দ্রের ব্যাসের ১/৮ এককে প্রকাশ করা হয়। সে জন্য গ্রহণ-নির্দেশকের পরিমাণ শূন্য অথবা কোন ছোট বিয়োগ-বোধক সংখ্যা দ্বারা আরম্ভ করা হয়। ক্রমে এর পরিমাণ বাড়তে বাড়তে অক্ষাংশে শূন্যে এসে এর মান ১৭, ২৪-এ যেয়ে পৌঁছে। পাতবিন্দু অতিক্রম করেও এই নির্দেশক বাড়তে বাড়তে ধ্রুবকের দ্বিগুণ ৩৪, ৪৮-এ যেয়ে পৌঁছায়। এ অবস্থায় চন্দ্রবিম্ব ছায়ার ভিতর থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসে; তখন আর সামান্যতম অংশেও গ্রহণ হয় না।

১৩৮ সেলুসিড অব্দ থেকে ১৬০ সেলুসিড অব্দ পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী

সময়ের সমস্ত গ্রহণ বা প্রায়-গ্রহণ ক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। নীচের চিত্রে চন্দ্র-তালিকার কয়েকটি কলাম দেওয়া গেল।

বৎসর এবং মাস			দ্রাঘিমাংশ		অক্ষাংশ		গ্রহণসূচক
২	১৮	I	৯ ৫২ ৩০	♏	১ ৭ ৩৯ ৪৮	+ +	২৮ ৪০ ৩৮
		VII	১ ৪০	♉	১ ১৭ ৮ ১২	− −	৩০ ১৫ ২২
	em	XII	১ ২২ ৩০	♎	১ ৪৭ ৩৪ ৪৮	− +	০ ১৮ ১২
২	১৯	VI	২০ ৩৬	♓	১ ৫৩ ৩৮ ২৪	+ −	−১ ৩২ ২৪
		XII	২০ ৩৬	♍	৩৮ ৩০	− +	১০ ৫৯
২	২০	VI	৯ ৪৫	♓	৫০ ৯ ৩৬	+ −	৯ ২ ২৪
		XII	৯ ৩২	♍	২৩ ১৪ ৪৮	+ +	২১ ১৬ ২৮
২	২১	V	২৯ ২২ ৩০	♒	১৭ ৭ ১২	− −	২০ ১৫ ১২
		XI	২৮ ২৮	♌	১ ২৪ ৫৯ ৩৬	+ +	৩১ ৩৩ ৫৬
২	২২	V	১৯ ০	♒	১ ২৪ ২৪	− −	৩১ ২৮
	em	X	১৭ ২৪	♋	১ ৪৫ ৪৭	− +	−০ ১৩ ৫০
২	২৩	III	১০ ৩০	♑	১ ২৫ ৫০ ৩৬	+ −	৩ ৫ ৩৪
		IX	৬ ২০	♋	৪৪ ২ ১২	− +	১০ ৩ ৩৮
২	২৪	III	০ ৭ ৩০	♑	১৮ ৩৩ ৪৮	+ −	১৪ ১৮ ২২
		IX	২৫ ১৬	♊	১৭ ৪২ ৩৬	+ +	১০ ২১ ৬
২	২৫	III	১৯ ৪৫	♐	৪৮ ৪৩	− −	২৫ ৩১ ১০
		IX	১৪ ১২	♊	১ ১৯ ২৭ ২৪	+ +	৩৩ ৩৮ ৩৪
২	২৬	II	৯ ২২ ৩০	♐	১ ৫৫ ৫৯ ৪৮	− −	৩৬ ৪৩ ৫৮
	em	VII	৩ ৮	♉	১ ৫০ ১৯ ১২	− +	−১ ৮ ২
২	২৭	I	০ ৫২ ৩০	♏	৫৪ ১৪ ৪৮	+ −	৮ ২১ ৩২
		VII	২২ ৪	♈	৪৯ ৩৪ ২৪	− +	৯ ৮ ১৬
২	২৮	I	২০ ৩০	♎	১৩ ২	− −	১৯ ৩৪ ২০
		VII	১১ ০	♈	১২ ১০ ২৪	+ +	১৯ ২৫ ৪৪
		XIIa	১০ ৭ ৩০	♎	১ ২০ ১৮ ৪৮	− −	৩০ ৪৭ ৮
২	২৯	VI	২৯ ৫৬	♓	১ ১৩ ৫৫ ১২	+ +	২৯ ৪৩ ১২
	em	XI	২৯ ৫৬	♌	১ ৪৩ ২৭ ৪৮	+ −	০ ৯ ২২

রেখাচিত্র ৯ঃ কালডিয়ার চন্দ্রগ্রহণ তালিকা

প্রথম কয়েকটি কলামে বৎসর, মাস, সূর্যপথে দ্রাঘিমাংশ ও চন্দ্রের অক্ষাংশ দেওয়া আছে। এর পরে দুইটি চিহ্ন দেখা যায়, এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'উ' এবং 'লাল', এদের অর্থ 'উপরে' এবং 'নীচে' অথবা 'যোগবোধক' এবং 'বিয়োগ-বোধক'। এদের প্রথমটিতে চন্দ্রের অক্ষাংশ উত্তরে না দক্ষিণে সেটা নির্দেশ করে, এবং দ্বিতীয়টিতে নির্দেশ করে চন্দ্র কি উচ্চপাতবিন্দুর নিকটে, না নিম্নপাতবিন্দুর নিকটে। + − অথবা − + অর্থে পাতবিন্দুর পূর্বে বোঝায়, এবং + + অথবা − − পাতবিন্দুর পরে বুঝায়।

এই তালিকার প্রথম ও শেষ কলামের দিকে লক্ষ্য করলে, পূর্ববর্তী যুগের সারোজ কানুনের একটি কলামের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে এই তালিকাতে উচ্চতর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা এই তালিকাতে গ্রহণ সম্ভাবনার বৎসর মাস ছাড়াও, গ্রহণ-নির্দেশক দেওয়া আছে। এ থেকে গ্রহণের পরিমাণের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রহণ-নির্দেশক ১২ থেকে ২৩-এর মধ্যে থাকলে পূর্ণগ্রহণ সংঘটিত হয়; এর মধ্যে নির্দেশক যদি ১৭ বা ১৮-এর নিকটবর্তী হয়, তাহলে পূর্ণগ্রহণের স্থায়িত্বকাল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হয়। গ্রহণ-নির্দেশকের মান ২৩-এর বেশী এবং ১২-এর কম হলে আংশিক গ্রহণ সংঘটিত হয়। এই নির্দেশকের মান শূন্য বা তার কম হলে এবং ৩৫-এর বেশী হলে কোন গ্রহণ সংঘটিত হয় না। এর পরে আর কোন প্রকার বিশদ বিবরণের প্রয়োজন হয় না।

উপরের তালিকার গ্রহণ-নির্দেশক থেকে সূর্যের গতির পরিবর্তন স্পষ্টই বোঝা যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গণনা দ্বারা বিষমতার যে মান পাওয়া গেছে, এ সমস্ত তালিকাতে তারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, ক্যালডীয় জ্যোতির্বিদ্যা সারোজ কানুনের স্তর থেকে গ্রহণ সংঘটন নির্ণয়ের তত্ত্বীয় ও সংখ্যাভিত্তিক স্তরে উন্নীত হয়।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, শিলার ভূমিতে প্রায় এক হাজার বৎসরের মধ্যে উচ্চস্তরের তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব হয়। এই জ্যোতির্বিদ্যার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষকিছু জানা যায় নাই। কতকগুলি ভাঙ্গা মৃৎ-লিপি থেকে যতটুকু জানা গেছে, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এই সময়েই

জ্যোতির্বিদ্যা প্রকৃত বিজ্ঞান পর্যায়ে উন্নীত হয়। অবশ্য এ সময়ে বিশ্ব-গঠনের কোন নূতন তত্ত্ব গড়ে ওঠে নাই অথবা বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার গাণিতিক নির্দেশ এ সময় থেকেই পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে, জ্ঞান যখন গাণিতিক আকার ধারণ করে, তখনই তাকে বিজ্ঞান বলা হয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে ক্যালডীয় জ্যোতির্বিদ্যাকে নিশ্চয়ই বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ এখানে খ-বস্তুর গতি ও ঘটনাকে কতকগুলি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর এই সমস্ত সংখ্যার সাহায্যেই খ-বস্তুসমূহের ভবিষ্যৎ গতি ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সঙ্কেত পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রীস

গ্রীসকে বর্তমান সভ্যতার জন্মভূমি বলে সাধারণতঃ স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমানে যে উন্নতি ও উৎকর্ষ দেখা যায়, তার প্রথম উৎপত্তি হয় গ্রীসে। বেবিলন, মিসর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশ যেখানে বিজ্ঞান-চর্চার শেষ ধাপ বলে মনে করেছিল, গ্রীস সেখান থেকেই আরম্ভ করে। মিসর প্রভৃতি দেশের জ্যোতির্বিদগণের আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্যবেক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঋতুর আগমন ঘোষণা, গ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী এবং নানাবিধ ধর্মীয় প্রয়োজন। ঋতুর নিয়মিত পরিবর্তনের কারণ, সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করবার মত কোন প্রচেষ্টা কোথাও হয় নাই; বরং কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে এগুলিকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরূপ মনে করবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, এই সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে যেয়েই, সহজবোধ্য কতকগুলি কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়। দেব, দেবতা, দৈত্য, অসুর ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে। আদি গ্রীসে যে এর ব্যতিক্রম ছিল, এমন মনে করবার কোন কারণ নাই। গ্রীস সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমরা জানতে পারি, তার প্রায় সমস্তই কিংবদন্তীরূপে প্রচারিত হয়ে এসেছে। প্রত্যক্ষ নিদর্শন কিছু পাওয়া যায় না। আইওনিয়ান দার্শনিকদের কোন লেখাই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সক্রেটিসের আগেকার দার্শনিকদের লেখার অতি সামান্য অংশ মাত্র পাওয়া যায়। প্লেটোর গ্রন্থে পূর্বেকার দার্শনিকদের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। আরিস্টটলই সর্বপ্রথম দার্শনিক যিনি তাঁর পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে যথেষ্ট উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই

সমস্ত উল্লেখও এত বেশী টীকা-টিপ্পনী ও বাদানুবাদে পরিপূর্ণ যে, তা থেকে পূর্বেকার প্রকৃত বিষয় উদ্ধার করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আরিস্টটলের প্রধান শিষ্য থিওফ্রেটাস পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন বলে মাঝে মাঝে উল্লেখ আছে। কিন্তু সে বই-এর সামান্য উদ্ধৃতি ও সমালোচনা ছাড়া এখন আর অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে লিখিত এমন কতকগুলি বই পাওয়া যায়, যেগুলি থিওফ্রেটাসের পদার্থবিদ্যার উপরে ভিত্তি করে লেখা। এই সমস্ত বইতে পূর্ববর্তী দার্শনিক সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণী পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত লেখকের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না, এমন কি, তাঁরা কোন্ সময়ের লোক, সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাওয়াও মুস্কিল। তবে নানাদিক থেকে বিবেচনা করে অনেকে মনে করেন যে, এই সমস্ত লেখকদের কেউ কেউ খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। তৃতীয় শতাব্দীর লেখক ডায়জেনিস লার্টিয়াসের "দার্শনিকদের জীবনী" গ্রন্থে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। যদিও এ বইতে দার্শনিকদের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা না করে, তাঁদের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও এ বইতে যে সমস্ত বিষয় জানা যায়, অন্য কোথাও সেরূপ পাওয়া যায় না। এ ছাড়া Placita philosophorum নামক ল্যাটিন বইতে বিষয় অনুসারে বিভিন্ন গ্রীক দার্শনিকের মতবাদের উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন প্লুটার্ক এই বই-এর সঙ্কলন করেন; অবশ্য অনেকে আবার এতে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীকে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের একটা স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। সারা পৃথিবীতে যেন একটা নূতন চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। চীনের কনফুসিয়াস ও লাওৎসে, ভারতবর্ষের বুদ্ধ এবং গ্রীসের পীথাগোরাস এই সময়ে পৃথিবীর চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে চালিত করেন। এই সময় থেকেই গ্রীক দার্শনিকগণ কোন প্রয়োজনের তাগিদ ব্যতিরেকেই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করবার কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই যুক্তিসহ ব্যাখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। রূপক ও অতীন্দ্রিয় চিন্তাধারা থেকে হঠাৎ এইরূপ

বাস্তব চিন্তাধারার আশ্রয় নেওয়া একটা অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার। চিন্তাধারার এই পরিবর্তনের কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। চিন্তার বিবর্তনই যদি এর জন্য দায়ী হয়ে থাকে, তা হলে সে বিবর্তনের কোন চিহ্ন আগে কোথাও দেখা যায় নাই। কল্পনাবাদী কাহিনীপ্রিয় মানুষ যেন হঠাৎ একদিন উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে সত্যিকার মানুষে পরিণত হলো। এখানেই গ্রীসের বিশেষত্ব এবং এজন্যই গ্রীসকে আধুনিক সভ্যতার জন্মভূমি বলা হয়।

দার্শনিকদের জ্যোতির্বিদ্যা

আইওনিয়ন সম্প্রদায়

থালেস (Thales)ঃ গ্রীসের যে সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের নাম জানা যায়, তাঁদের মধ্যে থালেস সর্বপ্রথম। খ্রীস্টপূর্ব ৬৪০ অব্দে তিনি এশিয়া মাইনরের মাইলেটাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৮ বৎসর বয়সে মারা যান। জ্ঞান সংগ্রহের জন্য তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি অনেক দিন মিসরে ছিলেন এবং সেখানে তিনি জ্যামিতি শিক্ষা করেন। এজন্য তাঁকে জ্যামিতি-বিদ থালেসও বলা হয়। পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। পৃথিবী বা বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ বর্তমানে অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হলেও তিনিই প্রথম বস্তুবাদ দিয়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। হোমারের মত তিনি মনে করতেন যে, পৃথিবী পানির উপরে ভাসমান একটা গোলাকার ডিম্ব। কিন্তু এটুকু বলেই তিনি শেষ করেন নাই। তিনিই প্রথমে বিশ্ব সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করেন। এই বিশ্ব কোন্ মূল পদার্থ দিয়ে তৈরী? এর আকার কিরূপ? কি ভাবেই বা এর সৃষ্টি হলো? বিশ্বরহস্যের এ মূল প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নকর্তা থালেস। এখনও জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। এইরূপ বিপ্লবাত্মক প্রশ্ন করেই থালেস ক্ষান্ত হন নাই; তিনি তার উত্তরও দিয়েছেন। তিনি বলেন, সমস্ত সৃষ্টির মূল পদার্থ পানি এবং সমস্ত জিনিসের সৃষ্টি আর্দ্রতা থেকে।

তাঁর মতে পানির বাষ্পীভবনের ফলেই বাতাসের সৃষ্টি হয়। এই মতবাদ সত্য কি মিথ্যা, সেটা বড় কথা নয়; তিনি যে একটা নূতন ধরনের প্রশ্ন মানুষের মনে তুলে ধরেছেন, সেটাই প্রধান বিষয়। বিশ্বরহস্যের জন্য কোন দেবতার নিকট প্রশ্ন করা হয় নাই যে, দৈববাণীতে তার উত্তর আসবে। প্রশ্ন করা হয়েছিল বোবা প্রকৃতির নিকট এবং কঠিন বাস্তববাদী প্রকৃতির সাহায্যেই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দৈবের বিরুদ্ধে মানুষের এই প্রথম বিপ্লব। এই প্রশ্নের ভিতরে নিহিত বৈপ্লবিক উত্তেজনা সম্যক অনুভব করতে হলে, সেই সময়ে ফিরে যাওয়া দরকার। অ্যারিস্টটল তাঁর Metaphysics-এ বলেছেন, "থালেস বলেন, 'পানিই সৃষ্টির মূল উপাদান এবং সেজন্যই তিনি বলেন যে পৃথিবী পানিতে ভাসমান। মানুষের সমস্ত ভোজ্যবস্তু পানি সহযোগে গ্রহণ করা হয়। আর্দ্রতা থেকেই তাদের উদ্ভব হয়। আর্দ্রতা থেকেই জীবাণুর সৃষ্ট হয়ে থাকে।' এসমস্ত পর্যবেক্ষণ করেই হয়তো থালেস তাঁর মতবাদে উপনীত হন।" পানির আলোড়নে ভূমিকম্প হয়, এরূপ ধারণাও তখন ছিল।

হেরোডোটাস বলেন, খ্রীস্টপূর্ব ৫৮৫ অব্দের ২৮শে মে তারিখের সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে থালেস ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা প্রকার মত প্রকাশ করেছেন। অনেকে এ থেকে মনে করেন যে, সারোজ গ্রহণ-তালিকা সম্বন্ধে থালেস জ্ঞাত ছিলেন। মিসর ভ্রমণের সময় তিনি ক্যালডিয়ানদের পর্যবেক্ষণলব্ধ এই জ্ঞানের সন্ধান পান এবং তা থেকেই তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত জ্ঞান ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যায় থালেসের বিশেষ কোন অবদানের কথা জানা যায় না। থালেস সম্বন্ধে প্লেটো একটা গল্প বলেছেন, 'কোন এক রাত্রিতে থালেস আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ তিনি একটা খালের ভিতরে পড়ে যান। থ্রেসের একজন ঝি দেখতে পেয়ে তাঁকে খাল থেকে টেনে তোলেন।' প্লেটো রহস্য করে বলেছেন, আকাশে কি ঘটছে সেকথা জানতে যেয়ে, পায়ের নীচে কি ঘটতে যাচ্ছে সেদিকে মন দেবার মত অবস্থা তাঁর ছিল না।

এনাকসিমেণ্ডার (খ্রীস্টপূর্ব ৬১০ – ৫৪৫)

আইওনিয়ান সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন এনাকসিমেণ্ডার। ইনি থালেসের সমসাময়িক। খ্রীস্টপূর্ব ৬১০ অব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং ৫৪৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তদানীন্তন গ্রীসের চিন্তাধারা তাঁর ভিতরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান ছিল। পূর্বতন দার্শনিকগণের মত এনাকসিমেণ্ডার বিশ্বকে একটা বাক্সের মত মনে করতেন না। তাঁর মতে বিশ্ব অপরিসীম ও অনন্তকাল স্থায়ী। 'অনন্ত'ই ছিল তার প্রধান মতবাদ। থালেস পানিকে সমস্ত সৃষ্টির আদি উপাদান বলে মনে করতেন, কিন্তু এনাকসিমেণ্ডার সে কথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে সমস্ত সৃষ্টির আদি উপাদান এমন একটা বস্তু, যার কোন বিশেষ ধর্ম নাই এবং যা অবিনশ্বর ও অনন্তকাল স্থায়ী। সমস্ত পদার্থই এ থেকে উদ্ভূত হয় এবং অবশেষে এতেই বিলুপ্ত হয়। এই-ভাবে অনন্তশ্রেণীর বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই পরম পদার্থে বিলীন হয়ে গেছে। পৃথিবী চ্যাপ্টা বা পৃথিবীপৃষ্ঠ অবতল। পৃথিবী ডিম্বাকার, একথা এনাকসিমেণ্ডার বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে পৃথিবী বেলনাকার বা পাথরের স্তম্ভের মত ; এর উচ্চতা প্রস্থের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবী চারদিকে বাতাসে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবী খাড়া অবস্থায় বিশ্বের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। এর কোন আশ্রয়ের দরকার হয় না। কারণ, কেন্দ্র থেকে বিশেষ কোন দিকে সরে যাওয়ার মত প্রবণতার কোন সুযোগ তার নাই। যে কোন একদিকে সরে গেলেই বিশ্বের সুষমতা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে। এনাকসিমেণ্ডার পৃথিবীর একটা মানচিত্র তৈরী করেন। তিনি নাকি সেখানে এশিয়া ও ইউরোপকে সমান আয়তনের বলে চিত্রিত করেছিলেন। তাঁর মতে আকাশ গাছের বাকলের মত বাতাসকে ঘিরে আছে এবং গাছের বাকলের মতই আকাশের বিভিন্ন স্তর আছে। এই সমস্ত স্তরে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা প্রভৃতি খ-বস্তুসমূহ অবস্থিত। এদের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্তরে সূর্য অবস্থিত এবং সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্তরে স্থির তারকারাজির অবস্থান। এই খ-বস্তুগুলি কোন বস্তু বা পদার্থ নয়। একটা বিরাট চাকার মাঝখানের একটা ছিদ্রই হলো সূর্য। এই চাকাটি আগুনে পরিপূর্ণ; সেই

ছিদ্র দিয়ে ঐ চাকার আগুনকেই আমরা সূর্য রূপে দেখতে পাই। এই চাকাটি পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে বলেই আমরা সূর্যকেও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে দেখতে পাই। সূর্যের এই চাকার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ২৭/২৮ গুণ বেশী। সূর্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের সমান। চন্দ্র এবং তারাদের বেলাতেও ঠিক একইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে চাকার ছিদ্র দিয়ে চাঁদ দেখা যায়, তার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১৯ গুণ বেশী। চাঁদের এই ছিদ্রের মুখে একটা ঢাকনা আছে। সেই ঢাকনা নিয়মিতভাবে চাঁদের ছিদ্রকে ঢেকে দেয়; তাতেই চাঁদের কণা দেখা যায়। সূর্য এবং চন্দ্রের ছিদ্র কোন কোন সময় হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন গ্রহণ হয়। সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী আগুনের চাকাতে ছোট ছোট অসংখ্য ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রগুলি দিয়ে যে আগুনের রশ্মি বেরোয়, সেগুলিকেই আমরা তারারূপে দেখি।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এনাকসিমেণ্ডারের এই মতবাদ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ, গাছের শেষ বাকলের ছিদ্র দিয়েই যদি সূর্যকে দেখা যায়, এবং তার নীচে যদি আরো অনেক বাকল থাকে, তা হলে সূর্যকে মোটেই দেখা যায় কেন? নীচের বাকলগুলি সূর্যকে ঢেকে রাখে না কেন? কেবল তারার ছিদ্র দিয়ে তো সূর্যের সামান্য অংশবিশেষ দেখা যাওয়ার কথা। এত সমস্ত কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় নাই। এ মতবাদ অসম্ভব এবং অত্যন্ত ত্রুটিবহুল; তবু এটাই হলো বিশ্বের আকৃতির এবং খ-বস্তুসমূহের গতিবিধির প্রথম বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। পূর্বতন সূর্যদেবতার নৌকা বা ঘোড়ার টানা রথের পরিবর্তে একটা প্রাণহীন চাকার প্রবর্তন এখানেই প্রথম।

এনাকসিমেনেস (খ্রীস্টপূর্ব ৫৬৫—৫০০)

আইওনিয়ান সম্প্রদায়ের তৃতীয় দার্শনিকের নাম এনাকসিমেনেস। তিনি এনাকসিমেণ্ডারের সহকর্মী ছিলেন। তিনি বলতেন, আকাশ কঠিন স্ফটিক পদার্থে গঠিত, এবং তারাগুলি পেরেকের মত আকাশের গায়ে আটকানো

আছে। আকাশ গোলকাকার, না অর্ধ-গোলকাকার এ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট কিছুই বলেন নাই। সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি ডুবে যাওয়ার ব্যাখ্যাতে তিনি একথা বলেন নাই যে, এগুলি পৃথিবীর নীচে যায়। তিনি বলেছেন, এগুলি পৃথিবীর উত্তরের সর্বোচ্চ অংশের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি আরো বলেছেন যে, টুপি যেমন মাথার চারদিকে ঘোরে আকাশও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এতে মনে হয় আকাশকে তিনি অর্ধ-গোলকাকার বলেই মনে করতেন। এনাকসিমেনেসের দর্শনে বাতাস সমস্ত কিছুর আদি উপাদান; বাতাস শক্ত হয়েই বিশ্বের সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। চ্যাপ্টা পৃথিবীও প্রথমে শক্ত বাতাস থেকেই তৈরী হয়। পরে বাতাসকে পাতলা করে আগুনের সৃষ্টি হয়। এই আগুন থেকেই আকাশের ঘূর্ণনের ফলে সূর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। বাতাসে তৈরী পৃথিবী, বাতাসের ভিতরেই অবস্থিত। সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদিও চ্যাপ্টা। বাতাসে বাধা পাওয়ার ফলেই পৃথিবীতে এসে পড়তে পারে না। দ্রুত গতিই সূর্যের তাপের উৎস। তারাগুলি অনেক দূরে বলে, তাদের তাপ আমরা বুঝতে পারি না। এখানে দেখা যায়, এনাকসিমেণ্ডারের মতবাদের চেয়ে এনাকসিমেনেসের মতবাদ অনেক উন্নত। অবশ্য এ সমস্ত মতবাদ কার কতটা সেটা বলা শক্ত। তাঁদের কারোরই কোন লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পরবর্তীযুগে নানা জনের লেখার ভিতরে এই সমস্ত মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইলিয়াটিক সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম জেনোফেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি তদানীন্তন বহু-ঈশ্বরবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। "মানুষ দেবতাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলে, সে-দেবতাকে কেউ কোন দিন দেখে নাই, তাদের সম্বন্ধে কোনদিন কিছু জানে নাই এবং কোনদিন দেখবেও না, জানবেও না। কোন বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ মনে করে, দেবতারাও তাদের মত জন্মগ্রহণ করে;

তাদেরও খাদ্যবস্ত্রের প্রযোজন আছে, তারাও মানুষের মত কথা বলে, প্রেম করে, তাদেরও হিংসা-দ্বেষ আছে। আর ইথিওপিয়ানদের দেবতাদের গায়ের রং কালো, নাক চ্যাপ্টা; থ্রেসিয়ানদের দেবতাদের চুল লাল, চোখ নীল। যদি গরু, ঘোড়া ইত্যাদি ছবি আঁকতে পারতো তা হলে তাদের দেবতাদের চেহারাও গরু, ঘোড়া ও সিংহের আকারই হতো। হোমার ও হেসিয়াড দেবতাদের চুরি, জুয়াচুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি এমন সব গুণের অধিকারী করেছেন, যা সাধারণ মানুষকেও লজ্জা দেয়।" জেনোফেনের মতে, পৃথিবী সমতল; এর কোন সীমা নাই, কিন্তু অনন্তে স্থিরভাবে আছে। পৃথিবীর উপরিভাগের বাতাসেরও কোন সীমা নাই। পৃথিবীর আর্দ্র শ্বাস উপরে উঠে যায়, আর সেই গতির ফলেই তারা প্রজ্বলিত হয়, আর সেজন্যই সূর্য, তারা ও ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়। এদের গতিপথ সরল বৈথিক; কিন্তু অনেক দূরে অবস্থিত বলেই আমাদের কাছে বৃত্তের মত মনে হয়। প্রত্যেক দিন সকালে তারাগুলি নিভে যায় এবং সন্ধ্যায় আবার নূতন তারার জন্ম হয়। একইভাবে প্রত্যেক সন্ধ্যায় সূর্য নিভে যায় এবং সকালে নূতন সূর্যের জন্ম হয়। চাঁদ সংনমিত মেঘ মাত্র; চাঁদ নিজের আলোকেই উজ্জ্বল। প্রত্যেক মাসে এই মেঘ উবে যায় এবং নূতন মেঘের সংনমন আরম্ভ হয়। জেনোফেনের মতে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্য, চাঁদ তারা ইত্যাদি বিভিন্ন। এক দেশের সূর্যের সঙ্গে অন্য দেশের সূর্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

পারমেনাইড্‌স্‌

ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় দার্শনিক পারমেনাইড্‌স্‌। এঁর বাসস্থান 'ইলিয়া' থেকেই এ সম্প্রদায়ের নাম হয়েছে ইলিয়াটিক। জেনোফেনকে যদিও এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, তবু তাঁকে দার্শনিক না বলে কবি বলাই সঙ্গত। পারমেনাইড্‌স্‌ই এ সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃতির উপর সুন্দর একটা কবিতাতেই তাঁর

মতবাদ সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী যুগে সে কবিতার সামান্য মাত্র অংশই পাওয়া গেছে। পারমেনাইড্‌স্‌গণ, আইওনিয়ানদের মত প্রত্যেক জিনিস একটি মূল উপাদান থেকে সৃষ্ট বলে মনে করতেন না। পারমেনাইড্‌স্‌ মাত্র দুটো তত্ত্ব স্বীকার করতেন: 'অস্তি' (ent) অর্থাৎ যা আছে এবং 'নাস্তি' (non-ent) যা নাই। একটি কঠিন গোলকের অস্তি সমস্ত দিকে সমভাবে সম্পূর্ণ; কেন্দ্র থেকে এর প্রতিটি কণা সমান দূরে অবস্থিত; এ ক্ষেত্রে অস্তি অবিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে শূন্য বলে কিছু নাই। অতএব, কোন পরিবর্তন বা কোন গতি সম্ভব নয়। কেননা শূন্যস্থান ছাড়া পরিবর্তন বা গতির কল্পনা করা যায় না।

পারমেনাইড্‌স্‌ যদিও জেনোফেনের দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। পৃথিবীকে গোলকাকার বলে সর্বপ্রথম ধারণা করবার কৃতিত্ব পারমেনাইড্‌সের। অনেকে অবশ্য পীথাগোরাসকেই এই কৃতিত্বের দাবিদার বলে মনে করেন। পারমেনাইড্‌সের আর একটি কৃতিত্ব হচ্ছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম সমকেন্দ্রিক গোলকশ্রেণীর কল্পনা করেন। পৃথিবী গোলকাকার, সুতরাং তার বাইরেও সব কিছু গোলকাকার হবে, এই ছিল তাঁর ধারণা। সবচেয়ে বাইরের গোলকের তিনি নাম দেন 'অন্তিম অলিম্পাস' (extreme Olympus)। এটি একটি কঠিন গোলক, প্রয়োজনবশতঃ এটি তারাসমূহের গতিপথের সীমা নির্দেশ করে। এর পরের স্তরের গোলক সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। এর পরের স্তর মিশ্র উপাদানে গঠিত। প্রথম স্তরে শুকতারা ও সন্ধ্যাতারার গোলক; এর পরের স্তরে সূর্যের গোলক, তার পরে চন্দ্র-গোলক। সূর্য ও চন্দ্র উভয় গোলকই অগ্নিপ্রকৃতির এবং সমান আয়তনের। চন্দ্র যে সূর্য থেকে আলোক পায়, এ কথা তিনি জানতেন। সূর্য ও চন্দ্র ছায়াপথ থেকে উৎপন্ন। সূর্যের সৃষ্টি উষ্ণ ও সূক্ষ্ম উপাদান থেকে এবং চন্দ্রের সৃষ্টি ঠাণ্ডা ও অন্ধকার উপাদান থেকে। সূর্য ও চন্দ্র-গোলকের পরের স্তরে তারাদের গোলক। অতএব,

দেখা যায় যে, এনাক্সিমেণ্ডারের মত পারমেনাইড্স্ও মনে করতেন, সূর্য ও চন্দ্র থেকে তারাসমূহ নিকটবর্তী। সমস্ত স্তরের মাঝখানে পৃথিবী। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মত পারমেনাইড্স্ও মনে করতেন যে, বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলে কোন বিশেষ দিকে যাওয়ার মত প্রবণতা পৃথিবীর নাই। সেজন্য সে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থির হয়ে আছে। এ সমস্ত কিছুর মাঝখানে (বোধ হয় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে) একজন দেবতা আছেন; তিনি সব কিছুর উপর প্রভুত্ব করেন।

ইলিয়াটিক সম্প্রদায় ছাড়া আরো অনেক দার্শনিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের কয়েকজন সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা নীচে করা গেল।

এমপিডক্ল্স্

এমপিডক্ল্স্ ছিলেন এগ্রিজেন্টামের লোক। তিনিই প্রথম দার্শনিক, যিনি দুই-এর অধিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের কল্পনা করেন। তাঁর মতে আগুন, বাতাস, পানি ও মাটি এই চারটি বিশ্বের সমস্ত মৌলিক উপাদান। এ চারটি অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর। এই চারটি মৌলিক উপাদান ছাড়া বিশ্বে দুইটি শক্তি কাজ করে, এই দুইটি শক্তি হলো আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, অথবা প্রেম ও বিদ্বেষ। এই দুই শক্তির মাধ্যমে মৌলিক পদার্থসমূহ বিভিন্ন অনুপাতে মিলিত ও বিযুক্ত হয়ে নানা প্রকার পদার্থের সৃষ্টি করে। প্রেম ও বিদ্বেষ পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করে, আর তার ফলেই পৃথিবীর ইতিহাস শান্তি ও যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। এমপিডক্ল্সের মতে বিশ্ব সসীম, গোলকাকার ও কঠিন। বাতাস ঘনীভূত হয়ে স্ফটিকাকার ধারণ ক'রে বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। আকাশের তারাসমূহ অগ্নিময় পদার্থে গঠিত এবং বাতাসের ঊর্ধ্বচাপে এগুলি বিশ্বগোলকে আটকে আছে। গ্রহসমূহের উপর বাতাসের ঊর্ধ্বচাপের পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় এগুলি বিশ্বগোলকে যেয়ে আটকাতে পারে না, শূন্যে ভাসমান অবস্থায় আছে। বাতাস ও আগুনের মিশ্রণে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছে; চাঁদ চ্যাপ্টা ও

সূর্যের আলোকে আলোকিত। এমপিডক্‌ল্‌স্‌ দুইটি পৃথক গোলকের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। একটি আগুনের তৈরী, এটি দিনের অংশ। অন্যটি বাতাস ও সামান্য আগুনের তৈরী; এটি রাত্রির অংশ। আগুনের চাপে গোলকটি ঘুরতে থাকে; এর ফলে পর্যায়ক্রমে দিনের অংশ ও রাত্রির অংশ পৃথিবীর উপরে এসে পৌঁছায়। তাঁর মতে সূর্য দুইটি। এক গোলকার্ধে একটি; অন্যটি এর প্রতিবিম্ব। "সূর্য নিজে অগ্নিময় নয়; পানির ভিতরে প্রতিবিম্ব যেরূপ দেখায়, সেইরূপ।" সূর্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের সমান। ঘনীভূত বাতাস যখন আগুনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন শীতকাল। আর আগুন যখন বাতাসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন গ্রীষ্মকাল। এজন্য অগ্নি-গোলকার্ধের প্রতিবিম্ব-সূর্যকে কোন সময় উত্তরে আবার কোন সময় দক্ষিণে যেতে দেখা যায়। এমপিডক্‌ল্‌স্‌ বলতেন, পৃথিবীতে যখন প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয়, তখনকার একদিন এখনকার দশ মাসের সমান ছিল। এরপরে একদিনের দৈর্ঘ্য আমাদের সাত মাসের সমান হয়। এজন্য দশ মাসে ও সাত মাসে প্রসূত শিশু বেঁচে থাকে।

এমপিডক্‌ল্‌স্‌ জানতেন যে, চাঁদ সূর্যের সামনে আসলেই সূর্যগ্রহণ হয়। তিনি মনে করতেন, চাঁদ পৃথিবী থেকে যতদূরে, সূর্য থেকে তার দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত। বিশ্বের যে অংশে মানুষের বাস, সে অংশ পাপে পরিপূর্ণ। এই পাপ অঞ্চল চাঁদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পরেই সমস্ত কিছু পবিত্র। এমপিডক্‌ল্‌সের মতে, বিশ্ব দ্রুতগতিতে ঘুরছে এবং 'দ্রুত ঘূর্ণায়-মান পেয়ালার মাঝখানে পানি যেমন স্থির হয়ে থাকে, পৃথিবীও তেমনি বিশ্বের কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে।' বিশ্বগোলকের উত্তর মেরু প্রথমে পৃথিবীর উপরে ছিল। কিন্তু বিশ্বঘূর্ণনের ফলে এবং বাতাসের চাপে মেরু ভেঙ্গে যায়। উত্তর মেরু কিছুটা উপরে থাকে, দক্ষিণ মেরু কিছুটা নীচে নেমে যায়। এতে বোঝা যায়, এমপিডক্‌ল্‌স্‌ পৃথিবীকে চ্যাপ্টা বলে জানতেন।

লিউকিপ্‌পাস ও ডেমোক্রিটাস

পারমাণবিক মতবাদের প্রবর্তক লিউকিপ্‌পাস খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোক। তাঁর শিষ্য থ্রাসের ডেমোক্রিটাসের প্রতিভার জন্য তাঁর স্বীয় প্রতিভা কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। এঁদের মতে প্রত্যেক বস্তু অতি ক্ষুদ্র, সান্ত, অবিভাজ্য, অসংখ্য পদার্থকণা দ্বারা গঠিত। এগুলিকে তাঁরা পরমাণু বলতেন। তাঁরা বলতেন, পরমাণুসমূহ মাধ্যাকর্ষণের অধীন। এদের আয়তন বিভিন্ন; সেজন্য এরা বিভিন্ন গতিতে নীচের দিকে পড়তে থাকে। এতে যে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়, তাতে একটা ঘূর্ণীয় গতির সৃষ্টি হয়। এক সময়ে পদার্থটির সমস্ত পরমাণু এই গতিতে অংশগ্রহণ করে এবং এর ফলেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। অনন্ত মহাশূন্যে অসংখ্য পরমাণু এইভাবে অসংখ্য পৃথিবী সৃষ্টি করে। বাইরের পরমাণুর যোগদানে পৃথিবীর আয়তন বেড়ে যায়, আর ভিতরের পরমাণুর বিচ্ছেদে পৃথিবীর আয়তন কমে যায়। পৃথিবীতে এইভাবে অনবরত পরিবর্তন ঘটছে। যে সমস্ত ঊর্ধ্বগামী পরমাণু বিশ্বগোলকে ধরা পড়ে, তাদের কতকগুলি একত্রীভূত হয়ে প্রথমে আর্দ্র ও পরে শুষ্ক হয়। তারপরে এতে আগুন লেগে যায়। এগুলোই তারা হয়ে বিশ্বগোলকে স্থান পায়। লিউকিপ্‌পাস বলেন, পৃথিবীর আকার অনেকটা কর্ণগহ্বরের মত; অর্থাৎ এর পৃষ্ঠদেশ চ্যাপ্টা, এবং প্রান্তদেশ সামান্য উঁচু। ডেমোক্রিটাস পৃথিবীকে একটা চক্রের (discuss) সাথে তুলনা করেছেন; তবে খেলার চক্র যেমন মাঝখানে উঁচু আর প্রান্তদেশ নীচু, পৃথিবী ঠিক তার বিপরীত; এর প্রান্তদেশ উঁচু, এবং মধ্যদেশ নীচু।

খ-বস্তুসমূহের অবস্থান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই দার্শনিকের দুই প্রকার মতবাদ ছিল। লিউকিপ্‌পাসের মতে, পৃথিবী থেকে সূর্যকক্ষ সবচেয়ে দূরে, চন্দ্রকক্ষ সবচেয়ে নিকটে। এই দুইয়ের মাঝখানে অন্যান্য গ্রহ-তারাসমূহের কক্ষ অবস্থিত। সূর্য ও চন্দ্রকক্ষের আয়তনের পার্থক্য হেতুই সূর্যগ্রহণের চাইতে চন্দ্রগ্রহণের সংখ্যা বেশী। ডেমোক্রিটাসের মতে, চন্দ্র এবং শুক্রগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে, তারপরে সূর্য, অন্যান্য

গ্রহ এবং স্থির তারাগুলি সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। গ্রহসমূহের কোন কক্ষ-গতি আছে বলে তিনি মনে করতেন না। সূর্য ও চন্দ্র কঠিন পদার্থে গঠিত, এবং আয়তনে বেশ বড় হলেও পৃথিবীর চেয়ে ছোট। এ দু'টিও প্রথমে আমাদের পৃথিবীর মত দু'টি পৃথক পৃথিবী ছিল এবং উভয়ই বিশ্বকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। আমাদের পৃথিবীর সাথে এদের সংঘর্ষের ফলে, আমাদের পৃথিবী তাদের জায়গা দখল করে নেয়। দুইটি গ্রহ নিকটবর্তী হ'লে তাদের মধ্যে ধূমকেতুর সেতু সৃষ্টি হয়। ছায়াপথ সম্বন্ধে ডেমোক্রিটাসের ধারণা বেশ উন্নত ছিল। তিনি বলতেন, অসংখ্য তারার একত্রে সমাবেশের ফলেই ছায়াপথের আলো দেখা যায়।

এনাক্সাগোরাস

এনাক্সাগোরাসের মতে, বিভিন্ন মৌলিক কণার ধর্ম পৃথক এবং এদের সংখ্যা অসংখ্য। নিজস্ব কোন শক্তিতে এদের ভিতরে সংযোগ ঘটে না, বরং বাইরের একটা মননশক্তির প্রভাবেই এদের সংযোগ ঘটে। আদিতে বিশ্ব অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল; এই মননশক্তি একটি ঘূর্ণন বেগের সৃষ্টি করে। তার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন স্থান অধিকার করে। পদার্থ প্রথমে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়—ইথার ও বাতাস। ইথার উষ্ণ, হালকা এবং পাতলা; বাতাস ঠাণ্ডা, ভারী ও অন্ধকার। আরো ঘূর্ণনের ফলে বাতাস বিশ্বের মাঝখানে জমা হয়; এখান থেকে পরে পানি, মাটি এবং কোথাও কোথাও পাথরের সৃষ্টি হয়।

খ্রীস্টপূর্ব ৪৬৭ অব্দে এগোস পোটামোযাতে একটি প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। এনাক্সাগোরাস এ বিষয় জানতে অত্যন্ত উৎসাহী হন। দিবাভাগে এই উল্কাপাত হয়; এ জন্য তিনি মনে করেন যে, সূর্য থেকেই এই পিণ্ডটি পড়েছে। অতএব, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব খুব বেশী নয়। সূর্যের তাপে বাতাস ঘনীভূত হয় এবং ঘনীভূত বাতাসের চাপেই অয়নের সময় সূর্য উত্তর বা দক্ষিণ দিকে সরে যায়। চাঁদের

বেলাতেও তাঁব ঠিক একই ধারণা ছিল। চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষ-গতি সম্বন্ধে তিনি কিছু জানিতেন না; কেবলমাত্র আহ্নিক গতির কথাই তিনি বলে গেছেন। তিনিই প্রথমে মনে কবেন যে, প্রথমে চন্দ্রেব কক্ষ, তাব পরে সূর্যের কক্ষ; এদেব বাইরে আরও পাঁচটি গ্রহের কক্ষ। প্লেটো এবং আবিস্টটলও এই পর্যায মেনে নিযেছিলেন। তিনি মনে করতেন তারাগুলো পাথবেব তৈবী; এরা প্রথমে পৃথিবীর অংশ ছিল, পবে বিচ্ছিন্ন হযে উপবে উঠে গেছে। ঘূর্ণনের জন্যই এবা পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়তে পারে না এবং ইথারেব সঙ্গে ঘর্ষণেই এরা উজ্জল হযে উঠে। অনেক দূবে আছে বলে আমবা এদেব তাপ বুঝতে পারি না। পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত; বাতাসের চাপে কোন দিকে পড়তে পারে না। তাবাগুলি যখন ডুবে যায তখন সেগুলি পৃথিবীব নীচে যায়। চাঁদেব আযতন পেনোপনিসের মত; এব কিছু অংশ অগ্নিময় এবং কিছু অংশ পৃথিবীর মত। চাঁদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পদার্থে তৈবী বলেই এব কোন অংশ সাদা দেখায, কোন অংশ কালো দেখাব। অবশ্য অনেকে এ কথাও বলেন যে, চাঁদে সমতল ভূমি ও উচ্চভূমি আছে বলে এনাক্সাগোবাস বিশ্বাস কবতেন। চাঁদ যে সূর্য থেকে আলো পায় এবং চাঁদেব কলার সত্যকাব কাবণ সম্বন্ধেও তিনি জানতেন বলে অনেকে বলেন। চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণেব কাবণও তাঁব অজানা ছিল না। অবশ্য তিনি এ কথাও মনে কবতেন যে, পৃথিবী ও চাঁদেব মধ্যে অবস্থিত কোন খ-বস্তুর জন্য কোন সময চন্দ্রগ্রহণ হযে থাকে।

ছাযাপথ সম্বন্ধে এনাক্সাগোরাসের একটা অদ্ভুত ধাবণা ছিল। তিনি মনে করতেন, সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক ছোট; সেজন্য পৃথিবীর ছাযা মহাশূন্যে অনন্তদূব পর্যন্ত বিস্তৃত হযে পড়ে। ছাযার ভিতবেব তারাসমূহেব উজ্জলতা ছাযার বাইরের তাবাসমূহেব উজ্জলতা থেকে অনেক বেশী বলে ছায়াব ভিতবে অনেক বেশী তারা দেখা যায।

এথেন্সেব অধিবাসিগণ এনাক্সাগোবাসেব এই মতবাদ অশাস্ত্রীয বলে তাঁব বিরুদ্ধে আন্দোলন আবম্ভ কবে। অনেকে মনে কবেন, তিনি এক

আল্লাতে বিশ্বাস করতেন ; সেজন্য ঈশ্বরবাদী অনেকেই তাঁকে নাস্তিক বলে অপবাদ দেয়। ধর্মবিরোধী বলে তাঁর বিচার করা হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাঁর প্রিয় শিষ্য ও বন্ধু পেরিক্লিসের হস্তক্ষেপে তাঁর জীবন রক্ষা পায় এবং তাঁকে এশিয়া-মাইনরে নির্বাসিত করা হয়। খ্রীস্টপূর্ব ৪২৮ অব্দে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ডাইওজেনিস

আইওনিয়ান সম্প্রদায়ের শেষ দার্শনিক ডাইওজেনিসও এনাক্সাগোরাসের মত জনসাধারণের অপ্রিয় হয়েছিলেন। এনাক্সিমেনাসের মত তিনি মনে করতেন, বাতাসই সমস্ত পদার্থের মৌলিক উপাদান। বাতাস ঘনীভূত ও লঘুভূত হওয়ার ফলেই বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়। তবে তিনি এ কথাও বিশ্বাস করতেন যে, বুদ্ধিসম্পন্ন কোন সত্তার ইচ্ছাতেই বিভিন্ন সৃষ্টিকার্য সংঘটিত হয়ে থাকে। তাপে বাতাসে আবর্তের সৃষ্টি হয় ; এই আবর্তের মাঝখানে ভারী বাতাস জমা হয় ; এটাই পরে ঠাণ্ডা হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি করে। হালকা বাতাস উপরে উঠে যায়, এবং তাতে সূর্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে এখনও অনেক হালকা বাতাস আটকা পড়ে আছে। এগুলি যখন বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন ভূমিকম্প হয়। এই সময়ে যে উল্কাপিণ্ড পড়ে, তাতে ডাইওজেনিস যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তিনি মনে করতেন, তারাগুলি বিশ্বের ছিদ্র ; ঐ ছিদ্র দিয়ে তপ্ত বাতাস বেরিয়ে আসে বলেই সেগুলি উজ্জ্বল দেখায়। এ ছাড়া পাথরের মত কতকগুলো কালো জিনিসও বিশ্বে আছে ; সেগুলো মাঝে মাঝে পৃথিবীতে এসে পড়ে। সূর্যের ভিতরে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করবার জন্যই অয়নের সময় সূর্য দিক পরিবর্তন করে, এই ছিল ডাইওজেনিসের ধারণা।

দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা

গ্রীক-সভ্যতার আদিযুগে প্রত্যেক দার্শনিকই বিশ্ব-সৃষ্টি, সূর্য, চন্দ্র, তারা ও পৃথিবী সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা বলে গেছেন। জ্যোতির্বিদ্যা

তখন দর্শনেব অঙ্গ ছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বাবা দর্শনশাস্ত্র আলোচনা কবা আর পর্যবেক্ষণ দ্বাবা খ-বস্তুসমূহেব আলোচনা করা সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক সময় এই সমস্ত দার্শনিকেব মতবাদের সঙ্গতি থাকতো না। প্রত্যেক দার্শনিকই অল্পসংখ্যক পর্যবেক্ষণেব উপব ভিত্তি করেই নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা কবতেন। এব ফলে বিভিন্ন দার্শনিকের বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠতো এবং সাধারণ লোকও এতে কোন উৎসাহ বোধ কবতো না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান যুগের সূচনা

পীথাগোরাস : সংখ্যাবাদ, গোলক-সঙ্গীত

পীথাগোরাসকে বিজ্ঞানের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। সাধারণ স্কুলের ছাত্রও পীথাগোরাসের 'থিওরেম' নামে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতিক তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। এখনও শিশুরা গুণনের যে নামতা মুখস্থ ক'রে থাকে পীথাগোরাস তার উদ্ভাবক। এদেশে বা চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে হয়তো বা এই গুণনের নামতা স্বাধীনভাবে রচিত হয়েছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা এবং সংখ্যাকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতে আরম্ভ করা হয় পীথাগোরাসের সময় থেকে। পীথাগোরীয়ান দর্শনের মূল বক্তব্যই ছিল 'সংখ্যাই সব'। প্রকৃতির সমস্ত বিষয় এবং ঘটনার কারণ ও উৎসই হচ্ছে সংখ্যা। তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাতের উপর সুর নির্ভর করে; এই অনুপাতও সংখ্যা দিয়েই প্রকাশ করা হয়। অতএব সুরও সংখ্যার উপরই নির্ভরশীল। পীথাগোরাস এ থেকেই দর্শনে *armonia* কথাটি ব্যবহার করেন এবং এ থেকেই বর্তমানের Harmony কথাটি প্রচলিত হয়েছে। পীথাগোরীয়ান দর্শনে সঙ্গীতের স্থান অত্যন্ত উচ্চে ছিল এবং সঙ্গীতের নিয়মেই বিশ্ব পরিচালিত হয়, এই ছিল এ দর্শনের বক্তব্য।

খ্রীস্টপূর্ব ৫৮০ অব্দে সামোসে পীথাগোরাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রূপার কাজ করতেন এবং মণি-রত্নাদিখচিত অলঙ্কার তৈরী করতেন। তাঁর নাম ছিল মনে-সারকেস। পীথাগোরাস নাস্তিক দার্শনিক এনাক্সিমেণ্ডারের শিষ্য ছিলেন। অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক ফেরেকাইড্‌স্

বলতেন, 'আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করতে পারে'। এই মতবাদ পীথাগোরাসকে প্রভাবান্বিত করে। সামোস তাঁর জন্মস্থান হলেও পীথাগোরাসের বাসস্থান ছিল ইটালীর দক্ষিণে ক্রোটোনে এবং খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ৫০০ অব্দে তিনি মেটাপণ্টামে মারা যান। তিনি এশিয়া-মাইনর ও মিশরের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন এবং এ সমস্ত দেশ থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করেন। এই সমস্ত দেশের বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্যে এসেই তাঁর একটা স্বাধীন মতবাদ গড়ে ওঠে এবং এখান থেকেই তাঁর দর্শনের গোড়াপত্তন হয়। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, সামোসের রাজা পলিক্রেটিস পীথাগোরাসকে রাজদূতরূপে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। পলিক্রেটিস যদিও অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন, তবু তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চারুকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এজন্য তিনি অন্য দেশ লুঠ করতেও দ্বিধা করতেন না। তদানীন্তন সর্বপ্রধান কবি এনাক্রিয়ন এবং সর্বপ্রধান ইঞ্জিনিয়ার ইউপালিনস্ তাঁর রাজসভার সভাসদ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে হেরোডোটাস বলেন যে, পলিক্রেটিস এত বেশী শক্তিশালী ছিলেন যে, দেবতাদের রোষ শান্ত করবার জন্য একবার তিনি তাঁর নিজ মোহরাঙ্কিত আংটি সমুদ্রে ফেলে দেন। কয়েকদিন পরে তাঁর রাজপাচক একটি সদ্য ধরা মাছ কাটতে যেয়ে তার পেটের ভিতরে আংটিটি পান। এতে সবার ধারণা হয় যে, সমুদ্রের দেবতারা সন্তুষ্ট হয় নাই। এর কিছুদিন পরেই এক ক্ষুদ্র পারস্য সামন্তের চক্রান্তে তিনি বন্দী হন এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। ইতিমধ্যে পীথাগোরাস তাঁর পরিবার-পরিজন সমেত সামোস থেকে ক্রোটোনে যেয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন। এর পূর্বেই তাঁর খ্যাতি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল; এবং তিনি ক্রোটোনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'পীথাগোরীয়ান ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ' সেখানকার শাসন-কার্য চালাতে থাকে। এক সময়ে বৃহত্তর গ্রীসের অধিকাংশ অংশে তাদের প্রাধান্য বিস্তারলাভ করে। কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রাধান্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। বৃদ্ধবয়সে পীথাগোরাসকে ক্রোটোন

থেকে মেটাপণ্টামে নির্বাসিত করা হয় এবং তিনি সেখানেই মারা যান।

পীথাগোরাসের জীবনী সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু জানা যায় এবং একে সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প, কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এর অনেকগুলি তাঁর জীবদ্দশাতেও প্রচলিত ছিল। গ্রীসের অধিবাসিগণ তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল। ক্রোটোনের লোকেরা তাঁকে এপোলোর সন্তান বলে মনে করতো। তদানীন্তন একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, 'দেবতা ও পীথাগোরাসের মত লোকেরাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী'। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। আকাশের দেবতাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, পাতালে যেয়ে ঘুরে বেড়াতেন, ইত্যাকার নানা প্রকার আজগুবী কাহিনী তাঁর নামে প্রচলিত ছিল। তাঁর নামের এমনি মোহ ছিল, এবং তিনি মানুষের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন যে, ক্রোটোন অধিবাসীদের উদ্দেশে তাঁর প্রথম বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সভায় উপস্থিত ছয় শত লোক তাঁর 'ভ্রাতৃ-সঙ্ঘে' যোগ দিয়ে সম্প্রদায়গত জীবন যাপন করতে আরম্ভ করে। নিজ নিজ বাড়ী যেয়ে নিজেদের পরিবারের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আসার কথা পর্যন্ত তাদের মনে উদয় হয় নাই। তাঁর শিশুদের ভিতরে তাঁর প্রভাব ছিল নিরঙ্কুশ। 'প্রভু বলেছেন' এই ছিল তাদের আইন।

পীথাগোরীয় দর্শন

একটি কণাকে কেন্দ্র করে যেমন একটি পরিপূর্ণ স্ফটিক গড়ে ওঠে, অতিকথা (myth)-ও ঠিক সেইরূপে একজন অতিমানবকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। অতিকথার স্ফটিক গড়বার মত প্রাণশক্তি সাধারণ মানুষের নাই। কোন উদ্ভট কল্পনাবিলাসী হয়তো কিছুদিনের জন্য আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, ফ্যাশান তৈরী করতে পারে, সাময়িকভাবে কিশোর যুবকদের মধ্যে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু এ সমস্ত স্থায়ী

হওয়ার মত বাস্তবতা তার মধ্যে থাকে না। জীবনের বা বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন হয় না। মহামানবের মতবাদের প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক। জীবন ধারণের উদ্দেশ্য, প্রতিদিনের কাজকর্মের পদ্ধতি, প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় একটি সুষ্ঠু ধারা, এসব তো এনে দেয়ই, এ ছাড়া এই মতবাদে বিশ্বের প্রতিটি ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। পৃথক পৃথক মহামানবের চিন্তাধারা পৃথক হতে পারে, কিন্তু কোনটাই উপেক্ষা করবার মত নয়। যে মতবাদের প্রয়োগক্ষেত্র যত ব্যাপক হতে পারে, সমস্ত বিষয়ে সর্বপ্রকার চিন্তায় যে মতবাদ জীবনে যত অধিকভাবে প্রতিফলিত হয়, সে মতবাদ তত সার্থক এবং জনমনে তার প্রভাব তত গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। নিউটনের বিরাটত্ব এখানেই। তাঁর মতবাদ পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষেত্রে তো প্রতিফলিত হয়েছেই, এমনকি মহাকাশের খ-বস্তুসমূহের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। আইনস্টাইনের যুগে বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রয়োগ করা চলে—এমন দর্শনের স্রষ্টা আইনস্টাইন। তাই আইনস্টাইন মহামানব বা অতি-মানব। পীথগোরাসও ছিলেন তেমনি। তাঁর দর্শন দ্বারা তদানীন্তন সমস্ত বিশ্বকে এক সূত্রে একই আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। এজন্য পীথাগোরাসও অতিমানব। তাঁর সম্বন্ধে অতি-কথার যুগ পার হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের জীবনধারার প্রতিটি কাজকর্মের খবর বর্তমান ক্ষুদ্র পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে প্রচারিত হয়। অতিকথার সুযোগ আর হয় না। পুরাকালে কিন্তু এরূপ ছিল না। পীথাগোরাসের মতবাদ সম্বন্ধে লিখিত কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁর দর্শন অনুসরণকারী একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়ের লোক একটি ধর্মীয় 'ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ' গঠন করে। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই এঁদের দর্শন প্রয়োগ করা হতো না, বরং সমাজগত, এমনকি রাষ্ট্রগত জীবনেও তাঁরা এই দর্শন প্রয়োগ করতে চাইতেন। এর ফলে এই সম্প্রদায় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়ে; আর সেজন্য তাদেরকে যথেষ্ট অত্যাচারও সহ্য করতে হয়।

পীথাগোরাসের দর্শনের অনেক কথাই পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ কথার ভিতরে স্থায়ী আসন পেতে নিয়েছে। Philosophy, Harmony, Figure ইত্যাদি শব্দগুলি পীথাগোরীয় দর্শনের শব্দ এবং তাঁর ভ্রাতৃ-সঙ্ঘে ব্যবহৃত কথা।

পীথাগোরাসের দর্শনের সাহায্যে সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। এই সার্বজনীনতাই এ দর্শনের বৈশিষ্ট্য। এতে ধর্ম, বিজ্ঞান, গণিত, সঙ্গীত, ঔষধ, বিশ্বতত্ত্ব, শরীর, মন, আত্মা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। পীথাগোরাসের দর্শন অনুসারে সমস্ত কিছুই একে অন্যের সাথে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ একটি গোলকের মত; সর্ব অংশই একরূপ। এক অংশকে অন্য অংশের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না। এক অংশ থেকে অন্য অংশ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যে কোন দিক থেকে এ দর্শন বোঝা যেতে পারে। অনেকের মতে, সঙ্গীতের সাহায্যে এ দর্শন অধ্যয়ন করা সহজ ও মধুর। সুরের গ্রাম যে তারের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন সুরের গ্রামের পার্থক্য যে তারের দৈর্ঘ্যের সহজ অনুপাতে নির্ণীত হয়, এ দুইটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন সর্বপ্রথম পীথাগোরাস। জিনিসের ধর্ম বা গুণকে সংখ্যায় প্রকাশ করা এই প্রথম। এখান থেকেই মানুষের অভিজ্ঞতাকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করা হয়। এক কথায় এখান থেকেই বিজ্ঞানের সূচনা হয়।

পীথাগোরাসের এই দর্শনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচনা হয়। এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও অনেকে একে দর্শন বলতে আপত্তি করেছেন। মানুষের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে রূপ, রস, প্রেম ও বিদ্বেষশূন্য ক'রে শুধুমাত্র সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করাকে অনেকে ধৃষ্টতা বলে মনে করেন। কিন্তু পীথাগোরীয়ানদের মতে, মানুষের অভিজ্ঞতাকে গণিতের আওতায় নিয়ে আসাতে দর্শনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ তো হয়ই নাই, বরং অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, অপার্থিব ও অবিনশ্বর; সুতরাং পবিত্র। এ জন্যই সংখ্যার সঙ্গে মিলনে সঙ্গীত মহান ও স্বর্গীয় হয়েছে।

বীণার জড় তারের কোন গুরুত্ব নাই। যে কোন পদার্থের বা ধাতুর তার হতে পারে; এই তারের যে-কোন দৈর্ঘ্য বা বেধ হতে পারে। যতক্ষণ বিভিন্ন তারের দৈর্ঘ্যের ভিতরের অনুপাত সহজ শুদ্ধ সংখ্যা হবে, ততক্ষণ সুরের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। এই সহজ অনুপাত অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংখ্যাই সুরের সৃষ্টি করে। সংখ্যা স্বর্গীয়, অবিনশ্বর; অন্য সমস্তই পার্থিব ও নশ্বর। সংখ্যার উৎস মন, পদার্থ নয়।

আইওনিয়ান দার্শনিকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্ব কি পদার্থে তৈরী তার অনুসন্ধান করা; কিন্তু পীথাগোরীয় দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের আকৃতি, বিশ্বের বিভিন্ন অংশের আয়তন ও তাদের অনুপাত, বিশ্বের গঠন-পদ্ধতি ইত্যাদির অনুসন্ধান করা। দুইটি বিশেষ শব্দের উপর এরা জোর দিতেন—*eidos* এবং *schema*; গঠন-বস্তু সম্বন্ধে এঁদের বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না; এঁরা উৎসাহী ছিলেন বিশ্বগঠন-নিয়ম সম্বন্ধে।

সুরের সঙ্গে সংখ্যার সম্বন্ধই হলো পীথাগোরাসের দর্শনের মেরুদণ্ড। এই দণ্ডকে উভয় দিকে বাড়িয়ে দিলে তার এক প্রান্ত যেয়ে পৌঁছায় আকাশের চাঁদ, তারা ও সূর্যের জগতে; আর অন্য প্রান্ত যেয়ে পৌঁছায় মানুষের শরীর, মন ও আত্মার জগতে। যে অক্ষ-নাভির উপরে এই অক্ষদণ্ড এবং সমস্ত বিশ্বজগত ও আধ্যাত্ম্য জগত আবর্তন করে, সে হলো *armonia*, harmony বা সমতান এবং *Katharsis* বা শোধন (purification)।

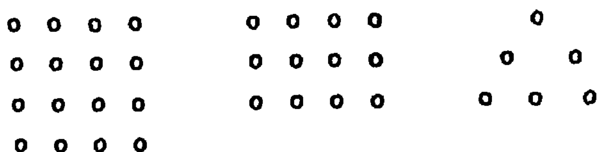
অন্য অনেক কাজের ভিতরে পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ কাজ ছিল 'শোধন' করা। তাঁরা দেহের শোধন করতেন ঔষধ দিয়ে আর আত্মার শোধন করতেন সঙ্গীত দিয়ে। মনন-চিকিৎসার (psychotherapy) একটি বিশেষ ধারা অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত আছে। এতে উৎকট গান ও বাজনার সাহায্যে রোগীর মনকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়, যাতে সে বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করে এবং পরিশ্রান্ত হয়ে সমাহিত অবস্থায় যেয়ে পৌঁছে

এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এতেই সে আরোগ্যলাভ করে। এ পদ্ধতিকে অভিঘাত-চিকিৎসা (shock-therapy) বা অভিস্ফোট-চিকিৎসার (abreaction therapy) আদিম প্রয়োগ বলা চলে। রোগীর আত্মার তার যদি কোন কারণে ঢিলা হয়ে যায় বা তাতে অতিমাত্রায় টান পড়ে অর্থাৎ কোন কারণে যদি আত্মার তার বেসুরো হয়ে যায়, তখন এই অসুর পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাকে সুস্থ করে তুলতে হয় বা সুরের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে হয়। এখানে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত নাই; তার এবং সুর অর্থে সত্যিকার তার এবং সুরের কথাই বলা হয়েছে, কেননা পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের মতে শরীর একটা বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের প্রত্যেকটি তার একটি নির্দিষ্ট টানে বাঁধা আছে। এর ফলে 'উঁচু-নীচু' 'গরম-ঠাণ্ডা, 'শুকনা ভিজা' প্রভৃতি বিপরীত প্রকৃতিসমূহের ভিতরে সমন্বয় সাধিত হয়। কোন তারের টানের ব্যতিক্রম হলে শরীরের এই সমন্বয়েরও ব্যতিক্রম হয়; ফলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

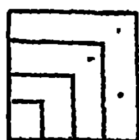
Harmony কথাতে যেমন সঙ্গীতে একটা মধুরতা ও মিষ্টতার আভাস পাওয়া যায়, প্রাচীন গ্রীক-সঙ্গীতে পীথাগোরাসের *armonia* শব্দে ঠিক সেই আভাস ছিল না। সমস্ত তার ঠিকমত টানে ও অনুপাতে বাঁধা থাকলে এবং সুরের গ্রাম ঠিক থাকলেই *armonia* ঠিক আছে বলা হতো। অর্থাৎ সুরের সমন্বয় এবং গ্রামের পর্যায় ছিল তাদের লক্ষ্য। সঙ্গীতে তখনও মিষ্টতার সৃষ্টি হয় নাই।

পীথাগোরাসের মতবাদ হচ্ছে 'দর্শন সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত' এবং 'সংখ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন'; কেননা 'সমস্ত জিনিসেরই শেষ পরিণতি সংখ্যা'। এই মতবাদের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে অনেকে বলেন, সমস্ত পদার্থের আকৃতি আছে, অতএব আকৃতিই পদার্থ। এবং সমস্ত আকৃতিই সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা যায়। যেমন ৪×৪=১৬ এই বর্গসংখ্যাটি একটি বর্গক্ষেত্রের আকার নির্দেশ করে; ৩×৪=১২

সংখ্যাটি একটি আয়তক্ষেত্র এবং ১+২+৩=৬ সংখ্যাটি একটি ত্রিভুজ নির্দেশ করে।



সংখ্যা এবং আকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য এখানেই শেষ হয় নাই। পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায় এরূপ আরো অনেক সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। বর্গসংখ্যার সঙ্গে বিজোড় সংখ্যা যোগ করলে পরবর্তী বর্গসংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন, ১+৩=৪, ৪+৫=৯, ৯+৭=১৬ ইত্যাদি।



রেখাচিত্র ১০ : পীথাগোরাসের আয়তসংখ্যা

এইরূপে ঘনসংখ্যা (cubic number), পিরামিড সংখ্যা (pyramid number) ইত্যাদি সংখ্যার সৃষ্টি হয়। পীথাগোরীয়ান মতে এইভাবে প্রকৃতির সমস্ত জিনিসকেই সংখ্যা-শ্রেণী (number series) অথবা সংখ্যা-অনুপাতে (number-ratio) বিশ্লেষণ করা যায়। এই বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে *Philosophos* বা জ্ঞানান্বেষীর প্রধান কাজ।

পীথাগোরাসের সংখ্যাপ্রিয়তা এবং সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান সাধারণ লোকে না জানতে পারে, সংখ্যার সঙ্গে আকৃতির সম্বন্ধও এখন আর বিশেষ কেউ মনে করে না, কিন্তু তাঁর বিখ্যাত 'থিওরেমে' এখনও তিনি বেঁচে আছেন। একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মধ্যে সাধারণভাবে কোন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায় না; কিন্তু অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অন্য দুইটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্র-

ফলের সমষ্টির সমান। আকৃতি ও সংখ্যার মধ্যে এই গূঢ় সম্বন্ধ যদি সাধনা দ্বারা মানুষ আবিষ্কার করতে পারে, তা হলে বিশ্বের অন্য সমস্ত গূঢ় রহস্য যে সংখ্যা সাধনা দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব, এমন আশাকে অন্যায় বলা চলে না।

গোলক-সঙ্গীত

সঙ্গীত পীথাগোরাসের দর্শনের মূল উপাদান। মানুষের শরীরের ও আত্মার সঙ্গে সঙ্গীতের যে সম্বন্ধ, বিশ্বের সর্বত্র তিনি সেই সম্বন্ধ সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তেমন সমন্ধ নিশ্চয়ই আছে। পীথাগোরাসের মতে বিশ্ব গোলকাকার। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করে। এই কক্ষগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। এই খ-বস্তুসমূহের প্রত্যেকটি এক একটি গোলকে আবদ্ধ। এদের দ্রুত আবর্তনের ফলে বাতাসে পৃথক পৃথক সুরের সৃষ্টি হয়। তারের দৈর্ঘ্যের উপর যেমন সুরের গ্রাম নির্ভর করে, গ্রহ-গণের পথের দৈর্ঘ্যের উপরও তেমনি তাদের সুরের পার্থক্য হয়। গ্রহসমূহের পথ এক একটি বিরাট গোলকাকার বীণার তার। সঙ্গীতের নিয়ম অনুসারেই পৃথক পৃথক গ্রহের জন্য পৃথক পৃথক সুরের সৃষ্টি হয়। এই বিশ্বসঙ্গীত নির্ণয় করাই দার্শনিকের কাজ। এ সঙ্গীত শ্রবণ করবার জন্য কঠিন সাধনা দরকার। প্রবাদ আছে যে, প্রভুর (*পীথাগোরাসের*) সাধনমার্গ এত উচ্চ ছিল যে, তিনি এই বিশ্বসঙ্গীত শুনতে পারতেন। সাধারণ মানুষ আজন্ম এই সঙ্গীতের ভিতরে ডুবে আছে বলে এ সঙ্গীত শুনতে পায় না। পীথাগোরাসের এই গ্রহ, তারা ইত্যাদি খ-বস্তুর সঙ্গীত তদানীন্তন সমাজ-জীবনকে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করে। সাহিত্য, কাব্য, শিল্প প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্তরে এই প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিকে' বলেছেন, "পীথাগোরাস বলেন, মানুষের চোখের সৃষ্টি হয়েছে খ-বস্তুসমূহের গতিবিধি নিরীক্ষণ করবার জন্য, আর কানের সৃষ্টি হয়েছে খ-বস্তুসমূহের গতিজনিত সঙ্গীত

শুনবার জন্য।" পীথাগোরাসের মৃত্যুর অনেক পরেও এই বিশ্বগোলক-সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ চর্চা ও আলোচনা করা হয়। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, পীথাগোরাস একজন বড় গণিতবিদ ছিলেন। গণিতই তাঁর দর্শনের মূল। তাঁর সম্প্রদায়ের লোক যদি গণিতের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করতেন, তা হলে গোলক-সঙ্গীত থেকে কেপলারের উপযন্ত্রে উপনীত হওয়া তাঁদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হতো না। তাঁরা তা করেন নাই; সেজন্য এবং পরবর্তী দুই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটো এবং আরিস্টটলের ভ্রান্ত মতবাদের জন্য জ্যোতির্বিদ্যার গতি দুই হাজার বৎসরের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকে। সে সম্বন্ধে পরে যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে। পীথাগোরাসের 'গোলক মতবাদ' বর্তমানে অত্যন্ত ভ্রান্ত বলে মনে হলেও, এই গোলকের স্বপ্নেই কেপলার অভিভূত হন এবং অবশেষে তাঁর তিনটি বিখ্যাত বিধি প্রণয়নে সমর্থ হন। কেপলারের এই বিধি তিনটিই জ্যোতির্বিদ্যাকে আধুনিক জগতের আলোতে এনে দেয়।

পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের ধর্ম, বীণাবাদক অরফিয়াসের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। অরফিয়াসের বাঁশীর সুরে গাছপালা, নদ-নদী, পশুপক্ষী, এমনকি পাতালের অন্ধকার পর্যন্ত মুগ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে আছে, এই হলো ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের সদস্যদের বিশ্বাস। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সত্যিকার সম্প্রদায়গতভাবে বাস করতেন। তাঁদের কারোরই পৃথক কোন জমিজমা বা ধনসম্পদ ছিল না। দলগত সম্পত্তি থেকে প্রয়োজন-মত জিনিস সবাইকে দেওয়া হতো। স্ত্রী-পুরুষের কোন পার্থক্য করা হতো না। সমস্ত দায়িত্ব ও সমস্ত সুযোগ সকলে সমানভাবে ভোগ করতো।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হয়। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত না থাকলেও, ধর্মীয় অনুশাসন অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অন্যান্য ধর্মের মত পরবর্তী যুগে এই সম্প্রদায়ও ধর্মকে রহস্যময় আধ্যাত্মিক বিষয় বলেই মনে করতো। ধর্ম যখন

এই পর্যায়ে পৌঁছে, তখন ধর্মের অনুশাসনের পিছনে কোন যুক্তি আছে কিনা অথবা এর কারণ কি, এ সমস্ত জিজ্ঞাসা ধৃষ্টতা ছাড়িয়ে পাপের সীমায় গিয়ে পৌঁছে। আলেকজাণ্ডারের সময় পর্যন্ত এই ধর্ম প্রচলিত ছিল। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে পীথাগোরাসের ধর্ম আবার নূতনভাবে আলোচিত হতে থাকে। আলেকজাণ্ডার পলিহিস্টারের মতে পীথাগোরাস বলেছেন, "বিশ্ব চারটি পদার্থে গঠিত। পদার্থ চারটি: মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন। বিশ্বের জীবন আছে, বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তিও আছে। বিশ্ব গোলকাকার, আমাদের পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। পৃথিবীর আকারও গোলকসদৃশ।" পীথাগোরাসই সর্বপ্রথম বিশ্বকে κοσμος বলে অভিহিত করেন এবং পৃথিবীকে গোল (καὶ τὴν στρογγύλην) বলে স্বীকার করেন। ডাইওজেনিস বলেন যে, শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা যে একই খ-বস্তু, এবং চাঁদ যে আয়নার মত আলো প্রতিফলন করে, এ কথা পীথাগোরাস জানতেন। স্মার্নার থিওন বলেছেন, পীথাগোরাস এও জানতেন যে, গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করে এবং এই সমস্ত গ্রহকক্ষ সূর্যকক্ষের সাথে বিভিন্ন কোণে ছেদ করে।

পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায় ও জ্যোতির্বিদ্যা

ঈটিয়াস বলেছেন, ক্রোটনের গণিতবিদ আলকামিওন প্রথম আবিষ্কার করেন যে, স্থির তারাসমূহের পূবদিক থেকে পশ্চিম দিকে যে গতি আছে, গ্রহসমূহের সেই গতি ছাড়াও বিপরীত দিকে অন্য একটি গতি আছে। অবশ্য এর ব্যাখ্যাতে তাঁরা বলতেন যে, গ্রহগণের এই বিপরীতমুখী গতি অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূবদিকের গতি ঠিক সত্যিকার গতি নয়; স্থির তারাগুলি যে গতিতে পূবদিক থেকে পশ্চিম দিকে যায়, গ্রহগণের গতি সে তুলনায় কম। সেজন্যই এগুলির বিপরীত গতি আছে বলে মনে হয়। অনেকে বলে থাকেন, পীথাগোরাস নিজেই ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের স্রষ্টা। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। পীথাগোরাস

খুব বড় গণিতবিদ ছিলেন। এ তথ্য যদি তাঁর জানাই থাকতো, তা হলে এর গাণিতিক সম্ভাবনা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারতো না এবং এ তথ্য শুধু এইভাবে আলকামিওনের নামে প্রচারিত না হয়ে বিশদ-ভাবে তাঁর নিজের নামেই প্রচারিত হতো। আলকামিওন যদিও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন না, তবুও তাঁর জ্ঞানশিষ্য বলা চলে; কেননা পীথাগোরাসের দর্শন আলকামিওনকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে।

অনেকে এমনও মনে করেন যে, পৃথিবীর গতির জন্যই যে চাঁদ, সূর্য ইত্যাদিকে গতিশীল বলে মনে হয়, পীথাগোরাস ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এ তথ্য জানতেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে এই মতবাদ ও বর্তমান সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

এই মতবাদ অনুসারে পৃথিবী প্রতিদিন আকাশপথে পশ্চিম থেকে পুবদিকে একটি বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে, সেজন্য পৃথিবী থেকে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা প্রভৃতি খ-বস্তুসমূহকে প্রতিদিন পুবদিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখা যায়। জ্যোতির্বিদ্যা-জগতে এই মতবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যদিও বর্তমানে এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল বলে মনে হয়, তবুও সমস্ত আকাশকে ঘূর্ণায়মান না বলে, পৃথিবীর গতি কল্পনা করা, এই বিষয়টাই একটা বিরাট ব্যাপার। পৃথিবী যে নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করতে পারে আর তার জন্যই খ-বস্তুসমূহের আহ্নিক গতি বোঝা যায়, এ ধারণা করা অত্যন্ত কষ্টকর। আকাশে এমন কোন বস্তু নাই যে নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করে বলে প্রত্যক্ষ করা যায় বা মনে করা যেতে পারে। বর্তমানে আমরা জানি যে, চাঁদের নিজ অক্ষের উপর আবর্তনের গতি আর পৃথিবীর চারিদিকে তার পরিভ্রমণের গতি সমান বলেই আমরা সব সময় চাঁদের একই পিঠ দেখতে পাই। কিন্তু, চাঁদ যে স্থির, পুরাকালে তার সপক্ষে এই বিষয়টাকেই যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো হতো যে, চাঁদের একই পিঠ সব সময় দেখা যায়, অতএব চাঁদ স্থির হয়ে আছে। সে যদি নিজ

অক্ষের উপর আবর্তিত হতো, তা হলে তার অন্য অংশ নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে দেখা যেত। সমস্ত আকাশ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, এর বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে চাঁদ, সূর্য ও গ্রহদের বেলায়। অবশ্য সেও অনেক পরের যুগের কথা। দেখা যায় যে, চাঁদ, সূর্য ও গ্রহগণ প্রতিদিন পূবদিক থেকে আকাশপথে পশ্চিম দিকে যায় বটে, কিন্তু এ ছাড়া আকাশে পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকেও এদের গতি আছে। এই গতির ব্যাখ্যা দেওয়া তখনও সম্ভবপর হয় নাই। তা ছাড়া এই খ-বস্তুসমূহের সমগ্র আকাশে গতির বিপরীত একটা গতি থাকতে পারে, এ কল্পনা তখন অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। এই অবস্থায় গণিতবিদ পীথা-গোরাসের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এমন কোন একমুখী গতি কি সম্ভব নয়, যা দিয়ে বিশ্বের এই সমস্ত গতির ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আকাশপথে পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকে পৃথিবীর গতির কল্পনা করেন। আকাশপথে পৃথিবী যদি পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকে যেতে থাকে, তা হলে তার ভ্রমণপথের বিভিন্ন অবস্থায় গ্রহ, তারা, চন্দ্র, সূর্যকে উদিত হতে ও অস্ত যেতে দেখা যাবে এবং তাদের পূবদিক থেকে পশ্চিম দিকে গতি আছে বলেও মনে হবে।

কেন্দ্রীয় অগ্নি

সুতরাং দেখা যায় যে, পীথাগোরীয়ান মতবাদে কোন সময়েই পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র বলে স্বীকার করা হয় নাই। পীথাগোরাস পৃথিবীকে এমন গুরুত্ব দেন নাই, যার জন্য তাকে কেন্দ্রস্থানীয় বলে মনে করা যেতে পারে। একটি 'কেন্দ্রীয় অগ্নি' বা 'বিশ্বচুল্লী'কেই (εστια του παντος) বিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করা হতো। জিউস এইখান থেকেই সমস্ত বিশ্বের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও খ-বস্তুসমূহ এই কেন্দ্রীয় অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে। এদের ভ্রমণপথকে বৃত্তাকার বলে মনে করা হতো।

প্রতি-পৃথিবী

পৃথিবী থেকে সেই কেন্দ্রীয় অগ্নি দেখা যায় না, তার কারণ পৃথিবী সেই কেন্দ্রীয় অগ্নির বিপরীত দিকে অবস্থিত। অবশ্য এখানে 'পৃথিবী' অর্থে গ্রীস এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহকেই বোঝানো হয়েছে। এ সম্বন্ধে আরিস্টটল পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায় সব সময় একটা পূর্বকল্পিত মতবাদ নিয়ে চলেন। তাঁদের কল্পনার সাথে প্রকৃতির কোন মিল আছে কিনা, সে সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ কোন চিন্তা করেন না। বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁদের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে, এবং তাঁদের সেই ধারণা অনুসারে তাঁরা আর একটি 'প্রতি-পৃথিবী'র (ἀντιχθών, counter earth) কল্পনাও করেন। এরূপ উদ্ভট কল্পনা যুক্তিসঙ্গত কিনা এবং বিশ্বের গঠনের সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা, সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন না।" আরিস্টটল অন্যত্র বলেছেন, "পীথাগোরীয়ান সংখ্যাপ্রিয়তা এতই অদ্ভুত যে, তাদের বস্তুজগতে সংখ্যা ও অনুপাতের তালিকাতে কোথাও যদি খালি থাকে, সে জায়গার জন্য তারা একটি বস্তুর কল্পনা করে নেয়। দশ একটি perfect সংখ্যা, আর এই দশ সংখ্যাটি সমস্ত সংখ্যার প্রতীক (কেননা প্রথম চারটি পূর্ণসংখ্যার যোগফল দশ), অতএব বিশ্বে দশটি খ-বস্তু আছে। কিন্তু খালি চোখে মাত্র নয়টি খ-বস্তু দেখা যায়। অতএব তাদের কল্পিত 'প্রতি-পৃথিবী' সেই দশম খ-বস্তু। আরিস্টটল যে নয়টি খ-বস্তুর উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হলো পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, পাঁচটি গ্রহ এবং স্থির তারাসমূহের গোলক। দশ সংখ্যা পূরণ করবার জন্য ফিলোলাউস এই প্রতি-পৃথিবীর কল্পনা করেন। কোন বিশেষ নিয়ম অনুসারে গঠিত সংখ্যা-তালিকাতে, কোন সংখ্যার অনুযায়ী পদার্থ পাওয়া না গেলে, অনেক তালিকাতেই সেখানে পদার্থের অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সেরূপ পদার্থের সন্ধানও পাওয়া গেছে। (পরবর্তী যুগে বোডের সংখ্যা-তালিকা থেকে গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। পারমাণবিক ওজনের তালিকার খালি জায়গা থেকে

এমন পরমাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে।) দশম গ্রহ প্রতি-পৃথিবী কোন সময়েই পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। তার কারণ, আমাদের পৃথিবী ও কেন্দ্রীয় অগ্নির মাঝখানে এই প্রতি-পৃথিবী অবস্থিত। দুইটি পৃথিবীই সমান বেগে কেন্দ্রীয় অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে। প্রতি-পৃথিবীতে কোন বসতি আছে বলে তাঁরা মনে করতেন না। পীথাগোরীয়ান দর্শন মতে বিশ্বের যে গোলকে বংশের পরিবর্তন হয়, সে গোলক চাঁদের নীচে অবস্থিত এবং পৃথিবী থেকে তার আরম্ভ। এই গোলকের নাম Heavens (ovpανos)। যে গোলকে নিয়মিত গতি আছে তার নাম Kosmos; এই গোলকে চাঁদ, সূর্য ও গ্রহগণের অবস্থান। Olympos গোলকে মৌলিক পদার্থসমূহ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে; এখানে স্থির তারাসমূহের বাস। এর বাইরে বহিস্থ অগ্নির গোলক। তারও বাইরে অনন্ত মহাশূন্য (το απειρον) বা অনন্ত বাতাসের গোলক। এই গোলক থেকেই বিশ্ব নিশ্বাস গ্রহণ করে থাকে।

পরবর্তী কোন কোন লেখক বলেছেন যে, পীথাগোরীয়ানগণ পৃথিবীকে গোলকাকার বলে মনে করতেন না। তাঁদের মতে পৃথিবী ও প্রতি-পৃথিবী একই গোলকের দুইটি অর্ধ, এক মধ্যরেখায় ছেদিত। এই দুই অংশের ছেদিত সমতল অংশ পরস্পর মুখোমুখী অবস্থিত; তাদের মাঝখানে সামান্য একটু শূন্যস্থান আছে। প্রতি-পৃথিবীর অর্ধ-গোলকাকার পিঠের দিকে কেন্দ্রীয় অগ্নি অবস্থিত। এজন্য পৃথিবী থেকে কেন্দ্রীয় অগ্নি দেখা যায় না। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। কেননা পীথা-গোরাস এবং পারমেনাইড পরিষ্কারভাবে পৃথিবীকে গোলকাকার বলে গেছেন। দশ সংখ্যা পূরণ করবার জন্য ফিলালাউস যদিও প্রতি-পৃথিবীর কল্পনা করেন, কিন্তু তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের গুরু পীথাগোরাসের মতের বিরোধিতা করবেন, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। পীথাগোরীয়ানদের শত্রুর অভাব ছিল না; গুরু ও শিষ্যের বিরোধিতার উল্লেখ করবার সুযোগ তাঁরা নিশ্চয়ই নিতেন এবং তাঁদের লেখার ভিতরে পৃথিবীকে দুই টুকরা করবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যেত।

কেন্দ্রীয় অগ্নি ও সূর্য

পৃথিবীর কক্ষের বাইরে চাঁদের কক্ষ অবস্থিত। চাঁদ কেন্দ্রীয় অগ্নিকে সাড়ে-উনত্রিশ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর বাইরে (পীথাগোরাস 'বাইরে'র পরিবর্তে 'উপরে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন) সূর্য ও গ্রহসমূহের কক্ষ। কেন্দ্রীয় অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের এক বৎসর সময় দরকার হয়। পরবর্তী যুগের সমস্ত লেখকই ফিলা-লাউসের এই মতবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে, সূর্য যে কক্ষে কেন্দ্রীয় অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে, তার উল্লেখ করেছেন। অতএব সূর্যকে কেন্দ্রীয় অগ্নি বলে ভুল বুঝবার কোন সম্ভাবনা নাই। গ্রহসমূহের কক্ষের ক্রম নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতবাদকে পীথাগোরীয়ান মতবাদ বলে উল্লেখ করেছেন। প্লুটার্ক বলেছেন, ফিলালাউসের মতে, চন্দ্র ও সূর্যকক্ষের মাঝখানে বুধ ও শুক্রের কক্ষ। আফ্রোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডার বলেছেন, পীথাগোরীয়ানদের মতে, দশটি কক্ষের মধ্যে সূর্যের কক্ষ সপ্তম। প্লেটো এবং তাঁর পরবর্তী দার্শনিকগণ পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে, পরপর চন্দ্র, সূর্য, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শনির কক্ষের অবস্থান বলে নির্দেশ করেছেন। এতে মনে হয়, সে সময়ে পীথাগোরীয়ানদের যে মতবাদ প্রচলিত ছিল, এঁরা সেই মতবাদই গ্রহণ করেছিলেন।

এই অদ্ভুত মতবাদের সাহায্যেও রাত, দিন, ঋতুপরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিল, এ কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। পৃথিবী আকাশে তারার মত একটি পদার্থ। আমরা জানি এর নিজ অক্ষের উপর আবর্তনের জন্যই দিন রাত হয়। কিন্তু ফিলালাউসের মতবাদে পৃথিবীর অক্ষের উপর আবর্তনের কোন কথাই নাই। তবুও দিবা-রাত্রির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কেন্দ্রীয় অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করবার সময়ে পৃথিবীর যে দিকটা সূর্যের দিকে থাকে, সেদিকে দিন, আর যে দিকটা কেন্দ্রীয় অগ্নির দিকে থাকে সেদিকে রাত। এই ছিল দিবা-রাত্রের ব্যাখ্যা। একইভাবে চাঁদ ও গ্রহসমূহের পরিভ্রমণের ব্যাখ্যাও দেওয়া

হতো। ঋতুর পরিবর্তনের ব্যাখ্যাতে বলা হতো যে, সূর্যের প্রদক্ষিণ-পথ তার বিষুব-অঞ্চলে অবস্থিত নয়, সেইজন্যই এইরূপ পরিবর্তন হয়। গ্রহসমূহের অদ্ভুত গতির (কোন সময়ে গতি সামনে, কোন সময়ে পিছনে এবং কোন সময়ে স্থির) ব্যাখ্যা দিতে তাঁরা সক্ষম হন নাই। কিন্তু মনে হয় যে, এই অনিয়মিত গতি তখন সূক্ষ্মভাবে জানাও যায় নাই।

নামে কেন্দ্রীয় অগ্নি হলেও, বিশ্ব যে একমাত্র এখান থেকেই তাপ ও আলো পায়, পীথাগোরীয়ানরা এমন কথা বিশ্বাস করতেন না। এই কেন্দ্রীয় অগ্নি থেকে তাপ সংগ্রহ করা ছাড়াও, দৃশ্য জগতের বাইরে অবস্থিত অগ্নিগোলক (বা উপরের অগ্নিগোলক) থেকে সূর্য, তাপ ও আলো সংগ্রহ করে থাকে। সূর্যকে একটি ছাঁকনার মত মনে করা হয়। বাইরের অগ্নি-গোলক থেকে আলো ও তাপ এই ছাঁকনার ভিতরে প্রবেশ ক'রে চারদিকে বেরিয়ে আসে। এই আলো চাঁদের উপরে পড়েই চাঁদকে আলোকিত করে। তবে পীথাগোরীয়ানদের মতে, কেন্দ্রীয় অগ্নির আলো চাঁদের উপরে পড়ে বলে, দ্বিতীয়ার সময় চাঁদের উজ্জ্বল অংশের পাশে অনুজ্জ্বল অংশও অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। পীথা-গোরীয়ান সম্প্রদায়ের মতে পৃথিবীর মত চাঁদে বসতি আছে। এখানে গাছপালা, পশুপাখীও আছে। চাঁদের পশু পৃথিবীর পশু অপেক্ষা ১৫ গুণ অধিক শক্তিশালী, কেননা চাঁদের একদিন পৃথিবীর ১৫ দিনের সমান।

পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের অনেকের মতে, চাঁদে যে সমস্ত কালো দাগ দেখা যায়, সেগুলি আমাদের পৃথিবীর সমুদ্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে চন্দ্র প্রবেশ করলে চন্দ্রগ্রহণ হয়, এ ছাড়া প্রতি-পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে চন্দ্র প্রবেশ করলেও চন্দ্রগ্রহণ হয়; সেজন্যই সূর্যগ্রহণের সংখ্যা অপেক্ষা চন্দ্রগ্রহণের সংখ্যা বেশী। চন্দ্রগ্রহণ ব্যাখ্যা করবার জন্য এই সম্প্রদায়ের অনেকে আরো অনেক অদৃশ্য খ-বস্তুর কল্পনা করেছিলেন। এতে মনে হয় তাঁরা দশটি গ্রহেও শেষ পর্যন্ত

সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নাই। ধূমকেতুকেও এঁরা বুধ গ্রহের মত একটি গ্রহ মনে করতেন।

কেন্দ্রীয় গোলকের চারদিকে দশটি গোলক পরিভ্রমণ করে। এর সর্বশেষ গোলক হলো স্থির তারার গোলক। এতে প্রথমে একটু খটকা লাগে। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আবর্তন জানা না থাকায় পৃথিবীর গোলককে আকাশপথে পরিভ্রমণ করানো হলো, কিন্তু সেই আকাশ অর্থাৎ স্থির তারার গোলককে আবার পরিভ্রমণ করানোর কি দরকার ছিল? কিন্তু মনে হয়, এই সমস্ত দার্শনিক বিশ্বাস করতেন যে, এই কেন্দ্রীয় অগ্নি থেকে যে গোলক যত কাছে তার পরিভ্রমণ-বেগ তত দ্রুত এবং যে গোলক যত দূরে তার পরিভ্রমণ বেগ তত মৃদু। অনেকে বলতে চান যে, স্থির গোলকের এই মৃদু গতি দ্বারা অয়ন চলন (precession of equinoxes) বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

হিকেটাস

বিশ্ব সম্বন্ধে ফিলোলাউসের এই অদ্ভুত মতবাদ ছাড়া হিকেটাস নামে আর একজন পীথাগোরীয়ান দার্শনিক ভিন্ন মত পোষণ করতেন। হিকেটাস সাইরাকিউসের লোক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এমনকি তিনি ফিলোলাউসের আগে না পরে সে সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা যায় না। কিন্তু এঁর জ্যোতির্বিদ্যার মতবাদ সম্বন্ধে সিসেরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আরিস্টটলের শিষ্য থিওফ্রেস্টাস বলেন যে, সাইরাকিউসের হিকেটাস বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী ছাড়া চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ এবং অন্যান্য তারা স্থিরভাবে আছে। একমাত্র পৃথিবীই নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করে ও আকাশপথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীকে স্থির মনে ক'রে সমস্ত আকাশকে তার চারদিকে ঘুরিয়ে যে সমস্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, পৃথিবীর উপরের দুইটি গতি দ্বারাও সে সমস্তই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।" আরিস্টটলের এই প্রধান শিষ্যের উক্তিতে

আর কেউ কোথাও প্রতিবাদ করেন নাই। এজন্য এ উক্তির গুরুত্ব যথেষ্ট অধিক। মনে হয় ফিলালাউসের কেন্দ্রীয় অগ্নি-মতবাদ অস্বীকার করেই হিকেটাস এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

একফান্টাস

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে, হিকেটাস ছাড়া আরো অনেকেই কেন্দ্রীয় অগ্নি-মতবাদ পরিত্যাগ করেন। একফান্টাস নামে সাইরা-কিউসের আর একজন পীথাগোরীয়ান দার্শনিক বলেন যে, "পৃথিবী আকাশে পরিভ্রমণ করে না, বরং চাকার মত নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকে আবর্তন করে।" এতে বোঝা যায় যে, ফিলালাউসের দশ গ্রহের জটিলতা পীথাগোরীয়ানগণও স্বীকার করে নিতে পারেন নাই। এঁদের অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, চন্দ্রগ্রহণের সংখ্যার আধিক্য ব্যাখ্যা করবার জন্য দশের চাইতে অধিক অদৃশ্য গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করা দরকার। পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করে, এ মতবাদও গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু পীথাগোরাস স্বর্গের দেবতা, আর ফিলালাউস তাঁর প্রধান শিষ্য। এঁদের মতবাদকে ভ্রান্ত কল্পনা করবার ধৃষ্টতা কারো নাই। এজন্য তাঁর সম্প্রদায়ের পরবর্তী যুগের লোকেরা সাফাই দিতে আরম্ভ করেন যে, পীথাগোরাস ও ফিলালাউসের মতবাদ সাধারণ মানুষ ভালমত বুঝতে পারে না এবং তাদের কথার ভিতরে পৃথিবীর ঘূর্ণন ইত্যাদি আধুনিক তথ্যাদি নিহিত ছিল। কেন্দ্রীয় অগ্নিকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয় এবং এমনও বলা হয় যে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় সেই আগুনকেই বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

আমাদের নিকট পীথাগোরাস ও ফিলালাউসের মতবাদ যতই ভ্রান্ত বলে মনে হোক না কেন, জ্যোতির্বিদ্যা-জগতে এদের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। পৃথিবী স্থির, তাকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্বের সমস্ত জ্যোতির্জগৎ প্রদক্ষিণ করে, প্লেটো ও আরিস্টটলের আশীর্বাদ-ধন্য এই মতবাদ পৃথিবীর

জ্ঞানকে দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখে। কোপারনিকাস অতি ভয়ে ভয়ে পৃথিবীকে গতিশীল বলে প্রকাশ করেন। কিন্তু সে সময়ে পৃথিবীর অবস্থা এমন ছিল যে, কোন প্রাচীন দার্শনিকের সমর্থনপুষ্ট না হলে কোন নূতন মতবাদই কেউ শুনতে রাজী ছিল না। ফিলা-লাউস ও অন্যান্য পীথাগোরীয়ান দার্শনিকের মতবাদ উল্লেখ ক'রে কোপারনিকাস তাঁর গ্রন্থে নিজের মতবাদের সারবত্তা প্রমাণ করেন বলেই কেউ তাঁর কথা উড়িয়ে দিতে সাহস পায় নাই। পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের সমর্থন উল্লেখ করতে না পারলে জ্যোতির্বিদ্যা তথা বিজ্ঞানের অগ্রগতি আরো যে কতদিনের জন্য ব্যাহত হয়ে থাকতো, কে বলতে পারে।

পৃথিবী গোলকাকার, এই তথ্যের যে-প্রমাণ এখনও আমাদের বিদ্যা-লয়ের ছাত্রদের নিকট দেওয়া হয়, সে প্রমাণও পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের দেওয়া। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে আগত কোন জাহাজের দিকে লক্ষ্য করলে প্রথমে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়, তার পরে ক্রমাগত তার নীচের দিক দেখা যেতে থাকে। যতই পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে যাওয়া যায়, ততই দক্ষিণ আকাশের নূতন নূতন তারা দেখা যায় এবং উত্তর আকাশের তারা ক্রমেই অদৃশ্য হতে থাকে। চন্দ্র-গ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে যেয়ে পড়ে এবং ঐ ছায়া গোল। পৃথিবী গোলকাকার, এই তথ্যের এই সমস্ত প্রমাণ পীথা-গোরীয়ানগণের দেওয়া। অনেকে বলেন, এই প্রমাণগুলি ফিলালাউসের, আবার অনেকে বলেন, এই প্রমাণগুলি ঐ সম্প্রদায়েরই অন্য কোন দার্শনিকের।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যায় সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ

হেরাক্লাইডস ও আরিস্টারকাস

আমরা এখানে যে দুইজন গ্রীক মনীষীর কথা বলব, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা প্লেটো এবং আরিস্টটলের শিষ্য হলেও তাঁদের দর্শন পীথাগোরীয়ান ভাবসম্পন্ন। ফিলোলাউসের বিশ্ব একটি কেন্দ্রীয় অগ্নির চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। হেরাক্লিয়াসই প্রথম কল্পনা করেন যে, গ্রহসমূহ সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে; এর পরে আরিস্টারকাস সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন। আরিস্টারকাসকে অনেকে গ্রীক যুগের কোপারনিকাস বলে অভিহিত করে থাকেন। আরিস্টারকাসের মতবাদের পরে কেপলারের আবির্ভাবের জন্য মাত্র একটি পদক্ষেপের প্রয়োজন; এবং তার সঙ্গে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব ও স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু এই একটি মাত্র পদক্ষেপ করতে পৃথিবীর দুই হাজার বৎসর দরকার হয়। প্লেটো এবং আরিস্টটল, বিশেষ করে আরিস্টটল পৃথিবীর উপর এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেন যে, দুই হাজার বৎসর পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে নাই, বরং হতবুদ্ধি হয়ে পিছিয়ে গেছে। বিশ্বের অন্য কোথাও যদি মানুষের মত বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব থেকে থাকে এবং সেখানে যদি একই সময়ে আরিস্টারকাসের মত দার্শনিকের জন্ম হয়ে থাকে এবং তার পরে আরিস্টটলের মত দার্শনিকের আবির্ভাব না হয়ে থাকে, তা হলে সেই গ্রহ পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানে দুই হাজার বৎসর এগিয়ে আছে। তাদের পক্ষে ক্লাইং সসার আবিষ্কার করা হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে। দর্শন ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়

প্লেটো ও আরিস্টটলের দান যত মঙ্গলকরই হোক না কেন, বিজ্ঞানের পক্ষে এঁদের দুইজনের অবদান অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। যদিও হেরাক্লাইডস ও আরিস্টার্কাস এঁদের সমসাময়িক এবং শিষ্য, তবু বিজ্ঞানজগৎ কি হারিয়েছে এবং বিশ্ব কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার পরিমাণ নির্দেশ করবার জন্যই হেরাক্লাইডস ও আরিস্টারকাস সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হচ্ছে।

হেরাক্লাইডস

হেরাক্লাইড্‌সের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তিনি বলেছেন, তাঁর সময়েই আকাইয়া প্রদেশের হেলাইক শহর ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আলেকজান্দ্রিয়া আবিষ্কারের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন। হেলাইকের এই ভূমিকম্প খ্রীস্টপূর্ব ৩৭৩ অব্দে সংঘটিত হয়। এতে মনে হয় তিনি এই সময়ের লোক ছিলেন। পন্টাসের হেরাক্লিয়াসে তাঁর জন্ম হয়, কিন্তু পরে তিনি এথেন্সে যেয়ে বসবাস করেন। এখানে তিনি প্রথমে প্লেটো মতবাদী স্পিউসিপপাসের শিষ্য হন এবং পরে স্বয়ং প্লেটোর শিষ্য হওয়ার সুযোগও তিনি পান। তিনি যদিও প্লেটোর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন এবং সেই সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল। পরে তিনি আরিস্টটলের নিকটও শিক্ষালাভ করেন। কোন কোন বিষয়ে হেরাক্লাইড্‌স্‌ প্লেটোর মতবাদ সমর্থন করেছেন, এমনকি কোথাও বা সে মতবাদের উপর ভিত্তি ক'রে আরো অগ্রসর হয়েছেন। জগতকে তিনি স্বর্গীয় মনসম্পন্ন একজন দেবতা বলে মনে করতেন এবং গ্রহসমূহেও তিনি দেবত্ব আরোপ করতেন। তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক গ্রহের পৃথিবীর মতই অবয়ব ও আবহাওয়া আছে। তাঁর লিখিত বই-এর একটা বিরাট তালিকা আমরা ডাইওজেনিসের নিকট থেকে পাই। এর মধ্যে একখানা বই-এর নাম "স্বর্গের জিনিস সম্বন্ধে"

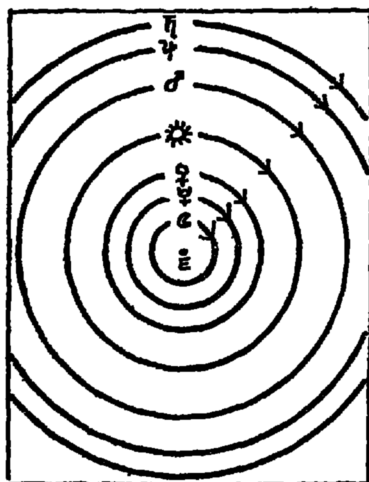
(περι των εν ουρανω)। প্রথম দৃষ্টে মনে হয়, বইখানা জ্যোতির্বিদ্যার কোন বই। কিন্তু ঐ তালিকাতেই "পাতালের জিনিস সম্বন্ধে" এই নামে একখানা বই-এর উল্লেখ থাকাতে বুঝতে পারা যায়, এ ধারণা ভুল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কোন বই-এর সন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন লেখক জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে হেরাক্লাইড্‌সের মতবাদের বিশদ আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত আলোচনা থেকেই তাঁর মতবাদ আমরা জানতে পাই। জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আরিস্টটলের বইতে হেরাক্লাইড্‌সের মতবাদের কোন উল্লেখ নাই। এমনও হতে পারে যে, আরিস্টটল এ সম্বন্ধে কিছুই অবহিত ছিলেন না।

হেরাক্লাইড্‌স্ যে পীথাগোরীয়ান দর্শন অধ্যয়ন করতেন এবং এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, ডাওইজেনিসের লেখা থেকেই আমরা এ বিষয় জানতে পারি। এই যোগাযোগের ফলেই তিনি হিকেটাস ও একফাণ্টাসের মতবাদের সাথে পরিচিত হন। পৃথিবী যে নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করে, হিকেটাস ও একফাণ্টাসের এই মতবাদ হেরাক্লাইড্‌স্ পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন। এর উপরে ভিত্তি করেই তিনি আকাশের গ্রহসমূহের গতিবিধির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আবর্তনে খ-বস্তুসমূহের আহ্নিক গতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহের বার্ষিক গতির কোন ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায় না। গ্রহসমূহের এই বার্ষিক গতিই ছিল এ সময়কার জ্যোতির্বিদ্যা ও বিশ্বতত্ত্বের প্রধান প্রশ্ন। অগণিত স্থির তারা নিয়ে কোন অসুবিধা ছিল না; তাদের পরস্পরের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। বিশ্বে নিয়ম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতীক হলো এই স্থির তারাসমূহ। এগুলিকে আকাশের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র মনে করলেও কোন অসুবিধা হয় না। পৃথিবীই নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করুক আর আকাশই ঘুরুক, উভয় মতবাদেই স্থির তারাসমূহের গতি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু ভবঘুরে গ্রহের গতি সাংঘাতিক ভাবে অনিয়মিত। এদের গতির মধ্যে একটিমাত্র

মাত্র সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় যে, আকাশের ছোট একটা গলিপথে এদের যাতায়াত। রাশিচক্রের সামান্য প্রশস্ত একটু জায়গার ভিতর দিয়েই এরা আকাশপথে পরিভ্রমণ করে। এদের কোনটাই কোন সময়েই সেই স্বল্পপরিসর গলির বাইরে যায় না।

বিশ্ব সম্বন্ধে গ্রীকদের ধারণা কিরূপ ছিল, তার একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন কোয়েসলার (Koestler) তাঁর *Sleepwalker* গ্রন্থে। মনে করা যাক, আটলান্টিক মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে জাহাজ, তার পানির ভিতর দিয়ে সাবমেরিন এবং তার আকাশপথে এরোপ্লেন যাতায়াত করে। এই বিভিন্ন প্রকারের যান যদি একই বাণিজ্যপথে চলে, তা হলে তাদের কক্ষসমূহ সমকেন্দ্রিক বৃত্ত হবে। এই সমস্ত বৃত্ত একই সমতলে অবস্থিত হবে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রই হবে এই সমস্ত বৃত্তের কেন্দ্র। পৃথিবী যদি স্বচ্ছ হতো এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে শুয়ে কোন লোক যদি এই সমস্ত যানের যাতায়াত লক্ষ্য করতো, তা হলে তার কাছে মনে হতো কতকগুলি বিন্দু বিভিন্ন গতিতে একটিমাত্র পথে চলাচল করছে। এখন স্বচ্ছ পৃথিবী যদি নিজ অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে, তা হলে এই সমস্ত যান পৃথিবীর আবর্তন ছাড়াও নিজ নিজ গতিতে চলতে থাকবে; তাদের গতিপথ সেই একই থাকবে, তার কোন পরিবর্তন হবে না। এই যানসমূহের ভিতরে দুইটি সাবমেরিন বিভিন্ন গভীরতায় আটলান্টিকের ভিতরে ছুটাছুটি করছে। এই দুইটি হলো দুইটি অন্তঃগ্রহ: বুধ ও শুক্র। তারপরে আগুনের শিখা নিয়ে একটা জাহাজ আটলান্টিকের বুকের উপর দিয়ে চলছে; এই হলো সূর্য। এর পরে বিভিন্ন উচ্চতার তিনটি এরোপ্লেন ঐ একই পথে আটলান্টিকের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে; এ তিনটি হলো তিনটি বহির্গ্রহ: মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। শনি সবার উপরে, আর তার উপরে স্থির তারাদের গোলক। চন্দ্র সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, এটি অতি নিকটে, কেন্দ্রের চারপাশে, অন্যান্য গ্রহের গতিপথের একই সমতলে, ছোট একটা গর্তে যাতায়াত করে। এই হলো প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ব-নক্সা।

কিন্তু এই নক্সাতে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই। গ্রহগণের অনিয়মিত গতিবিধিই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। হেরাক্লাইড্‌সের সময় যে সমস্ত দার্শনিক বিশ্ব-দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁদের প্রধান সমস্যা হয়েছিল গ্রহগণের অনিয়মানুবর্তিতা। সূর্য এবং চন্দ্র আকাশ



রেখাচিত্র ১১ঃ প্রাচীন ভূ-কেন্দ্রিক পদ্ধতি

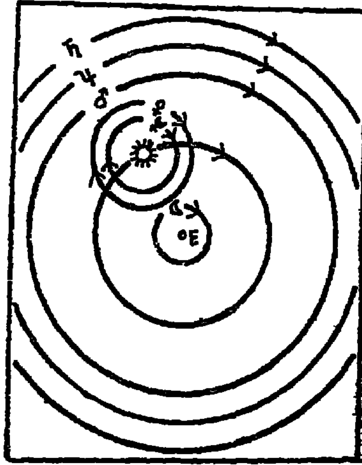
পথে প্রায় নিয়মিতভাবে চলাফেরা করে। কিন্তু পাঁচটি গ্রহের গতি-বিধির কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় নাই। এরা যখন যেমন খুশী চলে। আকাশের অন্যান্য খ-বস্তুর সাথে কখনো দেখা যায় এরা ঠিক পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকে যায়; কোন সময় গ্রহগুলি হঠাৎ থেমে যায়। সেখান থেকে কোনটা হয়তো পূবদিকে যায়, আবার কোনটা হয়তো পশ্চিম দিকে যায়। গ্রহগণের এই খামখেয়ালী গতিই দার্শনিকদিগকে সবচেয়ে বিব্রত করে তুলেছিল। শুক্রগ্রহের গতিই ছিল সবচেয়ে বেশী বেখাপ্পা। তার উজ্জ্বলতা ও আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি এত বেশী স্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যাতে এই মাত্র বলা যেতে পারে যে,

শুক্রগ্রহ কোন সময়ে আমাদের পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে এসে পড়ে আবার কোন সময় অনেক দূরে সরে যায়। এতে সহজেই বোঝা যায় যে, অন্ততঃ এই গ্রহটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কোন বৃত্তপথে ঘোরে না, বরং এর পরিভ্রমণ-পথ অদ্ভুত ঢেউ-খেলানো মত। এ ছাড়া শুক্র ও বুধ গ্রহের বেলায় আরো দেখা যায় যে, এই দুটি গ্রহ কোন সময়েই সূর্য থেকে বেশী দূরে যেতে পারে না। এরা হয় সূর্যের সামান্য আগে বা সামান্য পেছনে চলে। সেজন্য শুক্রগ্রহকে কোন সময়ে Phosphorus বা শুকতারা-রূপে দেখা যায়, আবার কোন সময় Hesperous বা সন্ধ্যাতারা রূপে দেখা যায়।

শুক্রগ্রহের এই অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করে হেরাক্লাইড্‌স্‌ সর্বপ্রথম বলেন, সূর্য যদিও পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু শুক্রগ্রহ আবার সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করে। এবং বুধও ঠিক একইভাবে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি প্রত্যেকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে; আর বুধ ও শুক্র সূর্যকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে। সেজন্যই এই দুইটি গ্রহকে কোন সময়েই সূর্য থেকে বেশী দূরে যেতে দেখা যায় না এবং এদের পথ ঢেউ খেলানো বলে মনে হয়।

নীচের নক্সা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, কেন শুক্রগ্রহকে কোন সময় পশ্চিম দিক থেকে পুবদিকে যেতে দেখা যায়, কোন সময় পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখা যায়; আবার কোন সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যদিও এ ব্যবস্থা এখন অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর বলে মনে হয়, কিন্তু সেই সময় প্লেটোর মত দার্শনিকের মতবাদকে উপেক্ষা করবার মত মনের বল বড় সহজ ছিল না। তা ছাড়াও শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত মতবাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ ক'রে অন্যভাবে চিন্তা করবার মত কল্পনাশক্তিও বিরল প্রতিভার পরিচয় দেয়। হেরাক্লাইড্‌স্‌ এইজন্য একজন প্রতিভাবান এবং দুঃসাহসী লোক ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পরিচিত মহলে তাঁকে

Paradoxolog বা উদ্ভট কাহিনীকাব বলে ডাকা হতো। সিসেবো বলেন, হেবাক্লাইড.স্ ছেলেমানুষী গল্প আব মন-মাতানো কাহিনী বলতে

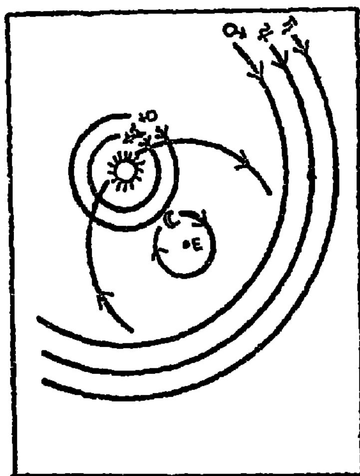


বেখাচিত্র ১২ঃ হেবাক্লাইডসেব মিশবীয পদ্ধতি

ভালবাসতেন। প্রোক্লাস বলেছেন, 'হেবাক্লাইড.সের ধৃষ্টতার সীমা নাই। সে প্লেটোর কথাব প্রতিবাদ কবে।'

উপবে যে বিশ্ব-নক্সা দেওযা হলো, অথাৎ সূর্যকে কেন্দ্র কবে বুধ ও শুক্র পরিভ্রমণ করে, আর সূর্য তার এই দু'টি উপগ্রহ নিযে পৃথিবীর চাবদিকে পবিভ্রমণ কবে, এই মতবাদ পববর্তী যুগে মিশবীয মতবাদ বলে পবিচিত হয এবং যথেষ্ট জনপ্রিযতাও অর্জন কবে। এই মতবাদ ভূ-কেন্দ্রিক ও সৌবকেন্দ্রিক মতবাদেব মাঝামাঝি একটি মতবাদ। হেবাক্লাইড.স্ এ মতবাদে সন্তুষ্ট ছিলেন কিনা জানা যায না। অনেকে বলেন, "তিনি এ পর্যন্ত বলেছেন যে, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি,

এ পাঁচটি গ্রহই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, আর সূর্য এই গ্রহগুলো নিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।



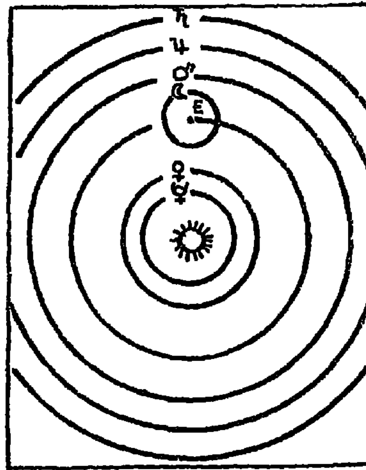
রেখাচিত্র ১৩ ঃ টাইকো ব্রাহের পদ্ধতি

আরিস্টারকাস

পীথাগোরীয়ান দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশেষ দার্শনিক আরিস্টারকাস। পীথাগোরাসের জন্মভূমি সামোস দ্বীপে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর জন্ম হয়। জ্যোতির্বিদগণের জন্ম-মৃত্যুর ভিতরে একটা অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, খ্রীস্টপূর্ব ৩১০ অব্দে হেরাক্লাইড্‌সের মৃত্যু হয় এবং ঐ বৎসরেই আরিস্টারকাসের জন্ম হয়। তেমনি, গ্যালিলিওর যে বৎসর মৃত্যু হয়, নিউটনের সেই বৎসর জন্ম হয়। আবার কোপার্নিকাসের মৃত্যুর ঠিক একশত বৎসর পরে নিউটনের জন্ম হয়।

আরিস্টারকাস কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ-পারদর্শীই ছিলেন না, তিনি একজন অত্যন্ত প্রতিভাশালী তত্ত্ববিদও ছিলেন। টলেমী বলেন,

আরিস্টারকাস খ্রীস্টপূর্ব ২৮১ অব্দে সূর্যের গ্রীষ্মায়ন পর্যবেক্ষণ করেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় 'চাঁদ ও সূর্যের আয়তন ও দূরত্ব' নামে ছোট একখানা বই ছাড়া তাঁর লিখিত অন্য কোন বইয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পর্যবেক্ষণ দ্বারা চাঁদ ও সূর্যের আয়তন ও দূরত্ব নির্ণয় করবার এই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা। চাঁদের ঠিক অর্ধাংশ যখন আলোকিত থাকে (অর্থাৎ শুক্লা, সপ্তমী ও অষ্টমীর মাঝামাঝি সময়) তখন চাঁদের ও সূর্যের ভিতরের কৌণিক-দূরত্ব তিনি নির্ণয় করেন। এই কোণটিকে তিনি এক সমকোণের ৩০ ভাগের ২৯ ভাগ অর্থাৎ ৮৭ ডিগ্রী বলে নির্ণয় করেন। এতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের ১৮ থেকে ২০ গুণের মধ্যে।



রেখাচিত্র ১৪ : আরিস্টারকাসের সৌরকেন্দ্রিক পদ্ধতি

বর্তমানে আমরা জানি যে, আরিস্টারকাসের এই সিদ্ধান্ত ভুল। তত্ত্বগতভাবে এই প্রণালীতে কোন ত্রুটি নাই; দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এই অতি সুন্দর ও সহজ প্রণালীই ছিল চাঁদ ও সূর্যের

দূরত্ব নির্ণয়ের একমাত্র প্রণালী। আরিস্টারকাসের প্রদত্ত দূরত্ব ভুল হওয়ার কারণ, সেই সময়ে ঠিক কোন্ মুহূর্তে চাঁদের ঠিক অর্ধেক অংশ আলোকিত হয়, তা জানা সম্ভব ছিল না। আরিস্টারকাসের নির্ণীত দূরত্ব যতই ভুল হোক না কেন, তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভা এবং অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা অস্বীকার করবার উপায় নাই। আমাদের মনে রাখতে হবে, দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ঘড়িও আবিষ্কৃত হয়েছিল আরিস্টারকাসের দুই হাজার বৎসর পরে; অথচ সেই সময়েই আরিস্টারকাস ৩৬৫¼ দিনের সঙ্গে আরো ১৬২৩ দিন যোগ ক'রে সৌর-বৎসরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেছিলেন।

আরিস্টারকাসের সর্বপ্রধান আবিষ্কার হলো, তাঁর সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ। তিনি প্রচার করেন যে, সূর্য স্থির এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে। দুই হাজার বৎসর পরে কোপারনিকাস ঠিক একই তত্ত্ব পুনরায় আবিষ্কার করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে বইতে আরিস্টারকাস এ তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সে বইয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু সেজন্য তাঁর এ আবিষ্কারে সন্দেহ করবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। আরিস্টারকাসেরই সমসাময়িক, প্রাচীন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ ও বিজ্ঞানবিদ, সর্বজনমান্য গণিতবিদ আর্কিমেডিসের বইতে এ কথার উল্লেখ আছে। আর্কিমেডিস 'বালুকা গণনা' নামে একখানা অদ্ভুত বই লেখেন। সমস্ত বিশ্বকে কত বালুকা কণা দিয়ে পূর্ণ করা যায়, তিনি এ বইখানাতে তার সংখ্যা নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। এই বইতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "কেননা, তিনি (আরিস্টারকাস) বলেছেন, সূর্য ও স্থির তারাসমূহের কোন গতি নাই, বরং পৃথিবীকেই সূর্যের চারদিকে একটি বৃত্তপথে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়।" আর্কিমেডিস এই মতবাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথাই বলেন নাই। এজন্য অনেকেই বলে থাকেন, আরিস্টারকাস

নিজে এ মতবাদকে একটা প্রকল্পরূপে প্রকাশ করেছিলেন, এর কোন ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই।

আর্কিমেডিসের বই ছাড়া, প্লুটার্কের 'চন্দ্রবিম্বে মুখ' নামে বইতেও আরিস্টারকাসের এই মতবাদের উল্লেখ আছে। এই বই-এর কথোপকথনে একজন লোক অন্য একজনকে পৃথিবী উল্টে যাওয়া সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করছে। তার উত্তরে সে বলছে 'সামোসের আরিস্টারকাস বিশ্ব-ঘটনা রক্ষা (ব্যাখ্যা ?) করবার জন্য (to save the phenomenon), বিশ্বের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীকে সরিয়ে নিয়ে তার নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করানো ছাড়াও আকাশে বৃত্তপথে তাকে প্রদক্ষিণ করিয়েছিল ; এজন্য ধর্মবিরোধী বলে ক্লিনথেস তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। 'আমাকে সেভাবে ধর্মবিরোধী না বললে, জগতের উল্টে যাওয়াতে আমার কোন আপত্তি নাই।' এ থেকে এটা ঐতিহাসিক সত্যরূপে বোঝা যায় যে, বিশ্ব-ঘটনা ব্যাখ্যা বা রক্ষা করবার জন্য তিনি সৌরকেন্দ্রিক প্রকল্প মতবাদ প্রকাশ করেন।

এ কোন্ ঘটনা, যাকে ব্যাখ্যা বা রক্ষা করবার জন্য এত প্রয়াস ? এবং যার জন্য সামোসের আরিস্টারকাসকে ধর্মবিরোধী বলে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল ? গ্রহসমূহের অনিয়মিত গতিই হলো এই ঘটনা। গ্রহগুলোকে কখনো দেখা যায় পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকে যেতে, আবার কখনো তার উল্টো দিকে যেতে দেখা যায়। কখনও বা একেবারে স্থির হয়ে থাকতেও দেখা যায়। আরিস্টারকাস তাঁর সৌর-কেন্দ্রিক মতবাদ দ্বারা এই অনিয়মিত গতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বর্তমান মতবাদের পথে এতদূর অগ্রসর হওয়ার পরেও জ্যোতির্বিজ্ঞান আবার কিভাবে পিছিয়ে পড়ে এবং দুই হাজার বৎসর পশ্চাদ্‌পদ অবস্থায় থাকে। সে যুগে আরিস্টারকাস একজন অজ্ঞাত, অখ্যাত দার্শনিক ছিলেন না। আর্কিমেডিস ও প্লুটার্ক ছাড়া তাঁর মতবাদ আরো অনেকেই উল্লেখ করেছেন। 'সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয়' সম্বন্ধে তাঁর বইখানা

একটি ক্লাসিকাল গ্রন্থরূপে সমস্ত মধ্যযুগে আদৃত হয়েছে। তাঁর খ্যাতি এত অধিক ছিল যে, তিনশত বৎসর পরেও রোমান স্থপতি পেট্রুবিয়াস বলেছেন, "সামোসের আরিস্টারকাসের মত প্রতিভাশালী লোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছে।" এতদসত্ত্বেও তাঁর এই অতি সহজ ও সুন্দর প্রণালী ত্যাগ ক'রে লোকে একটা জটিল ও অদ্ভুত প্রণালী গ্রহণ করেছিল এবং দুই হাজার বৎসর ধরে সেটাকেই আঁকড়ে ধরে ছিল, তার কারণ কি?

এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ড্রায়ার বলেছেন, সে সময়ে ফলিত জ্যোতির্বিদ্যার অতি দ্রুত উন্নতি হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ 'ঘটনা'ও দেখা দেয়। কিন্তু আরিস্টারকাসের পরে, তাঁর মত প্রতিভাসম্পন্ন কোন গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এদিকে পড়ে নাই; সেজন্য সেই সমস্ত 'ঘটনা' রক্ষা বা ব্যাখ্যা করা এই মতবাদ দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তার ফলেই ফলিত জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক মহলে এই মতবাদের আর কোন আলোচনা হয় নাই। এ ছাড়া আর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে, প্লেটো ও আরিস্টটলের মত বিরাট প্রতিভাশালী দার্শনিকদের বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বিরূপ মনোভাব। পরবর্তী যুগে আরিস্টটলের কথা 'বাণী' হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রভু বলেছেন' এর বাইরে কোন কথা সে যুগে কেউ শুনতেও রাজী ছিল না। আরিস্টটলের জনমত গঠনকারী কয়েকটি শব্দই বিজ্ঞান-জগতকে দুই হাজার বৎসর পিছিয়ে দেয়।

গ্রীক বিজ্ঞানের অধোগতি

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেই গ্রীক বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছিল। এর পরেই তার অধোগতি আরম্ভ হয়। প্লেটো এবং আরিস্টটলের সময় থেকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে হেয় ও অসম্মানজনক বলে জ্ঞান করা হতে থাকে।

আরিস্টারকাস ও কোপারনিকাসের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুই হাজার বৎসর; কিন্তু এই দুইজনের মতবাদের মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটি স্তর। বিজ্ঞান-পথের সেতুতে এই দুই বৈজ্ঞানিক দুইটি সুদৃঢ় স্তম্ভ; এঁদের যোগ-সূত্রের জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র একখণ্ড কাঠের। আর এই একখণ্ড কাঠের জন্য দুই হাজার বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এর কারণ কি? অনেকে হয়তো বলতে পারেন, এতদিন পরে এ কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনই বা কি? এখন ত জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠিক পথেই চলেছে, অতএব এই পুরানো পচা প্রশ্ন কি বর্তমানে অবাস্তব নয়? কিন্তু এ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। যে সমস্ত বিমান কোন কারণে দুর্ঘটনায় প'ড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাদের ধ্বংসের ও দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, সেই বিমান বা নিহত ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনবার জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতে এরূপ কারণে যেন আর কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তারই জন্য। আমরা মনে করছি, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিজ্ঞান ঠিক পথেই চলছে। প্লেটো এবং আরিস্টটলের যুগের লোকেরাও ঠিক তাই মনে করতো। কিন্তু তাদের ধারণা যে কত মারাত্মক ছিল, তিন হাজার বৎসর পরে আমরা সেটা বুঝতে পারি। অতএব এই অধোগতির কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বইকি। গ্রীক বিজ্ঞানের ভাস্বর-যুগ ও অন্ধকার যুগের সীমা নির্ধারণ করে দুইটি বিরাট প্রতিভা—প্লেটো এবং আরিস্টটল। নীচের দুইটি উদ্ধৃতি থেকে এই দুই যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিশেষভাবে বোঝা যাবে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে হিপোক্রেটিক সম্প্রদায়ের জনৈক লেখক মৃগীরোগ সম্বন্ধে লিখেছেন, "এই রোগকে সবাই দৈবরোগ বলে থাকে। কিন্তু আমি মনে করি, অন্যান্য রোগের থেকে এ রোগের এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, যার জন্য একে দৈবরোগ বলা যেতে পারে। অন্যান্য রোগের যেমন কোন না কোন কারণ আছে, এ রোগেরও নিশ্চয়ই কোন স্বাভাবিক কারণ আছে। এই কারণ জানা যায় নাই বলেই একে দৈবরোগ বলা যেতে পারে না। এইভাবে যারই কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না বা যা বুঝতে

প্যাবা যায না, তাকেই যদি দৈব বলা হয়, তা হলে এমন দৈবব্যাধি বা দৈর্বঘটনাব আব শেষ থাকবে না।" দ্বিতীয় উদ্ধৃতি হচ্ছে প্লেটোব 'রিপাবলিক' থেকে। জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বলতে যেযে তিনি বলেছেন, "তারাসমূহ দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, সেগুলো দৃশ্য-জগতের অংশ ছাড়া কিছুই নয়। এই দৃশ্য-জগৎ, প্রকৃত ভাব-জগতের (world of ideas) অস্পষ্ট ও বিকৃত ছাযা বা অনুকরণ মাত্র। অতএব এই সমস্ত অসাব বস্তুব গতিবিধি নির্ণয়েব চেষ্টা কববাব কোন সার্থকতা নাই। যদি আমরা প্রকৃত জ্যোতিবিদ্যা জানতে চাই, তা হলে আকাশেব জ্যোতিক মণ্ডলীকে বাদ দিযে জ্যামিতির মত জ্যোতির্বিদ্যাব বিশুদ্ধ প্রশ্নের (abstract problem) সমাধানের জন্য আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত।" এই হলো অন্ধকার যুগেব সূচনা। বিশুদ্ধ ভাব (abstract idea) নিযেই এঁদের কাববাব। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্লেটোব দর্শনই ছিল চরম ও পবম আদর্শ। এর পরে আবিস্টটলকে প্রতিষ্ঠিত কবা হয় সমাজ-জীবনেব ভিত্তিতে। প্রায় দুইশত বৎসব পর্যন্ত তিনিই ছিলেন একমাত্র দার্শনিক (the Philosopher)।

এই দুই দার্শনিকেব প্রভাব পাশ্চাত্য চিন্তাধাবাকে একদিকে যেমন উদ্বুদ্ধ কবেছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি অন্ধ কবে বেখেছে। জ্যোতির্বিদ্যার যুগ যখন গ্রীক-জগতে উজ্জলভাবে দেখা দিচ্ছিল, তখনই এই দুই দার্শনিকেব অস্বাভাবিক প্রভাব তাকে দুই হাজার বৎসব পিছিযে দেয়। এঁদেব এই প্রভাবেব প্রকৃত কাবণ নির্ণযেব চেষ্টা চলছে অনেকদিন থেকে। কোন একটি মাত্র বিশেষ কারণে যে এমন ব্যাপাব ঘটে নাই, সে সম্বন্ধে সবাই একমত। ইতিহাসের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে এমন কতকগুলি ঘটনাব একত্র সমাবেশ হযেছিল যাব সম্মিলিত কাবণেই এইরূপ দুর্ঘটনা সম্ভব হযেছিল। এর কযেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ প্লেটো এবং আবিস্টটলের লেখা সম্পূর্ণভাবে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এব আগেব কোন দার্শনিকের লেখাই

এভাবে সংরক্ষিত হয় নাই। আমরা পূর্বেই দেখেছি, পীথাগোরাসের নিজের কোন লেখা পাওয়া যায় নাই। হেরাক্লাইড্‌স্‌ এবং আরিস্টার্ক-কাসের লেখার উল্লেখ পাওয়া গেছে পরবর্তী লেখকদের লেখাতে। এ সমস্তই যে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি, এমন সম্ভাবনাও খুব কম। হয়তো বা দুই, তিন বা তারো অধিক লোকের লেখায়, কথায় বা গল্পে এ সমস্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু প্লেটো ও আরিস্টটলের দর্শন, সমাজের সমস্ত স্তরের সমস্যা এবং পূর্ববর্তী দার্শনিকদের দর্শনের বিশ্লেষণ সমেত সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে রক্ষিত হয়েছে। কোয়েসলার এখানে একটি সুন্দর তুলনামূলক ছবি তুলে ধরেছেন। যদি আণবিক যুদ্ধে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, কিন্তু একখানা 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, তা হলে সেই একখানা বই-ই হবে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীকে গড়ে তুলবার একমাত্র সম্বল। এই একখানা বইকে ভিত্তি করেই পরবর্তী যুগের জ্ঞানসাধনা চলতে থাকবে। ঠিক একইভাবে প্লেটো এবং আরিস্টটল তাঁদের পূর্ববর্তী জ্ঞান ও দর্শনের সঙ্কলন করেছেন তাঁদের বইতে। এ ছাড়া এঁরা উভয়েই নিজে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত প্রতিভাবান দার্শনিক ছিলেন এবং সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে এঁদের অবদান অত্যন্ত ব্যাপক। এঁরা উভয়েই পৃথক পৃথক সম্প্রদায় (school) স্থাপন করেন। প্লেটোর একাডেমী এবং আরিস্টটলের লাইসিয়াম (Lyceum), তাঁদের মৃত্যুর পরেও কয়েকশত বৎসর অধিষ্ঠিত ছিল।

প্লেটো এবং আরিস্টটলকে দুইটি জ্যোতিষ্ক বলা চলে। একে অন্যকে নিপ্রভ করে নাই, বরং একে অন্যের উজ্জলতা বৃদ্ধির সাহায্য করেছে। প্লেটো ছিলেন মরমবাদী, আর আরিস্টটল ছিলেন যুক্তিবাদী। প্লেটো যেখানে দৃশ্য জগত বলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন, আরিস্টটল সেখানে মনোযোগ সহকারে তিমিও শূশুক পর্যবেক্ষণ করেছেন।

এই দুর্ঘটনার অন্য কারণ, গ্রীসের তদানীন্তন অবস্থা। শত বৎসর ধরে যুদ্ধ আর গৃহযুদ্ধ ক'রে গ্রীস তখন নিঃস্ব, সর্বহারা। তখন তার না ছিল লোকবল, না ছিল অর্থবল। অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি তখন

গ্রীসের জনজীবনকে বিষময় ক'রে তুলেছিল। ভ্রূণ-হত্যা, শিশুহত্যা তখন গ্রীসের সাধারণ ব্যাপার ছিল। প্লেটো এবং আরিস্টটলের দর্শন গ্রীসকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। এঁদের রাজনীতি আলোচনা করবার মত যোগ্যতা আমাদের নাই; কিন্তু এ বিষয়ের সামান্য কিছু উল্লেখ না করলে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, জ্যোতির্বিদ্যার অধোগতি, সম্বন্ধে বিশেষ বোঝা যাবে না। রিপাবলিকে প্লেটো বলেছেন, "সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায় 'মহান মিথ্যা' দ্বারা দেশ শাসন করবেন। তাঁরা জনসাধারণকে এই বলবেন যে, খোদা তিন শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করেছেন। প্রথম শ্রেণীর লোক সোনার তৈরী, এঁরা দেশ শাসন করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক রূপার তৈরী, এরা যুদ্ধ করে। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক নিকৃষ্ট ধাতুর তৈরী, এরা সাধারণ লোক। আর একটি পবিত্র মিথ্যা দিয়ে জাতিকে উন্নত করা যায়। এটি হলো বিবাহ-পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়া। শ্রেণীমত লোক জন্মানোর জন্য প্রজননবিদ্যা অনুসারে শাসকগণ কতকগুলি দল ঠিক করে দেবে। নিজ নিজ দল থেকে সবাই যৌনসাথী বেছে নেবে। কড়া সেন্সর-প্রথা প্রয়োগ ক'রে যুবকদের হোমারের বই পড়া নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হবে; কেননা এ বই পড়লে দেবতাদের প্রতি অসম্মান, অহেতুক আমোদ-আহ্লাদ ও মৃত্যুভয় শিক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত বই পড়লে যুবকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে মরতে ভয় পাবে।"

আরিস্টটলের রাজনীতি একই ধারার হলেও কিছুটা নরমপন্থী। তিনি যদিও প্লেটোর চরমপন্থার প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু দাসত্বকে তিনি সমাজ-শৃঙ্খলার একটি স্বাভাবিক ভিত্তি বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে দাসের কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নাই এবং যুক্তি প্রয়োগ করবার মত কোন ক্ষমতাও নাই। তিনি কারিগর ও ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ ভাল চোখে দেখতেন না। তিনি বলেন, এরা শাসক সম্প্রদায়ের মত চালচলন ক'রে তাদের অসম্মান করে। সেজন্য তাঁর আদর্শ-রাষ্ট্রে (model state) এই সমস্ত লোকের কোন নাগরিক অধিকার থাকবে না। পীথাগোরীয়ানদের

সময়ে সাগোসে সামান্য খাদ খননকারীকেও যথেষ্ট সম্মান দেবা হতো; অথচ আরিস্টটল স্থপতি, ইঞ্জিনিয়াব, কারিগর, শিল্পী ইত্যাদি দক্ষ লোক-দিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীতে এই সমস্ত লোকেব কোন দরকাব নাই। কেননা, তাঁর মতে ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা অনেক পূর্বেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। জীবনকে আরো সুন্দব এবং আবো স্বচ্ছন্দ ক'বে তুলবাব জন্য আব নূতন কিছু আবিষ্কার কববার প্রযোজন নাই। ফলিত বিষয়েব প্রয়োজন যখন শেষ হয়েছে, তখন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা কবাই সর্বাপেক্ষা প্রযোজন।

প্লেটো এবং আরিস্টটলের সময় 'পরিবর্তন' ও 'প্রগতি' এই দুইটি শব্দের ভিন্ন অর্থ ছিল। জগৎ স্থায়ী ও স্থিতিশীল। এখানে পরিবর্তন অর্থ অধঃপতন এবং প্রগতির অর্থ অধোগতি। প্লেটোব সৃষ্টিতত্ত্বে জীব ক্রমেই হীন হ'তে হীনতব যোনীতে জন্মগ্রহণ কবে। এই সৃষ্টির ইতি-হাসের সর্বপ্রথমে খোদা; তিনি সমস্ত সদগুণের অধিকারী। এর পবে প্রকৃত জগৎ; এ জগতের আকাব সর্বাঙ্গসুন্দর (perfect) এবং এ জগৎ সর্বাঙ্গসুন্দবভাবে পরিপূর্ণ। এর পরে দৃশ্য-জগৎ; এ জগৎ প্রকৃত জগতেব ছায়া ও অনুকরণ মাত্র। মানুষের বেলাতেও তিনি বলেছেন, মানুষেব মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয পুরুষেব। এই সমস্ত পুরুষের কোন যৌনকামনা ছিল না। এরা শৌর্যেবীর্যে বীবপুরুষ এবং সুবিচারক। কিন্তু যে সমস্ত পুরুষ সে ভাবে থাকতে পারে না, কাপুরুষ হযে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, এবং অবিচার করে, দেবতাগণ তাদের উপর রুষ্ট হযে পবজন্মে তাদেব নারীরূপে সৃষ্টি করে। এই সময়ে মানুষের যৌনকামনারও সৃষ্টি হয। মেযে মানুষেব ভিতবে যারা নীচ কাজ করে, পবজন্মে তাদেব পশু হ'যে জন্মগ্রহণ করতে হয; এরা দুই পাযে চলতে পারে না, চার পাযে চলতে হয। এখানে দেখা যায়, উন্নতি বা প্রগতির কোন কথাই নাই, কেবল অবনতি আর অধোগতি। আর এই দর্শনের ফলে অবনতি আর অধোগতিই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। তার অবশ্যম্ভাবী ফলই অন্ধকার যুগ।

নবম পরিচ্ছেদ

অন্ধকার যুগের সূচনা : প্লেটো এবং আরিস্টটল

প্লেটো

প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করবার স্থান এটা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য জ্যোতির্বিদ্যার উত্থান-পতন পর্যবেক্ষণ করা এবং তারই পরি-প্রেক্ষিতে প্লেটো এবং আরিস্টটলের বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা।

মুসলিম জগতে প্লেটো আফলাতুন নামে পরিচিত। এঁর পুরা নাম আরিস্টক্‌ল্‌স্‌, প্লেটো। পিতার নাম আরিস্টটল এবং মাতার নাম পেরিকটিওন। খ্রীস্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে এথেন্সে প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যদিও দার্শনিক হন, কিন্তু শিক্ষা-জীবনে তিনি মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরেরও চর্চা করতেন। জানা যায় যে, ব্যায়াম-বীর হিসাবে তিনি এত সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, তাঁকে ইসথমিয়ান এবং পাইথিয়ান ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ছোট-বেলায় তিনি অনেক কবিতাও লিখেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি মনে করতেন, কবিতা অত্যন্ত বাজে জিনিস এবং এ বিষয়ে চর্চা করা সময়ের অপব্যবহার মাত্র। তিনি যে সমস্ত কবিতা আগে লিখেছিলেন, পরে তিনি সেগুলি নষ্ট করে ফেলেন। তিনি বেশ অল্পবয়সেই দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন বলে মনে হয়। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি সক্রেটিসের সংস্পর্শে আসেন এবং এর আগে তিনি ক্রাটাইলাস নামে একজন দার্শনিকের কাছে অধ্যয়ন করেন। এমনও অনেকে মনে

করেন যে, পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের শেষভাগে তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন। গ্রীসে ৩০ সদস্যের সরকার গঠনে তাঁর সমর্থন ছিল। তিনি বেশ সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন, আর এ সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশ কোনদিনই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত না। প্রথমে প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে, গণতন্ত্রে জ্ঞান ও সুবিচার সম্ভব নয়; সাময়িক উত্তেজনার বশেই গণতন্ত্রে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। কিন্তু এই ৩০ সদস্য বিশিষ্ট সরকার যখন পরে স্বৈরাচারী সরকারে পরিণত হয়, তখন এ থেকে তিনি তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেন। খ্রীস্টপূর্ব ৪০৯ অব্দে তিনি সক্রেটিসের সংস্পর্শে আসেন এবং সক্রেটিসের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে প্লেটো এথেন্স ছেড়ে মেগারাতে যান এবং সেখানে ইউক্লিডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এর পরে মিশর এবং ইটালীর বিভিন্ন জায়গাতে তিনি ভ্রমণ করেন এবং খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৬ অব্দে তিনি আবার এথেন্সে ফিরে আসেন। এথেন্স থেকে প্রায় এক মাইল দূরে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ একাডেমী স্থাপন করেন। বহু সংখ্যক ছাত্র এখানে তাঁর অধীনে শিক্ষালাভ করে। শেষ পর্যন্ত তিনি এখানেই বসবাস করেন। মাঝখানে তিনবার তিনি সিসিলীতে যান। শেষ বয়সে দেশে-বিদেশে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন। খ্রীস্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

একমাত্র Laws নামের বইখানা ছাড়া প্লেটোর আর সমস্ত বই-ই কথোপকথন (*Dialogue*) আকারে লিখিত। নানা জনে প্রশ্ন করছেন, আর প্রধানতঃ সক্রেটিস সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, এইভাবেই তাঁর বইগুলো লেখা। প্লেটোর নিজের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে পরিচিত, সেজন্যই তাঁর সমস্ত বই সর্বত্র সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বই-এর পাণ্ডুলিপিগুলি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত একাডেমীতে রাখা হয়। পরবর্তী যুগে ডেমেট্রিয়াস ফ্যালারিয়াস প্লেটোর সমস্ত বইয়ের একখানা করে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে রেখে দেন।

শ্লাইয়েরমাখের প্লেটোর বইগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রাথমিক গঠন। তিনি নিম্নলিখিত বইগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করেছেন: *Phaedrus, Lysis, Protagoras, Laches, Charmides, Euthyphro* এবং *Parmenides*; এর সঙ্গে পরিশিষ্টে *Apology, Crito, Ion, Hippias Minor, Hipparcus, Minos, Alcibiades II* বইগুলি সংযোগ করেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রগতিশীল কথোপকথন। এতে আছে, *Gorgias, Theaetetus, Meno, Euthedemus, Cratylus, Sophist, Statesman, Synopsium, Pheado* এবং *Philebus*; এই শ্রেণীর পরিশিষ্টে আছে *Theages, Erastae, Alcibiades I, Menexenus, Hippias Major* এবং *Clitophon.* তৃতীয় শ্রেণী গঠনমূলক কথোপকথন। মাত্র তিনখানা বইকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। বই তিনখানা হলো: *Republic, Timaeus* এবং *Critias.* এর পরিশিষ্টে আছে *Laws* এবং *Epistles.*

প্লেটোর কোন লেখাতেই এমন কোন আভাস পাওয়া যায় না যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল। তাঁর মতে, ভাবই একমাত্র সত্য; ভাবের অস্তিত্ব শুদ্ধ অস্তিত্ব। এই ভাবকে জানাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। আমরা দৃশ্য প্রাকৃতিক জগত সাকারভাবে দেখতে পাই। এ জগত প্রকৃত ভাব জগতের ছায়া মাত্র। এই ছায়ার অনুসরণ করলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তাঁর মতবাদ অত্যন্ত কঠিন এবং এর ব্যাখ্যা নিয়ে নানা প্রকার মতভেদ আছে, এবং অনেক বাদানুবাদও হয়েছে।

অনেকে মনে করেন, *Phaedrus* তাঁর প্রথম দিকের রচনা। এই বই-এর কথোপকথনে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই। এই বইয়ের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, বিশ্ব গোলকাকার। এর উপরের অংশ শাশ্বত ভাবধারায় পূর্ণ; এখানে পবিত্র আত্মাসমূহ ঘুরে বেড়ায়। এর নীচের অংশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য-জগত। আধুনিক যুগেও প্লেটোর

অনেক ভক্ত আছেন যাঁরা প্লেটোকে সর্বজ্ঞানের আধার বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে জার্মানীর ফন ও. এফ. গ্রুপ্পে অন্যতম।

Phaedrus-এর এক জায়গায় আছে, "স্বর্গরাজ জিউস, সব কিছু গুছিয়ে এবং সমস্ত বিষয়ের যত্ন নিয়ে নিজের পাখা-বিশিষ্ট রথে সর্বাগ্রে যাত্রা করলেন। দেবতা ও প্রেতাত্মাগণ এগারো ভাগে বিভক্ত হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। একমাত্র হেস্টিয়াই স্বর্গরাজ্যে রয়ে গেলেন। অন্য সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের অধীনে বারোজন শাসক নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করলেন।" এখানে 'বারো' কথাটি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বোঝা যায় না। হোমারীয় এবং অরফিক স্তোত্রের অনেক জায়গাতেই পৃথিবীকে হেস্টিয়া বলা হয়েছে। অতএব প্লেটোও হেস্টিয়া অর্থে পৃথিবীকেই বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, পৃথিবী স্থির, আর সবাই গতিশীল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই *Dhaedo*-তে সক্রেটিসের শেষ মুহূর্তের মর্মস্পর্শী কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানেও বিশ্ব সম্বন্ধে কোন সাধারণ তত্ত্ব পরিবেশন করা হয় নাই। শুধু বলা হয়েছে, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। পৃথিবীকে স্থির করে রাখবার জন্য বাতাস বা অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নাই, কেননা, কেন্দ্র থেকে কোন বিশেষ দিকে পড়বার প্রবণতার কোন কারণই থাকতে পারে না। পৃথিবীর আকার বারো টুকরা চামড়া দিয়ে তৈরী বলের মত। এর আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ।

বিশ্বগোলকের গতিশীলতার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে *Republic*-এর দশম খণ্ডে। Perfect মানুষ, এবং Perfect রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করবার পর একজন Perfect লোক তার জীবদ্দশায় কি পুরস্কার লাভ করে, প্লেটো তার বিবরণ দিয়েছেন। মৃত্যুর পরে এমন লোকের কি অবস্থা হয়, তার একটি চিত্রও তিনি এঁকেছেন। এরুস নামে একজন যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় বলে মনে করা হয়; কিন্তু বারোদিন পরে তাকে চিতাতে উঠানোর সময় সে জীবিত হয়ে ওঠে। এই অন্তর্বর্তী বারোদিনে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার আত্মা

কোথায় কি কি দেখেছে, চিতাতে বসেই সে তার বর্ণনা দেয়। প্রথমেই বিচার-স্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সৎ লোকের আত্মা কিভাবে স্বর্গে যায় আর অসৎ লোকের আত্মা নিজ নিজ কুকার্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুযায়ী কিভাবে দীর্ঘদিন বা অল্পদিন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে তার বিশদ বিবরণও এতে দেওয়া আছে। তার পরে তিনি বলেছেন, "অষ্টম দিনে সবাইকে যাত্রা করতে হয় এবং চারদিন পরে সবাই একটা বিশেষ জায়গায় এসে উপস্থিত হয়। এই জায়গায় আকাশ ও পৃথিবী-ব্যাপী একটা আলোর স্তম্ভ দেখা যায়। এই স্তম্ভটি দেখতে অনেকটা রামধনুর মত, কিন্তু তার চেয়ে স্পষ্ট ও সুন্দর। এই আলোক-স্তম্ভের নিকটে পৌঁছিতে আরও একদিন দরকার হয়। এই স্বর্গীয় আলোক-স্তম্ভের মাঝখানে একটি বেষ্টনী আছে। এই আলোর বেষ্টনী জাহাজের কাছির মত সমস্ত বিশ্বকে একত্র সংযুক্ত করে রাখে।"

অনেকে বলেন, এখানে আলোক-স্তম্ভ বলতে প্লেটো ছায়াপথের কথা বলেছেন। এই ছায়াপথের বাইরে থেকে একে হয়তো বৃত্তের মত দেখা যায় এবং সেজন্য একে স্তম্ভ বা নলের মত মনে করা হয়েছে। এই আলোক-বেষ্টনী আকাশ ও পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত; এর অর্থে হয়তো বলা হয়েছে যে, এই ছায়াপথ আকাশে পৃথিবীর উপরে ও নীচে বিস্তৃত। একসের বর্ণনার ভিতরে আরো বলা হয়েছে যে, ঐ স্বর্গীয় আলোক-স্তম্ভের মাঝখানে যে বেষ্টনী বা বন্ধনী আছে, সেটি ঐ স্তম্ভের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষুবন ও অয়ন বৃত্তকে এই বন্ধনী বলা হয়েছে এবং প্রান্তদেশ অর্থে এদের মেরু বোঝানো হয়েছে।

একসের বর্ণনা এখানেই শেষ হয় নাই। এর পরে তিনি বলেছেন, "প্রান্তদেশ থেকে প্রয়োজনের (necessity) ঘূর্ণন-দণ্ডকে বর্ধিত করা হয়েছে; এজন্যই সমস্ত পরিভ্রমণ হয়ে থাকে। এই ঘূর্ণন-দণ্ড এবং এর দুই প্রান্ত অত্যন্ত কঠিন পদার্থে গঠিত। আমরা এখান থেকে যেভাবে দেখি, এই আবর্তের (whorl) আকৃতিও প্রায় সেইরূপ। একটি বাক্সের ভিতরে যেমন অন্য একটি বাক্স থাকে, এই আবর্তকেও

ঠিক সেইভাবে কল্পনা করা যায়। একটি আবর্তের গর্তের ভিতরে আর একটি আবর্ত আছে। তার ভিতরে তৃতীয় আর একটি, এবং তৃতীয়টি গর্তের ভিতরে চতুর্থ আরো একটি আবর্ত আছে। এর পরে আরো চারটি আবর্ত আছে। একটি বৃত্তের ভিতরে অন্য বৃত্তের মত এইভাবে মোট আটটি আবর্ত আছে। এদের ঠোঁট (lips) উপরের দিকে এবং এরা সবাই মিলে ঘূর্ণন-দণ্ডের চারদিকে একটি সংযুক্ত আবর্তের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণন-দণ্ডটি আটটি আবর্তের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেছে। বাইরের প্রথম আবর্তটির (স্থির তারার গোলক) ঠোঁটের দিকের পরিধি সর্বাপেক্ষা অধিক। ষষ্ঠ আবর্তটির (শুক্রগোলক) পরিধি দ্বিতীয়, চতুর্থ আবর্তটির (মঙ্গল-গোলক) পরিধি তৃতীয় ; এর পরের পরিধি যথাক্রমে অষ্টম আবর্তের (চন্দ্রগোলক), সপ্তম আবর্তের (সূর্যগোলক), পঞ্চম আবর্তের (বুধ-গোলক), তৃতীয় আবর্তের (বৃহস্পতি-গোলক) এবং সর্বক্ষুদ্র পরিধি বিশিষ্ট ঠোঁট দ্বিতীয় আবর্তের (শনি-গোলক)।"

এখানে স্থির তারার গোলক এবং সাতটি গ্রহের গোলককে আবর্ত বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের 'ঠোঁট' বলতে কি বুঝানো হয়েছে, ঠিক বোঝা যায় না। চাঁদ, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগণের কোনটিই ঠিক একই পথে পরিভ্রমণ করে না। এদের প্রত্যেকের পরিভ্রমণ-পথ কিছুটা চওড়া। অনেকে মনে করেন, পরিভ্রমণ-পথের এই বিস্তৃতিকেই ঠোঁট বলা হয়েছে। স্থির তারা আকাশের সমস্ত অংশেই দেখা যায় ; এজন্য এদের পরিভ্রমণ-পথ সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। শুক্রগ্রহের বিষুবলম্বের চরম মান অন্যান্য গ্রহের বিষুবলম্বের চরম মান অপেক্ষা অধিক। এইভাবে ব্যাখ্যা করলে বাইরের সর্বপ্রথম আবর্তটির ঠোঁট, অর্থাৎ তারার বিষুবলম্বের চরম মান সর্বাপেক্ষা অধিক। তার পরে ষষ্ঠ আবর্তের ঠোঁট অর্থাৎ শুক্রগ্রহের বিষুবলম্বের চরম মান দ্বিতীয়। কিন্তু এর পরে মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি গ্রহের বেলায় ঠিক এই অর্থ প্রয়োগ করা যায় না।

এরুস এর পরে আরো বলেছেন, "সর্ববৃহৎ বৃত্তটি নানা বর্ণের। সপ্তমটির (সূর্যের) বৃত্ত সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। এই উজ্জ্বল সপ্তম বৃত্ত থেকে

অষ্টম (চন্দ্রের) বৃত্তের বর্ণ গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় ও পঞ্চম (শনি ও বুধ) বৃত্তের বর্ণ একই প্রকার, কিন্তু অন্যান্য বৃত্ত অপেক্ষা হলুদ। তৃতীয়টির (বৃহস্পতির) বর্ণ সর্বাপেক্ষা সাদা, চতুর্থটির (মঙ্গলের) বর্ণ লাল; ষষ্ঠটির (শুক্রের) বর্ণ সাদা, তবে তৃতীয়টির পরে। ঘূর্ণন-দণ্ডটি তার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত কিছু নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরছে। এই সমস্ত যখন ঘোরে, তখন ভিতরের সাতটি আবর্ত আস্তে আস্তে বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে। এর মধ্যে অষ্টম আবর্ত (চন্দ্রের) সর্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে ঘোরে; তার পরে সপ্তম (সূর্য), ষষ্ঠ (শুক্র), পঞ্চম (বুধ), প্রায় একই গতিতে ঘোরে। চতুর্থ আবর্তের (মঙ্গল) গতি দ্রুততায় তৃতীয়, তৃতীয় আবর্তের (বৃহস্পতি) গতি চতুর্থ, দ্বিতীয় আবর্তের (শনি) গতি পঞ্চম। ঘূর্ণন-দণ্ডটি 'প্রয়োজনে'র হাঁটুর (knees of necessity) উপরে ঘোরে। প্রত্যেক আবর্তের একজন করে অপ্সরী (siren) এক একটি সুরের সৃষ্টি করে। এইভাবে আটজন অপ্সরীর আটটি সুর একটি সমতানের (harmony) সৃষ্টি করে। 'প্রয়োজনে'র তিন কন্যা, তিন ভাগ্যদেবী: Lachesis, Klotho এবং Atropos; এরা সাদা পোশাক এবং মাথায় মুকুট পরে সমান দূরে দূরে তিনটি সিংহাসনে বসে অপ্সরীদের সুরে গান করে। Lachesis-এর গান অতীতের, Klotho-র গান বর্তমানের এবং Atropos-এর গান ভবিষ্যতের। মাঝে মাঝে Klotho তার ডান হাত দিয়ে ঘূর্ণন-দণ্ডটিকে ধরে বাইরের বৃত্তটিকে ঘুরিয়ে দেয়। একইভাবে Atropos বাম হাত দিয়ে মাঝে মাঝে ভিতরের বৃত্তগুলোকে ঘুরিয়ে দেয় এবং Lachesis দুই হাত দিয়েই একবার বাইরের বৃত্তগুলিকে আবার ভিতরের বৃত্তগুলিকে ঘুরিয়ে দেয়।"

অপ্সরীদের সুরে ভাগ্যদেবীদের গান গাওয়া, আর সমান দূরে দূরে তাদের সিংহাসনে বসবার মধ্যে পীথাগোরীয়ানদের সঙ্গীত এবং সংখ্যার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই গল্পের ভিতরে চাঁদ, সূর্য ও গ্রহগণের পরিভ্রমণের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। বর্তমানের ভাগ্যদেবী Klotho বাইরের বৃত্তটিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। তার ফলে আকাশ

পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে; আর সেজন্যই আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ককে পুবদিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখা যায়। ভবিষ্যতের ভাগ্যদেবী Atropos গ্রহগণের বৃত্তগুলিকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেয়; এজন্য গ্রহসমূহকে পশ্চিম দিক থেকে পুবদিকে যেতে দেখা যায়। অতীতের ভাগ্যদেবী Lachesis উভয় গতিকে সাহায্য করে, এজন্য গ্রহগণ দৈনিক ও বার্ষিক উভয় প্রকার গতিই লাভ করে।

উপরের তিনটি কথোপকথনের ভিতরে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে প্লেটো বিশ্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। *Republic* লিখবার পরে তিনি *Timoeus* নামে আর একখানা বই লেখেন। এটিও কথোপকথন আকারে লেখা। এই বইখানাতে তিনি প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছেন। সক্রেটিসের সঙ্গে টিমিয়াস নামে একজন পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের লোকের কথোপকথনরূপে এ বইখানা লিখিত। এখানে টিমিয়াসই প্রধান বক্তা। তিনি প্রথমে সৃষ্টিকর্তা কিভাবে জগত সৃষ্টি করেন, সে বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। তার পরে এই জগতকে কিভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর আকার (perfect shape) অর্থাৎ গোলকাকার দেওয়া হয়, সে বিষয়ে বলেছেন। এই গোলকাকার জগতকে সৃষ্টিকর্তা একটিমাত্র গতি দান করেন; সে গতিও সর্বাঙ্গসুন্দর, নিজ অক্ষের উপর আবর্তন। এতে কোন বিশেষ দিকে অগ্রগতির সম্ভাবনা নাই। এর পরে সৃষ্টিকর্তা জগতের আত্মাকে মাঝখানে স্থাপন করেন। কিন্তু আত্মা জগতের ভিতরে-বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বয়সে এবং সদগুণে আত্মা জগতের চেয়ে অনেক বড়। জগতের আত্মা সৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে বিশ্ব সম্বন্ধে পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায়ের এবং প্লেটোর নিজের মতবাদের একটি সহজ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। এই আত্মার সৃষ্টিতে তিনটি উপাদানের কল্পনা করা হয়েছে। প্রথম উপাদান অবিভাজ্য ও অভিন্ন; দ্বিতীয় উপাদান বিভাজ্য ও বিভিন্ন; তৃতীয় উপাদান প্রথম দুই উপাদানের মাঝামাঝি। এই তিনটি একত্র মিশিয়ে একটি পদার্থ গঠন করা হয় এবং এই পদার্থকে

জগতের বিভিন্ন অংশে স্থাপন করা হয়। সৃষ্টিকর্তা এই সমস্ত কিছুকে লম্বালম্বি দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে একটি X অক্ষরের মত তৈরী করেন। এর পরে এই অক্ষরটিকে বাঁকিয়ে দুইটি বৃত্তের মত গঠন করা হয়। এইভাবে সৃষ্ট দুইটি বৃত্তের একটি বহিস্থ এবং অন্যটি অন্তস্থ। বহিস্থ বৃত্তের গতির নাম দেওয়া হয় 'অভিন্ন (sameness)' এবং অন্তস্থ বৃত্তের গতির নাম দেওয়া হয় 'বিভিন্ন (diverse)'। অভিন্ন বৃত্তটিকে একটি সামান্তরিকের বাহুর উপর দিয়ে ডান দিকে ঘুরানো হয় এবং বিভিন্ন বৃত্তটিকে ঐ সামান্তরিকের কর্ণের উপর দিয়ে বাম দিকে ঘুরানো হয়। অভিন্ন বৃত্তটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়; একে আর বিভক্ত করা হয়-না। বিভিন্ন বৃত্তটিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। এইভাবে মোট সাতটি অসমান বৃত্ত গঠিত হয়। এই বৃত্তগুলিকে দ্বিগুণ ও তিনগুণ ব্যবধানে স্থাপন করা হয়। তিনটি বৃত্তের প্রত্যেকটিকে অন্যটি থেকে দ্বিগুণ দূরে এবং অপর তিনটি বৃত্তের প্রত্যেকটিকে অন্যটি থেকে তিনগুণ দূরে স্থাপন করা হয়। তিনটি বৃত্তকে একই গতিতে ঘুরতে আদেশ দেওয়া হয় এবং অন্য চারটিকে এদের থেকে ভিন্ন এবং পরস্পর বিভিন্ন গতিতে ঘুরতে বলা হয়। প্রত্যেকের গতি ভিন্ন হলেও, এদের ভিতরে অনুপাত একই থাকে। এইভাবে সৃষ্টিকর্তা নিজ ইচ্ছানুযায়ী জগতের আত্মার গঠন সম্পূর্ণ করেন। তিনি অবয়ব সৃষ্টি করেন এবং এদের কেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের সংযোগ সাধন করেন। তিনি অবয়বকে দৃশ্য করেন এবং আত্মাকে অদৃশ্য করেন।"

উপরে যে সমস্ত বৃত্তের কথা বলা হয়েছে, তার ভিতরে অভিন্ন বা বহিস্থ বৃত্ত বলতে বিষুববৃত্তকে (equator) বোঝানো হয়েছে; আর অন্তস্থ বা বিভিন্ন বৃত্ত থেকে যে সাতটি বৃত্তের সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সাতটি: চাঁদ, সূর্য ও পাঁচটি গ্রহের পরিভ্রমণ-পথ। এই গ্রহগুলির ভিতরে দূরত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এদের দূরত্ব আনুপাতিক প্রগমন অনুসারে গঠিত। তিনটির ভিতরে সাধারণ অনুপাত ২ এবং অন্য তিনটির ভিতরে সাধারণ অনুপাত ৩। চাঁদের দূরত্বকে ১ মনে করলে, অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব নিম্নলিখিতরূপ হয়:

চাঁদ	১
সূর্য	২
শুক্র	৩
বুধ	৪
মঙ্গল	৮
বৃহস্পতি	৯
শনি	২৭

উপরের কথোপকথনের ব্যাখ্যাতে আরিস্টটল বলেছেন, "একটি সরলরেখাকে বাঁকিয়ে প্রথমে বৃত্তে পরিণত করা হলো। এই বৃত্তকে ভাগ ক'রে দুইটি যুক্তবৃত্তের সৃষ্টি করা হলো। এর একটি বৃত্তকে তিনি সাতটি এমন বৃত্তে বিভক্ত করলেন যে, আত্মার গতিই আকাশের গতিতে পরিণত হলো। অভিন্ন বৃত্তের গতিই আত্মার প্রধান গতি। এই কথোপকথনের প্রারম্ভে, এই গতিকেই জগতের আদি গতি বলা হয়েছে। জগত নিজের চারদিকে এই গতিতেই সমবেগে ঘোরে। এতে আর কোন গতি নাই। অতএব অভিন্ন বৃত্তটিই বিষুববৃত্ত। আকাশের সমস্ত পদার্থ এই বৃত্তের সমান্তরাল পথে ঘোরে। বিভিন্ন বৃত্ত এই বৃত্তকে দুইটি বিপরীত বিন্দুতে ছেদ করে। এদের সমতল একটি সূক্ষ্মকোণে ছেদ করে, ফলে X অক্ষরের মত আকৃতি গঠিত হয়। অভিন্ন বৃত্ত ডান দিকে অর্থাৎ পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘোরে। বিভিন্ন বৃত্ত তার বিপরীত দিকে ঘোরে। ডানদিকের গতিকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিন্ন বৃত্তের এই দৈনিক গতিতে সাতটি গ্রহও ঘুরতে বাধ্য হয় আর সঙ্গে সঙ্গে তা'রা নিজেদের বৃত্তপথে পশ্চিম দিক থেকে পুবদিকে যায়। এই সমস্ত গতি পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে সংঘটিত হয়।"

আরিস্টটল

গ্রীক উপনিবেশ স্টাগিরাতে খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে আরিস্টটলের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষগণ চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আরিস্টটলের

পিতা নিকোমেকাস মাসিডিনিয়ার অধিপতি আমিটাসের বন্ধু ও চিকিৎসক ছিলেন। আরিস্টটল নিজে পেশা হিসাবে চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণ না করলেও, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি চিকিৎসাবিদ্যাও শিক্ষা করেন। তিনি যখন প্রথম এথেন্সে যান, তখন কিছুদিন চিকিৎসকরূপে কাজ করেছিলেন বলেও শোনা যায়। পরবর্তী জীবনে তিনি যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার প্রতি উৎসাহিত হন, তার মূলেও তাঁর চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান নিহিত ছিল।

১৮ বৎসর বয়সে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর নিকট অধ্যয়নের জন্য এথেন্সে যান। কিন্তু ঐ সময় প্লেটো এথেন্সে ছিলেন না; সাইরাকিউসের রাজা ডাইওজেনিসের পরামর্শদাতা হিসাবে এবং দুই ডাইওজেনিসের ভিতরে মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্য তিনি তখন সাইরাকিউসে গিয়েছিলেন। তিন বৎসর পরে প্লেটো এথেন্সে ফিরে আসেন। তখন আরিস্টটল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট পড়াশোনা আরম্ভ করেন। এইভাবে দীর্ঘ ২০ বৎসর তিনি প্লেটোর সঙ্গে ছিলেন। অতি অল্পদিনেই গুরু প্লেটো, শিষ্য আরিস্টটলের প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং তাঁকে 'একাডেমীর প্রতিভা' বলে অভিহিত করেন। খ্রীস্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে প্লেটো মারা যান এবং তার কিছুদিন পূর্বে তিনি আরিস্টটলকে বাদ দিয়ে নিজের ভাগনে স্পিউসিপ্‌পাসকে একাডেমীর পরিচালক নিযুক্ত করেন। গুরুর এই পক্ষপাতিত্বে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে আরিস্টটল এথেন্স ত্যাগ করেন। আটারনিয়াসের শাসক হারমিয়াস আরিস্টটলকে নিজ রাজ্যে আমন্ত্রণ করেন। আরিস্টটল তাঁর শিষ্য জেনোক্রোটসকে সঙ্গে নিয়ে আটারনিয়াসের রাজদরবারে উপস্থিত হন। তিন বৎসর পরে হারমিয়াস গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হলে, আটারনিয়াস ছেড়ে আরিস্টটল মিটিলিনে চলে যান। এই সময় তিনি হারমিয়াসের ভ্রাতুষ্পুত্রী পাইথিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং পরে তাঁকে বিয়ে করেন। এঁদের দুইটি মেয়ে হয়। এর পরে তাঁর এক উপপত্নী হারফাইনিসের গর্ভে নিকোমাস নামে তাঁর এক ছেলে হয়। এই ছেলের নাম থেকেই

আরিস্টটলের এক নীতি-দর্শনের নামকরণ করা হয় Nichomachean Ethics.

খ্রীস্টপূর্ব ৩৪২ অব্দে ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ্‌স্‌ আরিস্টটলকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ ক'রে নিজ পুত্র আলেকজাণ্ডারের শিক্ষার ভার দেন আরিস্টটলের হাতে। আলেকজাণ্ডারের বয়স তখন ১৪ বৎসর। আরিস্টটল তিন বৎসর আলেকজাণ্ডারকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেন। পরে যদিও তিনি তাঁর জন্মভূমি স্টাগিরাতে কিছুদিন বাস করেন, কিন্তু আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ না করা পর্যন্ত তিনি ম্যাসিডোনিয়া ত্যাগ করেন নাই। খ্রীস্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে তিনি পুনরায় এথেন্সে ফিরে যান এবং তখন থেকেই তাঁর জীবনের মহিমময় যুগ আরম্ভ হয়। তিনি লাইসিয়ামে একটি জিমনাসিয়াম স্থাপন করেন ; নামে জিমনাসিয়াম হলেও এখানে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। ক্লাসে পড়ানোর সময় আরিস্টটল হেঁটে হেঁটে বক্তৃতা দিতেন। এইভাবে তিনি ১২ বৎসর ঐ জিমনাসিয়াম পরিচালনা করেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হলে এথেন্সে তাঁর বিরুদ্ধবাদীগণ প্রতাপশালী হয়ে ওঠে। অত্যাচারী হারমিয়াসকে দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন বলে, আরিস্টটলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এই অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে এবং সক্রেটিসের পরিণাম স্মরণ ক'রে তিনি এথেন্স পরিত্যাগ ক'রে ইউবিয়াতে চলে যান এবং খ্রীস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে সেখানেই মারা যান।

পরবর্তী দুই হাজার বৎসরে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারার সমস্ত স্তরে আরিস্টটলের রচনাবলী যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, অন্য কোন দার্শনিকের ভাগ্যে তার সামান্য অংশও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আরিস্টটলের সুসংবদ্ধ কোন লেখা পাওয়া যায় না ; তাঁর সমস্ত লেখাই বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। অনেক জায়গাতেই দেখা যায়, তাঁর লেখার মাঝখানে হঠাৎ বিরতি ঘটেছে, যুক্তির ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা যায়, নানা প্রকার অবাস্তব কথাও ঢুকে পড়েছে। অনেক জায়গাতে সঙ্গতির অভাবও দেখা যায়।

আরিস্টটলের রচনাবলী কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) তর্ক-শাস্ত্র (Logic), (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যা (Natural Science or Physics), (৩) প্রাথমিক দর্শন (First Philosophy or Metaphysics), (৪) নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি (Ethics and Economics), (৫) সাহিত্য (Literature)।

তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর রচনাবলী অর্গানন নাম দিয়ে একত্র সম্পাদনা করা হয়েছে। এর মধ্যে *Categoriae, De Interpretatione, Analytica Priora, Analytica Posteriora, Topica* এবং *Sophistica Elenchi* নামে গ্রন্থগুলি স্থান পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর রচনাবলীকে দুই ভাগে সম্পাদনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ৪ খানা বই আছে: (১) *Physica Auscultatio*, (২) *De Coelo* (জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ), (৩) *De Generatione et Corruptione* এবং (৪) *Metereologica.* দ্বিতীয় ভাগের গ্রন্থসমূহে প্রধানতঃ প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাগে পাঁচখানা বই আছে: (১) *Historica Animalium*, (২) *De Partibus Animalium*, (৩) *De Generatione Animalium*, (৪) *De Anima* এবং (৫) *Para Naturalic* (৮ খণ্ড)। প্রথম দর্শন (first philosphy) সম্বন্ধে তাঁর একখানা বই আছে, নাম *Metaphysics* ; অর্থাৎ Physics-এর পরে। প্রথম সংস্করণে তাঁর Physics এর বই-এর শেষে এই বইখানা সংযোজন করা হয়েছিল বলেই এর নামকরণ করা হয়েছিল Metaphysics এ বইতে আল্লাহকে 'জগতের প্রধান চালক (prime mover of the world)' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বইয়ের মধ্যে তিনখানা নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয়; এগুলির নাম: (১) *Ethica Nicomaches*, (২) *Ethica Eudemia*, (৩) *Magna Moralia*, রাজনীতি সম্বন্ধে *Dolitica* এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে *Oeconomica* এই দুইখানা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সাহিত্যে তাঁর

দুইখানা বইয়ের নাম জানা যায়ঃ (১) *De Poetica* এবং (২) *Ars Rhetorica.*

সমস্ত জগতকে আরিস্টটল বুঝতে চেষ্টা করেন। সেজন্য জগতের প্রতিটি পদার্থের প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর দর্শনকে সর্বদর্শী বলা যেতে পারে। জ্ঞানের প্রতিটি স্তরে তাঁর অবদান আছে আর এই-জন্যই পরবর্তী যুগে তাঁর প্রভাব অত্যন্ত প্রবল।

'*De Coelo* বা আকাশ পরিচয়' নামক গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এই বইখানা চারখণ্ডে বিভক্ত। এ ছাড়া Metereologica বা আবহবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থের চার খণ্ডেও তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তিনি ইউডকসাস ও ক্যালিপপাসের গ্রহপদ্ধতি স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি সব সময় আধ্যাত্মিক যুক্তির অবতারণা করেছেন।

De Coelo বইখানার চার খণ্ডেই কেবলমাত্র জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করা হয় নাই; বরং দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বলা যেতে পারে। প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। বিশ্ব সসীম না অসীম, একে কেউ সৃষ্টি করেছে না এ স্বয়ম্ভূ, এর কোন আদি আছে কি নাই, ইত্যাদি বিষয় প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বের সীমা আছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে আরিস্টটল বলেছেন, বিশ্ব অসীম হতে পারে না। তার কারণ, বিশ্ব অসীম হলে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে অসীম দূরে অবস্থিত বস্তুকে একটি সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে, সেই রেখাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে (২৪ ঘণ্টায়) সম্পূর্ণভাবে আবর্তিত হতে পারে না। স্থান হলো বস্তুর ধারক। অসীম দূরে যদি কোন বস্তু না থাকে, তা হলে অসীম দূরে কোন স্থানও থাকতে পারে না। বিশ্বের সৃষ্টি নাই এবং ধ্বংসও নাই; কেননা যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই ধ্বংস। সৃষ্টি হলে ধ্বংস হতেই হবে। আর যে জিনিস ধ্বংস হয়, তার সৃষ্টিও হয়। এখানে প্লেটোর মতবাদ উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে প্লেটো বলেছেন, এক সময় বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এর ধ্বংস নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্বের আকৃতি, তারাসমূহের গতি ও প্রকৃতি এবং বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবীর অবস্থা ও আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই নাই। এ দুই খণ্ডে সৃষ্টি ও ধ্বংস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্ব সম্বন্ধে আরিস্টটলের মতবাদে একমাত্র আধ্যাত্মিক যুক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। বিশ্ব গোলকাকার। কেননা সমতলীয় চিত্রের ভিতরে বৃত্ত যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর, বস্তুর ভিতরে গোলাকাকার বস্তুও তেমনি সর্বাঙ্গসুন্দর। বৃত্ত ও গোলক সর্বাঙ্গসুন্দর, কেননা একটিমাত্র রেখা দ্বারা বৃত্ত পরিবেষ্টিত এবং যেভাবে ঘুরানো যাক না কেন, বৃত্তের রূপ একই থাকে। গোলকও তেমনি একটিমাত্র তল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং যেভাবেই ঘুরানো যাক না কেন, গোলকের রূপও একই থাকে এবং একই স্থান অধিকার করে। এই গোলকাকার বিশ্বে সেই গোলকই সর্বাঙ্গসুন্দর, যার সর্বাঙ্গসুন্দর গতি আছে। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিই সর্বাঙ্গসুন্দর। সর্ববহিস্থ গোলকের গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুত, অতএব এইটিই সবার চেয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর। এই গোলকে, যে সমস্ত বস্তু বা পদার্থ অবস্থান করে তাদের বিন্যাসের কোন পরিবর্তন নাই। গতির আদি ও স্বর্গীয় কারণ প্রত্যক্ষভাবে এই গোলকটির আবর্তন ঘটায়। এই গোলকের পরিধি থেকে, এই আদি ও স্বর্গীয় কারণ, সমস্ত গোলকের আবর্তন পরিচালনা করেন। আকাশের গতি ডান দিকে, অর্থাৎ পূবদিক থেকে পশ্চিম দিকে পরিচালিত হয়। কেননা ডান দিকের গতিই সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক। এই গতি সমবেগ-সম্পন্ন, কেননা আকাশের এক অংশ অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। আকাশের বিভিন্ন অংশের গতি বিভিন্ন হলে তারামণ্ডলসমূহের আকৃতি সর্বদা একই থাকতো না। আকাশ-গোলকের কোন ত্বরণ বা মন্দন নাই; ইহা অস্বাভাবিক। কারণ এই ত্বরণ বা মন্দনকে স্বীকার করতে হলে, এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, গতির আদি ও স্বর্গীয় কারণ কোন সময় বেশী সবল হন এবং কোন সময়ে বেশী দুর্বল হন; অর্থাৎ তিনি উত্তেজনা ও ক্লান্তির বশীভূত। তারার গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে আরিস্টটল

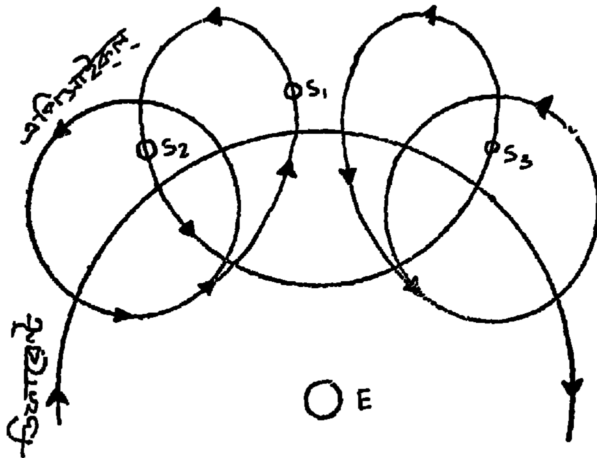
বলেছেন, যে তারা যে গোলকে অবস্থিত ও গতিশীল, সে তারা সেই গোলকের পদার্থে গঠিত। তার মধ্যে চারটি আদিম উপাদানের গতি সরল রৈখিক (আগুনের গতি উপরের দিকে এবং মাটির গতি নীচের দিকে); অতএব বৃত্তীয় গতি কোন শ্রেষ্ঠতর উপাদানের হওয়াই স্বাভাবিক। গোলক এবং তারাসমূহ আগুনে গঠিত নয়, এই শ্রেষ্ঠতর উপাদানে গঠিত। আরিস্টটল বলেন, তারাসমূহ উজ্জ্বল দেখার কারণ এই নয় যে, এরা আগুনে গঠিত; বরং ইথারের ভিতরে আবর্তন কালে যে ঘর্ষণ হয়, তার ফলেই এই উজ্জ্বলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি একথাও বলেন যে, এই ঘর্ষণের ফলে সেই শ্রেষ্ঠতর উপাদানে গঠিত তারা বা তারার গোলকে আগুন লাগে না; ইথারে আগুন লেগে পার্শ্ববর্তী ইথারই প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে আর সেই আলোই আমরা দেখতে পাই।

আরিস্টটল এর পরে তারার এবং তারা-গোলকের গতি সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। গোলকের সঙ্গে তারা সংযুক্ত, না গোলক থেকে বিযুক্ত, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, তারা যদি গোলকের সাথে সংযুক্ত না হয়, তা হলে গোলকের গতি ও তারার গতি একই হওয়া উচিত। তারার গতি এবং গোলকের গতি একই হবে, এইরূপ কল্পনাকে তিনি যুক্তিবিরুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেন, তারাসমূহ গোলকে কঠিনভাবে সংযুক্ত এবং একমাত্র গোলকেরই গতি আছে। তারার আকৃতি গোলকাকার। গোলকাকার বস্তুর দুই প্রকার গতি হতে পারে: নিজ অক্ষের উপর আবর্তন এবং কক্ষপথে পরিভ্রমণ। অতএব তারাসমূহের নিজস্ব কোন গতি যদি থাকে, তা হলে এই দুই প্রকার গতির যে কোন এক প্রকার গতি হবে। কিন্তু দেখা যায়, এর কোন-প্রকার গতিই তারার নাই। যদি তাদের অক্ষের উপর আবর্তন-গতি থাকতো, তা হলে তারাসমূহ একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকতো। কিন্তু সবাই জানে, তা'রা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, স্থান পরিবর্তন করে। যদি তারাসমূহের অন্য প্রকার গতি থাকতো, তা হলে তাদের প্রত্যেকের একই গতি থাকাই যুক্তিসঙ্গত হত। কিন্তু একমাত্র

সূর্যেব উদয ও অস্তের সময এই প্রকার গতি দেখা যায়। কিন্তু এই গতিও নিজস্ব নয। আমাদের দৃষ্টিব দুবত্বেব জন্যই এরূপ মনে হয। দুর্বলতার জন্য অনেক দূরেব জিনিসকে কাঁপতে দেখা যায়; দৃষ্টিব দুর্বলতা ও দূরত্বের জন্যই এরূপ হয। এই কাবণেই তারাব আলো অস্থিব এবং গ্রহের আলো স্থির। গ্রহসমূহ অনেক নিকটে; সেজন্য পূর্ণশক্তি নিয়েই তাদের উপর দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু স্থিব তারাসমূহ অনেক দূরে বলে দৃষ্টি তাদের উপরে পড়লেই কাঁপতে থাকে। তারাদের যে অক্ষের উপর আবর্তন-গতি সেটি স্পষ্ট বোঝা যায, কেননা যার আবর্তন-গতি আছে, তারই পবিভ্রমণ-গতিও আছে। কিন্তু চাঁদেব কেবলমাত্র দৃশ্য পিঠটাই আমরা দেখতে পাই। এই কথাতে আরিস্টটল বলতে চেয়েছেন যে, চাঁদের আবর্তন বা পরিভ্রমণ-গতি কিছুই নাই। যেহেতু এদেব কোন গতি নাই, অতএব এরা গোলকাকাব। আবিস্টটল প্রথমে এদের আকাব থেকে সিদ্ধান্ত কবলেন যে, তারাসমূহেব কোন গতি নাই; আবাব পবে বলেছেন যে, গতি নাই বলেই এবা গোলকাকাব। চাঁদ গোলকাকার বলেই তাব কলা দেখা যায, পীথাগোরাসের এই মতবাদ তিনি সমর্থন কবতেন। তাঁরা উভয়েই বলেন যে, কোন গোলকাকার বস্তুব এক অর্ধ মাত্র সূর্যের আলোকে আলোকিত হয এবং পৃথিবী থেকেই চাঁদের অর্ধেক মাত্র দেখা যায়। এই দুই অর্ধেব সাধাবণ অংশই চাঁদের কলা। সূর্য ও চাঁদেব কেন্দ্র যোগকাবী সরলরেখার উপরে চাঁদেব কেন্দ্র দিযে অঙ্কিত লম্ব সমতল, এবং পৃথিবী ও চাঁদের কেন্দ্র সংযোগকারী সরলরেখাব উপবে চাঁদের কেন্দ্র দিয়ে অঙ্কিত অন্য একটি সমতলেব ছেদিত অংশই চাঁদের কলারূপে দেখা যায়।

পীথাগোবাসেব গোলক-সঙ্গীত মত আবিস্টটল সমর্থন করতেন না। অনবরত এই সঙ্গীত চলছে, সেজন্য আমবা এর শব্দ শুনতে পাই না, এ কথাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, এই সমস্ত খ-বস্তু যদি কোন শব্দেব সৃষ্টি করে, তা হলে সে শব্দ খুব বিকট হওয়াই স্বাভাবিক এবং সে শব্দ যতই অনবরত চলুক না কেন, সাধারণ মানুষের কাছে

তা অশ্রাব্য হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। গ্রহসমূহ যে-কোন স্থির মাধ্যমে পরিভ্রমণ করে না এবং সেগুলি যে গোলকে স্থির-ভাবে সংবদ্ধ, এই তার আর একটি প্রমাণ।



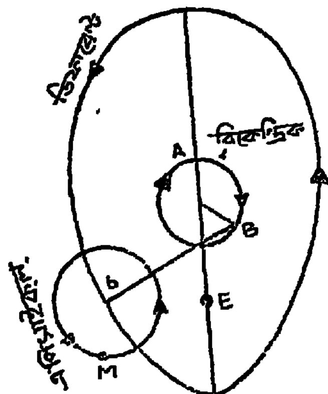
রেখাচিত্র ১৫ঃ এপিসাইকেলে গ্রহগতি

গ্রহসমূহ তাদের নিজ নিজ গোলকে সংযুক্ত। তারাসমূহও বহিস্থ গোলকে সংযুক্ত। প্রত্যেক গোলকের নিজস্ব গতি আছে। কিন্তু কেবল-মাত্র একটি গোলকে গ্রহের বিচিত্র গতি সম্ভব নয়। এজন্য আরিস্টটলের পূর্বে ইউডক্সাস ও ক্যালিপ্পাস গোলকের ভিতরে গোলকের কল্পনা করেন। আরিস্টটলও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কোনভাবে যদি এই সমস্ত গোলক একত্র সংযুক্ত থাকে, তা হলে বাইরের গোলকের গতি ভিতরের গোলকেও সঞ্চারিত হবে। কিন্তু এতে সমস্ত গতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিভাবে বাইরের গোলকের গতি ভিতরের গোলকে সঞ্চারিত হতে না পারে, তারই সন্ধান তিনি করেন। প্রত্যেক গ্রহের শেষ ও সবচেয়ে ভিতরের গোলকের পরে এবং তার পরবর্তী গ্রহের সবচেয়ে বাইরের গোলকের আগে তিনি অনেকগুলি

অতিরিক্ত গোলকের কল্পনা করেন। তিনি আরো বলেন যে, এই গোলক-গুলির কোন পরিভ্রমণ-গতি নাই। যেমন, শনিগ্রহের চারটি গোলক; এই চারটি গোলককে I, II, III এবং IV নামে অভিহিত করা যাক। এদের I গোলকটি সর্ববহিস্থ, অর্থাৎ এটি স্থির তারার গোলকের পরে প্রথম অন্তর্বর্তী গোলক। শনিগ্রহ নিজ IV গোলকটিতে সংযুক্ত। IV গোলকের অভ্যন্তরে আরিস্টটল IVa নামে আর একটি গোলক কল্পনা করেন। এই IVa গোলকটি IV গোলকের মেরুকে আবর্তন করে। এই আবর্তনের বেগ IV গোলকের আবর্তন-বেগের সমান, কিন্তু বিপরীত। এতে IV এবং IVa-এর আবর্তন-গতি পরস্পরকে বিনষ্ট করে দেয় বলে মনে হয়, এবং গ্রহটিকে III গোলকের সাথে সংযুক্ত বলে মনে হয়। এইভাবে IVa গোলকের অভ্যন্তরে তিনি IIIa নামে আর একটি গোলকের কল্পনা করেন। এই IIIa-এর আবর্তন-গতি III-র আবর্তন-গতির সমান ও বিপরীত। এতে উভয়ের গতি বিনষ্ট হয়ে গ্রহটিকে II গোলকে সংযুক্ত বলে মনে হয়। এইভাবে IIIa-এর অভ্যন্তরে IIa নামে আর একটি গোলকের কল্পনা করেন এবং গ্রহটিকে I গোলকে সংযুক্ত বলে দেখাতে চেষ্টা করেন। এইভাবে প্রত্যেকটি গ্রহের জন্ম তিনি অতিরিক্ত কয়েকটি ক'রে গোলকের কল্পনা করেন। শনি ও বৃহস্পতি উভয়ের জন্ম অতিরিক্ত তিনটি করে, এবং মঙ্গল বুধ, শুক্র, ও সূর্যের, প্রত্যেকটির জন্ম অতিরিক্ত চারটি ক'রে গোলকের কল্পনা করতে হয়েছিল। চাঁদ সবার নীচে; অতএব এর গতি অন্য কোন গ্রহের গতিকে প্রভাবান্বিত করে না। সেজন্য চাঁদের বেলায় কোন অতিরিক্ত গোলকের প্রয়োজন হয় নাই। এইভাবে ক্যালিপ্‌পাসের মোট ৩৩টি গোলকের সাথে আরিস্টটল আরো ২২টি অতিরিক্ত গোলকের কল্পনা করেন। অর্থাৎ কয়েকটি গ্রহের গতিবিধির ব্যাখ্যার জন্ম মোট ৫৫টি গোলকের প্রয়োজন হয়।

আরিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী গোলকাকার। এর বেশ সুন্দর প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানবিদ ও দার্শনিকদের

মতবাদ নানাভাবে বিবেচনা ক'রে, পৃথিবী গোলকাকার ছাড়া অন্য সমস্ত মতবাদ তিনি ভুল বলে সাব্যস্ত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত প্রমাণ



রেখাচিত্র ১৬ : মঙ্গলের ডিম্বাকৃতি কক্ষ

দিয়েছেন, তার দু'একটি এখানে উল্লেখ করা গেল। পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে চাঁদ প্রবেশ করলেই যে চন্দ্রগ্রহণ হয়, এ তথ্য অনেক বিজ্ঞানবিদ ও দার্শনিকই স্বীকার করেছেন। চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের উপর পতিত পৃথিবীর ছায়া সব সময়ই গোলাকার দেখায়। গ্রহণের আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত সব সময়ই এই ছায়া গোলাকার থাকে। আরিস্টটল বলেন, একমাত্র গোলকাকার বস্তুরই ছায়া সব সময় গোল হতে পারে; অন্য কোন আকারের ছায়া সমস্ত অবস্থায় গোল হয় না। অতএব পৃথিবী গোলকাকার। আরিস্টটল এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে প্রমাণ দিয়েছেন, সেটি আরো সুন্দর। এথেন্স থেকে উত্তরে গেলে, উত্তর আকাশের তারাগুলি ক্রমেই উপরের দিকে দেখা যায় এবং উত্তরে আরো নূতন নূতন তারা দেখা যায়। আবার এথেন্স থেকে দক্ষিণে গেলে, উত্তর আকাশের অনেক তারা দেখা যায় না এবং অন্যান্য তারা ক্রমেই নীচের দিকে দেখা যায়। আবার দক্ষিণ আকাশের তারাগুলিকে ক্রমেই উপরের দিকে দেখা যায় এবং দক্ষিণ আকাশে অনেক নূতন তারাও দেখা যায়।

আরিস্টটল বলেন, এইরূপ দেখা যাওয়ার একমাত্র কারণ, পৃথিবীর গোলকাকার আকৃতি। এই গোলকাকার আকৃতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দিগ্বলয় বিভিন্ন এবং বিভিন্ন দিগ্বলয়ের উপরে বিভিন্ন তারা দেখা যায়। এই দুইটি সুন্দর প্রমাণ ছাড়া তিনি আর যে সমস্ত প্রমাণ দিয়েছেন, সেগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। যেমন তিনি অন্য একটি প্রমাণে বলেছেন যে, যে সমস্ত লোক এথেন্সের পূর্বদিকের দেশসমূহে (বোধ হয় ভারতবর্ষে) ব্যবসা করতে যায়, তারা হাতী দেখেছে বলে জানায়, আবার যে সমস্ত লোক এথেন্সের পশ্চিম দিকের দেশসমূহে (বোধ হয় মরোক্কোতে) ব্যবসা করতে যায়, তারাও হাতী দেখেছে বলে জানায়। অতএব পূর্ব ও পশ্চিম দিকের এই সমস্ত দেশের ভিতরে ব্যবধান খুব বেশী নয়। পৃথিবী গোলকাকার হলেই এরূপ হওয়া সম্ভব। এইরূপ তিনি আরো অনেক প্রমাণ দিয়েছেন, যেগুলিকে যদিও তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে সেগুলির ভিতরে বিশেষ কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশ্য কোনক্রমেই একথা অস্বীকার করা যায় না যে, perfect বা সর্বাঙ্গসুন্দর শব্দটিই এই সমস্ত উদ্ভট প্রমাণের মূল যুক্তি। সেজন্য যত রকম প্রমাণের কল্পনা করা হয়েছে, তাদের ভিতরে এই একটিমাত্র যুক্তি ছাড়া অন্য কোন যুক্তি আছে কিনা, সে বিষয়ে এঁরা কোন চিন্তাও করেন নাই।

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করে, আরিস্টটল এ কথা বিশ্বাস করতেন না। এর বিরুদ্ধে তিনি যে আপত্তি তুলেছিলেন, সে-যুগে সে আপত্তি খণ্ডন করা তো সম্ভব হয়ই নাই, বরং পরবর্তী যুগেও সেআপত্তিকে যুক্তিসঙ্গত এবং অখণ্ডনীয় বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আরিস্টটল বলেন, পৃথিবী যদি সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করতো, তা হলে এই পরিভ্রমণ-পথের বিভিন্ন অবস্থানে পৃথিবী থেকে তারাসমূহকে বিভিন্ন দিকে দেখা যেত। কিন্তু বৎসরের সব সময়েই পৃথিবী থেকে আকাশের প্রত্যেকটি তারাকে একই দিকে দেখা যায়। পরে অবশ্য প্রমাণ

করা হয়েছে যে, পৃথিবীর এই পরিভ্রমণের জন্য নিকটবর্তী কোন কোন তারার অবস্থানে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ তারার দূরত্ব অত্যন্ত বেশী, সে জন্য এই পরিবর্তন বুঝতে পারা যায় না।

চাঁদ, সূর্য ও গ্রহগণের দূরত্ব সম্বন্ধেও আরিস্টটল আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, চাঁদ ও সূর্যের থেকে গ্রহগণের দূরত্ব অনেক বেশী। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন যে, অনেক সময় মঙ্গলগ্রহকে চাঁদের পিছনে ঢাকা পড়তে দেখা যায় ; ব্যাবিলনিয়া ও মিশরের জ্যোতির্বিদগণ অন্যান্য গ্রহও যে এইভাবে চাঁদের পিছনে ঢাকা পড়ে, তার উল্লেখ করেছেন। অতএব চাঁদের চাইতে গ্রহগণের দূরত্ব বেশী, কিন্তু সূর্যের বেলায় এরূপ যুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা সূর্যের তীব্র উজ্জ্বলতার জন্য কোন গ্রহ সূর্যের সামনে যায়, কি পিছনে ঢাকা পড়ে, সে কথা বোঝা যায় না। অতএব আরিস্টটলের এই উক্তির কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি আরো বলেছেন, "তারাসমূহের দূরত্ব সূর্যের দূরত্বের প্রায় নয়গুণ।"

জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে আরিস্টটলের অবদান যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর হয়েছে। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদগণের মতবাদ একত্র সন্নিবেশিত ক'রে এবং সে সমস্ত মতবাদ আলোচনা ক'রে যথেষ্ট উপকারও করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁর মতবাদ এবং নিখুঁত বা perfect এই স্লোগানটি জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি ব্যাহত করেছে। পরবর্তী দুই হাজার বৎসর জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় আরিস্টটলের দর্শনের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, এই দর্শনের সমর্থন না দিতে পারলে কোন মতবাদই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো না।

ইউডক্সাস (খ্রীস্টপূর্ব ৪০৮–৩৫৫)

প্লেটো ও আরিস্টটলের সময়ে গ্রীসে দুইজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। এঁদের একজনের নাম ইউডকসাস এবং অন্যজনের নাম ক্যালিপ্পাস।

এঁরা উভয়েই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্লেটো এবং আরিস্টটল দর্শন-জগতে পরবর্তীকালে দেবতার আসন লাভ করেছিলেন। সে জন্য সে সময়ের অন্য কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের নাম জনসাধারণের নিকটে পৌঁছাতে পারে নাই। কিন্তু সে সময়কার বিভ্রান্ত দর্শন সত্ত্বেও ইউডক্সাস ও ক্যালিপ্‌পাস বিশ্ব-প্রকৃতির একটি সুন্দর ও সূক্ষ্ম কার্যপদ্ধতি নির্ণয় করতে সক্ষম হন। ইউডক্সাসের পদ্ধতিকে ভিত্তি করেই আরিস্টটল তাঁর বিশ্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ৪০৮ অব্দে ইউডক্সাস এশিয়া-মাইনরের ক্নাইডাস নামক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীস্টপূর্ব ৩৫৫ অব্দে মারা যান। তাঁহার বয়স যখন ২৩ বৎসর তখন তিনি এথেন্সে গিয়ে প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পড়াশুনার পর তিনি আরো জ্ঞান অর্জনের জন্য মিশরে যান। গ্রীসের রাজা এজিসিলাসের নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি মিশরের রাজা নেকটানেবিসের সঙ্গে দেখা করেন। মিশরে অবস্থানকালে তিনি হেলিওপোলিসের পুরোহিতের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। অনেকে বলেন, গ্রহের গতিবিধি সম্বন্ধে ইউডক্সাস এই পুরোহিতের নিকট সর্বপ্রথম শিক্ষালাভ করেন। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডাইওজেনিস বলেছেন, মিশরের দেবতা আপিস নাকি এক সময় জিব দিয়ে ইউডক্সাসের কাপড় চেটে দেয়; এতে সেই পুরোহিত ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ইউডক্সাস খুব শীঘ্রই মারা যাবেন বটে, তবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। পরে দেখা যায়, পুরোহিতের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

গ্রীক গণিতবিদগণের মধ্যে ইউডক্সাস নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইউক্লিডের জ্যামিতির পঞ্চম খণ্ডের অধিকাংশই ইউডক্সাসের লেখা। ক্যালকুলাস প্রবর্তনের আগে পরিমিতি বিষয়ক প্রশ্ন নিঃশেষ পদ্ধতির (method of exhaustion) সাহায্যে সমাধান করা হতো। এই নিঃশেষ পদ্ধতির আবিষ্কর্তাও ইউডক্সাস। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে দেখা যায় যে, চারিবর্ষ-চক্রের স্রষ্টাও ইউডক্সাস। তিনিই প্রথম

স্থির করেন যে, পরপর তিন বৎসর ৩৬৫ দিন করে গণনা করবার পর, চতুর্থ বৎসর ৩৬৬ দিনে গণনা করতে হবে। কিন্তু সে সময় তাঁর কথায় বিশেষ কেউ মনোযোগ দেয় নাই। তিনশত বৎসর পরে জুলিয়াস সিজার আবার এই চারিবর্ষ-চক্রের প্রবর্তন করেন এবং সেজন্য বর্তমানে একে জুলিয়াস-পঞ্জিকা বলা হয়।

গ্রহসমূহের অনিয়মিত গতিবিধি তখন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এই খ-বস্তুগুলি কোন সময় পশ্চিম দিক থেকে পুবদিকে যায়; আবার কোন সময় একেবারে থেমে থাকে, যেন কোন স্টেশনে পৌঁছে বিশ্রাম করে; আবার কোন সময় পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে যায়। এই গতি ব্যাখ্যা করবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কোন সন্তোষজনক সমাধান কেউ দিতে পারেন নাই। গণিতে ইউডক্সাসের গভীর জ্ঞান দেখে প্লেটো তাঁকে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার ভার দেন। গুরুর এই দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে অপরিসীম সাধনার ফলে ইউডক্সাস একটি অভিনব বিশ্বতত্ত্ব গঠন করতে সমর্থ হন।

প্লেটোর দর্শন যদি তখনকার জ্ঞানী সমাজের বিবেকবুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে না রাখতো, তা হলে আরিস্টারকাসের সূত্র ধরে ইউডক্সাস হয়তো কেপলারের সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন এবং বিজ্ঞান জগতকে দুই হাজার বৎসরের অন্ধকার কারাগার থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হতেন। প্লেটো বলেছেন, বিশ্ব perfect; সামতলিক ক্ষেত্রের মধ্যে বৃত্ত perfect, এবং কঠিন বস্তুর মধ্যে গোলক perfect. বিশ্ব perfect, অতএব এই perfect বিশ্বের গ্রহ, তারা ইত্যাদি perfect পথে যাতায়াত করবে, এটাই স্বাভাবিক। গোলক এবং বৃত্ত perfect; অতএব গ্রহের গতিপথ গোলক বা বৃত্ত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু একটি বা দুইটি গোলক বা বৃত্তেও যখন এই গতির ব্যাখ্যা করা গেল না, তখন অন্য কোন পথের কল্পনা না ক'রে গোলকের উপর

গোলক, বৃত্তের উপর বৃত্ত চাপিয়ে, তাঁরা গ্রহের গতিপথের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন।

ইউডক্সাস বলেন, প্রত্যেকটি গ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট গোলক আছে। এই গোলক একটি অদৃশ্য অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হয়। এই অক্ষদণ্ডের দুই প্রান্ত গোলকটির দুই মেরু। গোলকের কেন্দ্র থেকে তার অক্ষ-দণ্ডের উপর অঙ্কিত লম্ব সমতল গোলকটিকে যে বৃহৎ বৃত্তে ছেদ করে, তাকে ঐ গোলকের বিষুববৃত্ত বলে। ইউডক্সাস বলেন, প্রত্যেক গ্রহ তার নির্দিষ্ট গোলকের বিষুববৃত্তের কোন একটি স্থানে গোলকটির সাথে সংযুক্ত। গোলকটির আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহটিকেও ঘুরতে দেখা যায়। কিন্তু এই একটি মাত্র গোলকের সাথে সংযুক্ত থাকলে গ্রহের বিপরীত দিকে গতি এবং সাময়িক স্থিতির কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এ ছাড়া আরো দেখা যায় যে, গ্রহটিকে সব সময়ে সেই বিষুববৃত্তের ঠিক উপরেই দেখা যায় না, কোন সময়ে গ্রহটিকে তার উপরে, আবার কোন সময়ে নীচেও দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করতে যেয়ে, ইউডক্সাস মনে করেন যে, যে গোলকের বিষুববৃত্তের সাথে গ্রহটি সংযুক্ত, সেই বৃত্তের মেরু দুইটি স্থির নয়, এদেরও গতি আছে। এরা অন্য একটি বড় গোলকের সাথে সংযুক্ত। এই দ্বিতীয় গোলকটি প্রথম গ্রহ-গোলকের সাথে সমকেন্দ্রিক। এই দ্বিতীয় গোলকটি তার মেরুদণ্ডের উপরে ভিন্ন গতিতে আবর্তিত হয়। কিন্তু এতেও প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নাই। সে জন্য ইউডক্সাস এই দ্বিতীয় গোলকের মেরু দুইটিকে অন্য তৃতীয় একটি সমকেন্দ্রিক গোলকের সাথে সংযুক্ত বলে কল্পনা করেন, এবং এই তৃতীয় গোলকটিও তার মেরুদণ্ডের উপরে একটি সম্পূর্ণ পৃথক গতিতে আবর্তিত হয়। যে সমস্ত গোলকের সাথে কোন গ্রহ সংযুক্ত নয়, সেগুলিকে ইউডক্সাস ανάστροι (anastroi) বা তারা-শূন্য গোলক বলে অভিহিত করেন। চাঁদ ও সূর্যের গতিবিধি ব্যাখ্যার জন্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এইভাবে তিনটি করে সমকেন্দ্রিক গোলকের কল্পনা করা হয়। এই গোলকগুলির মেরুসমূহকে পরবর্তী গোলকে বিভিন্ন অবস্থায় সংযুক্ত ক'রে এবং বিভিন্ন আবর্তন-গতি প্রয়োগ ক'রে

চাঁদ ও সূর্যের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু পাঁচটি গ্রহের অনিয়মিত গতি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে প্রত্যেকটি গ্রহের জন্য চারটি করে গোলক সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এর প্রত্যেকটি গ্রহের গোলকসমূহ অন্য গ্রহের গোলকসমূহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন। স্থির তারাদের গতির জন্য একটিমাত্র গোলকই যথেষ্ট। এইভাবে মোট ২৭টি গোলকের সাহায্যে ইউডক্সাস, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ ও তারার গতির ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু এই সমস্ত আবর্তনের কারণ, গোলকসমূহের উপাদান, এদের পরস্পরের ভিতর দূরত্ব ইত্যাদি কোন বিষয়েই তিনি কিছু বলেন নাই। আর্কিমেডিস বলেছেন, ইউডক্সাস মনে করতেন যে, সূর্য চাঁদের চেয়ে নবগুণ বড়। এই ২৭টি গোলকের গতি কোনভাবে সংযুক্ত করবার চেষ্টা ইউডক্সাস করেন নাই। অবশ্য প্রত্যেকটি গ্রহের গতির জন্য যে কয়েকটি গোলকের প্রয়োজন, তাদের গতি একের সাথে অন্যের সংযোগ আছে; কিন্তু একটি গ্রহের গতির সাথে সংযুক্ত কোন গোলকের, অন্য গ্রহের গতির সাথে সংযুক্ত কোন গোলকের গতির কোন সংযোগ নাই।

এত গোলকের সৃষ্টি ক'রে গ্রহসমূহ সম্বন্ধে ইউডক্সাস যে তথ্য পেয়েছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক তথ্যের কতটা মিল আছে, অনেকেরই হয়তো জানবার আগ্রহ হতে পারে। দেখা যায় যে, একমাত্র মঙ্গলগ্রহ ছাড়া অন্য চারটি গ্রহের যুতিকাল ইউডক্সাসের মতে প্রাপ্ত এবং আধুনিক মতে প্রাপ্ত প্রায় সমান। নীচে এই যুতিকালের তালিকা দেওয়া গেল।

	যুতিকাল	
গ্রহ	আধুনিক মতে	ইউডক্সাসের মতে
বুধ	১১৫ দিন	১১০ দিন
শুক্র	৫৮৩ দিন	১৯ মাস
বৃহস্পতি	৩৯৯ দিন	১৩ মাস
শনি	৩৭৮ দিন	১৩ মাস
মঙ্গল	৭৮০ দিন	৮ মাস ২০ দিন

নাক্ষত্রিক পবিভ্রমণেব ক্ষেত্রে আধুনিক মতে এবং ইউডক্সাস মতে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিব বেলায সামঞ্জস্য আছে ; কিন্তু বুধ ও শুক্রের বেলায যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায।

	পরিভ্রমণ কাল	
গ্রহ	আধুনিক মতে	ইউডক্সাস মতে
বুধ	৮৮ দিন	১ বৎসব
শুক্র	২২৫ দিন	১ বৎসব
মঙ্গল	৬৮৭ দিন	২ বৎসব
বৃহস্পতি	১১·৮৬ বৎসর	১২ বৎসব
শনি	২৯·৪৬ বৎসর	৩০ বৎসব

ইউডক্সাস মতে প্রাপ্ত তথ্য যতই ভুল হোক না কেন, তাঁব সবচেয়ে বড কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম গ্রহগণেব অনিয়মিত গতিব একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা দেওযাব চেষ্টা কবেন। যখন সব কিছুই আধ্যাত্মিকতার কুযাশায আবৃত বাখা হতো, সেই সময এত সুষ্ঠু চিন্তাধাবা এবং গাণিতিক ব্যাখ্যার চেষ্টা একটা অচিন্তনীয ব্যাপাব এবং একে একটা নূতন যুগেব সূচনা বলা চলে।

ইউডক্সাসই সর্বপ্রথম আকাশেব তারামণ্ডলগুলিব বিশদ বিবরণ দেন। তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ কবেন এবং মিশব ও অন্যান্য দেশ থেকে প্রাপ্ত তাবামণ্ডলেব প্রচলিত বিববণ থেকে এগুলি লিপিবদ্ধ করেন। পরে হিপারকাসের তাবাব তালিকাতে এই মণ্ডলগুলিব উল্লেখ আছে।

ক্যালিপ্পাস

ইউডক্সাসেব শিষ্য ক্যালিপ্পাস গুরুর ত্রুটির সংশোধনের চেষ্টা কবেন। ইউডক্সাসেব গোলকসমূহ তত্ত্ব হিসাবে অত্যন্ত চমকপ্রদ ও সুন্দর। কিন্তু কোন তথ্যেব প্রযোজন আছে বলে ইউডক্সাস বিশ্বাস করেন নাই। তিনি নিজে যে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন, এমন

কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী মিশরীয় ও বেবিলনীয় পর্যবেক্ষণ-তথ্য তিনি হয়তো ব্যবহার করেছিলেন। পর্যবেক্ষণ-ত্রুটির জন্য তাঁর হিসাবে যথেষ্ট ভুল দেখা যায়। এই সমস্ত ভুল সংশোধন করবার জন্য ক্যালিপ্‌পাস নানা ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রায় ৩০ বৎসর পর্যবেক্ষণের পর তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। ক্যালিপ্‌পাস তাঁর পর্যবেক্ষণ-তথ্যাদি নিয়ে এথেন্সে আরিস্টটলের নিকট যান। মহাবীর আলেকজাণ্ডার তখন এথেন্সের সিংহাসনে সমাসীন। আরিস্টটল ছিলেন তাঁর গুরু ও পরামর্শদাতা। ইউডক্সাসের গোলক এবং নিজের পর্যবেক্ষণ-তথ্য নিয়ে ক্যালিপ্‌পাস আরিস্টটলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এথেন্স থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদে তিনি সূর্যের জন্য আরো দুইটি অতিরিক্ত গোলক, চন্দ্রের জন্য দুইটি অতিরিক্ত গোলক, এবং মঙ্গল, বুধ ও শুক্র প্রত্যেকের জন্য একটি ক'রে অতিরিক্ত গোলক কল্পনা করেন। এতে মোট গোলকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪। পরে আরিস্টটল এর সঙ্গে আরো ২২টি গোলক যোগ করেন।

দশম পরিচ্ছেদ

দীপ নিভবার আগে

উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিপারকাস

দীপ নিভবার আগে দীপশিখা যেমন দপ্ ক'রে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জ্যোতির্বিদ্যা-জগতের দুই হাজার বৎসরের অন্ধকার-যুগ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তেমনি অত্যন্ত প্রতিভাবান কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়। এর পূর্বে দর্শনশাস্ত্রের শাখা হিসাবেই জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করা হতো। প্লেটো, আরিস্টটল এঁরা মূলতঃ দার্শনিক এবং দর্শনের আলোচনাকালেই তাঁরা বিশ্ব-দর্শন করেন। সেই দর্শনকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ইউডক্সাস নানা প্রকার গোলকের কল্পনা করেন। আরিস্টটল এই গোলকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এঁদের কেহই আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন নাই এবং প্রকৃত ঘটনা অবগত হওয়ার চেষ্টাও কেউ করেন নাই। এ ছাড়া, কনিক্স্, ত্রিকোণোমিতি ইত্যাদি গণিতের শাখাসমূহ সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না, সে জন্য গাণিতিক আলোচনাও তখন সম্ভব হয় নাই। খ্রীস্টীয় যুগের দুইশত বৎসর আগে এপোলোনিয়াস কনিক্স্ আবিষ্কার করেন। এর পরে হিপারকাসের সমতলীয় ও গোলকীয় জ্যামিতি আবিষ্কার বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে।

এরাস্টোথেনিস

আলেকজান্দ্রিয় সম্প্রদায়ের একজন প্রতিভাবান দার্শনিক এরাস্টোথেনিস। ইনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। কবি এবং বৈয়াকরণিক

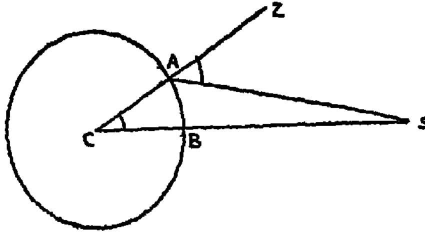
বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। এই বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তির লিখিত কোন গ্রন্থেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। এঁর সম্বন্ধে এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর পরিচালক ছিলেন। সেখানে তিনি বাহুবলয় গোলক (armillary sphere) নামে একটি যন্ত্র স্থাপন করেন এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ পরিমাপের কাজ করতেন। এর একটির সাহায্যে তিনি খ-বিষুববৃত্ত ও সূর্যপথের ছেদবিন্দু ও কোণ নির্ণয় করেন।

তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে, পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়করণ। সেই প্রাচীনকালে, অতি সূক্ষ্মভাবে অথচ সুন্দর ও সহজ প্রণালীতে এই পরিধি নির্ণয় একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এতে তাঁর অপরিসীম পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আরিস্টটল বলেছেন, অনেক পূর্ব থেকেই নাকি জানা ছিল যে, পৃথিবীর পরিধি ৪ লক্ষ স্টেডিয়া, অর্থাৎ ৩৭,৫০০ মাইল। কে কখন এই পরিধি নির্ণয় করেন, আরিস্টটল, তার কোন উল্লেখ করেন নাই। এরাটোস্থেনিসের নির্ণীত পরিধি এর চাইতে অনেক সূক্ষ্ম।

এরাটোস্থেনিস লক্ষ্য করেন যে, গ্রীষ্মায়নের সময় সাইনের (বর্তমান আসোয়ান) কূপের একেবারে তলদেশ পর্যন্ত সূর্যের আলো লম্বভাবে পড়ে। এতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ দিনে সূর্য ঐ স্থানের সুবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। কিন্তু ঐ একই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিন্দু থেকে সূর্যের দূরত্ব থাকে বৃত্তের পরিধির $\frac{1}{50}$ অংশ; অর্থাৎ প্রায় ৭ ডিগ্রী। সাইনকে আলেকজান্দ্রিয়ার ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত মনে করলে এই দুই জায়গার অক্ষাংশের পার্থক্য হয় একটি বৃত্তের পরিধির $\frac{1}{50}$ অংশ। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, সাইন থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্বের ৫০ গুণ দৈর্ঘ্যই পৃথিবীর পরিধি।

মনে করা যাক, পরপৃষ্ঠার চিত্রে S=সূর্য, A=আলেকজান্দ্রিয়া, B=সাইন, C=পৃথিবীর কেন্দ্র এবং Z=আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিন্দু। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সুবিন্দু AZ দিকে দেখা যাবে। এরাটোস্থেনিস

জানতেন যে, পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় সূর্যের দূরত্ব অনেক বেশী, অতএব AS এবং CS-কে সমান্তরাল মনে করা যেতে পারে। সুতরাং $\angle ZAS = \angle ZCS$=৭ ডিগ্রী। এ থেকেই তিনি অনুমান করেন যে ঃ AB চাপ : বৃত্তের পরিধি=৭ : ৩৬০। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সাইনের দূরত্ব ৫০০০ স্টেডিয়া বলে জানা ছিল। এ থেকে পৃথিবীর পরিধি ২৫,০০০০ স্টেডিয়া



রেখাচিত্র ১৭ ঃ এরাস্টোথেনিস পদ্ধতিতে পৃথিবীর আয়তন নির্ণয়

S=সূর্য, A=আলেকজান্দ্রিয়া
B=সাইন, C=পৃথিবীর কেন্দ্র
Z=সুবিন্দু

সহজেই নির্ণয় করা যায়। এই সংখ্যাটিকে পরে ২,৫২,০০০ হাজারে পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতি ডিগ্রী পরিমিত স্থানের দৈর্ঘ্য হয় ৭০০ স্টেডিয়া। পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ এবং সম্পূর্ণ শুদ্ধ। তবে যে সমস্ত উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত স্থূল। তা ছাড়া স্টেডিয়ার প্রকৃত দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা আছে; সে জন্য এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফল কতটা শুদ্ধ, বলা কঠিন। অনেকে মনে করেন, এক স্টেডিয়া ৫২০ ফুটের সমান। এতে পৃথিবীর পরিধি হয় ২৪,৬৬০ মাইল; বর্তমান মতে আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যরেখায় পৃথিবীর পরিধি ২৪,৬৮০ মাইল। অতএব এরাস্টোথেনিসের প্রাপ্ত ফলকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলা যেতে পারে। এত নির্ভুল ফল দেখে অনেকে সন্দেহ করেন, এতে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে।

এর প্রায় এক শতাব্দী পরে রোড্‌স্‌ দ্বীপের অধিবাসী পসিডনিয়াস অন্য একটি উপায়ে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন। তিনি সূর্য পর্যবেক্ষণ না ক'রে দক্ষিণ আকাশের তারা অগস্ত্য (সোহাইল)-কে পর্যবেক্ষণ ক'রে এই পরিধি নির্ণয় করেন। তিনি রোড্‌স্‌ দ্বীপ ও আলেকজান্দ্রিয়া এই দুই জায়গা থেকেই অগস্ত্য তারাটির মধ্যরেখার উন্নতি নির্ণয় করেন; এই উন্নতির পার্থক্যের সাথে ঐ দুই জায়গার দূরত্বের তুলনা করেই তিনি পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন। তাঁর নির্ণীত পরিধি ২৪০,০০০ স্টেডিয়া।

এরাস্টোথেনিস সূর্যপথের তীর্যকতা, অর্থাৎ সূর্যপথ ও বিষুবরেখার ছেদ-কোণও নির্ণয় করেন। তাঁর মতে এই তীর্যকতার পরিমাণ এক সমকোণের $\frac{11}{83}$ অংশ, অর্থাৎ ২৩° ৫১′। প্রকৃত তীর্যকতার পার্থক্য মাত্র কয়েক মিনিট।

হিপারকাস (খ্রীস্টপূর্ব ১৬০-১০২)

প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিপারকাস। সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে হিপারকাসের স্থান সর্বোচ্চ। অবস্থান-জ্যোতির্বিদ্যার সৃষ্টি হয় হিপারকাসের হাতেই। দর্শন ও কল্পনাকে বাদ দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসম্মত জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা করেন হিপারকাস। তিনিই সর্বপ্রথম আকাশের ১০২৫টি তারার একটি অবস্থান-তালিকা নির্ণয় করেন। তিনি নিজে অনেক পর্যবেক্ষণ করেন এবং পূর্বতন যে সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফল তাঁর জানা ছিল, সেগুলি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেন। এ থেকেই তিনি বুঝতে পারেন যে, খ-বস্তুসমূহের অবস্থানের পরিবর্তন হয়। চন্দ্রপথের তীর্যকতা, চন্দ্রের লম্বন ও দূরত্ব, বৎসরের প্রকৃত পরিমাণ, অয়ন-চলন প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়সমূহও তিনি নির্ণয় করেন। জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক এই সমস্ত অবদান ছাড়াও গণিতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সমতলীয় ও গোলকীয় জ্যামিতি আবিষ্কার। গণিতের এই একটিমাত্র শাখা আবিষ্কারে সমস্ত বিজ্ঞান-জগতের একটি যুগের পরিবর্তন হয়।

গ্রীসে বিথিনীবা প্রদেশেব অন্তর্গত নিকিযাতে হিপারকাসের জন্ম হয়। নিকিয়াব অধিবাসী হলেও জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিকিযাব বাইরে, বিশেষ কবে বোড্স্ দ্বীপে অতিবাহিত কবেন। তদানীন্তন গ্রীসে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য এবং সুকুমারশিল্প প্রভৃতি বিষযে এ দ্বীপটি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। খ্রীস্টীয যুগের এক শতাব্দী পূর্বে রোড্স্ দ্বীপ সমস্ত বিষয়েই আলেকজান্দ্রিয়াব প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। যে সমস্ত প্রতিভাবান লোকের জন্য বোড্স্ দ্বীপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িযে পড়ে, তার মধ্যে হিপারকাস সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যেব বিষয, তাঁব সমস্ত বচনাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হযেছে। এমনকি তাঁর আবিষ্কৃত জ্যামিতিব কিছুই এখন আব পাওয়া যায না। এবাস্টোথেনিসের ভূগোলেব তিনি কঠোর সমালোচনা কবেন; সে সম্বন্ধে কোন বই বা কোন রচনা কিছুই পাওবা যায় না। পববর্তী লেখকদের গ্রন্থেই তাঁব এই সমস্ত অবদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ১৪০ অব্দে লিখিত হিপাবকাসেব একখানা মাত্র বইযেব সন্ধান পাওযা যায। এই বইখানা অয়ন-চলন আবিষ্কাবের আগে লেখা। এবও পবে খ্রীস্টপূর্ব ১২৯ অব্দে হিপাবকাসের তারাব তালিকা প্রকাশিত হয। যদিও হিপারকাসেব সমস্ত গ্রন্থই ধ্বংস হযেছে, কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত সমস্ত বিষযই টলেমীব μεγιστη গ্রন্থে স্থান পেযেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে আলেকজান্দ্রিযাব স্বর্ণযুগ পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যাব যে ক্রমবিকাশ হযেছে, তাব সমস্তই টলেমীর এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হযেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয, টলেমী কোথাও হিপাবকাসেব বা অন্য কাবো নাম উল্লেখ কবেন নাই। সে জন্য ঐ গ্রন্থেব কতটা হিপারকাসের এবং কতটা অন্যের বা টলেমীর নিজেব, তা বুঝতে পাবা মুস্কিল। এজন্য অনেকদিন পর্যন্ত হিপাবকাসের অনেক আবিষ্কাবই টলেমীব আবিষ্কাব বলে মনে কবা হতো।

চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহের গতির ব্যাখ্যাব জন্য ইউডক্সাস যে গোলকের উপব গোলক সৃষ্টি করেন, হিপাবকাসের তা বিশেষ মনঃপূত হয নাই। গোলকেব পবিবর্তে তিনি শুধুমাত্র বৃত্ত ব্যবহার কবেন এবং কেবলমাত্র

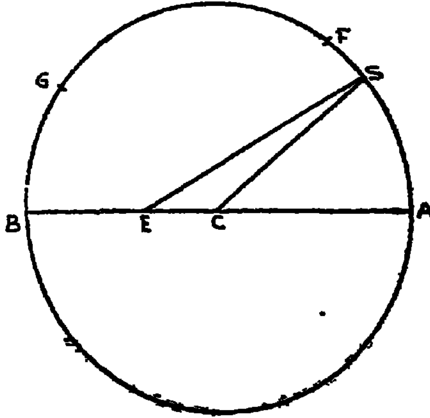
সমগতিসম্পন্ন বৃত্তের সাহায্যেই তিনি সমস্ত খ-বস্তুর গতিবিধির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। এই ব্যাপারে কনিক-সেকশনের আবিষ্কর্তা আপোলো-নিয়াস তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

সূর্য

আমরা জানি, সমস্ত খ-বস্তুর পূবদিক থেকে পশ্চিম দিকে একটি গতি আছে। এই গতি সমস্ত খ বস্তুর সাধারণ গতি। এই সাধারণ গতি ছাড়াও সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকে মৃদু গতি আছে। এই গতির পরিমাণ এদের সবার জন্য সমান নয়। এই গতির ফলেই সূর্য প্রতি বৎসরে একটি বৃত্তপথ পরিভ্রমণ করে। এই পথের নাম সূর্যপথ। এই পথটি বিষুববৃত্তকে একটি নির্দিষ্ট কোণে ছেদ করে। সূর্যপথে সূর্যের পরিভ্রমণ-বেগও সমান নয়। বৎসরের কোন সময়ে সূর্যের এই বেগ বেশী হয় আবার কোন সময়ে কম হয়। জ্যামিতির সাহায্যে হিপারকাস একটিমাত্র বিকেন্দ্রিক বৃত্তের দ্বারাই এই অসম গতির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। বিকেন্দ্রিক বৃত্ত অর্থে যে বৃত্তের কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত নয়, এমন একটি বৃত্তকে বোঝানো হয়।

মনে করা যাক, AFGBA একটি বৃত্ত, C উহার কেন্দ্র। S একটি বিন্দু, ঐ বৃত্তটির পরিধির উপরে সমবেগে গতিশীল। অতএব সমান সময়ে সে বৃত্তটির সমান পরিমাণ চাপ অতিক্রম করে, ফলে ACS কোণটিও সমবেগে বাড়তে থাকে। কিন্তু AB ব্যাসের উপরে E যদি কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন বিন্দু হয়, তা হলে, AES কোণটি সমবেগে বাড়বে না। E যদি পৃথিবী হয়, এবং S যদি সূর্য হয়, তা হলে, E থেকে দেখলে মনে হবে যে, A থেকে S-এর দূরত্ব সমবেগে বাড়ছে না, অর্থাৎ সূর্যের গতি সমবেগসম্পন্ন নয়। S যখন A বিন্দুতে উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব সবচেয়ে বেশী থাকে; এই অবস্থানকে অপভূ (Apogee) বলে। আবার S যখন B বিন্দুতে উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে; এই অবস্থানকে বলে অনুভূ (Perigee)।

এই কম দূরত্বের জন্যই B-এর নিকটবর্তী স্থানে S-কে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চলতে দেখা যায়। সূর্য পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে গতি দ্রুত এবং দূরবর্তী



রেখাচিত্র ১৮ : বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি
E=পৃথিবী, C=বৃত্তের কেন্দ্র
BECA=অপদূরক রেখা
A=অপভূ
B=অনুভূ, CSE কোণ=কেন্দ্রসমীকরণ

হলে গতি হ্রাস হয়; এ তথ্য পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যায়। এ বিষয়টি হিপারকাসের পূর্বেও জানা ছিল। এই অসম গতির ব্যাখ্যা দিতেই ইউডক্সাস সূর্যের গতিকে তিনটি গোলকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেন এবং আরিস্টটল এর সঙ্গে আরো চারটি গোলক যোগ করেন।

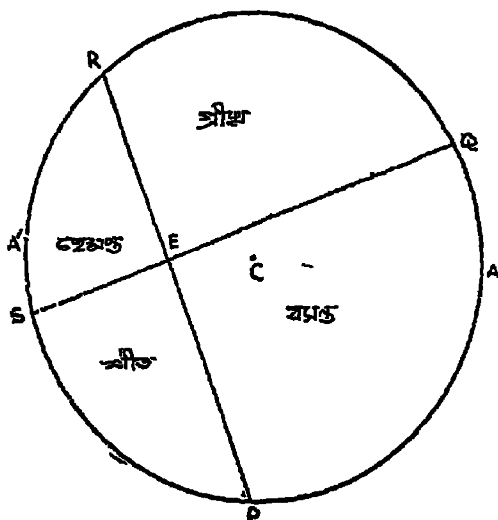
হিপারকাস মাত্র এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থান কি, তা পূর্ব থেকেই নির্ণয় করা। সূর্যের অপদূরক রেখা (line of apses, সূর্যের সর্বদ্রুত ও সর্বধীর অবস্থানের সংযোজক রেখা) এবং উৎকেন্দ্রিতা (eccentricity) জানতে পারলে তবেই সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। এই দুইটি বিষয় থেকে সূর্যের অবস্থান নির্ণয় ক'রে তার প্রকৃত অবস্থানের সাথে

তুলনা করা যেতে পারে। এই দুই অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য সামান্য হলে, সেটা পর্যবেক্ষণ-ত্রুটি বলে মনে করা যেতে পারে এবং হিপার-কাসের বিকেন্দ্রিক মতবাদ সন্তোষজনক বলেও মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ দ্বারা সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। প্রখর উজ্জ্বলতার জন্য সূর্যের দিকে তাকানোই সম্ভব নয়, সেখানে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব। সূর্য এবং তারা একসঙ্গে দেখা যায় না, অতএব সূর্য ঠিক কোন্ জায়গায়, সে কথা সঠিকভাবে বলা কঠিন। ঠিক দুপুরের সময় একটি কাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্যের সাহায্যে দিগ্বলয় থেকে সূর্যের উচ্চতা নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু এই একটিমাত্র অঙ্ক দিয়ে সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। এই অঙ্কটি থেকে সূর্যের বিষুবলম্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু সূর্যের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ঐ সময়ে সূর্যের বিষুবাংশও জানা প্রয়োজন। কিন্তু সেই সময়ে বিষুবাংশ নির্ণয়-পদ্ধতি অত্যন্ত স্থূল ছিল। কোন নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যরেখা দিয়ে সূর্যের এবং কোন একটি স্থির তারার অতিক্রমের সময়ের পার্থক্য থেকে বিষুবাংশ নির্ণয় করা হতো। আধুনিক যুগের ঘড়ির সাহায্যে অতি সূক্ষ্মভাবে এই সময় ও তাদের পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু পুরাকালের বালু-ঘটিকা বা পানি-ঘটিকার সাহায্যে নির্ণীত সময় খুব নির্ভরযোগ্য ছিল না। অন্য একটি পদ্ধতিতে চাঁদকে সূর্য ও তারার মধ্যবর্তী বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এই পদ্ধতিতে রাত্রিতে চাঁদ ও নির্দিষ্ট তারার দূরত্ব নেওয়া হতো এবং দিনে সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব নেওয়া হতো। আর এই দুই দূরত্ব থেকে সূর্য ও তারাটির দূরত্ব নির্ণয় করা হতো। কিন্তু চাঁদ একদিনে প্রায় ১২ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করে। সেজন্য দুই পর্যবেক্ষণের মধ্যবর্তী সময়ের চাঁদের নিজের অবস্থানের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। অতএব এ পদ্ধতিও মোটেই সন্তোষজনক ছিল না।

অপদূরক-রেখা নির্ণয় করতেও হিপারকাস যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুর দৈর্ঘ্যের

সাহায্যে সূর্যেব অপদূরক-বেখা নির্ণয কবা যায়। দুইটি অযন-বিন্দুর সংযোজক-রেখা এবং দুইটি বিষুবন বিন্দুব সংযোজক-রেখা সূর্যপথকে চাবভাগে বিভক্ত কবে। অর্থাৎ বৎসবও চার ভাগে বিভক্ত হয। হিপাবকাস নিজে পর্যবেক্ষণ ক'বে এবং তাঁব পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদগণেব পর্যবেক্ষণ-ফল আলোচনা ক'বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন যে, বসন্তকাল (বসন্তবিষুবন থেকে গ্রীষ্মাযন) ৯৪ দিন এবং গ্রীষ্মকাল (গ্রীষ্মাযন থেকে



রেখাচিত্র ১৯ ঃ সূর্যের অপভূর অবস্থান
E=পৃথিবী, C=বৃত্তেব কেন্দ্র
QES=অযন বিন্দুতে সূর্যেব অবস্থানেব দিক
PER=বিষুবন-বিন্দুতে সূর্যেব অবস্থান-দিক
P=বসন্ত বিষুবন, R=হেমন্ত বিষুবন
Q=গ্রীষ্মায়ন বিন্দু, S=শীতাযন বিন্দু

হেমন্তবিষুবন) ৯২½ দিন দীর্ঘ। ৩৬৫¼ দিনে এক বৎসর হয, এ তথ্যও তিনি জানতেন। উপবে বর্ণিত বৎসবেব চাবভাগ যথাক্রমে গ্রীষ্ম, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এই চার ঋতুব প্রত্যেক ঋতুতে সূর্য একসম-

কোণ পরিমাণ পথ অতিক্রম করে। কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে। এর মধ্যে বসন্ত ঋতুই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। অতএব, এই ঋতুতেই সূর্যের গতি অন্য ঋতু অপেক্ষা ধীর। সুতরাং এই ঋতুতেই সূর্য অপভূতে অবস্থান করে। মনে করা যাক, সূর্যপথে P এবং R বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে বসন্ত ও হেমন্ত-বিষুবন নির্দেশ করে; এবং S ও Q যথাক্রমে শীতায়ন ও গ্রীষ্মায়ন নির্দেশ করে। অতএব PER এবং QES যথাক্রমে বিষুবন-রেখা ও অয়ন-রেখা নির্দেশ করে। অপভূ A বিন্দু, P এবং Q-এর মধ্যবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত। A এর প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল। হিপারকাসের গণনা মতে PEA কোণটির পরিমাণ ৬৫ ডিগ্রী এবং উৎকেন্দ্রিকতার পরিমাণ $\frac{1}{24}$। এতে পাওয়া যায় যে, জুন মাসের প্রথম দিকে সূর্য অপভূতে অবস্থান করে।

এইভাবে জ্যামিতির সাহায্যে সূর্যের গতি নির্দেশ করবার পর বৎসরের বিভিন্ন দিনে সূর্যের অবস্থান-তালিকা গঠন করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কেন্দ্র-সমীকরণের সাহায্যে এই অবস্থান নির্ণয় ও তালিকা গঠন করা হতো। সূর্যের প্রকৃত দ্রাঘিমা এবং সমগতিতে চললে যে দ্রাঘিমা হয়, এই দুই দ্রাঘিমার অন্তর অর্থাৎ CSE কোণটিকে কেন্দ্র-সমীকরণ বলা হয়। পর্যবেক্ষণের ত্রুটির জন্য এ সমস্ত ব্যাপারে যে ফল পাওয়া যায়, সেগুলি ত্রুটিহীন নয়। উৎকেন্দ্রিকতার মান অধিকতর সূক্ষ্ম হলে এই-ভাবে নির্ণীত সূর্যের অবস্থানে এক মিনিটের বেশী পার্থক্য হয় না।

বিকেন্দ্রিক বৃত্ত ছাড়া সূর্যের গতির ব্যাখ্যা যে অন্যভাবেও দেওয়া যেতে পারতো, সে কথা হিপারকাস জানতেন। যে এপিসাইকেল পরবর্তী যুগে জ্যোতির্বিদ্যা-জগতে প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই এপিসাইকেলের সাহায্যে কিভাবে এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে কনিকস্-এর স্রষ্টা এপোলনিয়াস সে বিষয়ে হিপারকাসকে অবহিত করেন। কিন্ত হিপারকাস এপিসাইকেল পদ্ধতি গ্রহণ না ক'রে বিকেন্দ্রিক-বৃত্ত পদ্ধতিই গ্রহণ করেন।

চন্দ্র

সূর্যের গতির চাইতে চাঁদের গতি জটিল। প্রায় ২৯½ দিন পর অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হয়, অর্থাৎ সূর্যের সাথে তুলনা করলে চাঁদকে এই সময়ে আবার পূর্ব স্থানে ফিরে আসতে দেখা যায়। এই সময়কে চাঁদের যুতিকাল (synodic period) বা চান্দ্রমাস বলে। চাঁদ যেমন প্রতিদিন পুব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যায়, সূর্যেরও ঠিক তেমনি পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে গতি আছে। তবে সূর্যের গতি চাঁদের গতির চেয়ে অনেক ধীর। সেজন্য সূর্যের তুলনায় পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসতে চাঁদের একটু বেশী সময় দরকার হয়। কোন স্থির তারার সঙ্গে তুলনা ক'রে যদি চাঁদের এই পশ্চিম থেকে পুব দিকের গতি বিবেচনা করা যায়, তা হলে দেখা যায় ২৭ দিন ৮ ঘণ্টা পরে চাঁদ আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসে। এই সময়কে চাঁদের নাক্ষত্র-মাস (sidereal month) বলে। পূর্বেই বলা হয়েছে, সূর্যপথ ও বিষুববৃত্ত দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বৃত্ত এবং উভয়ে উভয়কে একটি নির্দিষ্ট কোণে ছেদ করে। চন্দ্রপথ এই দুইটি বৃত্ত থেকে পৃথক। চন্দ্রপথও খ-গোলকে একটি বৃহৎ বৃত্ত। সূর্যপথকে এই চন্দ্রপথ দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে। এই ছেদবিন্দু দুইটিকে পাতবিন্দু (nodes) বলে। চন্দ্রপথ সূর্যপথকে প্রায় ৫ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে। হিপারকাস সর্বপ্রথম এই কোণের পরিমাণ নির্ণয় করেন। চন্দ্রের গতি অতি বিচিত্র। সূর্যপথের সাথে চন্দ্রপথের নতি যদিও সর্বদা একই থাকে, কিন্তু পাতবিন্দু দুইটির গতি আছে। সূর্যপথের উপরে এই বিন্দু দুইটি পুব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যায়। সূর্যপথের উপর পাত-বিন্দুদ্বয়ের পরিভ্রমণ কাল ১৯ বৎসর। এজন্য এই পাতবিন্দু দুইটির সাথে তুলনা করলে, চন্দ্রের পূর্বস্থানে ফিরে আসতে কিছু কম সময় দরকার হয়। এই সময়ের পরিমাণ ২৭ দিন ৫ ঘণ্টা। একে ড্রাকোনি-টিক (Drakonitic) মাস বলে। নামটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হিন্দু-পুরাণে রাহুর গ্রাসের জন্য যেমন গ্রহণ হয়, তেমনি গ্রীসের উপকথাতেও ড্রাগনের গ্রাসের জন্যই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। অমৃত বণ্টনের সময়,

সূর্য ও চন্দ্র রাহুকে দেবতাদের পংক্তিতে দেখিয়ে দেয় এবং বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মাথা কেটে ফেলেন; সেই আক্রোশে রাহু সূর্য ও চন্দ্রের পিছনে ধাওয়া করে এবং মাঝে মাঝে তাদের গ্রাসও করে। এই হ'লো হিন্দুপুরাণের গল্প। রাহু এবং কেতুকেও হিন্দু-জ্যোতির্বিদ্যায় গ্রহ বলে বিবেচনা করা হয়। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় এদেরও গতি আছে। এই গতির কালই হচ্ছে রাহুমাস বা ড্রাকোনিটিক মাস।

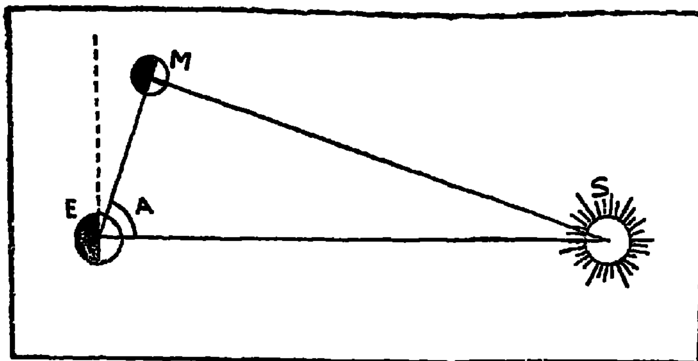
সূর্যের গতি যেমন সর্বদা একই থাকে না, চাঁদের গতিও সেইরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণের হয়। চাঁদের গতির অসমতা সূর্যের গতির অসমতা অপেক্ষা অনেক বেশী। হিপারকাসই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, আকাশের যে স্থানে চাঁদের গতি সবচেয়ে বেশী, সেই স্থান স্থির নয়। এই স্থানটিও গতিশীল। বিভিন্ন বৎসরে আকাশের বিভিন্ন স্থানে চাঁদের গতি সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ চাঁদের অপদূরক রেখাটিরও গতি আছে। প্রায় ৯ বৎসরে এই রেখাটি একটি চক্র পূর্ণ করে। এই থেকে একটি চতুর্থ প্রকার মাসের উৎপত্তি হয়। অনুভূ বা অপভূ থেকে আরম্ভ করে পুনরায় অনুভূ বা অপভূতে আসতে চাঁদের যে সময় দরকার হয়, তাকে কৌণিক (anomalistic) মাস বলে।

হিপারকাস এই চার প্রকার মাসের প্রত্যেকটির পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম-ভাবে নির্ণয় করেন। এর পূর্বে আর কেউ এত সূক্ষ্মভাবে এই পরিমাণ নির্ণয় করতে পারেন নাই।

সূর্যের গতি নির্দেশ করবার জন্য হিপারকাস যেমন বিকেন্দ্রিক বৃত্তের কল্পনা করেছিলেন, চাঁদের এই বিভিন্ন প্রকার জটিল গতি নির্দেশ করতেও তিনি একইভাবে বিকেন্দ্রিক বৃত্তেরই সাহায্য নেন। চাঁদের অপদূরক-রেখার গতি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে হিপারকাস বলেন যে, চাঁদের বিকেন্দ্রিক বৃত্তের কেন্দ্র, পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে অপর একটি বৃত্তে পরিভ্রমণ করে এবং ৯ বৎসরে একটি চক্র পূর্ণ করে। তিনি আরো মনে করতেন যে, চাঁদের বিকেন্দ্রিক বৃত্তের সমতল সূর্যপথের সমতলকে ৫ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে। এই সমতলটির একটি পশ্চাৎ গতি আছে; সেজন্য পাতবিন্দু দুইটি গতিশীল।

বিকেন্দ্রিক বৃত্তের সাহায্যে সূর্যের গতির ব্যাখ্যা দেওয়া যেমন সহজ, চাঁদের গতি, বিশেষ ক'রে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গতি, সর্বাধিক গতির স্থান পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া তত সহজ নয়। হিপারকাস নিজেও একথা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু কোন সদুত্তর দিতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

গ্রহণ-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে হিপারকাস অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে চাঁদের আয়তন ও দূরত্ব নির্ণয় করেন। সূর্য যে চাঁদ অপেক্ষা অনেক বেশী দূরে অবস্থিত, তিনি সে কথা জানতেন। তিনি নানা ভাবে চাঁদের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন এবং প্রত্যেকভাবেই দেখিয়েছেন যে পৃথিবী থেকে



রেখাচিত্র ২০ : সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়ে আরিস্টারকাসের পদ্ধতি

চাঁদের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের ৫৯ গুণ। আরিস্টারকাস এবং হিপারকাসের নির্ণীত দূরত্ব ও অনুপাত তুলনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ১২০০ গুণ। কয়েক শতাব্দী ধরে একেই প্রকৃত দূরত্ব বলে ধরা হয়েছে।

গ্রহসমূহ

গ্রহ সম্বন্ধে পূর্বেকার কোন তথ্য হিপারকাস পান নাই। সেজন্য গ্রহের গতি ব্যাখ্যা করবার কোন চেষ্টাও তিনি করেন নাই। তবে

গ্রহ সম্বন্ধে তিনি অনেক পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের জন্য অনেক তথ্য রেখে গিয়েছেন।

তারা

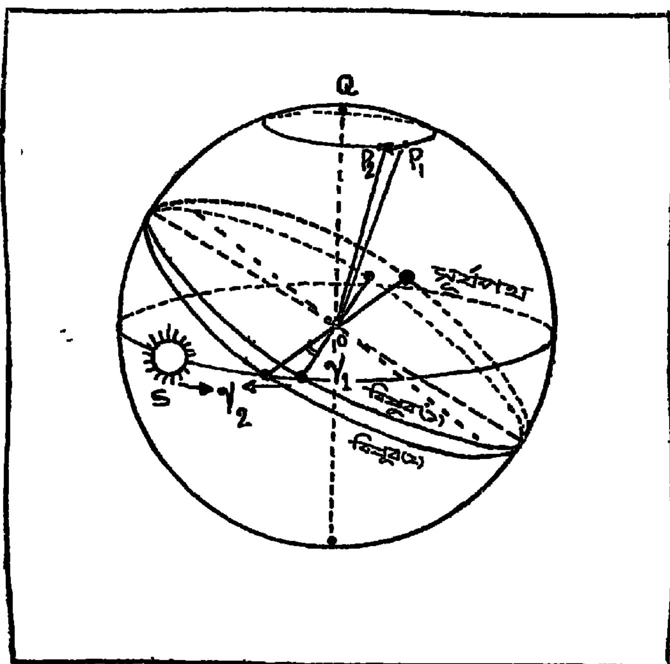
হিপারকাসের তারার তালিকাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম তারা-তালিকা। তারা সম্বন্ধে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ মৌলিক। খ্রীস্টপূর্ব ১৩৪ অব্দে বৃশ্চিক রাশিতে একটি নবতারা দেখা যায়। এই নবতারাটি দেখেই হিপারকাসের তারার তালিকা প্রণয়নের ইচ্ছা হয়। তিনি মোট ১০৮০টি (কেহ কেহ বলেন ১০২৮টি) তারা এই তালিকাভুক্ত করেন। সেই তালিকাতে প্রত্যেকটি তারার খ-অক্ষাংশ এবং খ-দ্রাঘিমাংশের উল্লেখ করেন। তিনিই প্রথম উজ্জ্বলতা অনুসারে তারাগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তিনি যে সমস্ত মণ্ডলের উল্লেখ করেন, সেগুলি প্রায়ই ইউডক্সাস বর্ণিত মণ্ডলসমূহের অনুরূপ। দক্ষিণ আকাশের কিছু তারা অতিরিক্ত সংযোজন ছাড়া হিপারকাসের এই তালিকার এ পর্যন্ত বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। তিনি অনেক জায়গায় এমন তিনটি বা তার চেয়ে বেশী তারার উল্লেখ করেছেন, যেগুলি একই সরলরেখায় বা বৃহৎ বৃত্তে অবস্থিত। এর সাহায্যে পরবর্তী যুগে এই সমস্ত তারার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা সহজেই বোঝা যায়। প্রায় ১৬০০ বৎসর পর্যন্ত, সামান্য পরিবর্তিত অবস্থাতে, হিপারকাসের এই তালিকাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য তারার তালিকা বলে পরিগণিত হতো।

এই তারার তালিকা প্রণয়ন করতে যেয়ে হিপারকাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য আবিষ্কার করেন। এই তথ্যটি বিষুব-চলন তথ্য। তাঁর ১৫০ বৎসর পূর্বে টিমোকারিস এবং আরিস্টিলাসের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে কতকগুলি তারার অবস্থান তুলনা করতে গিয়ে হিপারকাস দেখতে পান যে, বিষুবন-বিন্দু থেকে ঐ সমস্ত তারার দূরত্বের পরিমাণের পরিবর্তন হয়েছে; যেমন তিনি দেখতে পান যে, চিত্রা তারাটির দূরত্ব

ঐ ১৫০ বৎসরে প্রায় ২ ডিগ্রী পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে ; আরো কতকগুলি তারার পূর্বেকার অবস্থানের সঙ্গে তাঁর নিজ পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত অবস্থান তুলনা ক'রে তিনি দেখতে পান যে, খ-দ্রাঘিমাংশের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু খ-অক্ষাংশের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এর কারণস্বরূপ তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, তারাসমূহের নিজেদের গতি থাকলে খ-দ্রাঘিমাংশ এবং খ-অক্ষাংশ, উভয় স্থানাঙ্কেরই পরিবর্তন হতো। খ-দ্রাঘিমাংশ নিরূপণের আদি বিন্দু, অর্থাৎ বিষুবন-বিন্দুর পশ্চাদগতির জন্যই প্রত্যেক তারারই খ-দ্রাঘিমাংশের বৃদ্ধি হয়। অবশ্য সমস্ত তারার ক্ষেত্রেই এই বৃদ্ধির পরিমাণ একই পাওয়া যায় নাই। তার কারণ তৎকালীন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অভাবে পর্যবেক্ষণে ত্রুটি। হিপারকাস এই ত্রুটির কথা বিবেচনা ক'রে স্থির করেন যে, বিষুবন-বিন্দু প্রতি বৎসর ৩৬ সেকেণ্ড পরিমাণ পশ্চাদগমন করে। বর্তমানে আমরা জানি, বিষুবনের পশ্চাদগমনের বার্ষিক হার প্রায় ৫০ সেকেণ্ড।

সূর্যপথ ও খ-বিষুব, এই দুইটি বৃহৎ বৃত্তের ছেদবিন্দু দুইটিই বিষুবন-বিন্দু। বিষুবন-বিন্দুর গতির অর্থ এই ছেদবিন্দু দুইটির গতি। যে দুইটি বৃহৎ বৃত্তের ছেদনে এই দুইটি ছেদবিন্দু পাওয়া যায়, সেই দুইটি বৃত্তের বা তাদের যে কোন একটি বৃত্তের গতি থাকলে, তবেই ছেদ-বিন্দুর গতি থাকা সম্ভব। কিন্তু খ-অক্ষাংশের কোন পরিবর্তন হয় না। এতে বোঝা যায়, সূর্যপথের কোন পরিবর্তন হয় না। অতএব বিষুবন-বিন্দুর পশ্চাদগমন খ-বিষুবের গতির ফলেই হয়ে থাকে। হিপারকাস তাঁর পূর্বসূরীদের মত নিজেও সূর্যপথের তীর্যকতা নির্ণয় করেন, কিন্তু এতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখতে পান না। খ বিষুবের গতি আছে, অথচ সূর্যপথের তীর্যকতার কোন পরিবর্তন নাই, এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, খ-বিষুবের সমতল সমান্তরালভাবে পিছনের দিকে, অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে যায়। সেজন্যই খ-দ্রাঘিমাংশের বৃদ্ধি হয়। খ-বিষুবের পশ্চাদগমনের ফলেই যে বিষুবন-চলন সংঘটিত হয়, হিপারকাসই সর্বপ্রথম এ তথ্য আবিষ্কার করেন।

বিষুবন-বিন্দুর প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণ পশ্চিমে সরে যাওয়ার ফলে এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার কিছু আগেই সূর্য ঐ বিন্দুতে উপস্থিত হয়। বিষুবনের এই অগ্রচলন থেকেই হিপারকাস বুঝতে পারেন যে, দুইটি



রেখাচিত্র ২১ ঃ হিপারকাস কর্তৃক বিষুবনের অগ্রগতি নির্ণয় পদ্ধতি

বিভিন্ন প্রকার বৎসরের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। কোন একটি বিশেষ স্থির তারা থেকে আরম্ভ ক'রে পুনরায় ঐ তারার নিকটে আসতে সূর্যের যে সময় দরকার হয়, তাকে এক নাক্ষত্র-বৎসর বা কেবলমাত্র সৌর-বৎসর বলা হয়। আর বিষুবন-বিন্দু থেকে আরম্ভ ক'রে পুনরায় বিষুবন-বিন্দুতে ফিরে আসতে সূর্যের যে সময় দরকার হয়, তাকে এক ক্রান্তীয় (tropical) বৎসর বলা হয়। উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারা

যায় যে, ক্রান্তীয় বৎসর অপেক্ষা সৌরবৎসর প্রায় ৫০ সেকেণ্ড দীর্ঘ। এই দুই প্রকার বৎসরের দৈর্ঘ্যই হিপারকাস অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করেন। হিপারকাস নিজে অনেকদিন ধরে বিষুবন ও অয়ন-বিন্দু পর্যবেক্ষণ করেন; এর সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরীদের পর্যবেক্ষণ তুলনা ক'রে তিনি ক্রান্তীয় বৎসরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। খ্রীস্টপূর্ব ২৮০ অব্দে আরিস্টারকাস গ্রীষ্মায়ন পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণের সাথে, খ্রীস্টপূর্ব ১৩৫ অব্দের গ্রীষ্মায়নের তুলনা ক'রে, হিপারকাস সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্রান্তীয় বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫$\frac{1}{4}$ দিন অপেক্ষা $\frac{1}{300}$ দিন অর্থাৎ প্রায় ৫ মিনিট কম। অর্থাৎ তাঁর মতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে এক-ক্রান্তীয় বৎসর।

চাঁদ ও সূর্যের গতিবিধি সম্বন্ধে হিপারকাস যে ব্যাখ্যা দেন, তার সাহায্যে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁর পক্ষে বেশ সহজ হয়ে পড়ে। সূর্য ও চন্দ্র যে মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে যায়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ ব্যাপারটা যথেষ্ট প্রভাবিত ক'রে আসছিল, এবং এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার চেষ্টাও চলছিল। কিন্তু চাঁদ ও সূর্যের গতির কোন গাণিতিক ব্যাখ্যা না জানায় বা না দিতে পারায়, এতদিন পর্যন্ত নির্ভুলভাবে এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয় নাই। হিপারকাসই সর্বপ্রথম এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হন।

সূর্যের আলোতে পৃথিবীর ছায়া পড়ে। চাঁদ যখন এই ছায়ার ভিতরে পড়ে তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয়। অতএব চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে পৃথিবী থাকে। আর সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চাঁদ এসে পড়ে, ফলে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর এসে পড়ে, অথবা চাঁদ মাঝখানে থাকায় সূর্যের কিছুটা অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ পৃথিবীর কোন কোন জায়গা থেকে ঢাকা পড়ে যায়। গ্রহণের এই তথ্য আরিস্টটল এমনকি তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণও জানতেন বলে মনে হয়। অবশ্য সে সময়ে এ সমস্ত তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করা হতো না। দুই একজন শিষ্য অথবা নিজ নিজ গোষ্ঠীর কোন

লোককে ছাড়া অন্য কাউকেই এ তথ্য জানান হতো না। গ্রহণের সঙ্গে একটা ভীতির সম্বন্ধ অতি প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল।

গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করবার প্রধান অসুবিধা এই যে, সূর্যপথ ও চন্দ্রপথ অভিন্ন নয়। দুটো পথ যদি একই হতো, তা হলে প্রতি অমাবস্যাতেই চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে সূর্যগ্রহণ ঘটাতো, আর প্রতি পূর্ণিমাতে পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে এসে চন্দ্রগ্রহণ ঘটাতো। কিন্তু সূর্যপথ ও চন্দ্রপথের সমতল দুইটি পরস্পরকে প্রায় ৫ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে। পূর্ণিমার সময় যখন চাঁদ ও পৃথিবীর প্রতি-যোগ (opposition) হয়, তখন এদের খ-দ্রাঘিমাংশের পার্থক্য হয় ১৮০ ডিগ্রী আর অমাবস্যায় চাঁদ ও পৃথিবীর যখন সংযোগ (conjunction) হয় তখন এদের উভয়েরই একই খ-দ্রাঘিমাংশ থাকে। কিন্তু এই দুই সময়ের মধ্যে চাঁদ ও সূর্যের অক্ষাংশের পার্থক্য ৫ ডিগ্রী পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ণিমার সময় চাঁদ, পৃথিবীর ছায়ার বাইরেও থাকতে পারে এবং অমাবস্যার সময় চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে নাও আসতে পারে। অতএব পূর্ণিমার সময় চন্দ্রগ্রহণ এবং অমাবস্যার সময় সূর্যগ্রহণ হবে কিনা, সেটা নির্ভর করে চাঁদের অক্ষাংশের উপরে। পাত-বিন্দুর নিকটে থাকলে চাঁদের খ-অক্ষাংশ কম হবে, আর পাতবিন্দু থেকে দূরে থাকলে চাঁদের খ-অক্ষাংশ বেশী হবে। অতএব পাতবিন্দু থেকে চন্দ্রের দূরত্বের উপরই গ্রহণ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। অতএব চাঁদ এবং চন্দ্রপথের গতি জানা থাকলে গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজসাধ্য হয়। এই দুইটা গতি সম্বন্ধেই হিপার্কাস বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। অতএব তাঁর পক্ষে গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা মোটেই অসম্ভব ছিল না।

সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে একটা বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। পূর্ববর্তী কোন জ্যোতির্বিদ এ ব্যাপার লক্ষ্য না করলেও, বিষয়টি হিপার্কাসের দৃষ্টি এড়ায় নাই। পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে চাঁদ প্রবেশ করলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। এজন্য চন্দ্রগ্রহণ পৃথিবীর যে-কোন জায়গা থেকে, এমনকি পৃথিবীর

বাইরে থেকেও দেখা যায়। যেমন পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়। কিন্তু সূর্যগ্রহণ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ঘটনা। দর্শক ও সূর্যের মাঝখানে চাঁদ এসে পড়াতে, দর্শক সূর্যকে দেখতে পায় না, বা সূর্যের সামনে চাঁদকে দেখতে পায়। এ ঘটনা দর্শকের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সেজন্য পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে একসঙ্গে সূর্যগ্রহণ দেখা যায় না। সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে দর্শকের অবস্থানের বিষয়ও বিবেচনা করতে হয়। হিপারকাস এবং আরো অনেকেই চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা নির্ভুলভাবেই করেছেন; অবশ্য দুই-এক ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য কোন কোন সময় দেখা গিয়েছে, কিন্তু সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কোন সময়েই নির্ভুল হয় নাই।

হিপারকাস সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ, ডু লম্বর, তাঁর 'প্রাচীন জ্যোতিবিদ্যার ইতিহাসে' বলেছেন, "হিপারকাসের আবিষ্কার পরবর্তী সমস্যাসমূহের সমাধান, সংশোধন, তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা এবং অসংখ্য গণনা ইত্যাদির কথা চিন্তা করলে, মনে হয়, কি একটা বিরাট প্রতিভা এই হিপারকাস। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রাচীনকালে এত বড় পণ্ডিত আর ছিল না।"

হিপারকাসের পরবর্তী তিনশত বৎসর

হিপারকাসের মৃত্যুর পরে তিনশত বৎসর জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস একেবারে শূন্য। এই সময়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন জ্যোতির্বিদের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই সময়ে জ্যোতির্বিদ্যাকে জনপ্রিয় করবার যে একটা প্রয়াস চলছিল, সেটা বুঝতে পারা যায়। এ সময়ে জ্যোতির্বিদ্যার কয়েকখানা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়। অতি সহজ ও সাবলীলভাবে পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যগুলি এই সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে আলোচনা করা হয়। এই সমস্ত বইয়ের কল্যাণে সাধারণ লোকেরাও জ্যোতির্বিদ্যাতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম অর্ধে রোড্‌সের অধিবাসী জেমিনাস 'জ্যোতির্বিদ্যা পরিচয়' (Elements

of Astronomy) নামে একখানা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। এ বইতে তিনি প্রধানতঃ গোলকীয় জ্যোতির্বিদ্যা (spherical astronomy) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। জেমিনাসের সমসাময়িক অথবা তাঁর পরবর্তী যুগের লোক, ব্রিওমেডিস আর একখানা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। এ বইখানার নাম 'খ-বস্তুসমূহের তথ্য' (Theory of Heavenly Bodies)। এ বইখানাতে প্রধানতঃ দার্শনিক পসিডিনিয়াসের আলোচনাই করা হয়েছে। গ্রহসমূহ সম্বন্ধে এ বইতে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই; কেবলমাত্র এদের যুতিকাল এবং সূর্যপথ থেকে তাদের দূরত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরে স্মার্ণার অধিবাসী থিওন প্রণীত *Exposition of the Mathematical Subjects which are useful to the study of Plato* বইখানা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন, থিওন টলেমীর সমসাময়িক। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি টলেমীর পূর্ববর্তী সময়ের লোক। তাঁর পুস্তকে তিনি গণিত, সঙ্গীত ও জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করেছেন। তাঁর এ বইয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অংশ এতকাল অজ্ঞাত ছিল। কেবল মাত্র ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে মার্টিন এই অংশ প্রকাশ করেন।

আকাশের তারা যে কোন গোলকের উপর অবস্থিত নয়, পৃথিবী থেকে বিভিন্ন তারার দূরত্ব যে বিভিন্ন হতে পারে, এ সমস্ত বিষয়ে এই বইগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য তারার দূরত্ব নির্ণয় করবার কোন পদ্ধতি এই বইগুলিতে দেওয়া হয় নাই। এই সমস্ত পুস্তকে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী থেকে সূর্য ও তারাসমূহ এত দূরে অবস্থিত যে, সূর্য থেকে পৃথিবীকে একটি বিন্দুর মত দেখায়, আর কোন তারা থেকে পৃথিবী দেখাই যায় না। বুধ ও শুক্র, সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে, এমন একটা আভাসও এ সমস্ত বইতে পাওয়া যায়। এই সময়ে এপিসাইকেলের সাহায্যে গ্রহের গতিপথ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই।

টলেমী

ক্লডিয়াস টলেমিকাস টলেমীর প্রভাব প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা-জগতে অতুলনীয়। প্রায় দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর মতকে প্রায় বেদবাক্যের মত মনে করা হতো। তাঁর প্রচলিত পদ্ধতি টলেমীয় পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে এসেছে।

হিপারকাসের পরের তিনশত বৎসর পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা-জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোন দার্শনিক বা জ্যোতির্বিদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়াতে সসিজেনিস নামে একজন জ্যোতির্বিদের নাম শোনা যায়। পঞ্জিকা সংস্কারের সময় জুলিয়াস সিজার এঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। ইনি সূর্য ও চন্দ্রের আপাত দৃশ্য-ব্যাসের পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন বলেও জানা যায়। এ ছাড়া টলেমী নিজে উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীস্টীয় ৯২ অব্দে বিথীনিয়ার এগ্রিপ্পা কৃত্তিকার সমাবরণ (occultation) পর্যবেক্ষণ করেন এবং রোমে মেনেলাউস চিত্রা এবং বিটা-বৃশ্চিক সমাবরণ পর্যবেক্ষণ করেন। এঁদের ছাড়া পর্যবেক্ষণ-জ্যোতির্বিদ্যায় হয়তো আরো অনেকের অনেক অবদান আছে। কিন্তু তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিদ্যায় হিপারকাসের পরে তিন শত বৎসরের ভিতরে যে আর কারো কোন অবদান নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

টলেমীর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই জানা যায় না। এইমাত্র জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে বসবাস করতেন। সম্রাট আলেকজাণ্ডার মিশর জয় ক'রে, তাঁর সেনাপতি টলেমীকে সেখানকার শাসনভার দিয়ে আসেন। তাঁরই বংশধরগণ মিশরে তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন। জ্যোতির্বিদ টলেমী রাজবংশসম্ভূত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও তিনি যে টলেমীবংশীয় রাজা ছিলেন না, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জুলিয়াস সিজার তাঁর উপপত্নী ক্লিওপেট্রাকে তদীয় শিশুভ্রাতা ত্রয়োদশ টলেমীর সাথে বিয়ে দেন। ক্লিওপেট্রা তাঁর স্বামী ও ভাইকে হত্যা করেন এবং তাঁর (সম্ভবতঃ জুলিয়াস সিজারের)

পুত্র চতুর্দশ টলেমীকে মিশবেব সিংহাসনে উপবেশন কবান। ইনিই টলেমী-বংশীয শেষ বাজা এবং খ্রীস্টপূর্ব ৩০ অব্দে এঁকে হত্যা ক'রে অগাস্টাস মিশবের সম্রাট হন। টলেমী-বাজবংশ এখানেই শেষ হযে যায। অতএব জ্যোতির্বিদ টলেমীব মিশবের বাজা হওয়াব কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

টলেমীব পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওযা যায হাড্রিয়ানেব একাদশ বর্ষে, অর্থাৎ ১২৭ খ্রীস্টাব্দে এবং তাঁর সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ ১৫০ খ্রীস্টাব্দে হযেছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায। তিনি এন্টোনাইনেব প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৩৭ খ্রীস্টাব্দে তারাব তালিকা প্রণযন কবেন বলে জানা যায়। *Hypothesis of Planets* নামে তাঁব ছোট বইখানা এন্টো- নাইনের দশম বর্ষে বচিত বলে উল্লেখ আছে। এই বইখানা মিশবেব বাজা প্রথম টলেমী বা টলেমী সোটারেব নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে বলে অনেকে জ্যোতির্বিদ টলেমীকে বাজবংশজাত বলে মনে করেন।

টলেমীব গ্রন্থ 'আলমাজেস্ট' মধ্যযুগে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে বিবে- চিত হতো। এই বইখানাকে মধ্যযুগীয় জ্যোতিবিদ্যাব বাইবেল বললেও অত্যুক্তি করা হয না। গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এই বইযের সাহাযোই পেযে থাকি। 'আলমাজেস্ট' কথাটি ঠিক টলেমী ব্যবহাব কবেন নাই। তাঁব বইযের পাণ্ডুলিপিব নাম ছিল μεγαλη σηνταξις (Megali Syntaxis) বা বৃহৎ সংকলন। একে ভারতীয সংহিতাব সাথে তুলনা কবা যেতে পাবে। সংহিতাব মতই Megali Syntaxis ধর্মীয় পুস্তকের মর্যাদা লাভ কবেছিল। টলেমী নিজে অন্যত্র এই বইখানাকে μαθηματικη συνταξις বা গাণিতিক সংকলন বলে উল্লেখ করেছেন। আববী অনুবাদকগণ, এ বইযেব বিশালত্ব দেখে এবং এব বিষয-বস্তুতে মুগ্ধ হয়েই হোক অথবা অসাবধানতা বশতই হোক, μεγαλη বা বৃহৎ শব্দটিকে 'μεγαστη বা বৃহত্তম' বলে অনুবাদ কবেন। পববর্তী যুগে বইখানাকে সম্মানিতভাবে নির্দেশ কববাব জন্য এব পূর্বে Al-(The) শব্দটি যোগ ক'বে একে Al-magisti-তে পবিণত করা হয। আববী

থেকে পুনরায় লাটিনে অনূদিত হওয়ার সময় একে Almagestum এবং পরে Almagest-এ রূপান্তরিত করা হয়।

'আলমাজেস্ট' ছাড়া টলেমী ছোট ছোট আরো কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে তাঁর প্রণীত ভূগোল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আলোকবিদ্যা (optics) সম্বন্ধেও তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন বলে অনেকের ধারণা। অনেকে বলেন, এই আলোকবিদ্যা গ্রন্থে তিনি আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং প্রতিসরণের ফলে আকাশের খ-বস্তুসমূহ উচ্চতর স্থানে দেখা যায়, এ সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন।

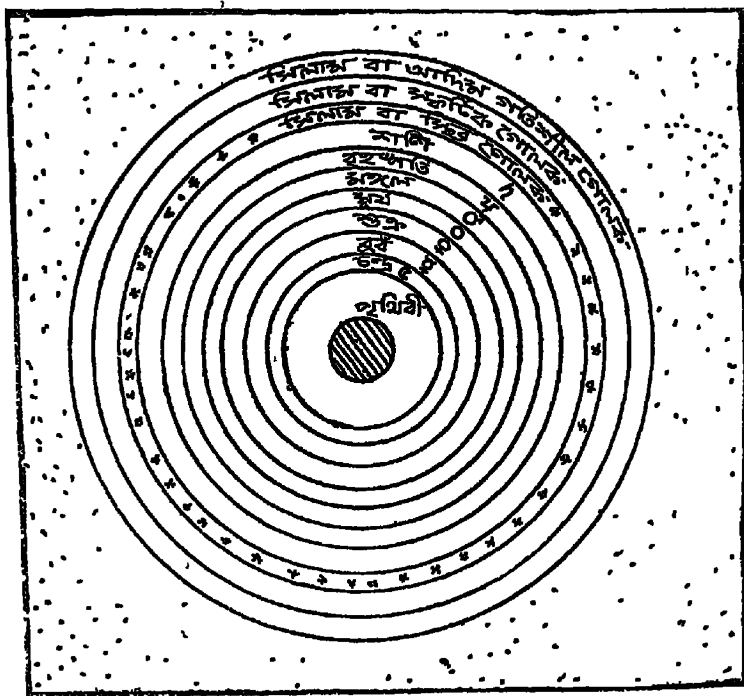
পূর্ববর্তী জ্যোতিবিদগণের কার্যাবলীই হচ্ছে 'আলমাজেস্টে'র ভিত্তি। বিশেষ করে হিপারকাসের কার্যাবলী ও মতবাদ এর মূল ভিত্তি। গ্রন্থখানার অনেক জায়গাতেই টলেমী হিপারকাসের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে 'আলমাজেস্টে'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই এর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও ঐতিহাসিক অবদানের জন্য এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

'আলমাজেস্ট'

'আলমাজেস্ট' মোট ১৩ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম দুই খণ্ডে সাধারণ প্রত্যক্ষ তথ্যসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে খ-গোলকের দৈনিক গতি এবং সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহের বিশেষ গতির বিষয়ও আছে। এ ছাড়া দিবাভাগের দৈর্ঘ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তারাসমূহের উদয় ও অস্ত সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। গোলক-ত্রিকোণমিতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে শুদ্ধ ও বিস্তৃত কতকগুলি তালিকার সংযোজন করা হয়েছে। এই দুই খণ্ডকে প্রকৃতপক্ষে 'আলমাজেস্টে'র ভূমিকা বলা চলে। এই ভূমিকার

প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হলো, টলেমীর প্রথম স্বীকার্য (postulate), পৃথিবী গোলকাকার। টলেমী বিভিন্ন মতের সমালোচনা ক'রে অন্য সমস্ত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। পৃথিবী গোলকাকার, তাঁর এই মতের সপক্ষে তিনি অনেক প্রমাণও দিয়েছেন। তার ভিতরে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করলে পৃথিবীর অধিকতর অংশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণ যে পৃথিবীর গোলাকৃতি এ প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের



রেখাচিত্র ২২ : টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ

সময় পৃথিবীর যে ছায়া চাঁদের উপরে পড়ে, তার আকার গোল, অতএব পৃথিবী গোল, এ প্রমাণের উল্লেখ তিনি কোথাও করেন নাই।

তিনি বলেছেন, আকাশ গোলাকার, পৃথিবী তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং আকাশ নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হয়। মেরু প্রদক্ষিণকারী তারা-সমূহ দেখলেই এ কথা বিশেষভাবে বুঝা যায়। পৃথিবী যে আকাশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন, পৃথিবী যদি আকাশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত না হয়ে, কোন একদিকে আকাশের বেশী কাছে থাকতো, তা হলে আকাশের সেদিকে তারার সংখ্যা বেশী দেখা যেত এবং সেদিকের তারাদের আয়তনও বড় বলে মনে হতো। এই কারণে আকাশের তুলনায় তিনি পৃথিবীকে একটি বিন্দু বলে মনে করেন। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর দিগন্ত আকাশকে খ-বিষুবে ছেদ করে। এর পরেই তিনি আবার বলেছেন, পৃথিবী যদি আকাশের কেন্দ্রে অবস্থিত না হয়ে খ-অক্ষের উপরে কোন মেরুর নিকটবর্তী জায়গায় অবস্থান করতো, তা হলে দিগন্ত আকাশকে খ-বিষুবে ছেদ না করে, কোন একটি ক্ষুদ্র বৃত্তে (small circle) ছেদ করতো।

তিনি বলেন, পৃথিবীর কোন সরলগতি নাই। কেননা সরলগতি থাকলে, কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সে গতির আরম্ভ হতে হবে। কিন্তু সেরূপ স্থান কোথাও নাই। এ ছাড়া ভারী বস্তুসমূহ বিশ্বের কেন্দ্র অর্থাৎ পৃথিবীর দিকেই পড়ে। পৃথিবীর যদি কোন গতি থাকতো তা হলে সে গতি পৃথিবীর বিরাট ভরের অনুপাতে অত্যন্ত প্রচণ্ড হতো। ফলে অল্প ভর-বিশিষ্ট পশুপাখীসমূহ বাতাসের ভিতরে ছিটকে পড়তো। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আবর্তনের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবী যদি নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করতো, তা হলে সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হতো। কিন্তু পৃথিবীর বিরাট আবর্তন-গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে পশুপক্ষী ইত্যাদি বিক্ষিপ্তভাবে চার-দিকে ছড়িয়ে পড়তো ; পৃথিবীর স্থিতাবস্থা সম্ভব হতো না।

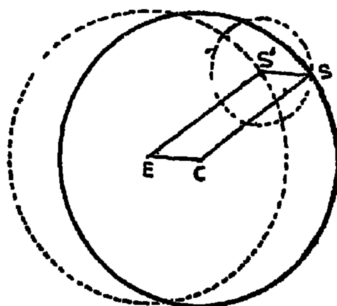
অতএব দেখা যাচ্ছে যে, টলেমীর মতবাদ তাঁর পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ-গণের মতবাদের বাইরে কিছুই নয়। তবে একটা পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পীথাগোরাস প্রভৃতি গ্রীক মনীষিগণ নিজেদের

মতবাদকে একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। বিরুদ্ধ মতবাদকে তাঁরা মিথ্যা ও অসত্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করবার মত ধৈর্যও তাঁদের ছিল না। কিন্তু টলেমী সমস্ত মতবাদকেই স্বীকার্য বলে মেনে নিয়ে, একটি একটি করে যাচাই করেছেন। তাঁর যুক্তিতে টিকলে, অন্য মতবাদ মেনে নিতেও হয়তো তাঁর আপত্তি থাকতো না।

'আলমাজেস্টে'র তৃতীয় খণ্ডে সূর্য ও বৎসর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তিনি হিপারকাসের মতবাদের বাইরে কিছুই বলেন নাই।

চতুর্থ খণ্ডে টলেমী মাস ও চাঁদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এখানেই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। চন্দ্রপথের নিজস্ব একটা গতি আছে এবং এর অপদূরক-রেখার একটা আবর্তন-বেগ আছে। অপদূরক-রেখার উপরে চন্দ্রের বিকেন্দ্রিক অবস্থানের জন্য তার গতি অনিয়মিত। একে কেন্দ্র-সমীকরণ বলে। টলেমী আবিষ্কার করেন যে, এই সমস্ত বৈষম্য ছাড়া সূর্যের অবস্থানের উপরেও চন্দ্রের গতি নির্ভরশীল এবং সেজন্য কিছু অসমতার সৃষ্টি হয়। এই কারণে চন্দ্রের গতির যে অসমতা হয়, তাকে evection বলে। হিপারকাসের গণনা অনুযায়ী চাঁদের যেরূপ অবস্থান হওয়ার কথা, তার সঙ্গে দৃশ্য-অবস্থান তুলনা ক'রে টলেমী দেখতে পান যে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে এই দুই অবস্থানের ভিতরে যথেষ্ট মিল থাকলেও, অন্য সময়ে এই দুই অবস্থানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় অর্থাৎ অমা-বস্যা ও পূর্ণিমাতে চন্দ্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেই হিপারকাসের মতবাদ সৃষ্টি হয়। এই মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য টলেমী পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা ছাড়া অন্য সময়েও চন্দ্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার ফলেই তিনি এই অসমতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এই অসমতা দেখানোর জন্যও একটি epicycle এবং একটি deferrent-এর প্রয়ো-জন হয়। টলেমীর মতবাদ এত সূক্ষ্ম যে, তাঁর গণনা ও পর্যবেক্ষণে কোন সময়েই ১০ মিনিটের বেশী পার্থক্য হয় নাই।

এখানেই epicycle মতবাদের দুর্বলতা অতি প্রকটভাবে ধরা পড়ে। এই মতবাদ অনুসারে কোন কোন সময়ে চাঁদেব দূরত্ব অন্য সময়েব চেয়ে



রেখাচিত্র ২৩ : এপিসাইকেল ও ডেফারেন্ট
S'=এপিসাইকেলেব কেন্দ্র
বিন্দুচিহ্নিত বড় বৃত্তটি ডেফারেন্ট ও ছোট বৃত্তটি এপিসাইকেল

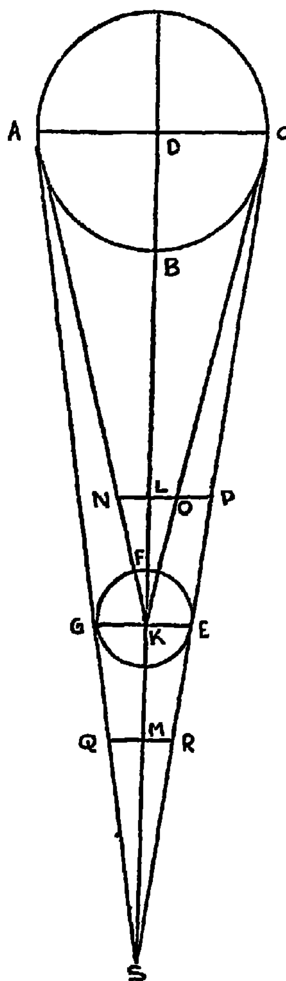
দ্বিগুণ হওয়া উচিত, অর্থাৎ কোন সময় চাঁদেব ব্যাস অন্য সময়েব চেয়ে দ্বিগুণ হওয়ার কথা। কিন্তু পর্যবেক্ষণে কোন সময়েই এরূপ দেখা যায় না। চাঁদেব ব্যাসার্ধ সব সময়েই প্রায় একইরূপ থাকে। টলেমী এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু তিনি এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই।

'আলমাজেস্টে'র পঞ্চম খণ্ডে টলেমী প্রধানতঃ আস্তারলাবের বিবরণ দিয়েছেন। এই একটিমাত্র যন্ত্রই ছিল তাঁর প্রধান সহায। আস্তারলবের বিবরণের পরে তিনি চন্দ্রের লম্বন এবং সূর্য ও চন্দ্রেব দূরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। লম্বনের সাহায্যে টলেমী যেভাবে চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় করেন, বর্তমানেও অনেকটা সেই একইভাবে চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এইভাবেই টলেমী প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৫৯ গুণ। এরপরে তিনি হিপারকাসের গ্রহণ-পদ্ধতি অনুসারে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের

দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ১২১০ গুণ বলে প্রমাণ করেন। কিন্তু এই দূরত্ব সূর্যের প্রকৃত দূরত্বের ২০ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

'আলমাজেস্টে'র ষষ্ঠ খণ্ডে গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে হিপারকাসের মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

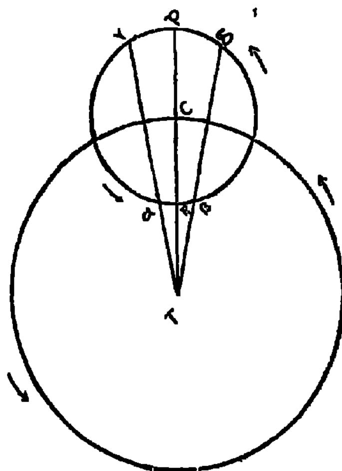
'আলমাজেস্টে'র সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে একটি তারার তালিকা এবং বিষুবনের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তালিকাটিতে মোট ১০২৮টি তারার উল্লেখ আছে এবং এর ভিতরে তিনটি তারার দুইবার ক'রে উল্লেখ করা হয়েছে। টলেমীর এই তারার তালিকা এবং হিপারাকসের তারার তালিকার ভিতরে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যই নাই। এমনকি রোড্‌স্ থেকে হিপারকাস যে সমস্ত তারা দেখতে পান নাই, কিন্তু আলেক-জান্দ্রিয়া থেকে টলেমী দেখতে পেতেন যে, সে সমস্ত তারাও



রেখাচিত্র ২৪ : গ্রহণ-পদ্ধতি অনুসারে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয়
গ্রহণ-সময়ে
D=সূর্যের কেন্দ্র, K=পৃথিবীর কেন্দ্র
M=চন্দ্রের কেন্দ্র
SQG, SRE=পৃথিবীর ছায়াশঙ্কুর সীমা

টলেমীর তালিকাতে নাই। হিপারকাসের মতে বিষুবনের গতি বার্ষিক ৩৬ সেকেণ্ড। এই গতির হিসাবে টলেমী হিপারকাসের তালিকার তারা-সমূহের পরিবর্তিত অবস্থান দেখিয়েছেন মাত্র। তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ ক'রে কোন তালিকা প্রণয়ন করেছেন বলে মনে হয় না।

'আলমাজেস্টে'র শেষ পাঁচ খণ্ডে গ্রহের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যাতে টলেমীর এই বিষয়ই সবচেয়ে বড় অবদান।



রেখাচিত্র ২৫ : টলেমীর আলমাজেস্টে গ্রহের বক্রগতির ব্যাখ্যা
T=পৃথিবী, ডেফারেণ্টের কেন্দ্র
C=এপিসাইকেলের কেন্দ্র
α, β=গ্রহের স্থির গতি
α থেকে β গ্রহের বক্রগতি
β থেকে α গ্রহের অগ্রগতি

গ্রহসমূহের গতি অত্যন্ত জটিল; এদের গতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। সূর্য ও চন্দ্রের গতিও অনিয়মিত; কিন্তু কিছু কিছু সংশোধন ক'রে, এবং কিছু উপেক্ষা ক'রে এদের গতি আলোচনা করা সম্ভব। গ্রহসমূহের গতি অত্যন্ত বিচিত্র। সব সময় এরা পশ্চিম দিক

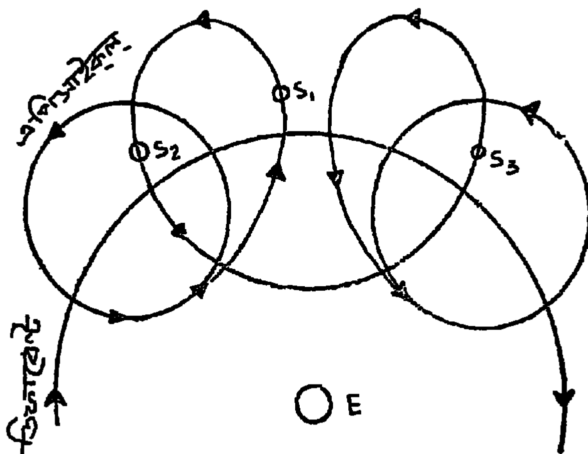
থেকে পূবদিকে যায় না। কোন সময়ে স্থির হয়ে থাকে, আবার কোন সময়ে বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পূবদিক থেকে পশ্চিম দিকেও যায়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই, অন্ততপক্ষে ইউডক্সাসের সময় থেকে তো বটেই, জ্যোতির্বিদগণের একটা ধারণা ছিল যে, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি অন্য একটি কাল্পনিক গ্রহের চারদিকে ঘোরে এবং বুধ ও শুক্র সূর্যের চারদিকে ঘোরে। সে জন্যই পৃথিবী থেকে এদের গতি এমন বিচিত্র দেখায়। গ্রহসমূহের এই বিচিত্র গতি, গোলকের উপর গোলক সাজিয়ে অথবা এপিসাইকেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ইউডক্সাস গোলকের সাহায্যে এই গতির ব্যাখ্যা করেন, এবং পরবর্তী কালে আপোলোনিয়াসের জ্যামিতির সাহায্যে এপিসাইকেল দ্বারাও এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। টলেমী এপিসাইকেলের সাহায্যে গতিসমূহের ব্যাখ্যা করেন এবং পরবর্তী যুগে এই ব্যাখ্যাই সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়।

জ্যোতির্বিদ্যাতে টলেমীর অবদান সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। মধ্য-যুগে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে টলেমীকেই একমাত্র প্রামাণ্য ব্যক্তি বলে মনে করা হতো এবং এ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা হতো। কিন্তু আরিস্টটলের মতবাদ সে সময়ে ধর্মীয় পর্যায়ে পরি-ণত হয়েছে। সেজন্য টলেমীর কোন মতবাদ যদি আরিস্টটলের মতের বিরোধী হতো, সেখানে আরিস্টটলকেই অভ্রান্ত বলে মানা হতো। বর্তমানে বিশেষভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, হিপারকাসের কার্যাবলীর উপরেই টলেমীর অবদান প্রতিষ্ঠিত। টলেমী নিজেও কখনও একথা অস্বীকার করবার চেষ্টা করেন নাই। যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ টলেমীর নিজের বলে উল্লেখ করেছেন, তার প্রায় প্রত্যেকটিই হয় কল্পিত, না হয় অত্যন্ত স্থূল। অবশ্য তাঁর কার্যাবলীতে একথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন অসাধারণ গণিতবিদ ছিলেন। গ্রহসমূহের গতি সম্বন্ধে টলেমীর অবদান সম্পূর্ণ নিজস্ব না হলেও, তিনি যে হিপার-কাস প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্বিদের কার্যাবলী রক্ষা করেছেন, সেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

টলেমীব মৃত্যুর পব গ্রীক-জ্যোতির্বিদ্যাব আব বিশেষ কোন আলোচনা হয নাই এবং গ্রীক-পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে আব বেশী আলোচনা কববাব প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই।

টলেমী ও বিশ্বের আকৃতি

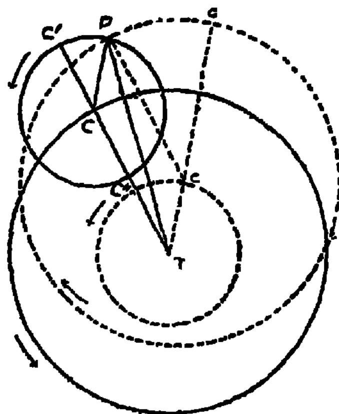
চাঁদ, সূর্য, গ্রহ ও তাবা নিযেই ছিল সে যুগেব বিশ্ব। এই বিশ্বের আকৃতি কেমন, এ নিযে বিভিন্ন প্রকার মতবাদও প্রচলিত ছিল। অ্যাবিস্ট-টল বলেছেন, গোলকেব স্তবেব উপব গোলকেব স্তর সাজিযে এ বিশ্ব গঠিত। একটি গোলকে চাঁদ, অন্য গোলকে সূর্য, প্রত্যেকটিব গ্রহের বিভিন্ন গোলক, স্থির তারাদের একটি গোলক, ইত্যাদি নিযে বিশ্ব গঠিত। অ্যাবিস্টটলের এই বিশ্বকে অনেকে পেঁযাজেব সাথে তুলনা কবেছেন। পেঁযাজেব একটি স্তরেব নীচে যেমন আব একটি স্তব থাকে, এবং এইভাবে স্তবে স্তবে পেঁযাজ গঠিত, আরিস্টটলের বিশ্বেব গঠনও অনেকটা সেইরূপ। গোলকেব উপব গোলক, তার উপবে গোলক সাজিযে এই বিশ্ব গঠিত।



বেখাচিত্র ২৬ : টলেমীব বিশ্ব

কিন্তু টলেমীর বিশ্বের আকৃতি অন্যরূপ। এখানে একটি বিরাট ও জটিল নাগবদোলাব সাথে বিশ্বেব তুলনা কবা যেতে পারে। নাগব-

দোলাতে যেমন একটা বিরাট চাকা ঘুরতে থাকে, আর সেই চাকার বিভিন্ন অংশে বাঁধা ছোট ছোট আসনে লোক বসে থাকে। এ সমস্ত লোকের গতি অত্যন্ত বিচিত্র। কোন সময় এরা নীচের দিকে ঝুলে থাকে, কোন সময়ে উপরের দিকে উঠে যায়, কোন সময় বামে, কোন সময়ে দক্ষিণে এদের গতি। বাইরের চাকা ঘোরে তার কেন্দ্র বা অক্ষের চারদিকে, আর সেই চাকার বিভিন্ন অংশে বাঁধা আসনগুলো ঘোরে সেই বাঁধা জায়গার চারপাশে। টলেমীর বিশ্ব এর চাইতেও জটিল। এখানে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট চাকা ঘুরছে। সেই চাকার বিভিন্ন অংশে আবার ছোট ছোট চাকা আছে। সেই চাকাগুলো বাঁধা জায়গার



রেখাচিত্র ২৭ : বিকেন্দ্রিক ও এপিসাইকেল দুই পদ্ধতির একত্র সংযোজন
T=পৃথিবী, P=গ্রহ

চারদিকে ঘুরছে। এই সমস্ত ছোট চাকার বিভিন্ন অংশেই আবার আরো ছোট চাকা বাঁধা আছে। এই চাকাগুলোর কোন অংশের চারদিকে হয়তো কোন গ্রহ ঘুরছে। এমনিভাবে চাকার উপরে চাকা, তার উপরে চাকা সাজিয়ে টলেমীর বিশ্ব গঠিত। এই বিচিত্রভাবে বিশ্বগঠন

কল্পনার প্রধান কারণ আরিস্টটলের প্রভাব। আরিস্টটলের মতে জ্যামিতিক আকারসমূহের মধ্যে বৃত্তাকারই সর্বাঙ্গসুন্দর (perfect), আকাশের খ-বস্তুসমূহ সর্বাঙ্গসুন্দর। অতএব এদের গতিপথ সর্বাঙ্গসুন্দর পথ বৃত্তের দ্বারা গঠিত। কিন্তু পর্যবেক্ষণ দ্বারা গ্রহের যে গতিপথ লক্ষ্য করা যায়, তা মোটেই বৃত্তাকার নয়। কোন সময়ে এরা সামনে যায়, কোন সময়ে স্থির থাকে, কোন সময়ে পিছনে যায়। এই বিচিত্র গতিকে বৃত্তাকারে ব্যাখ্যা করবার জন্যই এত বৃত্তের উপর বৃত্তের গঠনের প্রয়োজন হয়। যে-কোন গতিই, সে যত জটিলই হোক না কেন, এমনকি সরল রেখাতেও যদি হয়, বৃত্তাকার গতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়। আরিস্টটলের সর্বাঙ্গসুন্দর গতিপথকে রক্ষা করতে যেয়ে এত বেশী বৃত্তের আমদানী করতে বাধ্য হন।

মুসলিম রাজত্বের অবসানের পর স্পেনের রাজা কাস্টিলোর দশম আলফানসো একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যাতেও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি 'জ্ঞানী আলফানসো' নামেই সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। টলেমীর বিশ্বের এই বিচিত্র গঠন সম্বন্ধে তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেছেন, "বিশ্বসৃষ্টির সময় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তা হলে আমি এর চাইতে অনেক সহজ ও সুন্দর আকৃতির সন্ধান দিতে পারতাম।"

টলেমীর পরে গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা

আলেকজান্দ্রিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে টলেমী সর্বশেষ ব্যক্তি। এঁর পরে প্যাপাস, ডাওফেন্টাস প্রমুখবড় বড় গণিতবিদের আবির্ভাব হয়, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যাতে এঁদের কোন অবদান নাই। আলেকজান্দ্রিয়ার সমস্ত শিক্ষায়তনে টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যাই ছিল একমাত্র পাঠ্যপুস্তক। টলেমীর বইয়ের উপর আলেকজান্দ্রিয়ার থিওন একখানা ভাষ্য লেখেন। ইনিই আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবহার করবার শেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। এঁর জীবদ্দশাতেই কতকগুলি বর্বর

খ্রীস্টান ৩৮৯ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থাগারটি পুড়িয়ে দেয়। এই উন্মত্ত জনতা থিওনের মেয়েকেও হত্যা করে। অথচ এই মেয়েটিকে গ্রীকসভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতিমূর্তি বলে মনে করা হতো। এর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক-দর্শন ও গ্রীক-বিজ্ঞানের যবনিকপাত হয়। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

মুসলিম যুগে জ্যোতির্বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীর মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ

আল-ফাজারী

আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলিফা আল-মনসুরের শাসনকালে (৭৫৪-৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ) আবু ইসহাক ইবরাহীম আল-ফাজারী একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ইনি প্রধানতঃ গণিতবিদ হলেও জ্যোতির্বিদ্যাতে এঁর অনেক অবদান আছে। আল-ফাজারীর উৎসাহে খলিফা আল-মনসুর ভারতের জ্যোতির্বিদ কঙ্ককে বাগদাদে তাঁর রাজসভায় নিয়ে আসেন। জ্যোতির্বিদ্যাতে তখন ভারতের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। ভারতের সিদ্ধান্তসমূহের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৫৬ হিজরীতে (৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে) কঙ্ক খলিফার দরবারে আসেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যাতে পণ্ডিত ছিলেন এবং গ্রহণাদি সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে গণনা করতে পারতেন। যে বইয়ের সাহায্যে তিনি এই সমস্ত গণনা করতেন, আরবীতে তাকে 'সিন্দহিন্দ' বলা হয়েছে। 'সিন্দহিন্দ' কথাটি 'সিদ্ধান্তে'র বিকৃতরূপ বলেই অনেকের ধারণা।

ভারতীয় জ্যোতিষ তিন শাখায় বিভক্ত: গণিত, হোরা এবং সংহিতা। যে শাখায় গ্রহগণের গতির বিষয় আলোচনা করা হয় তাকে গণিতশাস্ত্র বা তন্ত্র বলে। জ্যোতিষের গণিতশাস্ত্র আবার দুই প্রকার: 'সিদ্ধান্ত' ও করণ। 'সিদ্ধান্তে' প্রমাণাদি প্রয়োগের পরে প্রত্যেকটি ফল নির্ধারণ করা হয়। 'করণে' কেবলমাত্র গণনা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা থাকে; অবস্থান

বিষয়ক সূত্র দ্বারা গ্রহের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কি উপায়ে সেই সূত্র আবিষ্কার করা যায়, 'করণে' তার কোন উল্লেখ থাকে না। 'করণে'র উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবার জন্যই ভারতবর্ষ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা উঠে যায়; তার পরিবর্তে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়, এবং শেষ পর্যন্ত কোষ্ঠী ইত্যাদি গণনাকার্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাতে পাঁচখানা সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি হচ্ছে, (১) সূর্যসিদ্ধান্ত, (২) বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, (৩) পৌলিশ সিদ্ধান্ত, (৪) রোমক সিদ্ধান্ত, (৫) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। আলবেরুনীর মতে, এই সমস্ত সিদ্ধান্তই ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বা পৌলিশ সিদ্ধান্ত থেকে গৃহীত। অনেকে সূর্যসিদ্ধান্তকে প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন; তাদের মতে স্বয়ং সূর্যদেব এই গ্রন্থখানির রচয়িতা। বর্তমানে প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্তের প্রথমেই বলা হয়েছে যে, "সত্যকাল অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকতে মায়াসুরকে স্বয়ং সবিতা গ্রহ-চরিত দান করেন।" এর উপরে নির্ভর ক'রে যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় সূর্যসিদ্ধান্ত ২২ লক্ষ বৎসর পূর্বের রচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। আল-বেরুনী বলেছেন, সূর্যসিদ্ধান্ত লাটদেবের রচনা, এবং বরাহমিহির বলেছেন, 'লাটাচার্য যবনপুরের সঙ্গে সংস্রব রাখিতেন', অর্থাৎ ইনি গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'জ্ঞান ভাস্কর' গ্রন্থে ময়কে যবন-পুরের অধিবাসী বলা হয়েছে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, 'ময়' অসুর, গ্রীক টলেমী নামের বিকৃত রূপ।

খলিফা আল-মনসুরের দরবারে যে সিদ্ধান্ত আনীত হয়, অনেকে মনে করেন, সেখানা মূল পাঁচ সিদ্ধান্তের একখানাও নয়, ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তকেই সিন্দহিন্দ নামে আরবীতে অনুবাদ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত ছাড়া ব্রহ্মগুপ্তের একখানা 'করণ' গ্রন্থও এই সময়ে অনুবাদ করা হয়। খলিফা আদেশ করেন যে, ভারতীয় যে বইতে জ্যোতির্বিদ্যার যাবতীয় গণনাকাজ সম্বন্ধে লেখা আছে, সে বই আরবীতে অনুবাদ করতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এর সাহায্যে গ্রহাদির গতি নির্ণয়ের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আল-ফাজারী সেই আদেশ অনুসারে সর্বপ্রথম এই

সিদ্ধান্তের অনুবাদ করেন। খলিফার আদেশক্রমে টলেমীর Syntaxis-ও আরবীতে অনুবাদ করা হয় বলে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। কিন্তু কে এই অনুবাদ করেন, তা জানা যায় না।

যতদূর জানা যায়, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য আল-ফাজারীই সর্বপ্রথম আস্তারলাব নির্মাণ করেন। তিনি আরবদের বর্ষ গণনাপদ্ধতি অনুসারে পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। ৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

আবু ইসহাক আল-ফাজারীর পুত্র আবু আবদুল্লাহ সোলায়মান ইবনে ইবরাহিম আল-ফাজারীও একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন।

ইয়াকুব ইবনে তারিক

খলিফা আল-মনসুরের দরবারে ইয়াকুব ইবনে তারিক ছিলেন আর একজন উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদ। ৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে খলিফার দরবারে ভারতীয় পণ্ডিত কঙ্কের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে, এবং কঙ্কের অনুপ্রেরণাতেই তিনি জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয় আল-ফাজারীকে 'সিন্দহিন্দ' অনুবাদে সাহায্য করা ছাড়াও, তিনি প্রথম ফাজারীর পঞ্জিকা প্রণয়নেও সাহায্য করেছিলেন। প্রতি অর্ধ ডিগ্রীর সাইনের সাহায্যে (আরবীতে এই প্রণালীকে 'কারদা গাস' বলা হয়। সম্ভবতঃ 'ক্রমজ্যা' শব্দ থেকেই 'কারদা গাস' শব্দের উৎপত্তি) গ্রহণাদির সমস্যা সমাধানের জন্য ইনি একখানা পুস্তকও প্রণয়ন করেন। ৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

মা'শা'ল্লাহ

মুসলিম যুগের জ্যোতির্বিদগণের ভিতরে অনেক অমুসলমান জ্যোতির্বিদও ছিলেন। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে মা'শা'ল্লাহ নামে একজন ইহুদী বাগদাদে জ্যোতির্বিদ্যাতে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি প্রধানতঃ জ্যোতিষ

আলোচনা করতেন। তবে সূর্য ও তারাসমূহের উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য তিনিও আস্তারলাব নির্মাণ করেন। তাঁর আস্তারলাবের উপর নির্ভর করেই দ্বাদশ শতাব্দীতে রাব্বি বেন এজরা এ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে যশস্বী হন। নবম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আল-ফারগানীর কার্যাবলীতেও এঁর প্রভাব দেখা যায়। ইনি ৮১৫ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

আস্তারলাব: মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের অনেকেই আস্তারলাবের উন্নতি সাধন করেন বলে জানা যায়। Astrolab কথাটি থেকেই আস্তারলাব শব্দের উৎপত্তি। খ-পদার্থসমূহের উন্নতি নির্ণয়ের জন্যই এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হতো, এবং এর সাহায্যেই বিভিন্ন খ-পদার্থের অবস্থানও নির্ণয় করা হতো। অনেকে মনে করেন, হিপারকাস বা এপোলো-নিয়াস সর্বপ্রথম এটি আবিষ্কার করেন। মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ এর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। বিশেষ করে তাঁরা এতে একটি নির্দেশক কাঁটা সংযোগ করেন এবং এই কাঁটাটির নাম দেন 'আল-ইদাদ'। এই কাঁটার সাহায্যেই সমস্ত পর্যবেক্ষণ করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ষষ্ঠাংশ (sextant) আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত, জ্যোতির্বিদ ও নাবিক উভয় সম্প্রদায়ই আস্তারলাব ব্যবহার করতেন।

খলিফা আল-মামুন ও জিজ আল-মুমতাহান

খলিফা আল-মামুনের আদেশক্রমে পৃথিবীর আয়তন নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়; এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের এক ডিগ্রী পরিমিত জায়গার পরিমাপ নির্ণয়ের ব্যাপারে খলিফা আল-মামুনের প্রচেষ্টার উল্লেখ অনেক জায়গায় দেখা যায়। কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক বা জ্যোতির্বিদ তাঁকে সাহায্য করেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এ কথা সবাই স্বীকার করেন যে, অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদ তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকতেন ও তাঁর অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হতেন। তাঁর আদেশক্রমে বাগদাদ, দামেস্ক ও সামাসিয়ার মানমন্দির থেকে খ-বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ ক'রে একটা তালিকা তৈরী করা হয়। এই তালিকা

আল-মামুনের তালিকা বা পরীক্ষিত তালিকা (জিজ আল-মুমতাহান) নামে পরিচিত। এই তালিকাতে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণসমূহ 'সিন্দহিন্দে'র পদ্ধতি অনুসারে করা হয় এবং সেইভাবে লিপিবদ্ধও করা হয়। খলিফার আদেশক্রমে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। এই গ্রন্থখানি পরে লাটিনে অনূদিত হয়। লাটিন অনুবাদের নাম "Astronoma Elaborate Compluribus DU Jussus Rogis Maimon." এই সময়েই বিষুবরেখা, বিষুবন-বিন্দু, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতু ইত্যাদি নানা বিষয়ে বহু তথ্য নির্ণয় করা হয়। এ সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ জানা যায় নাই। জিজ আল-মুমতাহান প্রণয়নে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে আবু আলি ইয়াহিয়া ইবনে আবি মনসুর একজন। ইনি প্রথমে অগ্নি-উপাসক ছিলেন, পরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি সামাসিয়া মানমন্দিরের পরিচালক ছিলেন। আল-আব্বাস ইবনে সাইদ আল-জওহেরী, সনদ ইবনে আলী প্রমুখ জ্যোতির্বিদ তাঁর সঙ্গে এই মানমন্দিরে কাজ করতেন। এঁরা সম্মিলিতভাবে অনেক পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেগুলি জিজ-ভুক্ত করেন। ৮৩১ খ্রীস্টাব্দে আবু আলী ইয়াহিয়ার মৃত্যু হয়। এই সময়ে হারুন ইবনে আলী, আল-তাবারী, আবুবকর প্রমুখ জ্যোতির্বিদেরও নাম জানা যায়। ইবনে আলি ছিলেন আলী ইয়াহিয়ার পৌত্র। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেন। আল-তাবারী জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে 'কিতাবুল ওসুল বেন্-নজুম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল মাবোযার রোজী আর একজন জ্যোতির্বিদ, যিনি 'জিজ আল-মুমতাহান' প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি দামেস্ক ও বাগদাদ উভয় মানমন্দিরেই পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর উপর ভার ছিল, সমস্ত জ্যোতির্বিদের পর্যবেক্ষণফল লিপিবদ্ধ করা। প্রধানতঃ তিনিই এগুলির সঙ্কলন করেন। এঁর পৌত্র ওমর 'আলমুসাত্‌তাহ' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

খলিফা আল-মামুনের দরবারের অন্যতম বৈজ্ঞানিক ছিলেন আলী ইবনে ঈসা আসতারলাবী। আস্তারলাব ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণে দক্ষ ছিলেন বলেই তাঁকে আস্তারলাবী বলা হতো। অনেকের ধারণা, খলিফা আল-মামুনের নির্দেশে ইনিই পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করবার চেষ্টায় এক ডিগ্রী পরিমিত স্থানের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। তদানীন্তন মানমন্দিরসমূহে এঁর নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো।

আল-ফারগানী

আল-মামুনের দরবারের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ছিলেন আল-ফারগানী। এঁর পুরা নাম আবুল আব্বাস ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কাছির আল-ফারগানী। পাশ্চাত্য জগতে ইনি আলফ্রাগানাস নামে পরিচিত। এঁর প্রণীত "জামি এলমুল নজুম ওযাল হরকত আল সামাযিয়া" গ্রন্থখানি পাশ্চাত্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে বলা চলে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থখানি *Elements of Astronomy* নামে লাটিনে অনূদিত হয়। ইউরোপে রেনেসাঁস যুগে রেজিওমন্টেনাস এই অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। ফরাসী ও হিব্রু ভাষাতেও এই গ্রন্থখানির অনুবাদ করা হয়। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আল-ফারগানীর এই বইখানিকে জ্যোতির্বিদ্যার একমাত্র প্রামাণ্য বই বলে মনে করা হতো। এই বইখানা ছাড়া আস্তারলাব সম্বন্ধেও তিনি দুইখানা বই লেখেন। বই দুইখানার নাম 'আল-কামিল ফিল আস্তারলাব' এবং 'ফি সানাতাল আস্তারলাব বিল হান্দাসা'।

পাঁচটি গ্রহ সম্বন্ধে আল-ফারগানীর নিজস্ব মতবাদ ছিল। অবশ্য পরে তাঁর সেই মতবাদ অন্যান্য মুসলিম জ্যোতির্বিদগণও মেনে নেন। টলেমীর গ্রহপদ্ধতিকে গণনাকার্যের সাহায্যের জন্য কেবলমাত্র জ্যামিতিক প্রণালী বলে স্বীকার ক'রে নিয়েই আলফারগানী ক্ষান্ত হন নাই, তিনি গ্রহসমূহের প্রকৃতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি এগুলিকে কঠিন স্ফটিক গোলক বলে মনে করতেন। চন্দ্রের উপরে আলাসিরের কোন

ওজন নাই এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়। এই পদার্থ দ্বারাই গ্রহ এবং গ্রহ-গোলকের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরো মনে করতেন যে, বিভিন্ন গ্রহের গোলকসমূহের ভিতরে কোন শূন্যস্থান নাই। এক গ্রহের বৃহত্তম দূরত্ব পরবর্তী উচ্চতর কক্ষে অবস্থিত গ্রহের ক্ষুদ্রতম দূরত্বের সমান। আল-ফারগানীর মতে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৩২৫০ মাইল। এর সঙ্গে আল-মামুনের এক ডিগ্রী পরিমিত জায়গার পরিমাপ ৫৬$\frac{২}{৩}$ মাইলের সঙ্গতি আছে। আলফারগানী অন্যান্য গ্রহেরও দূরত্ব নির্ণয় করেন। পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে একক ধরে, অন্যান্য গ্রহের বৃহত্তম দূরত্ব তাঁর গণনা মতে নিম্নরূপ :

চন্দ্র	৬৪$\frac{১}{৬}$
বুধ	১৬৭
শুক্র	১১২০
সূর্য	১২২০
মঙ্গল	৮৮৭৬
বৃহস্পতি	১৪৪০৫
শনি	২০১১০

গ্রহসমূহের বৃহত্তম দূরত্ব নির্ণয় করা ছাড়া আল-ফারগানী গ্রহসমূহের ব্যাসার্ধও নির্ণয় করেন। চন্দ্র যখন অপভূতে অবস্থান করে, তখন তার দৃশ্য-ব্যাসার্ধ এবং অন্যান্য গ্রহের গড়-দূরত্বের ব্যাসার্ধ তিনি পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় নির্ণয় করেন। নিম্নে এই সমস্ত ব্যাসার্ধ দেওয়া গেল :

গ্রহ		দৃশ্য ব্যাস	প্রকৃত ব্যাস (পৃথিবীর ব্যাস=১)
চন্দ্র, অপভূতে		৩১$\frac{১}{৫}$ মিনিট	১ : ৩$\frac{২}{৫}$
সূর্য, গড় দূরত্বে		৩১$\frac{১}{৫}$ "	৫$\frac{১}{২}$
বুধ	"	সূর্যের $\frac{১}{১৫}$	$\frac{১}{২৮}$
শুক্র	"	" $\frac{১}{১০}$	১ : ৩$\frac{১}{৩}$
মঙ্গল	"	" $\frac{১}{২০}$	১$\frac{১}{৬}$
বৃহস্পতি	"	" $\frac{১}{১২}$	৪$\frac{১}{২}$+$\frac{১}{১৬}$
শনি	"	" $\frac{১}{১৮}$	৪$\frac{১}{২}$

আল-ফারগানী জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। এর মধ্যে বিষুবন-চলন সম্বন্ধে তাঁর মতামতের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ টলেমীর দেওয়া বিষুবন-চলনের মান গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আল-ফারগানী টলেমীর মতই স্বীকার করে নেন যে, প্রতি ৬৬ বৎসরে বিষুবনের এক ডিগ্রী অগ্রগমন হয়। গণিতজ্ঞ হিসাবেও আল-ফারগানী বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এবং সবাই তাঁকে 'আল-হাসিব' বলেই ডাকত। তাঁর মৃত্যুসময় সঠিক জানা যায় না।

আল-খারেজমী

খলিফা আল-মামুনের দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুসা আল-খারেজমী। এঁকে বীজগণিতের জন্মদাতা বলা যেতে পারে। ইনিই সর্বপ্রথম সমীকরণ (মুকাবেলা) ও পক্ষ-পরিবর্তন (আল-জেবর)-এর প্রবর্তন করেন। এবং তাঁর বই 'আলজিবর ওয়াল মুকাবিলা'-এর নাম থেকেই 'আলজেবরা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বীজগণিত ও গণিতের অন্যান্য শাখাতেও এঁর অবদান অপরিসীম। ইনি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ বলে এখনও গণিতজগতে স্বীকৃত।

পারস্যের অন্তর্গত আরল হ্রদের দক্ষিণে খিভা প্রদেশের খারেজম নামক জায়গায় তাঁর জন্ম হয়। এজন্যই তিনি খারেজমী নামে পরিচিত। এঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে পরবর্তী জীবনে তিনি খলিফা আল-মামুনের লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ছিলেন বলে জানা যায়। এই লাইব্রেরীতে থাকা কালেই তিনি গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতি আকৃষ্ট হন। খলিফা আল-মামুন কোন একটা বিশেষ কাজে আফগানিস্তানে একটি মিশন পাঠান; আল-খারেজমী এই মিশনের একজন সদস্য ছিলেন। আফগানিস্তান থেকে তিনি ভারতবর্ষেও আসেন এবং সেখানকার গণিতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলনের ফলেই গণিতের প্রতি তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তী জীবনে গণিত নিয়ে চর্চা করেন।

সে যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সর্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হতো এবং প্রত্যেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করতেন। আল-খারেজমীর প্রধান চর্চার বিষয় গণিত হলেও, তিনি জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন; এবং এক্ষেত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আল-ফারগানীর মত ইনিও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আলফারগানীর বইয়ের মত এগুলি জনপ্রিয় না হলেও আল-খারেজমীর বইগুলি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অধীত হতো এবং সেগুলিকে প্রামাণ্য বই হিসাবেই গণ্য করা হতো। আডিলার্ড (Adilard of Bath) এবং রবার্ট (Robert of Chesh) আল-খারেজমীর এই বই-গুলিকে লাটিনে অনুবাদ করেন। মৌলিক বই ছাড়াও তিনি 'সিন্দহিন্দের' দুইটি সংস্করণ সম্পাদনা করেন এবং তার একখানা সংক্ষিপ্তসারও প্রণয়ন করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি নিজে অনেক পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও অন্যান্য সহকর্মীদের পর্যবেক্ষণের ফলা-ফল নিয়ে তিনি একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর নাম দেওয়া হয় 'ফিজিজ'। এই 'ফিজিজে' কেবলমাত্র তালিকা ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করা আছে। কিন্তু এই তত্ত্বগুলি কি ছিল, তার কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকের মতে, তিনি চন্দ্র, চান্দ্রমাস ও পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর এই তালিকা বা 'জিজ' পরবর্তীকালে এত বেশী প্রসিদ্ধিলাভ করে যে, এই তালিকার জন্য আল-খারেজমীকে 'সাহেব-অল-জিজ' বলে অভিহিত করা হতো।

আল-খারেজমী আস্তারলাব সম্বন্ধেও দু'খানা বই প্রণয়ন করেন। এর একখানিতে এ বিষয়ে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কৌশল বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। এ বইখানার নাম 'কিতাবুল আমল আল-আস্তারলাব'। দ্বিতীয় বইখানিতে আস্তারলাব ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া আছে। এ বইখানার নাম 'কিতাবুল আমল বিল-আস্তারলাব'। সূর্যঘড়ি সম্বন্ধেও

তিনি একখানা বই প্রণয়ন করেন বলে জানা যায়। খলিফা আল-মামুনের প্রেরণায় তিনি আকাশের একটা মানচিত্র প্রণয়ন করেন। আকাশের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তারাসমূহের অবস্থিতি দিয়ে এই মানচিত্রখানা সমৃদ্ধ। ৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে আল-খারেজমীর মৃত্যু হয়।

বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়

খলিফা আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট শেষ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের পিতা মুসা বিন শাকির, খলিফা আল-মামুনের দরবারের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। শাকিরের মৃত্যুকালে তাঁর তিন ছেলে নিতান্ত শিশু ছিল। খলিফা নিজে এঁদের লেখাপড়ার ভার নেন, এবং পরে তিন ভাই-ই বিজ্ঞানজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এঁরা তিন ভাই প্রায়ই একসঙ্গে কাজ ক'রে গেছেন; সেজন্য এঁদের তিন ভাইয়ের নাম একত্রে জড়িত দেখা যায়। জ্যোতির্বিদ্যাতে এঁদের কোন মৌলিক আবিষ্কার না থাকলেও, এঁরা অনেক আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ করেন। এঁরা সূর্য-পথের তীর্যকতা, অপভূ, অনুভূ, চন্দ্রের উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয় পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করেন বলে জানা যায়। এঁরা বিষুবন-বিন্দুর অগ্রগমন সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য বা আলোচনার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

হোনায়েন ইবনে ইসহাক

খলিফা আল-মামুনের সমসাময়িক আর একজন বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন হোনায়েন ইবনে ইসহাক। প্রধানতঃ চিকিৎসক হলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইনি নানাবিধ আলোচনা করেন। তিনি টলেমীর *Syntaxis*-এর অনুবাদ করেন। টলেমীর এই বইখানার আসল নাম μεγαλη σηνταξις (Megalı Syntaxis, বৃহৎ সংকলন; এখানে বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার নাম স্মরণ করা যেতে

পারে)। আরবীতে অনুবাদের সময় ভুলবশতঃই হোক বা অভিব্যক্তির জন্যই হোক, μεγάλη-কে μεγιστε, অর্থাৎ greatest, বৃহত্তম বলে লেখা হয়। পরবর্তী যুগে এই বইখানাকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয় যে, একে 'কিতাবুল মাজিস্তি', the greatest book, বৃহত্তম বই বলে আখ্যা দেওয়া হয়। পরে টলেমীর এই বইখানা শুধুমাত্র Almagiste বা Almagist নামেই প্রচলিত হয়। এখনও টলেমীর এই বইখানাকে 'আল-মাজেস্ট' বলা হয়ে থাকে। হোনায়েন বিন ইসহাক 'আলমাজেস্ট' ছাড়া আরো অনেক বই আরবীতে অনুবাদ করেন। ইনি ৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। এঁর মৃত্যুর পরে এঁর পুত্র ইসহাক ইবনে হোনায়েনও বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। তিনিও অনেক বইয়ের অনুবাদ করেন।

ছাবেত ইবনে কোরা

নবম শতাব্দীর শেষ ভাগের আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁর নাম ছাবেত ইবনে কোরা। তিনি আল মামুনের রাজত্বকালে ৮২৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯০১ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। জ্যামিতি ও বীজগণিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট আলোচনা করেন। বাগদাদের মানমন্দিরে তিনি অনেক পর্যবেক্ষণ করেন, এবং তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে যান। তিনি গ্রহসমূহের বিভিন্ন অবস্থান, সৌরবৎসরের দৈর্ঘ্য এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উন্নতি পর্যবেক্ষণ করেন, এবং সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ-তালিকা অনেকদিন পর্যন্ত প্রামাণিক তালিকাসমূহের অন্যতম বলে গণ্য করা হতো। ইবনে কোরার মতে বিষুবন-বিন্দুদ্বয়ের পর্যায়ক্রমিক গতি আছে। যদিও এই মতবাদ পরবর্তীকালে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবু বহুদিন যাবৎ একেই সত্য বলে স্বীকার করা হতো। পরবর্তী যুগে সৌরকেন্দ্রিক পদ্ধতির আবিষ্কর্তা নিকোলাস কোপারনিকাস পর্যন্ত ছাবেত ইবনে কোরার পর্যবেক্ষণ-তালিকাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন।

দশম শতাব্দী

আল-বাত্তানী

মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে যাঁর নাম পাশ্চাত্য জগতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন আল-বাত্তানী। এঁকে মুসলিম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকার করা হয়। পাশ্চাত্য জগতে ইনি Albategnius নামে পরিচিত। এঁর নামে চাঁদের একটা বিখ্যাত খাদের নামকরণ করা হয়েছে।

আল-বাত্তানী নবম-দশম শতাব্দীর লোক। ইনি ৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯২৯ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। তিনি মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত বাত্তান নামক জায়গায় একটি অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং কর্মজীবনে তিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে এঁকে প্রিন্স বলে অভিহিত করা হয়। অত্যন্ত অভিজাত বংশের সন্তান এবং অতি উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত হয়েও ইনি বিজ্ঞানের চর্চাতে এত বেশী উৎসাহী ছিলেন যে, ইনি মধ্যযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে পরিচিত ছিলেন।

আল-বাত্তানী জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট গবেষণা করেন, এবং অনেক পর্যবেক্ষণও করেন। ৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পর্যবেক্ষণকার্য চালান। টলেমীর দেওয়া অনেক ফলই তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ ক'রে পুনরায় সপ্রমাণ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ-ফলসমূহ তিনি তালিকাভুক্ত ক'রে যান। তাঁর পর্যবেক্ষণ-তালিকা পূর্ববর্তী অন্য সমস্ত তালিকা থেকে অনেক বেশী তথ্যবহুল ও জটিল। আল-খারেজমীর 'ফিজিজ' থেকে এর নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য ছিল। 'ফিজিজ' প্রণয়নে ভারতীয় প্রথা অবলম্বন করা হয়েছিল; কিন্তু আল-বাত্তানী সম্পূর্ণ অভিনব ও নিজস্ব প্রথায় এই তালিকা প্রণয়ন করেন। পূর্বেকার আরবীয় ও গ্রীক প্রথা অনুযায়ী তিনি অক্ষর দ্বারা সংখ্যা নির্দেশ করেন এবং সেই অনুসারে তাঁর পর্যবেক্ষণ-তালিকা লিপিবদ্ধ করেন।

আল-বাত্তানী সূর্যের অপভূব খ-দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করেন। তাঁর নির্ণীত এই খ-দ্রাঘিমাংশের পরিমাণ ৮২°১৭′। টলেমীর প্রদত্ত পরিমাণ থেকে ১৬°৪৭′ বেশী। আল-বাত্তানী বিশ্বাস করতেন যে, সূর্যের অপভূব অগ্র-গমনের জন্যই তাঁর ও টলেমীর নির্ণীত দ্রাঘিমাংশের পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়; তা না হলে তাঁর নির্ণীত দ্রাঘিমাংশ ও টলেমীর নির্ণীত দ্রাঘিমাংশ অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। এইভাবে আল-বাত্তানীই সর্ব-প্রথম আবিষ্কার করেন যে, সূর্যের অপভূ স্থির নয়, তার অগ্রগমন আছে। তিনি এই অগ্রগমনের হারও নির্ণয় করেন। তাঁর মতে সূর্যের অপভূর অগ্রগমনের বার্ষিক গতি ৫৪″, অর্থাৎ প্রতি ৬৬ বৎসরে সূর্যের অপভূ এক ডিগ্রী পরিমাণ স্থান এগিয়ে আসে। অবশ্য পরে দেখা গেছে যে, তাঁর নির্ণীত বার্ষিক অগ্রগমনের এই হার শুদ্ধ নয়।

আল-বাত্তানী সূর্যপথের নতির পরিমাণও নির্ণয় করেন। গ্রীক-জ্যোতির্বিদগণের মতে, এই নতির পরিমাণ ছিল ২৩°৫১′২০″; নবম শতাব্দীর খলিফা আল-মামুনের জ্যোতির্বিদগণ এই পরিমাণ প্যান ২৩° ৩৩′। আল-বাত্তানীর মতে এই নতির পরিমাণ হলো ২৩°৩৫′।

আল-বাত্তানী গ্রহসমূহের দূরত্বও নির্ণয় করেন। পৃথিবীর ব্যাসকে একক ধরে তিনি নিম্নরূপ দূরত্বসমূহ নির্ণয় করেন:

চন্দ্র	৬৪⅙
বুধ	১৬৬
শুক্র	১০৭০
সূর্য	১১৪৬
মঙ্গল	৮০২২
বৃহস্পতি	১২৯২৪
শনি	১৮০৯৪

এ ছাড়া আল-বাত্তানী চান্দ্রমাসের সঠিক গণনা, নাক্ষত্রিক ট্রপি-ক্যাল বৎসরের সঠিক দৈর্ঘ্য, ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় গবেষণা করেন। তাঁর গণনা অনুসারে ট্রপিক্যাল বৎসরের সঠিক দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা

৪৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড। এই দৈর্ঘ্য সঠিক দৈর্ঘ্য হতে মাত্র ২৭ মিনিট কম। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হ্যালীর মতে টলেমীর পদ্ধতি অনুসারে গণনা করবার জন্যই আল-বাত্তানীর এই ভুল হয়।

সূর্যের আপাতঃ কৌণিক ব্যাসও আল-বাত্তানী নির্ণয় করেন, এবং টলেমীর গণনার সঙ্গে তাঁর গণনার যথেষ্ট পার্থক্য হয়। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট আলোচনা করেন। বাষিক সূর্যগ্রহণ যে অসম্ভব ব্যাপার নয়, এ বিষয়ে আল-বাত্তানীই সর্বপ্রথম মত প্রকাশ করেন। গ্রহসমূহের গতি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ টলেমীর মতবাদ থেকে কিছু পৃথক ছিল বলে জানা যায়; কিন্তু তাঁর প্রকৃত মতবাদ কি ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

৯২৯ খ্রীস্টাব্দে আল-বাত্তানী পরলোকগমন করেন।

আল-বাত্তানীর কয়েকখানা বইয়ের নাম নীচে দেওয়া গেল ঃ

১। কিতাবুল মারেফাত আল-বুরুজ ফি মা বায়না আরবা আল-ফালাক (জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বই)

২। রিসালা ফি তাহকিক আকদার আল-ইত্তিসালাত (জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বই)

৩। সারাহ আল মাকালাত আল-আরবা লি বাতেমিয়াস (টলেমীর টেট্রাবিলেসের ভাষ্য)

৪। আল-জিজ (জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক)

আল-নাইরেজী

আল-বাত্তানীর সমসাময়িক আর একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন, আল-নাইরেজী। যদিও তিনি আল-বাত্তানীর পূর্বেই মারা যান, তবু তাঁকে আলবাত্তানীর শিষ্য বলা যেতে পারে। কেননা আল-বাত্তানীর জ্যোতি-বিজ্ঞানই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। নৈসর্গিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন কাহিনী দিয়ে এবং সেগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

গোলকীয় আস্তারলাব সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থখানি এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। এই বইখানা চারখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আস্তারলাবের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে গোলকীয় আস্তারলাবের বিবরণ, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এর ব্যবহারের প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জার্মান ভাষায় এই বইখানির অনুবাদ করা হয়।

আল-বাত্তানীর পরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের সকলেই কিছু না কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করেছেন। যদিও তাঁদের অনেকের অবদানই বর্তমানে খুব বড় কিছু বলে মনে হবে না, তবুও তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা চালু রাখার প্রয়াস যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আবুল ওয়াফা ইবনে ইউনুস প্রমুখ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদগণের অবদান সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চিকিৎসক আল-রাজী, সিনান ইবনে ছাবেত, ইবরাহীম ইবনে সিনান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পৃথক পৃথকভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

আবুল ওয়াফা

বাগদাদের সর্বশেষ জ্যোতির্বিদ আবুল ওয়াফা। তিনি সর্বশেষ হলেও কোন অংশেই অন্য কোন জ্যোতির্বিদের চাইতে কম ছিলেন না, বরং অনেকে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। আবুল ওয়াফার একটি আবিষ্কার পরে টাইকো ব্রাহের আবিষ্কার বলে পরিচিত হয়ে এসেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। আর এই অভিযোগ করেছে, পাশ্চাত্যেরই একজন জ্যোতির্বিদ মঃ সেডিলো। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, টাইকো ব্রাহে চন্দ্রের তৃতীয় অসমতা নির্ণয় করেন বলে যে মতবাদ প্রচলিত আছে, তা ঠিক নয়। আবুল ওয়াফার 'আলমাজেস্টে'র ভিতরে 'ইখতিলাফুল মুজাহাৎ' নামে ঠিক একই বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেডিলোর এই অভিযোগ পাশ্চাত্য জগৎ মানতে রাজী হয় নাই; সেজন্য এ

বিষয়ে দারুণ মতবিরোধ দেখা দেয়। বয়ট, লিব্রি প্রমুখ জ্যোতির্বিদ-গণ সেডিলোর কথা শুনতে পর্যন্ত রাজী হন নাই। তাঁরা বলেন, আবুল ওয়াফা চন্দ্রের স্থানচ্যুতির দ্বিতীয় অংশের উল্লেখ করেছেন মাত্র, এবং এই অংশটি টলেমীর প্রসনিউনিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু-দিন এই বাকবিতণ্ডা বন্ধ থাকে। পরে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে অন্য একজন জ্যোতির্বিদ মিঃ চাসেলস আবার আবুল ওয়াফার পক্ষে মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি টলেমীর বর্ণনাতে অনেক ত্রুটির উল্লেখ করেন; এই ত্রুটিগুলি যে আবুল ওয়াফা শুদ্ধ করেছিলেন, সেকথাও তিনি উল্লেখ করেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে মিঃ বারট্রাণ্ড এর জওয়াবে বলেন যে, আবুল ওয়াফার 'আলমাজেস্টে'ও অনেক ভুল দেখা যায়, তিনি আরো বলেন যে, টলেমীর প্রসনিউনিনিসে দ্বিতীয় Anomaly অন্তর্ভুক্ত না থাকায়, আবুল ওয়াফাও প্রসনিউনিনিসে তাঁর 'মুহাজ্জাৎ' যোগ করেন নাই। কিন্তু সেডিলো এবং চাসেলস কিছুতেই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁরা দৃঢ়ভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, টাইকো ব্রাহে নিজের নামে যে আবিষ্কারের দাবী করেছেন, সে আবিষ্কার তিনি আবুল ওয়াফার নিকট থেকে নকল করেছেন।

আবুল ওয়াফার 'আলমাজেস্ট' কোন সময়েই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকটি অধ্যায়ের তিনটি অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ তিনটি মূলতঃ এক; সামান্য যে পার্থক্য দেখা যায় তা উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি প্রথম (কেন্দ্রসমীকরণ) ও দ্বিতীয় (evection) অসমতা সম্বন্ধে নানা বিষয় উল্লেখ করেছেন, এবং কোন্ সময়ে এই অসমতার মান সবচেয়ে বেশী তা নির্ণয় করেছেন। এরপরে তিনি বলেছেন যে, তৃতীয় একটি অসমতা তিনি আবিষ্কার করেছেন। এপিসাইকেলের কেন্দ্র যখন বহির্বৃত্তের অপভূ ও অনুভূর মাঝখানে থাকে, তখন এই অসমতা সংঘটিত হয়। চন্দ্র যখন সূর্য থেকে টাছলিছ বা তাসদিস দূরত্বে অবস্থান করে তখন এই অসমতার মান সর্ববৃহৎ হয়। Syzygy বা Quadrature দূরত্বে এই অসমতা লক্ষ্য করা যায় না। এবং সর্বাধিক

মান ½ ডিগ্রী। এই অসমতার কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি বলেছেন যে, এপিসাইকেলের অপদূরক-রেখার স্থানচ্যুতির জন্যই এই অসমতা সংঘটিত হয়।

কিন্তু এ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ আবুল ওয়াফার কৃতিত্বকে স্বীকার করে নিতে পারেন নাই। তাঁদের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে যে, চন্দ্রের এই তৃতীয় অসমতা যদি আবুল ওয়াফাই আবিষ্কার করে থাকবেন, তা হলে সে কথা তাঁর পরবর্তী আরব বা মুসলীম জ্যোতির্বিদগণ উল্লেখ করেন নাই কেন। নাসিরুদ্দিন আল-তুসী আবুল ওয়াফার 'আলমাজেস্টে'র অনেক সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তিনিও এ সম্বন্ধে কোথাও কিছু উল্লেখ করেন নাই। নাসিরুদ্দিনের পরে মাহমুদ আল-জাজমিনি যে ভাষ্য লেখেন, তাতেও এর কোন উল্লেখ নাই।

যে কোন জায়গা থেকে মক্কার কেবলা শরীফের সঠিক দিক নির্ণয় করা প্রত্যেক মুসলিম জ্যোতির্বিদ বা বৈজ্ঞানিকের অবশ্য কর্তব্য ছিল। প্রত্যেক জিজেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। যে স্থান থেকে কেবলার দিক নির্ণয়ের প্রয়োজন হতো, সে স্থানের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ মক্কার দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের কাছাকাছি হলে গণনার বিশেষ প্রয়োজন হতো না; মোটামুটি দিক সকলেরই জানা ছিল, এবং তাতেই কাজ চলতো। কিন্তু যে জায়গা মক্কা শরীফ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, সেখান থেকে কেবলার দিক নির্ণয় করতে যথেষ্ট সূক্ষ্ম গণনার প্রয়োজন হতো। আল-নাইরেজী সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক-গণনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর গণনাতেও কিছু ভুল থেকে যায়। আবুল ওয়াফা তাঁর 'আলমাজেস্টে' এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং যে-কোন স্থান থেকে কেবলার দিক নির্ণয়ের বিশুদ্ধ গাণিতিক হিসাব দিয়েছেন।

খোরাসান প্রদেশের বুজ্জান নগরে ৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুন আবুল ওয়াফার জন্ম হয়। তাঁর পুরা নাম আবুল ওয়াফা মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসমাইল ইবনে আল-আব্বাস আল-বুজ্জানী। তিনি

আরব কি পারস্যদেশীয়, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মতে, তাঁর পূর্বপুরুষগণ পারস্যদেশের অধিবাসী ছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে আবুল ওয়াফা ইরাকে যান এবং সেখানেই বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করেন ও বিজ্ঞানচর্চা করেন। পরে তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং সেখানেই গবেষণা করেন। ৯৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবুল ওয়াফার পরে দশম শতাব্দীতে আর কোন উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে ইবনে আসাজুর, তাঁর পুত্র আবুল হাসান এবং ক্রীতদাস মুফলিহ্ জ্যোতির্বিদ্যার যথেষ্ট আলোচনা করেন। এঁরা তিনজন সম্মিলিতভাবে বানু আসাজুর নামে পরিচিত। পরবর্তী অনেক গ্রন্থকার এঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁদের প্রণীত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'আল-খালিস' (বিশুদ্ধ), 'আল-মুজায়র' (পরিবেষ্টিত), আলবদ্দি (আশ্চর্যজনক) এবং মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধীয় তালিকা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

আবদুর রহমান সুফীর নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি অনেক পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকে একটা তালিকা প্রণয়ন করেন। এঁর পর্যবেক্ষণ-তালিকা, উলুগবেগ ও ইবনে ইউনুসের তালিকার সম-পর্যায়ের বলে পরিগণিত হয়। স্থির তারা সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা করেন এবং এ সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ বইখানার নাম 'কিতাবুল কাওয়াকির আল-সাবিতা আল-মুসাও-ওয়ার' অর্থাৎ স্থির তারা বিষয়ক গ্রন্থ। ইনি ৯০৩ খ্রীস্টাব্দে রাই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে এঁর মৃত্যু হয়।

আবুল কাশেম আলী ইবনে হোসায়েন আল-আনওয়াই আশ-শারিফুল হোসায়েন দশম শতাব্দীর অন্য একজন জ্যোতির্বিদ। ইনি সাধারণতঃ আবুল কাশেম নামেই পরিচিত। ইনিও অনেক পর্যবেক্ষণ করেন, এবং তা থেকে একটা তালিকা প্রণয়নও করেন। ৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে এঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একাদশ শতাব্দী

আল-খুজান্দী

একাদশ শতাব্দীর প্রথম জ্যোতির্বিদ হিসাবে হামিদ ইবনোল খিদর আবু মোহাম্মদ আল-খুজান্দীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি সাধারণতঃ আল-খুজান্দী নামেই পরিচিত। এঁর জন্মস্থান বা জন্মসময় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মারা যান, এ সম্বন্ধে সবাই একমত। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট কাজ করেন এবং নিজে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেন ও সেগুলি দিয়ে পর্যবেক্ষণ-কাজ চালান। তাঁর নির্মিত প্রথম যন্ত্রটির নাম "আস-সুদ-আল-ফাখরী"। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সেক্স্‌ট্যান্ট। সুলতান ফখরোদ্দৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেন; সেজন্য তিনি তাঁর সেক্স্‌ট্যান্টকে সুলতানের নামানুসারে নামকরণ করেন। এই যন্ত্রটির নির্মাণ-কৌশল বেশ বিচিত্র। ১২ ফুট দূরত্বের ব্যবধানে ৩০ ফুট উঁচু দুইটি দেয়াল নির্মাণ করা হয়। প্রত্যেকটি দেয়াল মাটির নীচেও ৩০ ফুট পর্যন্ত গাঁথা। দক্ষিণ দেয়ালের দক্ষিণ কোণে, এবং সম্ভবতঃ উত্তর কোণেও ছিদ্র বিশিষ্ট গম্বুজ ছিল। এই গম্বুজের চারদিকে ৬০ ফুট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটা সেক্স্‌ট্যান্ট ছিল। পূর্ববর্ণিত দেয়াল দুইটির মাঝখানে অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে পালিশ-করা একটা তলের সাহায্যে সেক্স্‌ট্যান্টটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মাটির নীচে ৩০ ফুট থেকে প্রতি ১০ ইঞ্চি পরপর সেক্স্‌ট্যান্টটির উপরে দাগ কাটা ছিল। গম্বুজের ছিদ্র দিয়ে আলো আসতো, তা একটি সাদা

সমতলের উপর পড়তো। এই সাদা সমতলটি একটা বৃত্তের ভিতর ঘুরতো। এর সাহায্যে সূর্যের সর্বোচ্চ উন্নতি নির্ণয় করা হতো। এই সেক্স্‌-ট্যান্টের সাহায্যে ৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে আল-খুজান্দী সূর্যের সর্বোচ্চ উন্নতি নির্ণয় করেন। এই পদ্ধতিতে মেঘ-বৃষ্টির দিনে সূর্যের উন্নতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সেজন্য কর্কট ও মকর রাশিতে অবস্থানের সময় সূর্যের উন্নতি নির্ণয় করতে তিনি অনুপাতের সাহায্য নেন। এইভাবে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থান নির্ণয় ক'রে তিনি সূর্যপথের নতি-কোণ নির্ণয় করেন। তাঁর গণনা অনুসারে এই নতির পরিমাণ হয় ২৩°৩২'২১"। তখনকার দিনের সর্বজনস্বীকৃত নতি-কোণের সঙ্গে এর পার্থক্য ছিল মাত্র ১২⅛"। সেজন্য অনেকেই আল-খুজান্দীর এই গণনা নির্ভুল বলে স্বীকার করে নিতে পারেন নাই। এমনকি আল-বেরুনী তাঁর 'কানুনে মাসউদী'তেও আল-খুজান্দীর এই গণনা নির্ভরযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। আল-খুজান্দী নানাভাবে তাঁর গণনার নির্ভুলতা প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন ফলই সব সময় একরূপ থাকে না, এদের পরিবর্তন হয়।

'আস-সুদ আল-ফাখরী' ছাড়া 'আল-আলা আস-সামিলা' নামে আর একটি যন্ত্র আল-খুজান্দী নির্মাণ করেন। এ যন্ত্রটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত কাজেই ব্যবহার করা যেত; এবং একে আস্তারলাব বা কোয়াড্রাণ্ট উভয় যন্ত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলতো। প্রথমে এ যন্ত্রটি কেবলমাত্র একটি অক্ষাংশে ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল; পরে সমস্ত প্রকার অক্ষাংশে ব্যবহারের উপযোগী ক'রে এটির পরিবর্ধন করা হয়।

আল-বেরুনী

আল-বেরুনীর মত পণ্ডিত পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছে। গণিত, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, ভূগোল, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। এই জ্ঞান Jack of all trade-এর জ্ঞান নয়, বরং একজন

master-এর জ্ঞান। উপরোক্ত যে কোন বিষযে তাঁর আলোচনা ও সমালোচনা অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। যখনই তিনি কোন বিষযে শিক্ষা করেছেন, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই শিক্ষা করেছেন।

যে কোন বিষয় আলোচনা করতে গিযেই আল-বেরুনী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত দেশের পণ্ডিতগণের মতামত উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের ভিতরে কোথায পার্থক্য আর কোথায সামঞ্জস্য সব দেখিযে, সমস্ত প্রকার মতামতের তুলনা করেছেন। এছাড়া প্রত্যেক বিষযে তিনি নিজের মতামত পেশ করেছেন এবং অন্যের মতবাদ কেন গ্রহণযোগ্য নয়, তার কারণ দেখিয়েছেন। তিনি কোন মতবাদকেই নিজের যুক্তি দিযে যাচাই না ক'রে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করতেন না। এজন্য তিনি প্রত্যেকটি বিষয উল্টাভাবে প্রমাণসহ কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

জ্ঞানলাভের জন্য তিনি সব রকম কষ্ট স্বীকার করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ভারতবর্ষে অবস্থান কালে তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের নিকট থেকে হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয শুধু শিক্ষাই করেন নাই, প্রত্যেকটি বিষয তিনি তন্নতন্ন ক'রে অনুসন্ধান করেছেন। সে যুগে যেখানে অস্পৃশ্যতা সবচেযে প্রকট ছিল, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের নিকট, মুসলমান তো দূরের কথা অন্য বর্ণের হিন্দুরা পর্যন্ত কোন শিক্ষালাভ করতে পারতো না, তাদের নিকট থেকে হিন্দু-ধর্মের সমস্ত বিষয তিনি কেবল শিক্ষাই করেন নাই, বরং তাঁদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন।

আল-বেরুনী কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর অজ্ঞাত-কুলশীলতার জন্য অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু তাতে তিনি কর্ণপাত করেন নাই। তাঁর নিজের লেখা থেকেই জানা যায যে, তিনি ৩৬২ হিজরীর ৩রা জেলহজ্জ (৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর) তারিখে খারিজমের শহরতলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিভার জন্য তিনি তদানীন্তন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং এই রাজকীয অনুগ্রহের মধ্যেই তাঁর জীবনের প্রথম বাইশ বৎসর অতিবাহিত হয়।

কিন্তু পরে আব্বাসীয় বংশের দুর্বলতার জন্য রাজনৈতিক গোলযোগ আরম্ভ হয়, এবং খারিজমে দুইটি পৃথক রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হয়। উত্তরাংশ মামুন বিন মাহমুদের এবং দক্ষিণাংশ আল-বেরুনীর প্রতিপালক আল-ইরাক বংশীয় আবু আবদুল্লাহের শাসনাধীন ছিল। মামুন, আবদুল্লাহকে হত্যা ক'রে তাঁর রাজ্য দখল করে নেন। এর ফলে আল-বেরুনী খারিজম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে তিনি জুরজানের রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এখানে তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আবুল ওয়াফার সঙ্গে পরিচিত হন এবং মনে হয় যে, তাঁর নিকট যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেন। জুরজানে অবস্থানকালে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আসারুল বাকিয়া' রচনা করেন। এ ছাড়া এই সময়ে তিনি 'তাজারী দুশ-শুয়াত' নামে আর একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা তিনি এখান থেকেই আরম্ভ করেন।

জুরজান-রাজদরবারে আল-বেরুনীর যদিও যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল তবু পরে খারিজমের অবস্থা শান্ত হলে তিনি আবার খারিজমে ফিরে যান। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক আলোচনা করেন ও একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। খারিজমের রাজা আবুল আব্বাস তাঁর রাজদরবারে অনেক বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সমাবেশ করেন। তাঁর এই বিদ্বৎ-সভার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে, গজনীর সুলতান মাহমুদের দৃষ্টি এদিকে পড়ে। তিনি খারিজম অধিপতিকে অনুরোধ করেন, তাঁর দরবার থেকে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে গজনীতে পাঠাতে। যে সমস্ত পণ্ডিতকে গজনীতে পাঠানো হয়, তাঁদের মধ্যে আল-বেরুনী একজন।

আল-বেরুনীর নানাবিধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, গজনীতে যাওয়ার আগে থেকেই তিনি ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে তদানীন্তন মুসলিম বিজ্ঞানীদের ভিতরে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। খলিফা আল-মনসুরের সময়ে কঙ্কের 'সিন্দহিন্দ' ছাড়া অন্য কোন মুসলিম বিজ্ঞানী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে

কিছু জানতেন বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রকৃত বিষয় জানবার জন্য অনেক পূর্ব থেকেই আল-বেরুনী অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষে যেয়ে সেখানকার সমস্ত কিছু নিজে অধ্যয়ন করবেন। গজনীতে আসবার আগে তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। গজনী পৌঁছার কিছুদিন পরেই আল-বেরুনী রাজদরবার ত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষে যান এবং সেখানে নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রায় ১২ বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন এবং ১০২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি গজনীতে ফিরে যান; এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দ' রচনা করেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা কেবলমাত্র শিক্ষাই করেন নাই, বরং তিনি সে ভাষায় পাণ্ডিত্যও অর্জন করেন। 'কিতাবুল হিন্দে' তিনি হিন্দু মনীষীদের বিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা করেছেন, তাঁদের ভাষার উৎপত্তি নিয়ে যেভাবে সমালোচনা করেছেন, সে সমস্ত হতে তাঁর পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁকে যে কি কষ্ট ক'রে সমস্ত বিষয় শিখতে হয়েছে, তিনি নিজেই সে সম্বন্ধে বলেছেন:

"আমাদের কাজ শুরু করবার পূর্বেই ভারতীয় কোন জিনিসের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করবার পক্ষে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি আছে, সেগুলো জেনে নেওয়া দরকার। পাঠকগণ সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, হিন্দু-জাতি প্রায় সব বিষয়েই আমাদের বিপরীত। প্রথমতঃ ভাষার কথা ধরা যাক। এক জাতির ভাষার সঙ্গে অন্য জাতির ভাষার পার্থক্য থাকেই, কিন্তু ভারতের ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার পার্থক্য সুদূর-বিস্তৃত। সংস্কৃত ভাষা আরবী ভাষার মতই আজগুবী কুণ্ডলী পাকানো। ভারতীয়েরা তাঁদের এ ভাষার কুণ্ডলীত্ব নিয়ে গর্ব করেন বটে, কিন্তু আসলে ভাষার পক্ষে এ একটি মস্তবড় অন্তরায়। ভাষাটির আবার দুইটি স্তর দেখা যায়। একটি উপেক্ষিত নিম্নস্তরের অবস্থায়; এবং দ্বিতীয়টি উচ্চ-শ্রেণীর লোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। এই দ্বিতীয়টি বেশ উচ্চস্তরের ব্যাকরণ ও ছন্দ প্রকরণের সুষ্ঠু নিয়মাবদ্ধভাবে পরিচালিত। ভারতীয়

সমস্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলিই কাব্যে লিখিত। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, এতে প্রক্ষেপ বা বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে না এবং তাঁদের বিজ্ঞান বিশুদ্ধভাবেই রক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁরা একটি কথা ভুলে গিয়েছেন যে, কাব্যে কেবলমাত্র ছন্দের খাতিরেই কতকগুলো অবোধ্য ও সঙ্কুচিত ভাবকে ঢুকিয়ে দিতে হয়; তা ছাড়া অনেক সময় বেশী কথাও আমদানী করতে হয়। একই কথা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ারও এ অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো ধর্মের। হিন্দু-জাতি ধর্মের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বাক্য-বিরোধ ছাড়া দৈহিক বিবাদ-বিসম্বাদ না করলেও, তাঁদের যত গোঁড়ামী ও আক্রোশ হলো বিদেশীদের উপর। তাঁরা বিদেশীগণকে ম্লেচ্ছ বা অপবিত্র বলে মনে করেন, এবং তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব দূরের কথা, তাঁদের সঙ্গে খাওয়া, বসা বা পান করা পর্যন্ত ঘৃণা করেন। আমাদের সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারেও এতদূর পার্থক্য বর্তমান যে, তাঁরা তাঁদের ছেলে মেয়েদের আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়ে ভয় দেখান। এ সমস্ত ছাড়াও আর একটি মস্তবড় কারণ, তাঁদের জাতীয় দাম্ভিকতা। এটা যদিও রহস্যের মতই শুনাবে, তবুও এটা তাঁদের জাতীয় জীবনে দৃঢ় শিকড় গেড়ে বসে রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই এটা বেশ সুপরিস্ফুট। আমরা শুধু বলতে পারি যে, এ নির্বুদ্ধিতার কোন ওষুধ নাই। হিন্দুরা মনে করেন, তাঁদের দেশের মত কোন দেশ নাই, তাঁদের মত কোন লোক নাই, তাঁদের রাজার মত কোন রাজা নাই, তাঁদের ধর্মের মত কোন ধর্ম নাই, তাঁদের বিজ্ঞানের মত কোন বিজ্ঞান নাই। তাঁরা উদ্ধত, দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। তাঁরা স্বভাবতঃই অন্যদের সঙ্গে নিজেদের জানা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে নারাজ। এমনকি নিজেদের মধ্যেও এক সমাজ অন্য সমাজের সঙ্গে নিজেদের বিষয় আলোচনা করা ঘৃণা বোধ করে; বিদেশীয় ও বিজাতির সম্বন্ধে তো কোন কথাই নাই। তাঁদের ধারণা, সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁরা ছাড়া আর কেউই

বিজ্ঞান জানে না। যদি আপনি তাঁদের খোরাসান বা পারস্যের বিজ্ঞান বিষয়ের বা সেখানকার সুধীবর্গের কোন কথা বলেন, তা হলে তারা আপনাকে জলজ্যান্ত মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে। যদি তাঁদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ও অন্য লোকের সঙ্গে মেশার অভ্যাস থাকতো, তা হলে তাঁরা সংকীর্ণমনা হতেন না, বরং তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতই উদার হতেন।

পণ্ডিত বরাহমিহির এক জায়গায় ব্রাহ্মণদের ভক্তি করবার কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন,' গ্রীকরা যদিও অপবিত্র, তবুও সম্মানের পাত্র। কেননা তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী এবং অন্যদের চেয়ে অনেক উন্নত। যে ব্রাহ্মণ নিজের পবিত্রতার সঙ্গে প্রজ্ঞাও জুটিয়ে নিয়েছেন, তা হলে তাঁকে কত সম্মান করতে হবে।' পুরাকালের হিন্দুরা স্বীকার করতেন যে, তাঁদের চেয়ে গ্রীকদের দ্বারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেশী উন্নতি হয়েছিল; কিন্তু বরাহমিহিরের এই উক্তি থেকে দেখা যায় যে, তিনি কেমন অন্যের প্রতি বিচার করবার ভান ক'রে আত্মশ্লাঘায় মশগুল হয়ে পড়েছেন। প্রথমে আমি তাঁদের জ্যোতির্বিদদের ছাত্র হিসাবেই অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেছিলাম। তাঁদের নিয়মপদ্ধতি আয়ত্ত করবার পর আমি তাঁদের এই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির কথা বলতে আরম্ভ করি এবং যুক্তিতর্কসহ অঙ্কের সাহায্যে বর্তমান পরিস্থিতিকে কতদূর উন্নত করা যেতে পারে, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এতে তাঁরা বিশেষভাবে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সবাই আমাকে ঘিরে ধরে আমার নিকট থেকে এ সমস্ত শিক্ষা করতে শুরু করেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, আমি কোন হিন্দু-পণ্ডিতের নিকট এ সমস্ত শিক্ষা করেছি। যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, আমি কোন হিন্দু-পণ্ডিতের নিকট এ সমস্ত শিক্ষা করি নাই, তখন তাঁরা আমাকে যাদুকর বলে মনে করতে লাগলেন, এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, এ লোকটা সমুদ্রবিশেষ।

এই হলো ভারতের অবস্থা। তবে আমি বিষয়টি শিক্ষা করবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম স্বীকার করতেই পরাঙমুখ হই নাই। যে রকমভাবে

যেখানে পাওয়া যাক না কেন, এই সমস্ত বিষয়ের সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেছি, এবং এগুলো বুঝিয়ে দেবার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে আসার চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-সততার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সাধারণ্যে প্রচলিত কতকগুলো কুসংস্কার জড়িয়ে নিয়ে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে তুলেছেন। আমি তাঁদের অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যাকে একসঙ্গে মুক্তা এবং গোবর, বহুমূল্য প্রস্তর ও সাধারণ পাথরের সংমিশ্রণ মনে করি। এসবই তাঁদের চোখে সমান; কারণ বৈজ্ঞানিক-সততাকে দৃঢভাবে আঁকড়িয়ে ধরে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠবার মত সৎসাহস তাঁদের কারোরই নাই।"

আলবেরুনীর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। আর তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন এবং নানা বিষয়ে গ্রন্থও রচনা করেছেন। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, সভ্যতার ইতিহাস, দিন-পঞ্জিকার তালিকা ও ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে 'কানুনে মাসউদী'কে আল-বেরুনীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা যেতে পারে। এ বইতে তিনি ত্রিকোণমিতির সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করেছেন, এবং তার ফলে ত্রিকোণমিতির যথেষ্ট উন্নতি সাধনও করেছেন। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যা ও ত্রিকোণমিতিতে কতদূর উন্নতি হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'কানুনে মাসউদী'। এ বইতে যে কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বদেশের বৈজ্ঞানিকদের মতামত উদ্ধৃত করে এবং তাঁদের ভিতরকার পার্থক্য, কার্যকরণের দোষ-ত্রুটি, নিজের সময়ের বৈজ্ঞানিকদের সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ফলাফল ইত্যাদি বর্ণনা ক'রে, অবশেষে তিনি নিজের মত ও

পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি উদাহরণে তাঁর এই কার্যপদ্ধতির ধারা স্পষ্ট বোঝা যাবে। চন্দ্রকক্ষের আনতির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত ফলের কথা উল্লেখ করেছেন। "হিপারকাসের মতে এই আনতি হলো ৫°, টলেমীরও সেই মত। কিন্তু ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মতে এই আনতির পরিমাণ ৪½°। হাবাস তাঁর তালিকায় চন্দ্রকক্ষের আনতি ৪°৪৬′ অর্থাৎ গ্রীক ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের নির্ণীত মানের গড়ের সমান বলে উল্লেখ করেছেন।" এরপরে তাঁর নিজের নির্ণীত মানের উল্লেখ করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি উল্লেখ ক'রে তিনি গণনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, এ আনতির পরিমাণ ৫°৮′২২″–৫″। এর পরে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "টলেমীর সংখ্যা, কতকগুলি সংখ্যার গড়ের সমান; এবং আল-বাত্তানীও যখন গণনা ক'রে এই আনতি ৫°১′ বলে নির্ধারণ করেছেন, তখন আমরা কাজ চালানোর জন্য একে ৫ ডিগ্রী বলেই ধরে নিতে পারি।" এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা যেতে পারে যে, আরব ও গ্রীক বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্র-কক্ষের আনতির পৌনঃপুনিক গতির বিষয় ভাল করে বুঝতে পারেন নাই বলেই মনে হয়। ইবনে ইউনুস কয়েকবার পর্যবেক্ষণ ক'রে এ আনতির পরিমাণ পান ৫°৩′; দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ একই অবস্থার ভিতর দিয়ে করা হয়েছিল বলে ফলের কোন তারতম্য হয় নাই। আবুল হাসানও কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর পরিমাণ হিপারকাসের নির্ণীত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আনতির গতির জন্যই যে এই তারতম্য ঘটেছে, সে কথা বুঝতে না পেরে, যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই এরূপ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

'কানুনে মাসউদী'র চতুর্থ খণ্ডে প্রধানতঃ জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ক্রান্তি-বৃত্তের আনতি প্রথমেই আলবেরুনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিষয়েও তিনি তাঁর চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রথমে নিজ পদ্ধতিতে

এই আনতি গণনা করেছেন, পরে অন্যান্য আরব ও গ্রীক বৈজ্ঞানিক-গণের নির্ধারিত পরিমাণ উধৃত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি শুধু এতেই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এর পরিবর্তনশীল পশ্চাৎ-গতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, তিনি কিভাবে একের পর এক বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

চন্দ্রের লম্বন সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যেও তাঁর এই উন্নত চিন্তাধারার অব্যাহত গতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও তিনি পূর্বেকার বৈজ্ঞানিক-দের পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত ফল উল্লেখ করবার পর নিজের পদ্ধতি ও উদ্ভাবনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই নব উদ্ভূত পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ-গুলি সব দিক দিয়েই চিত্তাকর্ষক। এর একটি হলো চন্দ্রের আলোতে ছায়াঘড়ির কাঁটার ছায়া পর্যবেক্ষণ। পৃথিবী ও চন্দ্রের দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ খুব ছোট নয়। সেজন্য চন্দ্রের আলোতে ছায়াঘড়ির কাঁটার ছায়া, সূর্যের আলোতে পতিত ছায়ার চেয়ে অনেক বড়। আল-বেরুনী তাঁর 'কানুনে-মাসউদী'তে চন্দ্র ও সূর্যের ৪৫° উন্নতিতে ছায়াঘড়ির কাঁটার ছায়া দুইটির পার্থক্য নির্ণয় ক'রে চন্দ্রের লম্বন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, দিক নির্ণয়, গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থানজ্ঞাপক সংজ্ঞা নির্দেশের সহজ বিজ্ঞানসম্মত উপায় প্রভৃতি নির্ধারণ করতেও গ্রন্থের অনেকাংশ ব্যয়িত হয়েছে। আল-বেরুনী বিষুবাংশ, বিষুবলম্ব, দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, উন্নতি, দিগংশ প্রভৃতি স্থানাঙ্ক বিষয়ে তিনটি প্রণালীর সমাবেশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানাঙ্কের যে কোন দুইটি বিষয় জানতে পারলে, অন্যটি নির্ণয় করবার সহজ ফরমুলাও দিয়ে দিয়েছেন।

'কানুনে মাসউদী'র পঞ্চম খণ্ডে নিম্নলিখিত স্থানগুলির দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার উল্লেখ পাওয়া যায়: লাওয়াহোর (লাহোর), আভান্তার (কাশ্মীরের তৎকালীন রাজধানী), নেপাল (আল-বেরুনীর মতে এ জায়গাটি

হিন্দুস্থান ও তিব্বতের মধ্যে বিশ্রামস্থান), ভাইহিন্দ (সিন্ধু-উপত্যকার একটি শহর), শিয়ালকোট,মু লতান, তেজ, (বেলুচিস্তানের একটি বন্দর), সোমনাথ, নাহালওয়ালা, খামবায়াত, কালাঞ্জর, মাহুরা, কানলোজ (গ্রন্থকারের মতে এটি গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত ভারতের একটি শহর; এবং বহু রাজার রাজধানী এখানে অবস্থিত ছিল), গোয়ালিয়র, গোবরালি, দাইবাল (সিন্ধুর একটি বন্দর), খাজুরাহো, অযোধ (অযোধ্যা), বানারস (গ্রন্থকারের মতে এটি হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থান, এবং শিল্প ও সাহিত্যের পীঠস্থান), লঙ্কাদীপ, জামকোট, তাঞ্জোর, মঙ্গল, দুবা ও মানকরী।

অন্যান্য আরব বৈজ্ঞানিকের মত আল-বেরুনীও মাইলোল আওয়াল এবং মাইলোছ-ছানি ব্যবহার করেছেন। তিনি সূর্যের দ্রাঘিমার প্রত্যেক ১ ডিগ্রী বৃদ্ধি অনুসারে এই দুইটি বিষয় নির্ণয় করবার একটা তালিকা তৈরী করেন। মাইলোল আওয়ালকে বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানে আনতি (declination) বলা হয়; এবং মাইলোছ-ছানিকে কখনও দ্বিতীয় আনতিও বলা হয়। মাইলোল আওয়াল বর্তমানে অবিচলিত আছে, কিন্তু আজকালকার গণনায় মাইলোছ-ছানি ব্যবহার করা হয় না। সেজন্য ঐতিহাসিক কৌতূহল ছাড়া এর বিশেষ কোন গুরুত্বও দেওয়া হয় না। তবে এর বিশেষত্ব এখনও অবহেলার বিষয় নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনাবশ্যক বোধে অনেক জিনিস পরিত্যাজ্য হয়। কিন্তু মাইলোছ-ছানি মোটেই অনাবশ্যক নয়। খ-গোলকীয় ত্রিভুজের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; এ ছাড়া প্রধান ত্রিভুজের সমাধান নির্ণয় সহজ নয়। সূর্যপথের মেরু এবং কোন খ-বস্তুর ভিতর দিয়ে অঙ্কিত বৃহৎ বৃত্তের, খ-বিষুব ও ঐ খ-বস্তুর মধ্যবর্তী চাপকে মাইলোছ-ছানি বলে।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আজকাল আর কারুর কোন প্রকার সন্দেহ নাই। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। আল-বেরুনীর 'কানুনে মাসউদীতে'ই এ সম্বন্ধে

সর্বপ্রথম আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা নীচে উদ্ধৃত করা গেল :

"আমি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদকে জানি, যিনি এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে যখন কোন জিনিস উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ে তখন সে জিনিসটি তার পতনের ধারা অনুযায়ী লম্ব-রেখা ধরেই পড়ে না, বরং একটু বেঁকে যায় এবং বিভিন্ন কোণ ক'রে পতিত হয়। তিনি বলেন, যখন পৃথিবীর অংশ এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এই ছিন্ন অংশটির দুই প্রকার গতি হয়; একটি হলো বৃত্তিক গতি, পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যই এই গতির উদ্ভব হয়। আর একটি হলো সরল-রৈখিক গতি। পৃথিবীর কেন্দ্রে সরাসরিভাবে পতিত হওয়ার জন্যই এ গতির উদ্ভব হয়। প্রথমটির জন্য এর পরিবর্তন হয়, দ্বিতীয়টি এর অবস্থানকে ঠিক রাখে। যদি এর শুধু সরল-রৈখিক গতিই থাকতো, তা হলে এ লম্বরেখার পশ্চিমে পড়তো। কিন্তু একই সঙ্গে এই দুই গতিই কার্যকরী হওয়ায়, এ পশ্চিমের দিকেও পড়ে না, কিংবা ঠিক লম্বরেখাতেও পড়ে না। একটু পুবের দিকে বেঁকে পড়ে।"

আলবেরুনীর আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আসারুল বাকিয়া'। এই বইখানা যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের ধারা নিয়ে রচিত, তবু এখানেও তিনি প্রত্যেক জাতির জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিশেষ করে পঞ্জিকা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। এই বইখানা থেকেই এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এখানে ইহুদীদের বর্ষ গণনা সম্বন্ধে তাঁর বই থেকে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"ইহুদীদের মধ্যে বর্ষ গণনার অন্যতম উপায় হ'লো তেকুফা। এর অর্থ বৎসরের প্রতি চতুর্থাংশের প্রারম্ভ। অতএব তেকুফা-এ-নিশান হবে বসন্ত-বিষুবন, (vernal equinox), তেকুফা-এ-তামমুজ হবে গ্রীষ্মায়ন (summer solistice), তেকুফা-এ-তিশারী হবে হেমন্ত-বিষুবন (autumnal equinox), এবং তেকুফা-এ-তাবিত হবে শীতায়ন (winter solistice)। ইহুদীদের মতে যে কোন দুইটি তেকুফার মধ্যবর্তী সময় বৎসরের

এক চতুর্থাংশের সমান, অর্থাৎ ৯১ দিন ৭½ ঘণ্টা; এবং এই গণনা অনুসারেই তাদের পাল-পার্বণাদির দিনও নিরূপিত হয়। ইহুদী ধর্ম-যাজকদের মতে তেকুফার প্রারম্ভে সাধারণ লোকের পক্ষে কোন খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ; এতে নাকি তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আসলে এ কিছুই নয়। এর উদ্দেশ্য হলো সাধারণ লোকদেরকে প্রতারণা ক'রে তাদের উপরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা এবং তাদেরকে নিজেদের বশে রাখা। এর ফলে শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়িয়েছে যে, এখন ইহুদীরা রাব্বীদের আদেশ-উপদেশ ব্যতীত কোন কাজই করতে পারে না। তাঁরা অন্য লোকের পরামর্শ নিতেও রাজী নয়। রাব্বীরা যেন খোদা ছাড়া অন্য আর এক খোদা। ইহুদীদের মতে মাসের moleds-এর সময় পানি ঘোলাটে হয়। কোন একজন বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত ইহুদী এ ঘটনা নিজে দেখেছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। যদি সত্যই এমন কিছু হয়, তা হলে বলতে হবে যে, কোন প্রাকৃতিক কারণেই এরূপ হয়, তাদের ধর্মের জন্য হয় না। এ রকম হওয়া যে একেবারেই অসম্ভব, এমন কথা বলতে চাই না। যে ইহুদী আমাকে একথা বলেছিলেন, তিনি সত্যবাদী, তাঁকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নাই। যা হোক ইহুদী বৈজ্ঞানিকগণ তেকুফার যে গণনা দিয়েছে, তার সঙ্গে টলেমীর গণনার যথেষ্ট মিল দেখা যায়:

তেকুফা-এ-তিশারী থেকে	তেকুফা-এ-তাবেত	৮৮⅛	দিন
„ „ তাবেত „	„ „ নিশান	৯০⅛	„
„ „ নিশান „	„ „ তামমুজ	৯৪½	„
„ „ তামমুজ „	„ „ তিশারী	৯২½	„
	মোট	৩৬৫¼	দিন

কিন্তু এই তেকুফা গণনায় তাঁরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ষ গণনা করেন নাই। গণনা অনুযায়ী এবং প্রদত্ত তালিকা থেকে তেকুফা আরম্ভের দিন নির্ণয় করা বেশ সহজ। এই গণনা অনুসারে যে সময়ের নির্দেশ

পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রকৃত সময়ের যথেষ্ট অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তিশারী প্রথম দিনের জন্য আদামী বর্ষ (Aera Adami) থেকে ধরা যাক। এর moled আলেকজান্দ্রীয় বর্ষের ১৩১১ সনের ইলুলের প্রথম দিন রবিবার পড়ে। আদামী বর্ষে পূর্ণ বৎসরের সংখ্যা হলো ৪৭৫৩, বা ৮টি বৃহৎ চক্র (৮×৫৩২ — ৪২৫৫), ২৬টি ক্ষুদ্র চক্র (২৬×১৯ — ৪৯৪) এবং ৯টি পূর্ণ বৎসর। আদামী বর্ষের প্রথম বৎসরের moled এবং উপরোক্ত বৎসরের moled-এর মধ্যে এই ব্যবধান থাকবে। আমরা প্রথমেই বলেছি ইহুদীদের ধর্মমত অনুসারে তেকুফা-এ-তিশারী আদামী বর্ষের প্রথমেই বৎসরের moled-এর ৫ দিন ১ ঘণ্টা পরে সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং উপরোক্ত সংখ্যা থেকে ৫ দিন ১ ঘণ্টা বাদ দিলে প্রথম বর্ষের তেকুফা-এ-তিশারী এবং বর্তমান বৎসরের moled-এর মধ্যকার ব্যবধান পাওয়া যাবে। এই সময়কে ৩৬৫^{১} দিয়ে ভাগ করলে ৪৭৬৫৮ বৎসর হয়ে ৩৩৫$\frac{৩}{৪}$ দিন অবশিষ্ট থাকে। এই সৌরবৎসর পূর্ণ হয়ে আবার বিষুবনে আসতে ২৯ দিন ১১ ঘণ্টা ৮৮৭ হালাকিমের দরকার। এই সংখ্যাটি বর্তমান বৎসরের moled-এর সঙ্গে যোগ করলে অর্থাৎ রবিবারে দিনের বেলাতে ৭ ঘণ্টা ২৫৯ হালাকিম যোগ করলে তিশারী মাসের প্রথম দিনে মঙ্গলবারের রাত্রি ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। এইরূপ গণনা অনুসারে দেখা যায় যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী যেদিন বিষুবন হয়, ইহুদীদের মতানুযায়ী তেকুফা তার ১৪ দিন পরে সংঘটিত হবে। এমন পার্থক্য অথবা, এর চেয়ে কম পার্থক্যকেও কোন প্রকারে উপেক্ষা করা যায় না, তা'তে ধর্মমত যা-ই হোক না কেন।"

প্রচলিত বিভিন্ন মতের বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা গণনাও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা প্রকার তালিকায় পরিপূর্ণ। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়াই যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে বিরাট কার্যরূপে প্রতীয়মান হবে; তার সঙ্গে তাদের তারিখ, সন, পঞ্জিকার মূল উৎস বের ক'রে তার সমালোচনা এবং নিজস্ব

উদ্ভাবনা যোগ করে দেওয়া যে কি বিরাট প্রতিভার পরিচায়ক, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এর প্রত্যেকটি কাজের জন্য তিনি কিভাবে পূর্বাপর বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছিলেন, একটি উদাহরণ থেকেই তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

কোন বৎসরের moled নিরূপণের বৈজ্ঞানিক উপায় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "যদি কোন গণিতবিদ ইহুদীদের ধর্মমত প্রয়োগ না ক'রে শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী সংযোগ-সময় জানতে চান, তা হলে তিনি প্রদত্ত তালিকা ব্যবহার করলেই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞান-সম্মতভাবে জানতে পারবেন। পূর্বের গুলির মত এটিকেও পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই সম্পাদনা করা হয়েছে। এটি তৈরী করতে আমরা মাসের গড দৈর্ঘ্য খালেক ইবনে আবদুল মালিকের দামেস্কে জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ এবং মুসা বিন শাকিরের পুত্রদের মতই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং অনুসৃত হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করি; কেননা সত্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের জ্ঞান ও কৌশলে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ-ফলগুলির সতর্কতা সম্বন্ধে একমত।

৪৪০ হিজরীর ২রা রজব (১০৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর) আলবেরুনী পরলোকগমন করেন।

ইবনে ইউনুস

ইবনে ইউনুসের পুরা নাম আবুল হাসান আলী ইবনে আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে ইউনুস। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর কার্যক্ষেত্রও কায়রোতেই ছিল।

অতি অল্পবয়সেই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং অতি অল্পদিনেই তাঁর বিজ্ঞান-প্রতিভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মিশরের

খলিফা আবদুল আজিজ তাঁর বিজ্ঞান-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে, তাঁকে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান-তালিকা প্রণয়ন করবার নির্দেশ দেন। কায়রোর মানমন্দিরে ইবনে ইউনুস ৯৯০ খ্রীস্টাব্দে এই তালিকা প্রণয়ন করা আরম্ভ করেন। খলিফা আবদুল আজিজ জীবিত থাকতে এই তালিকা প্রণয়ন শেষ হয় নাই। সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই তালিকা শেষ হয়। এই তালিকাটি 'জিজোল কবিরুল হাকিমী' বা 'জিজে ইবনে ইউনুস' নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য এবং ইবনে ইউনুসের সমস্ত কার্যাবলী এই 'জিজে' সন্নিবেশিত করা হয়।

এই 'জিজ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিজ্ঞান-জগতে বিপুল সাড়া পড়ে যায়; সমস্ত বৈজ্ঞানিক ইবনে ইউনুসের বিজ্ঞান-প্রতিভার অভিনন্দন জানান। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবুল ওয়াফা এই তালিকা তৈরীর বহু পূর্বেই ইবনে ইউনুসের বিজ্ঞান-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলে অভিনন্দন জানান। আবুল ওয়াফার জীবনকালে এই মহৎ কার্যের অংশমাত্রও সমাপ্ত হয় নাই। তাঁর মত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের এই শ্রেষ্ঠতম কার্যের জন্য কিরূপ সহর্ষ বিস্ময় প্রকাশ করতেন এবং বৈজ্ঞানিককে কিভাবে সম্মান জানাতেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। গ্রন্থখানির আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের বিষয়েও এটুকু বলা যেতে পারে যে, সেই হস্তলিখনের যুগে যখন শাস্ত্র প্রচারিত হওয়ার কোন সুযোগই ছিল না, তখনও দেড়-শত বৎসরের মধ্যেই তিনটি ভাষায় এর অনুবাদ হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে পারস্যের কবি-বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম পারসীতে এ বইখানার অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে নাসিরুদ্দিন আল-তুসী তাঁর মঙ্গোলীয় ভাষায় বিজ্ঞান-পুস্তকে এবং চীনা বৈজ্ঞানিক গো চিউ কিং তাঁর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞান-পুস্তকে এর তথ্যাদি হুবহু উল্লেখ করেন। গ্রীসের *The Syntax of Chrysococca*-তে জিজোল কবিরের নানা তথ্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। বলতে গেলে গ্রীক বৈজ্ঞানিক টলেমীর এতদিনকার খ্যাতি 'জিজোল কবিরে'র দীপ্তিতে ম্লান হয়ে পড়ে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে

এতে গ্রহণ ও গ্রহসমূহের সংযোগ সম্বন্ধে পুরাতন ও নূতন মতবাদ নিয়ে সুবিস্তারিত আলোচনার এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্থির পরিমাপসমূহের সঠিক মূল্য নিরূপণ করবার বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। এই জিজ অনুসারে সূর্যপথের আনতি·২৩°৩৫′ সূর্যের অপভূর দ্রাঘিমা ৮৬°১০′। ইবনে ইউনুসের মতে সূর্যের লম্বন ৩′ না হয়ে ১′৫৭″ হবে।

দুঃখের বিষয় সম্পূর্ণ জিজখানি এখনও পাওয়া যায় নাই; খুব সম্ভব এর অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। এর কিছু কিছু অংশ লিডেন, অক্সফোর্ড, প্যারিস, বার্লিন ও কায়রোতে পাওয়া গেছে। অন্যতম বৈজ্ঞানিক মসিয়ে কস্যাঁ এর কিছু অংশ অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। তাঁর অনূদিত অংশটুকু Notices extract des mamus cutits de la Bibliothique nationale, Vol. VII-এ প্রকাশিত হয়েছে। এতে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের গ্রহণ ও গ্রহসমূহের সংযোগ সম্বন্ধে অভিমত এবং বৈজ্ঞানিকের নিজের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হলেও গোলকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। অন্ততঃপক্ষে ইবনে ইউনুসের পূর্বে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক লম্ব অভিক্ষেপ দিয়ে এর সমস্যাগুলির সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন, এমন কোন নজির পাওয়া যায় না। দিগন্তের সমতলে এবং দিগন্তের উপরে খ-গোলকের লম্ব-অভিক্ষেপ প্রয়োগের দ্বারা তিনি গোলকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্বেকার বহু অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করেন।

পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষকে একই পর্যায়ে ফেলা হতো। এ জন্য প্রায় প্রত্যেক জ্যোতির্বিদই জ্যোতিষ নিয়েও আলোচনা করেছেন। ইবনে ইউনুসও এদিক দিয়ে কম যান নাই। তাঁর কতকগুলি জ্যোতিষী মত এখন পর্যন্ত আরবদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত দেখা যায়। অতি সাধারণ একটা মত হলো তুলারাশিতে জন্মগ্রহণ বিষয়ক। তাঁর মতে 'মিজান' (তুলা) হলো সমতাস্থাপকের চিহ্ন। যে সমস্ত ব্যক্তি এই

রাশিতে জন্মগ্রহণ করে, তা'রা সাধারণতঃ ধীর, স্থির, সমদর্শী ও সদ্বিবেচক হয়। সমস্ত কাজে অপক্ষপাত আচরণ এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে ধীর-স্থিরভাবে বিবেচনার সঙ্গে কাজ করা তা'দের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অমায়িক ব্যবহারের জন্য তা'রা সবার প্রিয় হতে সক্ষম হয় এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন হয়। এ সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও তা'রা এমনিতে অস্থিরমনা, পোশাক-পরিচ্ছদে ও স্বভাবে বে-খেয়ালী ও অন্যমনস্কভাবের হয়। উম্মা বা ধমকানিকে তা'রা বিশেষ গ্রাহ্য করে না। এমনিতে তা'রা সদাশয় ও সদ্বিবেচক হয়। তা'রা ভাল বিচারক ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়। তা'রা প্রগাঢ় প্রেমিক ও স্ত্রীলোকের দ্বারা বেশীভাবে প্রভাবান্বিত হয়; প্রেমে তা'রা অন্ধ হয়, জ্ঞান, বিবেচনা সবই হারিয়ে ফেলে, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতেও অক্ষম হয়; সেজন্য তা'রা নিজেদের জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করতে ভুল করে। পৃষ্ঠের বেদনা, বাত, প্রস্রাবের ও মূত্রগ্রন্থির পীড়াতে ভুগবার আশঙ্কা তা'দের খুব বেশী। কাব্য ও গান তা'দের অতি প্রিয়। তোষামুদিতে তা'রা সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হয়। এই রাশিতে যে সমস্ত স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করে, হীরকের প্রতি তা'দের অসাধারণ আসক্তি হয়; কিন্তু মুক্তার প্রতি তা'দের তেমন অনুরাগ থাকে না। নীল রং তা'দের অতি প্রিয়। এই রাশি তা'দের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ। এই সময়ে নিয়মের চেয়ে বেশী ঘুমানো উচিত এবং তাজা ফল, বিশেষ করে আখরোট খুব বেশী করে খাওয়া দরকার; বিশেষ করে স্ত্রী-লোকদের পক্ষে। সূর্য যখন এই রাশিতে অবস্থান করে, তখন স্ত্রী-পুরুষ যে কেউ হোক না কেন, যদি পেটের পীড়ায় ভোগে, মরিচ দিয়ে চা ফুটিয়ে নিয়ে বা ভাল করে ভিজিয়ে পান করলে পেটের পীড়া ভাল হয়ে যায়। যদি এই রাশিতে রবিউল আউয়াল মাস পড়ে এবং সেই মাসের ১০ তারিখে কারো জন্ম হয়, তা হলে সে খুব ভাগ্যবান হয়, বিশেষ করে সেই সময়ে যদি শুক্রগ্রহ উদয়ের পথে থাকে।

লুব্ধক সম্বন্ধে ইবনে ইউনুসের একখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানিতে তিনি লুব্ধকের সূর্যের সঙ্গে উদয় এবং অস্ত সম্বন্ধে বিশেষভাবে

আলোচনা করেছেন। পরবর্তী বহু মুসলিম বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থেই এই গ্রন্থখানির নানা তথ্যাদির হুবহু উল্লেখ দেখা যায়। দুঃখের বিষয় সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থখানির তথ্যাদি জ্যোতিষের দিক থেকে বেশ কৌতূহলকর। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা গেল। যদি শাবান মাসে লুব্ধক আকাশে দেখা যায়, এবং সেই মাসে কারো জন্ম হয় এবং জন্ম-মুহূর্তে যদি প্রভাস তারাটি উদয়ের পথে থাকে, এবং বিশেষ করে যদি সেই সময়ে এটি ঠিক জন্মস্থানটির উপরেই দৃষ্ট হয়, তা হলে নবজাতক অত্যন্ত ভাগ্যবান হয়। সে স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়। তা'র জীবন সুখ-শান্তিতে কাটে, তা'র ব্যবহারও খুব অমায়িক হয়। তা ছাড়া জীবজন্তু তার খুব প্রিয় হয়।

১০০৯ খ্রীস্টাব্দে ইবনে ইউনুসের মৃত্যু হয়।

আল-জারকালী

টলেডো-তালিকা নামে বিখ্যাত গ্রহতালিকা প্রণেতা আল-জাবকালী এর পরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ। ১০২৯ খ্রীস্টাব্দে ইনি কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পুরা নাম আবু ইসহাক ইবনে ইয়াহিয়া আল-নাক্কাস্। ইনি সাধারণতঃ ইবনোল জাবকালা আল-জাবকালী নামেই সমধিক পরিচিত। পরবর্তী যুগের ইউরোপীয়গণের দ্বারা বিকৃতির ফলে ইনি আরজাকেলে পরিণত হন। কর্ডোভার টলেডো নামক জায়গাতে এঁর জন্ম হয় বলে, এঁর প্রণীত গ্রহ-তালিকার নামকরণ করা হয় টলেডো-তালিকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ইনি যে সমস্ত কাজ করেন, তার ভিতরে সূর্যপথ বা ক্রান্তি-বৃত্তের তীর্যকতা, সূর্যের অপভূর গতি, অয়ন-চলন এবং গ্রহ-তালিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল-জাবকালীর পূর্বের অনেক জ্যোতির্বিদই সূর্যের অপভুর অবস্থান এবং দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করেন। টলেমীর হিসাবে এর দ্রাঘিমাংশ ৬৫°৩০′; আল-বাত্তানীর মতে এর পরিমাণ ৮২°১৭′। আল-জারকালীর গণনা-মতে এর পরিমাণ হয়

৭৭°৫০′। আল-বাত্তানী এবং ইবনে ইউনুস যদিও সূর্যের অপভূর দ্রাঘিমাংশের পরিমাণ ভিন্ন প্রকার পান, তবু এঁদের কেউ-ই এ কথা বলেন নাই যে, সূর্যের অপভূর গতির জন্যই তা'র দ্রাঘিমাংশের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। আল-জারকালীই সর্বপ্রথম এই গতির কথা বলেন, সে হিসাবে তাঁকেই এই গতির আবিষ্কর্তা বলে মনে করা হয়। আল-জারকালীর গণনামতে সূর্যের অপভূর বার্ষিক গতি ১২'৪ সেকেণ্ড।

ক্রান্তি-বৃত্তের তীর্যকতা সম্বন্ধেও আল-জারকালী গণনা করেন। গ্রীকগণের গণনা অনুসারে এই তীর্যকতার পরিমাণ ২৩°৫১′২০″। আল-মামুন ৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এর পরিমাণ পান ২৩°৩৩′। ৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে আল-বাত্তানী, এবং পরে ইবনে ইউনুস এর পরিমাণ পান ২৩°৩৫′। আল-জারকালী এর সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য নিজে গণনা করেন, এবং তাঁর গণনায় এর পরিমাণ হয় ২৩°৩৩′।

অয়ন-চলন বা বিষুবন-বিন্দুর অগ্রগমন সম্বন্ধেও আল-জারকালী অনেক গবেষণা করেন। অনেক পূর্ব থেকেই জানা ছিল যে, সূর্যপথের সমান্তরালভাবে তারাসমূহের গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে পড়ে; এর ফলে এদের দ্রাঘিমাংশের পরিমাণ বেড়ে যায়, কিন্তু অক্ষাংশ একই থাকে। টলেমীর পূর্বেও এ বিষয়ে গ্রীক জ্যোতির্বিদগণের জানা ছিল, এর জন্য একটি নবম গোলকের (primum mobile) কল্পনা করা হয়। এই গোলকটি ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন ক'রে অষ্টম গোলকে এই গতি অনুপ্রেরণ করে। অষ্টম গোলকটি নিজ অক্ষে মৃদু আবর্তিত হয় এবং নবম গোলকের সাথে ২৩°৩৫′ কোণ সৃষ্টি করে। থিওন এ বং প্রকলাস এ কথাও বলেছেন যে, টলেমীর পূর্বে এ কথা জানা ছিল না। তারাসমূহের অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান নয়, ৮০ ডিগ্রী একটি চাপের উপর আন্দোলিত হয়ে এরা একবার সামনে আর একবার পিছনের দিকে যায়। এই আন্দোলন-গতির বেগ প্রতি ৮০ বৎসরে ১ ডিগ্রী। হঠাৎ এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গতির পরিবর্তন হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এ বিষয়টি মুসলিম জ্যোতির্বিদগণই প্রথম বুঝতে পারেন।

ছাবেত ইবনে কোরা এ বিষয়ে একটি সহজ ও অপেক্ষাকৃত কম আপত্তিকর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি সূর্যপথকে স্থির মনে করেন এবং এই স্থির সূর্যপথ বিষুব-বৃত্তকে দুইটি বিন্দুতে ২৩°৩৩′ কোণে ছেদ করে। এ ছাড়াও অষ্টম গোলকে আর একটি চল-সূর্যপথের কল্পনাও তিনি করেন। এই চল-সূর্যপথটি একটি ব্যাসের দুইটি বিপরীত বিন্দু দ্বারা দুইটি ক্ষুদ্র বৃত্তের সাথে সংযুক্ত। গড় বিষুবন দুইটি ঐ ক্ষুদ্র বৃত্ত দুইটির কেন্দ্র এবং ইহাদের ব্যাস ৪°১৮′৪৩″। কর্কট ও মকর রাশির চল-অয়নবিন্দু দুইটি কোন সময়েই স্থির সূর্যপথ ত্যাগ করে না, কিন্তু তার উপরে ৮°৩৭′২৬″ পরিমাণ জায়গা এদিক ওদিক আন্দোলিত হয়। অন্যদিকে অয়নবিন্দু দুইটির ৯০ ডিগ্রি দূরে চল-সূর্যপথের উপরের বিন্দু দুইটি, দুইটি ক্ষুদ্রবৃত্তের পরিধির উপরে পরিভ্রমণ করে। এর ফলে চল-সূর্যপথটি একবার স্থির সূর্যপথের উপরে পড়ে, আবার এর থেকে দূরে সরে যায় এবং চল-সূর্যপথ ও বিষুব বৃত্তের ছেদ-বিন্দুদ্বয় ১০°৪৫′ পরিমাণ জায়গা একবার এগিয়ে আসে আবার ঐ পরিমাণ জায়গা পিছিয়ে যায়। এটি অষ্টম গোলকের একটি গতি; ইহাই সমস্ত তারার সাধারণ গতি। সেজন্য সূর্য কোন সময়ে কর্কট রাশিতে যেয়ে সর্বাধিক বিষুবলম্ব লাভ করে, আবার অন্য সময় মকর রাশিতে যেয়ে সর্বনিম্ন বিষুবলম্ব লাভ করে। সূর্যপথের তীর্যকতা যে স্থির নয়, ছাবেত সে কথা বলেন নাই। তাঁর তত্ত্বের এটি একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, বোধ হয় তিনি সেটা বুঝতে পারেন নাই। তবে তিনি বলেছেন যে, টলেমীর সময়ে বিষুবনের গতি প্রতি ৬৬ বৎসরে এক ডিগ্রী ছিল, কিন্তু তাঁর নিজের সময়ে ঐ গতি হয়েছে প্রতি ১০০ বৎসরে এক ডিগ্রী। টলেমী প্রদত্ত পরিমাণের সাথে এই পার্থক্যের জন্য ছাবেতের মনে সংশয় জাগে এবং তিনি বোধ হয় নিজের গণনাকে বিশ্বাস করতে পারেন নাই। তাই তিনি বলেন যে, এই পার্থক্য কেন হয়, সেটা জানবার জন্য আরো পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার প্রয়োজন।

তাঁর পরে আল-বাত্তানী এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেন। তিনি অত্যন্ত সাবধানতা ও সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হন। যদিও তিনি বিষুব-বিন্দুর মৃদু আন্দোলন সম্বন্ধে থিওনের বিবরণের বর্ণনা দিয়েছেন, তথাপি কখনও এর ব্যবহার করেন নাই। আল-বাত্তানীর পরে ইবনে ইউনুস এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তিনি এই গতিকে ৭০ বৎসরে এক ডিগ্রী অর্থাৎ বার্ষিক ৫১'২ সেকেণ্ড বলে নির্ণয় করেন। আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই। আরবীয় জ্যোতির্বিদগণই সর্বপ্রথম এই কাল্পনিক ব্যাপারকে প্রত্যাখান করেন। এঁদের মধ্যে আল-সুদি, আবুল ফারাজ এবং জাগমিনির নাম উল্লেখযোগ্য। নাসিরুদ্দিন যদিও এই আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন, তবু তিনি এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আল-জারকালী এই ভ্রান্ত মতবাদটিই মেনে নিয়ে-ছিলেন, এবং তিনি গবেষণা করে স্থির করেন যে, এই আন্দোলনের গতি ২০০০ মুসলিম বৎসরে (১৯৪০ গ্রেগরিয়ান বৎসরে) ১০ ডিগ্রী।

আল-মামুনের জ্যোতির্বিদগণ সূর্যপথের নতির যে পরিমাণ পেয়ে-ছিলেন, পরবর্তী যুগে সেই নতির পরিমাণ কম পরিলক্ষিত হওয়ার জন্যই আন্দোলন গতির কল্পনা করা হয়। এবং এই অদ্ভুত তত্ত্বের উন্নয়নের জন্য পরবর্তী যুগে ক্রমবর্ধমান গতি ও আন্দোলন-গতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। আল-বেরুনী এ ব্যাপারের একটি ইতিহাসও দিয়েছেন। তিনি উপকথার হারমিসের থেকে আরম্ভ করে থিওনের ১০০ বৎসরে ১ ডিগ্রী গতি ও আন্দোলন-গতির সমন্বয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী শতাব্দীতে প্রকৃতপক্ষে এরূপই করা হয় এবং সম্রাট আলফানসোর জ্যোতির্বিদগণের হাতে এই তত্ত্বের সর্বশেষ পরিণতি লাভ ঘটে। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, ছাবেত ইবনে কোরার তত্ত্ব অনুসারে বিষুবনের যে স্থানে থাকার কথা, তার চাইতে অনেক দূরে সরে গেছে। এই সময় মনে করা হয় যে, ৪৯,০০০ বৎসরে বিষুবন সম্পূর্ণ একবার পরিভ্রমণ করে, অর্থাৎ বিষুবনের অগ্রগতির হার বার্ষিক ২৬'৪৪″ এবং আন্দোলনের অসমতার পর্যায়কাল ৭০০০ বৎসর।

অতএব কোন এক স্বর্ণযুগে প্রত্যেকটি খ-বস্তু আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসবে।

গ্রহসমূহের গতিপথ যে উপবৃত্তাকার, এটি প্রথম আবিষ্কার করেন কেপলার। কিন্তু আল-জারকালীরও এমন একটা ধারণা ছিল। তিনি সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন যে, গ্রহসমূহের গতিপথ উপবৃত্তাকার হলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে পড়ে। বোসো বলেন, সূর্যগতি সম্বন্ধে আল-জারকালী একটি উন্নততর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। হিপারকাস ও টলেমীর ব্যবহৃত পদ্ধতির চাইতে সহজতর ও বিশুদ্ধতর পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে তিনি সূর্যের গতি ও সূর্যকক্ষ সম্বন্ধে অনুরূপ ফল লাভ করেন। কিন্তু সে যুগে টলেমীর 'আল-মাজেস্ট' ছিল জ্যোতির্বিদগণের বেদবাক্য। 'আলমাজেস্ট' যা' বলে নাই, তা' ভুল—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তদানীন্তন জ্যোতির্বিদগণ আল-জারকালীর এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। আল-জারকালী কিন্তু এতে নিরুৎসাহ হন নাই। তাঁ'র নিজের আবিষ্কৃত তত্ত্ব অনুসারে তিনি অনেক পর্যবেক্ষণ করেন। কঠোর সাধনা ও পর্যবেক্ষণের ফলে সূর্যকক্ষ সম্বন্ধে তিনি যে ফল পান, কেপলারের গণনা অনুসারে পৃথিবী-কক্ষের সঙ্গে তার পার্থক্য অতি সামান্য।

আল-জারকালী সমস্ত গ্রহের একটা অবস্থান-তালিকা প্রণয়ন করেন। টাইকো ব্রাহের নির্দেশ অনুসারে কেপলার যেমন গ্রহের অবস্থান নির্ণয় করতে যেয়ে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার মূল ভিত্তি হিসাবে তিনটি বিধি প্রণয়ন করেন, আল-জারকালীর এই গ্রহ-তালিকাও ঠিক একইভাবে প্রণীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, টলেমীর প্রতি গোঁড়া ভক্তির ফলে এ তালিকা সেরূপ কোন কাজে ব্যবহার করা হয় নাই। টলেডোর অন্যান্য মুসলিম ও ইহুদী জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকগণের পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাপ্ত ফলসমূহের সঙ্গে নিজ পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলসমূহের তুলনা করে তিনি এই তালিকা প্রণয়ন করেন। এই তালিকাটি টলেডো-তালিকা নামে পরিচিত। এই তালিকাটি যদিও কোনদিন প্রকাশিত

হয় নাই, তথাপি পরবর্তী অনেক জ্যোতির্বিদ এই তালিকার উল্লেখ করেছেন। ক্রিমোনার জিরার্ড কর্তৃক এই তালিকা লাটিনে অনুবাদ করা হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করতে যেয়ে আল-জারকালী জল-ঘড়ি সম্বন্ধেও আলোচনা করেন এবং টলেডোর রাজপ্রাসাদের বাগানে দুইটি চৌবাচ্চা নিয়ে একটি জল-ঘড়ি নির্মাণ করেন। জল-ঘড়িটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে এই চৌবাচ্চা দুইটির পানি নিয়ন্ত্রিত হতো। প্রতিপদের সঙ্গে সঙ্গে পানি চৌবাচ্চায় প্রবেশ করতে আরম্ভ করতো, এবং পূর্ণিমার দিন চৌবাচ্চাটি একেবারে পূর্ণ হয়ে যেত। এর পরে পানি কমতে কমতে অমাবস্যায় চৌবাচ্চা একেবারে খালি হয়ে যেতো। চৌবাচ্চা দুইটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে, তাতে কিছু পানি বেশী ঢেলে দিলে বা কিছু পানি বের করে দিলেও পানির পরিমাণ আবার আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যেত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যান্য কাজের সঙ্গে আস্তারলাবের উন্নতি সাধন ক'রে তা'কে আরো বিজ্ঞানসম্মত করে তোলাই তাঁ'র জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলা যেতে পারে। এর পূর্বে যে সমস্ত আস্তারলাব ব্যবহার করা হতো, সেগুলো ছিল স্থানবিশেষের জন্য উপযোগী। এর উপরকার চিহ্নাদি শুধু স্থানবিশেষের জন্যই খোদিত হতো, সে জন্য একস্থানের যন্ত্র অন্যস্থানে ব্যবহার করা যেত না। সর্বত্র ব্যবহার করা যেতে পারে এমন আস্তারলাবের জন্য অনেকগুলি তালিকার দরকার হতো। তা ছাড়া অয়ন-চলনের জন্য এমন সাধারণ আস্তারলাব দিয়ে কাজও চলতো না। আল-জারকালীর পূর্ব পর্যন্ত এই সমস্ত অসুবিধা নিরসন করে সর্বত্র ব্যবহারোপযোগী কোন যন্ত্রই উদ্ভাবিত হয় নাই, বৈজ্ঞানিকদের অসুবিধাও দূর হয় নাই। আল-বেরুনী 'উস্তুযানী' নামে যে আস্তারলাবের পরিকল্পনা দেন, সেটা কাগজে-কলমে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হলেও কাজে লাগানোর উপযোগী ছিল না। জারকালীই

বৈজ্ঞানিকদের এ অসুবিধার হাত থেকে রেহাই দেন বলা যেতে পারে। তিনি পূর্বেকার Stereographical polar projection-এর পরিবর্তে Horizontal projection ব্যবহার করেন। এতে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি থাকে দিগন্তের পুব বা পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ দুইটি বিষুবন-বিন্দুর যে কোন একটিতে। তাতে projection-এর তলই অয়ন-বৃত্তের তল হয়ে দাঁড়ায়। দুইটি খ-বৃত্তের projection-ও এক হয়ে যায়; ফলে দুইটির জন্য একই চিহ্নাদিতে কাজ চলে। এমনভাবে যে সম্পূর্ণ আস্তারলাবটি তৈরী হয় আল-জারকালী তা'র নাম দেন 'আব্বাসিয়া'। নামটি দেওয়া হয় সেভিলের নৃপতি মুতামিদ বিন আব্বাসের নামানুসারে। সমস্ত যন্ত্রটিতে একটিমাত্র ছক এবং দুইটি সহায়ক অংশ থাকত। Stereographical projection-এর ছকের উপরে সমান্তরাল ও আনতি-চক্র সমেত দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখাচক্র এবং সূর্যপথও দেখানো যেত। এতে যে আস্তারলাবটি কেবলমাত্র সর্বস্থানের উপযোগীই হতো তাই নয়, বরং দুইটি গোলকের projection সূর্যপথ ও বড় বড় নক্ষত্রের স্থানাঙ্কের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য আস্তারলাবে 'জাল'-এর কাজও এর দ্বারা চলতো। ছকের কেন্দ্রে স্থাপিত একটা লৌহশলাকা দ্বারা সাধারণ আস্তারলাবের অন্যান্য কাজ হতো। এটিকে বিষুবরেখার দিকে একটু বাঁকিয়ে নিলে পর্যবেক্ষণ-স্থানটির দিগন্ত পাওয়া যেত, এবং তখন এর উপরকার ছক থেকে পুব-পশ্চিমের বিস্তারও অনায়াসে বের করা যেত। ছকের পিঠে অবশ্য অন্যান্য আস্তারলাবের মতই দাগ কাটা থাকতো। এমনিভাবে যন্ত্রটিকে শুধুমাত্র সর্বত্র ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, একে যা'তে অন্যান্য কাজে লাগানো যেতে পারে তারও ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবেই যা'তে চন্দ্রের গতিবিধির পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে সেজন্য তিনি যন্ত্রটির সঙ্গে একটি চন্দ্রবৃত্তও যোগ করেন। এতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চন্দ্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যেত। অবশ্য তিনি এর সঙ্গে ত্রিকোণমিতিক বর্গও সংযুক্ত করেন। এর সাহায্যে অতি সহজেই

সোজা এবং উল্টা ছায়ার (আজলাল মাবসুতা ওয়াল মালকুশ) পরিমাণ, কোণের ট্যানজেন্ট ও কো-ট্যানজেন্ট বের করা যেত। আরব বৈজ্ঞানিকেরা এই সহজ ও সম্পূর্ণ যন্ত্রের নাম দেন 'আস-সাফিহা আল-জারকালীয়া'। ইউরোপে এটি Saphaea নামে পরিচিত।

১০৮৭ খ্রীস্টাব্দে কর্ডোভাতেই আল-জারকালী পরলোকগমন করেন।

ইবনে সাইদ

পূর্বেই বলা হয়েছে, টলেডিয়ান তালিকা প্রণয়ন করতে আল-জারকালী টলেডোর অন্যান্য মুসলিম ও ইহুদী জ্যোতির্বিদগণের পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সমস্ত জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে তিনি ইবনে সাইদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং তাঁর গণনাকে অন্য সবার গণনার উপরে স্থান দিয়েছেন ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই ইবনে সাইদের পুরা নাম কাশিম সাইদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে সাইদ আল-কুরতুবী আল-আন্দালাসী। ইনি কর্ডোভার আল-মুরিয়া নামক স্থানে ১০২৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই মারা যান।

ওমর খাইয়াম

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের কাছে ওমর খাইয়াম কবি বলে পরিচিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন গণিতবিদ। গণিতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অমূল্য অবদানসমূহ আছে। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অবদান হলো পঞ্জিকা সংস্কার এবং খ-বস্তুসমূহের তালিকা প্রণয়ন। তাঁর এই তালিকা 'জিজ-ই-মালিকশাহী' নামে পরিচিত, এবং তাঁর পঞ্জিকা 'তারিখ-ই-জালালী' নামে পরিচিত।

১০১৯ খ্রীস্টাব্দে খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে ওমর খাইয়ামের জন্ম হয়। তাঁর পুরা নাম গিয়াসউদ্দিন আবুল ফতেহ ওমর ইবনে ইবরাহিম আল-খাইয়ামী। গিয়াসউদ্দিন অর্থ বিশ্বাসী। তাঁর দেশবাসীই

তাঁকে এই নামে অভিহিত করে। অবশ্য এব কাবণ ওমবেব ধর্মবিশ্বাস ; এ ছাড়া তিনি সমস্ত ব্যাপারেই দেশবাসীব বিশ্বাসভাজন ছিলেন। খাইয়ামী শব্দেব অর্থ তাঁবু নির্মাতা। তাঁব পিতা তাঁবু নির্মাণ কবতেন ; এবং তিনি নিজেও কিছুদিন এই ব্যবসা কবেছিলেন বলে তাঁকে খাইয়ামী বলা হতো।

ছাত্রাবস্থাতেই ওমব অসাধারণ প্রতিভাব জন্য তাঁর শিক্ষকবৃন্দ ও অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। তিনি দর্শন, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ পাবদর্শী বলে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ কবেন এবং 'হুজ্জুতুল হক' বা সত্য-প্রমাণকাবী বলে অভিহিত হন। খোবাসানেব বাদশাহ মালিক শাহেব প্রধানমন্ত্রী নিজামুল-মুল্‌ক্ হাসান আলী ইবনে ইসহাক এবং হাসান ইবনে সাব্বা তাঁব সহপাঠী ছিলেন। এই তিন বন্ধুব ভিতবে অগাধ ভালবাসাও ছিল। হাসান আলী ইবনে ইসহাক নিশাপুবেব বাজমন্ত্রী হযে ওমব খাইয়ামের জন্য বাজকোষ থেকে বার্ষিক ১২০ মোহব বৃত্তি নির্ধারণ কবেন এবং পবে তাঁকে বাজ-জ্যোতির্বিদ (মুনাজামে শাহী) পদে নিযুক্ত কবেন।

খোবাসানেব সুলতান অনেকদিন থেকেই পাবস্যেব প্রচলিত পঞ্জিকাব সংস্কার কবাব প্রযোজনীযতা অনুভব কবছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত লোকেব অভাবে এ বিষযে মনোযোগ দিতে পাবেন নাই। ওমবকে বাজ-জ্যোতির্বিদ পদে নিযুক্ত কবেই তিনি পঞ্জিকা সংস্কারেব কাজে হাত দেন, এবং কোন ধর্মীয বাধা আছে কিনা তা' জানবাব জন্য ওলামাদেব মত নেন। ওলামাগণ সুলতানকে সমর্থন কবেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে বাখা যেতে পারে যে, মুসলিম জাতি পারস্য অধিকাব করে নিলেও তাদেব আচার-ব্যবহারের উপব হস্তক্ষেপ কবে নাই। হিজবী অব্দ প্রচলিত হওযা সত্ত্বেও তাঁরা পাবস্যেব পুবাতন অব্দই বজায বেখেছিলেন। তাই পঞ্জিকা সংস্কাব হওযার পূর্ব পর্যন্ত সৌরমাস হিসাবে বাজস্ব গ্রহণ কবা হতো, কিন্তু ব্যয কবা হতো চান্দ্রমাস হিসাবে। ফলে বাজকার্যেব হিসাবে অনেক অসুবিধা দেখা দেয। ৪৬৭ হিজবীব

(১০৭৫ খ্রীস্টাব্দ) হিসাবে দেখা যায় রাজকোষ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কারণেই সুলতান প্রচলিত পঞ্জিকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস প্রবর্তনের দৃঢ় প্রয়াসী হন।

ওমরের পঞ্জিকা সংস্কার-কার্যের সুবিধার জন্য মালিক শাহ ১০৭৪ খ্রীস্টাব্দে এক মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মার্চ থেকে ওমর এই মানমন্দিরের কাজ শুরু করেন। সাতজন সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নিয়ে মন্ত্রণাপরিষদ গঠিত হয়। এই সাতজনই ওমরের নির্বাচিত লোক। ওমর নিজে সভাপতিরূপে কাজ করেন। সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, প্রাণপাত পরিশ্রম ও অসাধারণ সাধনায় এই সংস্কার-কাজ শেষ হয়। সুলতানের নামানুসারে এই-রূপে সংস্কৃত পঞ্জিকার নাম দেওয়া হয় 'তারিখ-ই-জালালী'। জালালী অব্দ ৪৭১ হিজরী ১০ই রমজান জুমার দিন (শুক্রবার, ১০ই মার্চ, ১০৭৯ খ্রীস্টাব্দ) থেকে আরম্ভ হয়। এই পঞ্জিকা প্রচলনের পূর্বে সূর্য মীন রাশির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় ছিল ; সেজন্য ওমর ফারওয়ারদিন (সমদিবা রাত্রদিন) থেকে বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। এই সময় বৎসরের ২৮ দিন পার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও ওমর ফারওয়ারদিন থেকেই বৎসর গণনা আরম্ভ করেন।

ওমরের পঞ্জিকা গণনা যে কত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত ছিল, তা বর্তমানে প্রচলিত গ্রেগরী পঞ্জিকার সঙ্গে তুলনা করলেই সম্যক বোঝা যাবে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে রোমের সম্রাট ত্রয়োদশ গ্রেগরীর রাজত্বকালে খ্রীস্টীয় পঞ্জিকার সংস্কার করা হয়। এর সঙ্গে ওমরের পঞ্জিকার তুলনা ক'রে পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে ওমরের পঞ্জিকার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে গ্রেগরী পঞ্জিকার চেয়ে জালালী পঞ্জিকা সর্বাংশে সুসংস্কৃত এবং শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম ও সমীচীন। ওমরের সংস্কার-প্রণালী রাজকার্যের জন্য সব দিক দিয়েই সুবিধাজনক। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের মতে জুলিয়াস সিজারের প্রবর্তিত পঞ্জিকার চেয়ে জালালী পঞ্জিকা গণনার সূক্ষ্মতায় এবং ত্রুটিহীনতায় অধিকতর উৎকৃষ্ট। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জালালী

অব্দ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এর পরমায়ু ছিল মাত্র চৌদ্দ বৎসর; সুলতানের জীবৎকাল পর্যন্ত। সুলতানের সমাধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধের জালালী অব্দও সমাধিলাভ করে। যাহোক, সুলতানের উত্তরাধিকারিগণের অবিমৃষ্যকারিতায় এর অধিক প্রচলন না হলেও, ওমরের কীর্তি চিরস্মরণীয় ক'রে রাখতে এই চৌদ্দ বৎসরই যথেষ্ট। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যদি ওমর খাইয়ামের আর কোন অবদান নাও থাকতো, তা হলেও কেবলমাত্র এই পঞ্জিকা সংস্কারের জন্যই তিনি বিদ্বৎ সমাজে অমর হয়ে থাকতেন। ওমরের এই সংস্কারের বহু ভাষ্য দেখা যায়। এখানে তিনটি ভাষ্যের উল্লেখ করা গেল। প্রথমটি হলো চতুর্দশ শতাব্দীতে শিরাজী কর্তৃক। তাঁর মতে, এতে ৭০ বৎসরে ১৫টি অধিমাস আছে। এ অনুসারে ১৫৪০ বৎসরে একদিনের পার্থক্য হবে। দ্বিতীয়টি হলো পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আমীর উলুগ বেগের। তাঁর মতে ৬২ বৎসরে ১৩টি অধিমাস আছে। এতে ৩৭৭০ বৎসরের গণনায় একদিনের পার্থক্য হয়। তৃতীয়টি হলো বর্তমান ভাষ্য। এতে ৩৩ বৎসরে ৮টি অধিমাসের কথা বলা হয়ে থাকে। এ অনুসারে ৫০০০ বৎসর গণনায় ১ দিনের পার্থক্য দেখা যায়। অন্যদিকে গ্রেগরী পঞ্জিকা অনুসারে ৩৩৩০ বৎসরের গণনায় ১ দিনের তারতম্য দেখা যায়।

ওমরের মানমন্দিরের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কারুর মতে এই মানমন্দির ছিল রাই-তে, কেউ কেউ বলেন নিশাপুরে, আবার অন্য অনেকের মতে এটি ছিল ইসপাহানে। প্রধানতঃ পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য কাজ করলেও তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ও উপেক্ষা করেন নাই। নিজের ও সহকর্মীদের পর্যবেক্ষণলব্ধ ফল লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি একটা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তালিকা প্রণয়ন করেন। হাজী খলিফার মতে রাজানুকূল্যের কৃতজ্ঞতা হিসাবে তিনি পঞ্জিকার মতই সুলতান মালিক শাহের নামানুসারে এই তালিকার নামকরণ করেন "জিজ-ই-মালিকশাহী"।

যতদূর জানা যায়, ১১৩৫ খ্রীস্টাব্দে ওমর খাইয়ামের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর বিবরণ থেকে মনে হয় যে, তিনি নিজের মৃত্যুর দিন ও সময়ের কথা অনেক আগে থেকেই জানতেন। ঐতিহাসিক শাহজুরী এ সম্বন্ধে বলেছেন, "একদিন ওমর খাইয়াম আবু আলী সিনার দার্শনিক গ্রন্থ 'কিতাবুশ শেফা' অধ্যয়ন করছিলেন। গ্রন্থের যে অধ্যায়ে 'ওহাদাৎ কসরৎ' আলোচিত হয়েছে সেই অধ্যায়টি পড়তে পড়তে তিনি পাতার মধ্যে সোনার দাঁতকাঠি রেখে উঠে দাঁড়ান। তখন মাগরেবের সময়, তিনি নামাজ পড়া শুরু করেন। সেদিন তিনি রোজাও রেখেছিলেন। যে কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে তিনি নামাজ পড়ছিলেন, তাতে রুকু অবস্থাতেই তিনি সহসা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'খোদা' যথাসাধ্য আমি তোমাকেই চেয়েছি। আজ এই ভিক্ষা জানিয়ে আত্মনিবেদন করছি যেন তোমার করুণা ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত না হই।' এরপর আর তাঁর নতমস্তক উন্নত হয় নাই।"

বদি আস্তারলাবী

বদি আস্তারলাবের পুরা নাম হলো আবুল কাশেম হিবাত উল্লাহ ইবনোল হোসায়েন ইবনে আহমদ বদিয়ুজ্জামান আল-আস্তারলাবী আল-বাগদাদী আল-ইসপাহানী। তবে সাধারণতঃ ইনি বদি আস্তার-লাবী নামেই পরিচিত। আস্তারলাবী নামের কারণ হলো, আস্তারলাব প্রণয়নে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। অবশ্য তিনি আল-জারকালির আস্তার-লাবের মধ্যে কোন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বা কোন নূতন বৈজ্ঞানিক অংশের সংযোজনা করতে পেরেছিলেন কিনা, সে কথা জানা যায় না; তবে সে সময়ে তিনি আস্তারলাব সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর সমস্ত জীবনী লেখকই আস্তারলাবে তাঁর দক্ষতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আস্তারলাবে দক্ষতাকে অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে দক্ষতার নামান্তর বলা যেতে পারে। অবশ্য সে সময়ে জ্যোতির্বিদ হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

জাবির ইবনে আফলাহ

এরপরে জাবির ইবনে আফলাহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনুবাদের ধাক্কায় তিনি 'জেবারে' রূপান্তরিত হয়েছেন। এজন্য অনেকে তাঁকে রাসায়নিক জাবির বা আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। আসলে দু'জনে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি।

জাবিরের জন্ম ও মৃত্যু-তারিখ সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায় যে, সেভিলে তাঁর জন্ম হয়, এবং ১১৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১১৫০ খ্রীস্টাব্দের মাঝে কোন এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

জ্যোতির্বিদ্যাতে জাবির টলেমীর মতবাদকে ভীষণভাবে সমালোচনা করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে নয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এগুলির নাম 'কিতাবুল হায়া' বা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। বার্লিন পাণ্ডুলিপিতে এর নাম দেখা যায় 'ইসলাহোল মাজিস্তি' অর্থাৎ আল-মাজেস্টের সংশোধন। এর মধ্যে প্রথমখানিতে ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে টলেমীর কাজের সমালোচনা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। এই সমালোচনা প্রধানতঃ গ্রহসমূহ সম্বন্ধে, এবং ধারাবাহিকভাবে নিবদ্ধিত করা হয়েছে। টলেমীর মতে বুধ এবং শুক্রগ্রহের কোন দৃশ্য লম্বন নাই, তবে সূর্যের প্রায় ৩ মিনিট লম্বন আছে, এবং গ্রহগুলি সূর্যের চেয়ে পৃথিবীর নিকটবর্তী, জাবিরের মতে এ সমস্ত মনে করবার কোন কারণ নাই। তাঁর মতে নিম্ন গ্রহগুলি, অর্থাৎ বুধ ও শুক্রের নিশ্চয়ই কিছু লম্বন থাকবে, এবং শুক্র হয়তো পৃথিবী ও সূর্যের সংযোজক-রেখার উপর অবস্থিত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঔপপত্তিক কাজ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সুনিপুণভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি এর যন্ত্রপাতির দিকেও মনোযোগ দেন।

জাবিরের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানি জিরার্ড কর্তৃক *Gebri filii Affla Hispalensis de astronomia Libri IX in quibus*

Ptolemaeum aliogin doctissimum emendavit নামে অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদখানি নিউরেমবার্গে পিটার এপিয়ান কর্তৃক ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। M Stein Schaeider 'গুপ্তবিজ্ঞান' নাম দিয়ে একখানি লাটিন অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এর মূল গ্রন্থখানি জাবিরের প্রণীত।

ইবনে বাজ্‌জা

টলেমীর মতবাদ এই সময়ে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন না। তাঁদের ভিতরে এর বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক টলেমীর মতবাদ সমর্থন করতে পারতেন না তাঁদের ভিতরে ইবনে বাজ্‌জা, ইবনে তোফায়েল ও ইবনে রুশদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনে বাজ্‌জা পাশ্চাত্য জগতে আভেম্পাস (Avempace) নামে পরিচিত। এঁর পুরা নাম আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-সায়েগ। ১১০৬ খ্রীস্টাব্দে সারাগোসায় ইবনে বাজ্‌জার জন্ম হয়। আলফান্সো কর্তৃক সারাগোসা অধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানেই অবস্থান করেন।

ইবনে বাজ্‌জা প্রচলিত মতবাদকে কোন সময়েই বিনা বিচারে মেনে নিতেন না। ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর মতবাদ সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল না, এবং তাঁকে নাস্তিক বলে অভিহিত করা হতো। এজন্য তাঁকে নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তিনি কারারুদ্ধ হন এবং বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। অনেকে মনে করেন, কারাগারেই বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইবনে বাজ্‌জার জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানা যায় ইহুদী-পণ্ডিত মোজেজ বেন মায়মুনের গ্রন্থ থেকে। এই ইহুদী-পণ্ডিত সাধারণভাবে মায়মুনাইড নামেই পরিচিত। সূর্য থেকে বুধ ও শুক্র যে নিকটবর্তী,

এ সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হচ্ছে, গ্রহের গতি সম্বন্ধে। তাঁর মতে, বাস্তবজগতে মাত্র তিন প্রকারের গতি সম্ভব, পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন-গতি এবং কেন্দ্রের দিকে বা কেন্দ্রের বিপরীত দিকে সরল-রৈখিক গতি। সুতরাং এপি-সাইকেলের উপরে গ্রহের গতি এই বাস্তব গতির পরিপন্থী। তিনি আরো মনে করেন যে, আরিস্টটলের মতানুযায়ী বৃত্তীয় গতি কেবলমাত্র কোন কেন্দ্রীয় বস্তুর চারদিকেই হতে পারে, কোন কাল্পনিক বিন্দুর চারদিকে হতে পারে না। ইবনে বাজ্‌জা টলেমীর মতবাদকে না মানলেও, তিনি আরিস্টটলকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলে মনে করতেন। তাঁর মতে আরিস্টটল যে বিষয় বলে যান নাই, তা সত্য হতে পারে না। গ্রহের গতি নির্ণয়ের জন্য ইবনে বাজ্‌জা একটা পৃথক পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এই পদ্ধতিতে এপিসাইকেল ব্যবহার না ক'রে কেবল-মাত্র বিকেন্দ্রিক বৃত্ত ব্যবহার করেছেন। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে এই পদ্ধতি দ্বারা তিনি অনেক কিছু প্রমাণ করেছেন বলে জানা যায়।

ইবনে তোফায়েল

টলেমীর মতবাদের বিরুদ্ধবাদী দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম ইবনে তোফায়েল। ইনি মরোক্কোর সুলতান ইউসুফ ইবনে আবদুল মোমিনের মন্ত্রী ও রাজ-চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর একখানা মাত্র বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। 'হাই ইবনে ইয়াকজান' নামে এই বইখানা অনেকটা ধর্মীয় উপন্যাসের মত। এতে এই নবজগৎ থেকে আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে এ বইতে কোন কথা বলা হয় নাই। কিন্তু ইবনে রুশদ আরিস্টটলের Metaphysics এর ভাষ্যে বলেছেন, গ্রহের গতি সম্বন্ধে টলেমীর এপিসাইকেল বা বিকেন্দ্রিক মতবাদের পরিবর্তে ইবনে তোফায়েলের একটি সুন্দর মতবাদ ছিল। ইবনে

তোফাযেলের শিষ্য আল-বেতরুজীও বলেছেন, টলেমীর এপিসাইকেল বা বিকেন্দ্রিক মতবাদ স্বীকার না ক'রে ইবনে তোফায়েল আর একটি নূতন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই পদ্ধতিতে গ্রহসমূহের গতির অতি সুন্দর ও নির্ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করা হয়। গ্রহসমূহের গতি নির্ধারণের জন্য জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় না। পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই পদ্ধতি সপ্রমাণের বা ছোট ছোট বিষয়ের বিবেচনায় পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। এই পদ্ধতির প্রধান বিষয় ছিল সমকেন্দ্রিক গোলকসমূহ। এই মতবাদে প্রত্যেকটি তারা একটি গোলকে আবদ্ধ, এবং স্থির তারাসমূহের বাইরে প্রধান গতিসম্পন্ন একটি নবম গোলক আছে। তাঁর মতে এই প্রধান গতিসম্পন্ন গোলক কেবলমাত্র পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকের গতি সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য গ্রহসমূহের যে পশ্চিম দিক থেকে পুবদিকে গতি থাকতে পারে, এ কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি মনে করতেন, স্থির তারাসমূহের গতি অপেক্ষা সাতটি গ্রহের গতি অনেকটা মন্থর। প্রধান গতিসম্পন্ন গোলকের গতি দ্রুততর। অষ্টম গোলক ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে এবং অন্য গোলক ২৫ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। এই মতবাদ অনেকটা প্রাচীন আইওনিযান মতবাদের মত। কিন্তু ইবনে তোফায়েল বলেন, এইটুকুই যথেষ্ট নয়; কেননা সূর্যপথের মেরু বিষুববৃত্তের মেরু থেকে পৃথক; সেজন্য গ্রহসমূহের কক্ষ বদ্ধ নয়। শুধু তাই নয়, গ্রহসমূহের অক্ষাংশের গতি আছে, এবং তাদের দ্রাঘিমাংশও স্থির নয়। এ সমস্ত কিছুরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। নবম গোলকের একটিমাত্র গতি আছে; অষ্টম গোলকের গতি দুইটি। একটি দ্রাঘিমাংশের গতি, এবং আর একটি সূর্যপথের মেরু একটি ক্ষুদ্র বৃত্তে পরিভ্রমণ করে বলে বিষুবন-বিন্দুর আন্দোলন-গতি। অনুরূপভাবে প্রত্যেক গ্রহের মেরু একটি গড় অবস্থানের চারদিকে একটা ক্ষুদ্র বৃত্তে পরিভ্রমণ করে, সেজন্য দ্রাঘিমাংশ পৃথক হয় এবং অক্ষাংশের গতির সৃষ্টি হয়। কোন গ্রহের প্রকৃত কক্ষ-মেরু গড়-মেরুর সমান্তরাল হলে

গ্রহটি গড় গতিতে আবর্তন করে। আর প্রকৃত মেরুর দূরত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক বা অল্প হলে গ্রহের গতি হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এপিসাইক্লেলের কোন প্রয়োজন হয় না। এই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য দেওয়া হয় নাই। শনির ক্ষুদ্র বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৩°৩′ এবং সূর্যপথের মেরু থেকে চন্দ্রকক্ষের মেরুর গড় অবস্থানের দূরত্ব ৫°। চন্দ্রকক্ষের মেরুর ক্ষুদ্র বৃত্তের ব্যাসার্ধ এত ছোট যে, এর জন্য কোন বক্রগতি হয় না। সূর্যের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। বহির্গ্রহসমূহের মেরুর আবর্তনকাল এইভাবে দেওয়া আছে: ৫৯ বৎসর ১$\frac{১}{৩}$+$\frac{১}{৪}$ দিনে শনিগ্রহ ৫৭ বার আবর্তন করে; এই সময়ে গড় মেরু ২ আবর্তন ও ১$\frac{১}{৩}$+$\frac{৩১}{২}$ ডিগ্রী পিছিয়ে পড়ে। ৭১ বৎসরে বৃহস্পতি ৬৫ বার আবর্তন করে; এই সময়ে এর গড় মেরু ৬ আবর্তন পিছিয়ে থাকে। ৭৯ বৎসর ৩$\frac{১}{৩}$+$\frac{১}{২৪}$ দিনে মঙ্গল ৩৭ বার আবর্তন করে; এই সময়ে এর মেরু ৪২ আবর্তন ও ৩$\frac{১}{২}$ ডিগ্রী পিছিয়ে থাকে।

অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, গ্রহসমূহের যুতিকালে এই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃত্তের আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। এইভাবে শুক্রের মেরু ৮ বৎসরের চেয়ে ২$\frac{১}{৪}$+$\frac{১}{২০}$ দিন কম সময়ে ৫ বার আবর্তন করে এবং প্রত্যেক বৎসর ১$\frac{০}{৮}$ আবর্তন পিছিয়ে থাকে। ৪৬ বৎসর ১$\frac{১}{৩০}$ দিনে বুধ ১৪৫ বার আবর্তন করে।

ইবনে বাজ্জা গ্রহসমূহের অবস্থানের ক্রমও পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে শুক্রগ্রহ সূর্য ও বুধের মাঝখানে অবস্থিত; শুক্রের পিছিয়ে পড়ার পরিমাণ সূর্যের পিছিয়ে পড়ার পরিমাণ থেকে কম। তিনি আরো বলেন যে, তদানীন্তন প্রচলিত গ্রহসমূহের অবস্থানের বিষয় কেন ঠিক বলে মেনে নিতে হবে, তার কোন প্রমাণ কেউ দেয় নাই। টলেমী যে বলেছেন, বুধ, শুক্র ও সূর্য কোন সময় এক সরলরেখায় অবস্থান করতে পারে না, ইবনে বাজ্জার মতে এ কথা ভুল। তাঁর মতে শুক্র ও বুধ নিজ আলোকেই উজ্জ্বল দেখায়। তিনি বলেন, এই গ্রহ দু'টি যদি সূর্যের আলো পেয়ে উজ্জ্বল হতো, তা হলে চাঁদের মত এদেরও কলার পরিবর্তন দেখা যেত।

আল-বেতরুজী

টলেমীর মতবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মুসলিম জ্যোতির্বিদ মত প্রকাশ করেন, তাঁদের মধ্যে আল-বেতরুজী অন্যতম। তাঁর পুরা নাম আবু ইসহাক নুরুদ্দীন আল-বেতরুজী। পাশ্চাত্য জগতে ইনি আল-পেট্রাজিয়াস নামে পরিচিত। ইনি ইবনে তোফায়েলের শিষ্য ছিলেন। ইবনে তোফা-য়েলের যে সমস্ত মতবাদ সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি আল-বেতরুজীর বই 'কিতাবুল হাইয়া'তে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি এই মতবাদ তাঁর গুরু ইবনে তোফায়েলের বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অনেকের ধারণা, এই মতবাদের সবটুকু ইবনে তোফায়েলের নয়, কিছুটা আল-বেতরুজীর নিজস্ব।

ইবনে রুশদ

ইবনে রুশদ আর একজন মুসলিম জ্যোতির্বিদ যিনি, টলেমীর মতবাদে সন্দেহ প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য জগতে ইনি আভেরোস (Averroes) নামে পরিচিত। তাঁর পুরা নাম আবুল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে রুশদ। তাঁর পূর্বপুরুষগণ স্পেনের রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন মোরাবিত খলিফাদের অধীনে আন্দালুসিয়ার প্রধান বিচারপতি—কাজী-অল-কুজ্জাত ; তাঁর পিতাও কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইবনে রুশদও পিতা ও পিতামহের ন্যায় সুবিশেষ আইনজ্ঞ ছিলেন, এবং ১১৬৯ খ্রীস্টাব্দে সেভিলের কাজীর পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে তিনি কর্ডোভার কাজীর পদ প্রাপ্ত হন। শুধু বিচারকার্যই নয়, চিকিৎসক হিসাবেও তিনি অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর চিকিৎসা-খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে মোয়াহেদ খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফ ১১৮২ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে মারাক্কাসে ডেকে পাঠান এবং বৃদ্ধ দার্শনিক চিকিৎসক ইবনে তোফায়েলের স্থানে তাঁকে রাজ-চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। পর-বর্তী খলিফা ইয়াকুব আল-মনসুরও তাঁকে প্রধান চিকিৎসক পদে নিযুক্ত

করেন। একের পর এক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করলেও তাঁর দার্শনিক মতবাদের জন্য তিনি গোঁড়া মুসলিম, খ্রীস্টান ও ইহুদী ধর্ম-যাজকদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। সমসাময়িক মুসলিম সমাজ তাঁকে 'শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ' বলে ঘোষণা করেন; খ্রীস্টান পাদ্রীরা তাঁর নামকে পাপের প্রতিশব্দ বলে প্রচার করা শুরু করেন। ইয়াকুব আল-মনসুরের সময় ধর্মান্ধদের এই অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করে। প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনও দার্শনিকের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। ফলে খলিফা তাঁকে কর্ডোভার নিকটবর্তী ইলিসানা (বর্তমান Lucena) নামক স্থানে নির্বাসন দেন, এবং তাঁর চিকিৎসা, অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ছাড়া সমস্ত গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। ইবনে রুশদ চরম দুরবস্থায় পতিত হন এবং নানা স্থানে নানা ভাবে অপমানিতও হন। যাহোক, ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইয়াকুব আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পর বৎসরই তিনি মারা যান।

নাসিরুদ্দিন আল-তুসী

১২০১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী খোরাসান প্রদেশের তুস নগরে নাসিরুদ্দিনের জন্ম হয়। তাঁর পুরা নাম আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনোল হাসান নাসিরুদ্দীন তুসী আল-মাহাকিক। তাঁর বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অল্পবয়সেই তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে নানা জায়গার রাজা-বাদশাহ তাঁকে নিজ নিজ দরবারে নেওয়ার চেষ্টা করেন; এমনকি অনেকে এজন্য বলপ্রয়োগও করেন। প্রথমে কুহিস্তানের গভর্নর তাঁকে চুরি ক'রে আলামুতে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি অনেকটা বন্দী-জীবন যাপন করেন। সেখান থেকে তাঁকে নিজ দরবারে নেওয়ার জন্য হালাকু খাঁ আলামুত আক্রমণ করেন এবং নাসিরুদ্দিনকে মারাঘায় নিয়ে যান। যদিও হালাকু খাঁ তাঁকে জোর করে নিয়ে যান, তবু মারাঘাতে যেয়েই

নাসিরুদ্দিনের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নাসিরুদ্দিনের জ্যোতিষী গণনার উপরে হালাকু খাঁ এত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, শেষ পর্যন্ত নাসিরুদ্দিনের পরামর্শ ছাড়া তিনি কোন কাজই করতেন না। নাসিরুদ্দিন হালাকু খানের মন্ত্রী এবং পরে ওয়াক্‌ফ-করের প্রধান কার্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

মারাঘার মানমন্দির প্রতিষ্ঠা, হালাকু খাঁ ও নাসিরুদ্দিনের একটা বিরাট অবদান। অনেকের ধারণা, ওয়াক্‌ফ-করের অংশবিশেষ দিয়েই এই মানমন্দির নির্মীত হয় এবং একটি লাইব্রেরীও স্থাপিত হয়। এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠার পরে, রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে মুক্ত হয়ে নাসিরুদ্দিন শান্তচিত্তে গবেষণা-কাজে লিপ্ত থাকেন। এই মানমন্দিরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানমন্দির ও গবেষণাগারে পরিণত করতে হালাকু খান চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। এই মানমন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এখানেই তৈরী করবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজের ভার পড়ে উরদীর উপরে। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে বাগদাদ ও আলামুতের গবেষণাগার লুণ্ঠন ক'রে হালাকু খান অনেক যন্ত্রপাতি মারাঘাতে নিয়ে আসেন। মারাঘার লাইব্রেরীতেও এমনিভাবে চার লক্ষেরও বেশী গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। মারাঘাতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়, তার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গোলক বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। মুসলিম যুগের পূর্বেও এই গোলক ব্যবহার করা হতো। টলেমী যে গোলক ব্যবহার করতেন তাতে তিনটি বলয় ছিল, মধ্য-রেখা বলয়, সূর্যপথ বলয় ও খ-বিষুবন বলয়। এই তিনটি ছাড়া পর্যবেক্ষণের জন্য আরো দুইটি বলয় ব্যবহার করা হতো। মারাঘায় নির্মিত গোলকে আরো দুইটি বলয় সংযোজন করা হয়। এদের একটি বলয়ের সাহায্যে খ-বস্তুসমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা হতো এবং অন্যটি দ্বারা উন্নতি পরিমাপ করা হতো। এই গোলকের ব্যাস ছিল বারো ফুট। এর পরবর্তী যুগে কাস্টিলের রাজা আলফানসো সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সূক্ষ্ম একটা গোলক নির্মাণ করতে যেয়ে মারাঘার এই গোলকের অনুকরণ করেন।

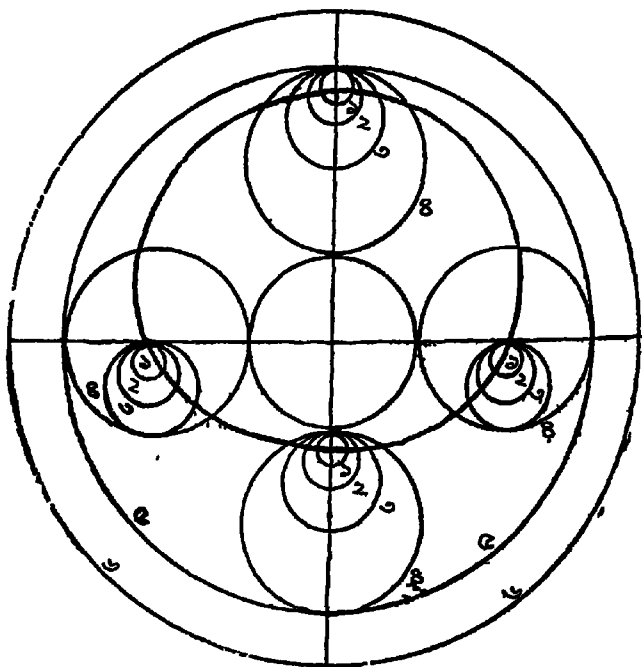
মারাঘার মানমন্দিরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক নাসিরুদ্দিনের সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলী ইবনে ওমর আল-কাজবিনি, উরদী, তিফ-লিসের ফখরুদ্দিন আল-খালাতি, মসুলের ফখরুদ্দিন আল-মারাঘী, মহীউদ্দিন আল-মাগরিবী, আবুল ফারাজ, ইবনোল-কুত্তি, আবদুর রাজ্জাক ইবনে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আশ-শাযাবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত সহকর্মীদের সহযোগিতায় সুদীর্ঘ বারো বৎসর পর্যন্ত নাসিরুদ্দিন গ্রহ-উপগ্রহসমূহের গতিবিধি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন ও সেগুলির তালিকা প্রণয়ন করেন। এই তালিকাটি 'জিজ-ই-ইলখানি' নামে পরিচিত। এই 'জিজ-খানি' প্রথমে পারসীতে লিখিত হয়। এটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চীন, গ্রীস, আরব ও পারস্যের জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে গ্রহসমূহের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান এবং চতুর্থ ভাগে জ্যোতিষ আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রহসমূহের এপিসাইকেল ও ডেফারেন্টের জটিল গতি সম্বন্ধে নাসি-রুদ্দিন অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই সমস্ত গতির জন্য একটি চালক-গোলক প্রবর্তনের প্রয়োজন; প্রাচীনকালের জ্যোতি-র্বিদগণ এ বিষয় উপেক্ষা করে গেছেন। এরপরে তিনি নিম্নলিখিতভাবে তাঁর নিজের পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন।

প্রথমে তিনি এই উপপাদ্যটি প্রমাণ করেন: একটি সমতলে যদি দুইটি বৃত্ত থাকে এবং তাদের একটির ব্যাসার্ধ যদি অপরটির অর্ধেক হয় এবং ছোটটি যদি বড়টিকে কোন অন্তস্থ বিন্দু স্পর্শ করে, এবং বড়টি যদি আবর্তিত হয় ও ছোটটির পরিধির উপরে একটা বিন্দু স্পর্শবিন্দু থেকে আরম্ভ ক'রে বিপরীত দিকে দ্বিগুণ বেগে ঘুরতে থাকে, তা হলে ঐ বিন্দুটি বড় বৃত্তটির একটি ব্যাসের বরাবর চলতে থাকবে।

এক্ষণে এই দুইটি বৃত্তকে দুইটি গোলকের বিষুববৃত্ত মনে করা যেতে পারে এবং বিন্দুটির পরিবর্তে চন্দ্রের এপিসাইকেল নির্দেশকারী গোলক

(চিত্রে ১নং) ব্যবহার করা যেতে পারে। এই এপিসাইকেলের বাইরে আর একটি গোলকের (২) কল্পনা নাসিরুদ্দিন করেন, এবং অপভূ-অনুভূ



রেখাচিত্র ২৮ : গ্রহসমূহের ডেফারেন্ট ও এপিসাইকেলের জটিল গতি সম্বন্ধে নাসিরুদ্দিনের ব্যাখ্যা

১. চন্দ্রের এপিসাইকেল, ২. অপভূ-অনুভূ নির্দেশকারী ও এপিসাইকেল পরিবেষ্টনকারী একটি গোলক, ৩. দ্বিতীয় একটি গোলক, এর ব্যাস পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ডেফারেন্ট কেন্দ্রের দূরত্বের সমান. ৪. তৃতীয় একটি গোলক, এর ব্যাস দ্বিতীয় গোলকের ব্যাসের দ্বিগুণ, ৫. পৃথিবীর সঙ্গে সমকেন্দ্রিক গোলক

ব্যাসটিকে গোলকের ব্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে যথাস্থানে রাখতে (৪) নির্দেশ দেন। একে প্রয়োজনমত মোটা করা হয়। এর পরে তিনি

আরো দুইটি গোলকের কল্পনা করেন। এদের একটি (৩), উপরের ছোট গোলকের অনুরূপ এবং এর ব্যাস টলেমীর পদ্ধতিতে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ডেফারেন্টের কেন্দ্রের দূরত্বের সমান। এই গোলকের দ্বিগুণ ব্যাসার্ধ সমেত আর একটি গোলক (৫)। অবশেষে ৪ নং গোলকটিকে পৃথিবীর সঙ্গে সমকেন্দ্রিক আর একটি গোলকের ভেতরে এমন ভাবে স্থাপন করা হয় যেন (৬) নং গোলকের অবতল অধিকার করে। এই গোলকটির বিষুবন-বৃত্ত চন্দ্রপথের সমতলে অবস্থিত; এপিসাইকেলের কেন্দ্র যে পর্যায়কালে পরিভ্রমণ করে (২), (৪) এবং (৫) সেই একই পর্যায়কালে পরিভ্রমণ করে; (৩) গোলক তার অর্ধেক কালে পরিভ্রমণ করে এবং বিকেন্দ্রিকের অপভূ যে গতিতে পরিভ্রমণ করে (৬) গোলকও সেই একই গতিতে পরিভ্রমণ করে। এইবার চিত্রে দেখা যায়, এপিসাইকেল কিভাবে (৪) গোলকের ব্যাসের উপরে পরিভ্রমণ করে এবং (৫) গোলকের পরিভ্রমণ-পথ একটি আবদ্ধ-রেখা উৎপন্ন করে। নাসিরুদ্দিন বলেছেন, এই আবদ্ধ-রেখাটি বৃত্তের মত দেখালেও ঠিক বৃত্ত নয়। তিনি গণনা করে দেখতে পান যে, দুইটি তত্ত্ব দ্বারা প্রদত্ত চন্দ্রস্থানসমূহের ভিতরে সর্বাধিক পার্থক্য ⅙ ডিগ্রী। চালক গোলকের কার্যকারিতা না থাকলে ঐ আবদ্ধ রেখাটি এপিসাইকেলের কেন্দ্র দ্বারা উৎপন্ন না হয়ে, (৩) এবং (৪) গোলকের স্পর্শ বিন্দু দ্বারা উৎপন্ন হতো।

পূর্বেই বলা হয়েছে, টলেমীর যন্ত্রপাতি থেকে উন্নততর যন্ত্রপাতি নাসিরুদ্দিন নির্মাণ করেন। তাঁর পদ্ধতিতে এপিসাইকেল সর্বদা সূর্য-পথ সমতলের সমান্তরাল থাকে। বিখ্যাত পদার্থবিদ ইবনোল হাইছাম (যিনি পাশ্চাত্য জগতে আল-হাজেন নামে পরিচিত) এ বিষয়ে নাসিরুদ্দীনের উল্লেখ করেছেন। অপভূ-অনুভূ ব্যাসের গতির ব্যাখ্যার জন্য প্রত্যেক এপিসাইকেলের ক্ষেত্রে তিনি দুইটি গোলক সংযোজন করেন এবং অন্তগ্রহসমূহের ক্ষেত্রে, ঐ ব্যাসের লম্ব ব্যাসের জন্য তিনি আরো দুইটি অতিরিক্ত গোলক সংযোজন করেন। দ্রাঘিমাংশের গতি নির্দেশের জন্য তিনি যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন, সেইভাবেই দুইটি

গোলকের সাহায্যে এপিসাইকেলের ব্যাস গোলকের চাপের উপর কিভাবে এদিক ওদিক যাতায়াত করতে পারে, তা প্রদর্শন করেন। তাঁর এই পদ্ধতি টলেমীর পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক উন্নত ; কেননা এতে দ্রাঘিমাংশের ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

এই তালিকা প্রণয়নেই নাসিরুদ্দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজ শেষ হয় নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো 'তাজকিরা ফি ইলমোল হাইয়া'। 'তাজকিরা অল-নাসিরিয়া' নামে গ্রন্থখানিও বিশেষভাবে পরিচিত। এ নামটি অবশ্য গ্রন্থকারের নামানুসারে করা হয় নাই, নাসিরুদ্দিনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কুহিস্তানের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিনের নামানুসারেই এই নামকরণ করা হয়। মারাঘা যাওয়ার পূর্বে তিনি এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। খুব সম্ভব ১২৫৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই এখানি প্রণীত হয়। তখনই এর দুইটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

'তাজকিরা ফি ইলমোল হাইয়া' গ্রন্থখানি চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত; প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমে রয়েছে জ্যামিতিক ও গতি বিষয়ক ভূমিকা। এতে সরল এবং জটিল গতি, স্থিরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সূর্যপথের তীর্যকতার পরিবর্তন, বিষুবন-বিন্দুদ্বয়ের কম্পন প্রভৃতিও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। হাইছামের বিশ্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মতবাদ সম্বন্ধেও নাসিরুদ্দিন আলোচনা করেছেন। হাইছামের মতে গ্রহগুলির কক্ষ বিভিন্ন আকারের ও কেন্দ্রে কঠিন গোলাকার পদার্থের মত, এবং একে অন্যের স্পর্শকে অবস্থিত। এই পরিচ্ছেদেরই এক অংশে গ্রন্থকার আলমাজেস্টের নানা মতবাদ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ সমালোচনা করা হয়েছে বিশেষ করে চন্দ্রের কোণ (anomalies) ও গ্রহগুলির অক্ষরেখার গতিকে কেন্দ্র করে। তিনি শুধু টলেমীর মতবাদের প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি এই জবরজঙ্গ পদ্ধতি বিদূরিত করবার জন্য নূতন মতবাদ ও পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পৃথিবীর উপরে অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহের প্রভাবের কথা এবং

মামুনের জ্যোতির্বিদ মণ্ডলীর, কুস্তা বিন লুকা ও আল বেরুনীর অনুসরণ ক'রে Geodesy সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে গ্রহগুলির আকার ও দূরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

'তাজকিরা' ছাড়া নাসিরুদ্দিন আরো কতকগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; যেমন:

(১) 'জুবদাতুল হাইয়া' (Cream of Astronomy)। এ বইখানার পুরা নাম হলো 'জুবদাতুল ইদরাক ফি হাইযা আল-ফালাক'। আরবী ও পারসী উভয় ভাষাতেই গ্রন্থখানি দেখতে পাওয়া যায়।

(২) 'কিতাবুত তাসহিল ফিন-নজুম' (Stars Made Easy)।

(৩) মঙ্গলের আকার, দূরত্ব ও গতিপথ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

(৪) 'ফিত্-তু'ল ওয়াল গুরুব' (risings and settings); ছাবেত ইবনে কোরার ধারা অনুসরণ ক'রে অটোলাইকাসের ভাষ্য।

(৫) গোলকের গতি সম্বন্ধে অটোলাইকাসের ভাষ্য; এতেও ছাবেতের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

(৬) 'কিতাবে আরস্তিখাস', সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব ও আকার সম্বন্ধে আলোচনা, আরিস্টারকাসের গ্রন্থের ভাষ্য।

(৭) ঘটনাসমূহ (Phaenomena)। ইউক্লিডের গ্রন্থের ভাষ্য।

(৮) নক্ষত্রের উদয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; হিপসিকলসের গ্রন্থের ভাষ্য। এতে আলকিন্দি ও কুস্তা বিন লুকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

(৯) গোলক সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। থিয়োডিসিয়সের ভাষ্য।

(১০) দিবা-রাত্রি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

(১১) বাসস্থান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; এতে কুস্তা বিন লুকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

(১২) থেকে (১৯) পর্যন্ত আটখানি পুস্তক খুব সম্ভব 'মুতাওয়াস্সিতাতের' অংশ। এ কয়েকখানিতে জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

(২০) 'তাহরিরুল মাজিস্তি', ১২৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত। এটিকে 'আল-মাজেস্টে'র একটি সংস্করণ বলা যেতে পারে। তবে এতে টলেমীর কার্যাবলীর সঙ্গে নিজের উদ্ভাবিত অনেক নূতন তথ্যও তিনি যোগ করেন। এই নূতন তথ্যগুলির মধ্যে অনুপাত, আরমিলারী গোলক এবং নূতন নূতন পর্যবেক্ষণের ফলসমূহ অন্যতম। 'তাজকিরাতে' যেমন 'আল-মাজেস্টে'র সমালোচনা করা হয়েছে, এখানে তেমন কিছু করা হয় নাই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে পঞ্জিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। জ্যোতির্বিজ্ঞান-তালিকা প্রস্তুত করার কথা উঠতে পঞ্জিকার কথা আপনি এসে পড়ে। নাসিরুদ্দিনেরও পঞ্জিকা সংক্রান্ত দুইখানা গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে পঞ্জিকার সঙ্গে বর্ষফল ইত্যাদি জ্যোতিষিক আলোচনা ও ভবিষ্যদ্বাণীর যে ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়, নাসিরুদ্দিনের পঞ্জিকাতেই তার সূচনা দেখা যায়। এর মধ্যে পঞ্জিকার সন, তারিখ, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির সঙ্গে জ্যোতিষের কার্যকলাপও অনেক অংশ জুড়ে রয়েছে। এর একখানার নাম হলো "মুখতাসার ফি ইলমোত তানজিম ওয়া মারিফাতোত তাকবিম"। এর একখানি পারসী সংস্করণও দেখা যায়। এই পারসী সংস্করণের নাম হলো "রিসালা-ই-সিফসল"। বদরুল তাবারী এর একখানা পারসী ভাষ্য লেখেন। ১৩১৪ খ্রীস্টাব্দে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে মোহাম্মদ এর একখানা আরবী ভাষ্য লেখেন। অন্য এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরও একখানা আরবী ভাষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পঞ্জিকাখানি "কিতাবুল বারি ফি অলুমোত তাকবিম ওয়া হারাকাতোল আফলাক ওয়া আহকামুন নজুম"। সম্পূর্ণ জ্যোতিষ বিষয়েও তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, টলেমীর Quadripantitum-এর অনুকরণে পারসীতে লিখিত একখানি গ্রন্থ, আরবী ও পারসীতে লিখিত Pseudo Ptolemy-এর অনুকরণে অন্য একখানি গ্রন্থ ও ফালনামা, 'কিতাবুল ওয়াফি ফি ইলমোর রামল' এবং তুর্কী ভাষায় লিখিত 'ইখতিয়ারাত'।

১২৭৪ খ্রীস্টাব্দে নাসিরুদ্দিন বাগদাদ গমন করেন এবং সেখানেই জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

নাসিরুদ্দিনের সহকর্মীবৃন্দ

নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে মারাঘার মানমন্দিরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কাজ করতেন, তাঁদের কয়েকজনের পরিচয় নীচে দেওয়া গেল।

উরদী

মারাঘার মানমন্দিরকে বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে সম্পূর্ণ ও সুসজ্জিত করবার ভার পড়ে বৈজ্ঞানিক উরদীর উপরে। তাঁর পুরা নাম মোয়ায়েদ উদ্দিন আল-উরদী আদ-দামিস্কি।

সিরিয়াতে তাঁর জন্ম হয়; তবে জন্মের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। প্রথম জীবনেই তিনি বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে যন্ত্রপাতি নির্মাণের দিকেও মনোযোগ দেন। তাঁর অসাধারণ ইন্‌জিনিয়ারিং বুদ্ধি অতি সহজেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিষয়ে তাঁর অভূতপূর্ব প্রতিভার খ্যাতি রাজদরবারে পৌঁছিতেও দেরী হয় না। হিমসের রাজা মনসুর ইবরাহিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য তাঁকে দামাস্কাসে ডেকে পাঠান। তিনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নাই। দামাস্কাসে ইবরাহিমের অনুরোধ অনুযায়ী যন্ত্রপাতি নির্মাণের সঙ্গে অন্য বিষয়েও তিনি তাঁর কারিগরী বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। তাঁর নির্মিত এই সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে রাজা ইবরাহিম তাঁর মানমন্দিরের কাজে ব্যবহার করেন। এতে তাঁর খ্যাতি আরব ও পারস্যে আরো বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ফলে মারাঘার মানমন্দির তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারাঘায় তাঁর ডাক পড়ে।

খুব সম্ভব ১২৫৯ খ্রীস্টাব্দেই তিনি মারাঘা গমন করেন এবং নাসিরুদ্দিনের সহকর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। মানমন্দিরের সংস্কার ও তালিকা প্রণয়ন ব্যাপারে উরদীর যে অনেকখানি হাত ছিল, নাসিরুদ্দিনের

গ্রন্থের ভূমিকাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাসিরুদ্দিন তাঁকে বন্ধু বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর কার্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মানমন্দিরের সঙ্গেই ছিল যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা। এ কারখানাটি ছিল সম্পূর্ণরূপে উরদীর তত্ত্বাবধানে। যন্ত্রগুলি যে শুধু বিজ্ঞানসম্মত তাই নয়, এর সূক্ষ্ম কারুকার্যও অতীব বিস্ময়কর।

মানমন্দিরের যন্ত্রপাতির নির্মাণ-প্রণালী ও প্রয়োগবিধি বর্ণনা করে উরদী একখানা গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এতে এগারোটি যন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁর আরো দুইখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একখানার নাম হলো 'রিসালা ফি আমালোল কোরা আল-কামিলা' (পরিপূর্ণ গোলক নির্মাণ পদ্ধতি)। অন্যখানা হলো সূর্যের কেন্দ্র ও অপভূর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে। টলেমীর জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করেও তিনি একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-তালিকা প্রস্তুত করেন।

উরদীর পুত্র শামসুদ্দিন ও মোহাম্মদ

উরদীর দুই পুত্রও বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা মারাঘায় গবেষণা করতেন। তাঁদের নাম হলো শামসুদ্দিন ও মোহাম্মদ ইবনে মোয়ায়েদ আল-উরদী।

শামসুদ্দিন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। নাসিরুদ্দিনের পুত্র সদরুদ্দিন যখন মানমন্দিরের পরিচালক, তখন শামসুদ্দিনও এই মানমন্দিরে গবেষণাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ কোন অবদান আছে বলে জানা যায় না। তাঁর লিখিত একখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই।

উরদীর দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ পিতার যন্ত্রনির্মাণ-কুশলতার অধিকারী হন। তিনি মানমন্দিরের জন্য একটা খ-গোলক নির্মাণ করেন। তাঁর পূর্বে মাত্র চারটি খ-গোলকের কথা জানা যায়। প্রথমটি তৈরী করেন একাদশ শতাব্দীর ইবরাহীম ইবনে সাইদ আস-সাহলী তাঁর

পুত্র মোহাম্মদের সাহায্যে। এটি তৈরী করা হয় দুইটি পিতলের ফাঁপা গোলাকার খণ্ড একসঙ্গে জুড়ে। এর ব্যাসার্ধ ছিল ২০০ মিলিমিটার। এতে ১০১৫টি তারা ও ৪৭টি সংযোগের যথাস্থান ও পরিমাপ খোদিত রয়েছে। বর্তমানে এটি ফ্লোরেন্স ইউনিভার্সিটিতে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয়টি তৈরী করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাইসার ইবনে আবুল কাশেম। ১২২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে এটি তৈরী হয়। অন্যান্য গ্লোব থেকে এর পার্থক্য হলো এই যে, এতে পিতলের গোলকখণ্ড দুইটি জোড়া হয়েছে চারটি পায়ার উপর; এতে দিগন্ত এবং মধ্যরেখা-বৃত্ত দেখানো আছে। বর্তমানে নেপল্‌সের National Museum-এ এটি রক্ষিত আছে। তৃতীয়টিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নির্মিত হয়। ১২৭৫-৭৬ খ্রীস্টাব্দে এটা তৈরী করা হয়। এটিও পিতলের; তবে এর উপরে পারসীয় কারুকার্য বিশেষ-ভাবে পরিদৃশ্যমান। এটিই মধ্যযুগীয় গ্লোবের মধ্যে সবচেয়ে বড; এর ব্যাসার্ধ হলো ২১৪ মিলিমিটার। রাশিচক্র, সাতচল্লিশটি সংযোগ, এবং দিগন্তের পরিধির উপর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সমস্তই এর উপরে খোদিত আছে। বর্তমানে এটি লণ্ডনের Royal Asiatic Society-তে রক্ষিত আছে। চতুর্থটির নির্মাণকর্তা বা নির্মাণ-তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্যারিসের Bibliotheque Nationale-এ এটি রক্ষিত আছে। এর ব্যাসার্ধ ১৯৯ মিলিমিটার। এর উপরে ৪৯টি সংযোগ খোদিত আছে। এর উপরকার খোদাই কাজসমূহ ঠিক মোহাম্মদ ইবনে মোয়ায়েদ আল-উরদীর গোলকের উপরের খোদাই কাজের মতই।

মোহাম্মদ তাঁর গোলকটি তৈরী করেন ১২৬৯ কিংবা ১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে। সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। এতেও দুইটি পিতলের গোলকখণ্ড আছে, তবে এ দুইটির মধ্যে সূর্যপথও দেওয়া আছে। অন্যগুলির থেকে এর পার্থক্য অতি সহজেই চোখে ধরা পড়ে। এতে দিগন্ত, সু-বিন্দুর সঙ্গে পরিবর্তনশীল মধ্যবৃত্ত একটি বিন্দু দ্বারা সংযুক্ত আছে। বৃত্ত-গুলিতেই পরিমাপ খোদিত থাকার ফলে, যে কোন নক্ষত্রের বিষুব-লম্ব

এবং বিষুবাংশ অতি সহজেই মেপে নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া এতে ৪৮টি সংযোগ, বিষুববৃত্ত এবং বিষুবন-বিন্দু থাকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিমাপের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। এগুলির উপর সোনার বা রূপার কাজ করা আছে। গোলকটির ব্যাসার্ধ ১৪০ মিলিমিটার। ড্রেসডেন ইউনিভার্সিটির Mathematical Salon-এ এটি রক্ষিত আছে।

মহীউদ্দিন আল-মাগরিবী

মারাঘার মানমন্দিরের অন্যতম বৈজ্ঞানিক ছিলেন মহীউদ্দিন আল-মাগরিবী। স্পেনের আন্দালুসিয়ায় এঁর জন্ম হয়। সে হিসাবে এঁকে প্রাচ্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে গণনা না করাই হয়তো সঙ্গত; কিন্তু এঁর সমস্ত কার্যকলাপ ও বিজ্ঞান-প্রতিভার স্ফুরণ হয় মারাঘার মানমন্দিরে। সেজন্য এঁকে প্রাচ্যের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গেই স্থান দেওয়া হয়।

মহীউদ্দিনের পুরা নাম হলো মুহী আলমিল্লা ওযাদ্‌দিন ইযাহিযা ইবনেমোহাম্মদ আবিশ্‌ শুকুর আল-মাগরিবী আল-আন্দালুসী। মারাঘার মানমন্দির তৈরী হবার পর হালাকুর অতিথি হিসাবেই তিনি মারাঘা আগমন করেন ও গবেষণায় নিযুক্ত হন। তিনি "খোলাসাতুল মাজিস্তি" নামে আলমাজেস্টের একখানা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণযন করেন। এতে তিনি আলমাজেস্টের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণযন করেই ক্ষান্ত হন নাই, মারাঘার মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ-ফলও এতে সন্নিবেশিত করেন। গ্রন্থখানি তিনি পরে নাসিরুদ্দিনের পুত্র আবুল হাসান আলী বিন মোহাম্মদ ইবনোল হাসান আত্‌-তুসীর লাইব্রেরীতে উপহার দেন। এ থেকে মনে হয়, গ্রন্থখানি নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১২৭৪ খ্রীস্টাব্দের পর প্রণীত হয়। "খুলাসাত" অনুসারে ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে মারাঘাতে সূর্যপথের আনতি ছিল ২৩°৩০'; বর্তমান গণনা অনুসারে ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে এই নতির পরিমাণ ছিল ২৩°৩২'১৯"। আস্তারলাব সম্বন্ধে তিনি আরো দু'খানা

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একখানার নাম "তাসতিহোল আস্তাবলাব"। খুব সম্ভব এর কিছু অংশে জ্যোতিষ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়খানার নাম হলো "তাজোল আজ-জাজ ওয়া গুলিয়াতোল মোহ-তাজ" (প্রয়োজনীয় তালিকা ও সম্পদের শিরোমণি)।

আবুল ফারাজ

অনেক অমুসলমান বৈজ্ঞানিকও মারাঘার মানমন্দিরে কাজ করতেন। জোহানা আবুল ফারাজ এমনি একজন অমুসলমান বৈজ্ঞানিক। যদিও তিনি জাতিতে খ্রীস্টান ছিলেন, তবু তিনি বেন হেব্রায়েন বা ইহুদীর ছেলে নামেই পরিচিত ছিলেন। ১২২৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সিরিয়ান ভাষায় তাঁর লিখিত একখানা বংশ-চরিত এবং কয়েকখানা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

আবুল ফারাজ যে সমস্ত বিষয় গবেষণা করেন, তার মধ্যে চন্দ্রের তৃতীয় অসমতা, চাঁদের দূরত্ব, গোলকসমূহের বিন্যাসের ক্রম এবং বিষুবন-চলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রহসমূহের তৃতীয় অসমতা সম্বন্ধে তিনি বলেন, "বিশ্বকেন্দ্র এবং গড় অপভূ থেকে এপিসাইকেলের কেন্দ্রে দুইটি সরলরেখা টানা হলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, সেই কোণই তৃতীয় অসমতা"। এপিসাইকেলের অপভূর প্রান্ত থেকে অগ্রগতি আরম্ভ হয়, এই প্রান্তকে গড় অপভূ বলে, এবং একে prosneusis বলা হয়েছে। বিশ্বকেন্দ্র থেকে অঙ্কিত সরলরেখার প্রান্তে যে অপভূ থাকে, তাকে আপাত অপভূ বলা হয়। বিকেন্দ্রিকের অনুভূর দিকে prosneusis বিন্দুটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ১০ অংশ (ডিগ্রী) ১৭ মিনিট দূরে অবস্থিত; বিকেন্দ্রিকের কেন্দ্র থেকেও দূরত্ব একই। দ্বিতীয়া বা ত্রয়োদশী তিথিতে এই কোণের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়; তখন এর পরিমাণ হয় ১৩ অংশ ৯ মিনিট। প্রকৃতপক্ষে, বিকেন্দ্রিকের অপভূ থেকে এপিসাইকেল যখন ৪ অথবা ৮ রাশি দূরে থাকে, তখন সূর্যের কেন্দ্র এপিসাইকেল

থেকে ২ অথবা ৪ বাশি দূরে থাকে। দুই অপভূর ভিতরের কোণকে প্রথম অসমতা বলে এবং কেন্দ্রের গতিতে একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

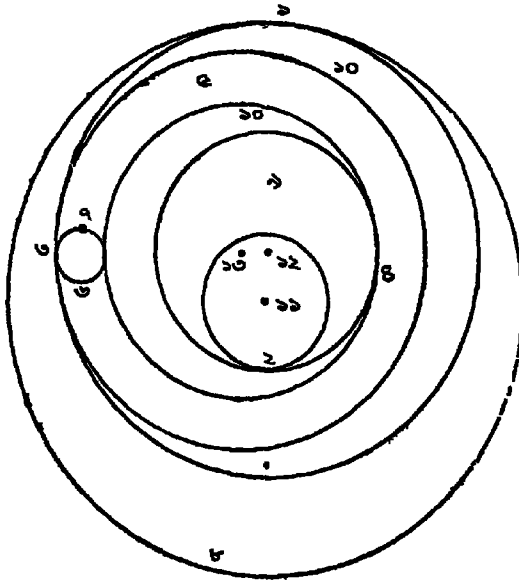
পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় গ্রহসমূহের যে দূরত্ব আবুল ফারাজ নির্ণয় করেন, সেগুলি এইরূপঃ চন্দ্র ৬৪২/৩, বুধ ১৭৪, শুক্র ১১৬০, সূর্য ১২৬০, মঙ্গল ৮৮২০, বৃহস্পতি ১৪২৫৯, এবং শনি ১৯৯৬৩।

১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে আবুল ফারাজ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে গ্রহসমূহের ফলকের বিন্যাস সম্বন্ধে তিনি বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই বিন্যাসের সাহায্যে প্রত্যেক গ্রহের প্রতিটি গতির তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে সূর্য একটি কঠিন গোলকীয় পদার্থ। দুইটি বিকেন্দ্রিক গোলকের তলের মাঝখানে সূর্য-গোলক অবস্থিত। এই বিকেন্দ্রিক গোলকীয় তল দুইটি আর দুইটি তলকে স্পর্শ করে। পরবর্তী এই দুইটি গোলকের কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত। এই দুইটি তলের অন্তর্বর্তী স্থানকে "মুমাত্তান" বলে। স্থির তারাদের গতির মত এর পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকে গতি আছে। একই পরিকল্পনায় শুক্র ও অন্য তিনটি বহির্গ্রহের গোলকও সন্নিবেশিত। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সূর্যের পরিবর্তে প্রত্যেক গ্রহের এপিসাইকেল-গোলক লওয়া হয়, এই গোলকের অন্তস্থ তলের দিকে গ্রহ-গোলকসমূহ মালাতে মুক্তার মত এক একটি জায়গাতে আবদ্ধ। বহির্গ্রহের গোলকের অক্ষ মুমাত্তাল গোলকের অক্ষের সাথে একটি কোণে আনত। চন্দ্র-পদ্ধতিতে অন্যান্য গোলকের বহির্দেশে আর একটি অতিরিক্ত গোলক আছে। এই বহির্গোলকের কেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্রে অবস্থিত। একে আল গার্ডজাহার বলে এবং এ দ্বারা ড্রাগন মণ্ডলকে নির্দেশ করা হয়।

বিষুবন-চলন সম্বন্ধে আবুল ফারাজ এইমাত্র বলেছেন যে, এই গতিকে টলেমী ১০০ বৎসরে ১ ডিগ্রী বলে মনে করতেন এবং অন্যান্যেরা ৬৬ বৎসরে ১ ডিগ্রী বলে মনে করতেন। তিনি আরো বলেন যে, ক্যালডিয় জ্যোতির্বিদগণ যদি এই বিন্দুর অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় প্রকার গতিই নির্দেশ করে থাকেন, তা হলে এটা মনে করতে হবে যে, স্থির

তারাসমূহেরও যে গতি আছে সে সম্বন্ধে তাঁবা অজ্ঞ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিষুবনেব অগ্র ও পশ্চাৎ গতিব মতবাদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

১২৮৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁব মৃত্যু হয।



রেখাচিত্র ২৯ ঃ আবুল-ফাবাজের পদ্ধতি অনুসাবে মঙ্গলেব গোলক ১. উচ্চ অপদূরক, ২. নিম্ন অপদূবক ৩. ডেফাবেণ্ট গোলকেব উচ্চ অপদূবক ৪ ডেফাবেণ্ট গোলকের নিম্ন অপদূবক ৫. ডেফারেণ্ট গোলক, ৬. এপিসাইকেল, ৭. মঙ্গল গ্রহ, ৮. পবিবেষ্টক সদগোলক, ৯. মুমাত্তাল গোলকের পবিবেষ্টিত অংশ, ১০. মুদিব গোলক, ১১. বিশ্বকেন্দ্র, ১২. মুদিব কেন্দ্র, ১৩. ডেফারেণ্ট গোলক কেন্দ্র

আল-কাতিবী

মাবাঘাব বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউটের অন্যতম সদস্য ছিলেন আল-কাতিবী। এঁর পুরা নাম নাজমউদ্দিন আলী ইবনে ওমর আল-

কাজবিনি আল-কাতিবী। যদিও তাঁর কাজ প্রধানতঃ দর্শনকে কেন্দ্র করে, তবু জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি আল-মাজেস্টের একটা সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর "কিতাব হিকমাতুল আইন" নামক গ্রন্থে তিনি পৃথিবী ঘোরে কিনা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পৃথিবী ঘোরার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তিতর্ক থাকতে পারে তিনি দার্শনিকের মত সবগুলিরই বিশেষভাবে আলোচনা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত অন্ধ অনুকরণের পথ এড়াতে পারেন নাই, টলেমীকেই অনুসরণ করেছেন। একটি যুক্তির বিষয় হলো পাখীর গতি সম্বন্ধে। প্রশ্ন ওঠে যে, পৃথিবী যদি ঘোরে, তা হলে, যে পাখী পৃথিবীর গতির দিকে ঘুরতে থাকবে, তার পৃথিবী থেকে পিছিয়ে পড়া উচিত। দার্শনিক কিন্তু একে যুক্তিসম্মত বলে মেনে নিতে পারেন নাই। তাঁর মতে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে এর উপরকার বাতাসও সমান গতিতে ঘুরতে থাকবে এবং পাখীকেও সেই সঙ্গে নিয়ে যাবে ; সুতরাং এর পিছিয়ে পড়ার কোন কথাই উঠতে পারে না। এদিক দিয়ে যুক্তিকে প্রাধান্য দিলেও অন্যদিকে কিন্তু তিনি বিজ্ঞান-বুদ্ধি প্রসারিত ও উদার করে নিতে অপারগ হয়েছেন। তাঁর মতে সমস্ত পার্থিব গতিই যখন সরলরেখায় সংঘটিত হয়, তখন পৃথিবী যে বৃত্তাকারে ঘুরবে, এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে না।

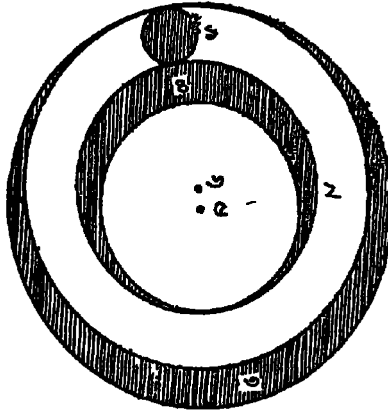
আল-কাজবিনি

আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া ইবনে মাহমুদ আল-কাজবিনি সাধারণতঃ কাজবিনি নামেই পরিচিত। তাঁর জন্মস্থানের নামানুসারেই তাঁকে কাজবিনি বলা হয়। ১২০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি পারস্যের কাজবিন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানতঃ দার্শনিক ছিলেন। তবে জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তিনি আবুল ফারাজের মত একই প্রকার গ্রহ-গোলক বিন্যাসের বর্ণনা করেছেন।

১২৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান।

আল-জাজমিনি

মোহাম্মদ বিন ওমর আল-জাজমিনি খারিজম প্রদেশের জাজমিন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ সঠিক জানা যায় না। তিনি গ্রহ-গোলকসমূহের বিন্যাস সম্বন্ধে এবং বিষুবন-চলন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁর গ্রহ-গোলক বিন্যাস এবং আবুল ফারাজের গ্রহ-গোলক বিন্যাস প্রায় একই রূপ। সূর্যের গোলক, দুইটি বিকেন্দ্রিক



রেখাচিত্র ৩০ঃ গোলক পদ্ধতির সাহায্যে জাজমিনির গ্রহগতি ব্যাখ্যা

১. সূর্য, ২. বিকেন্দ্রিক গোলক, ৩. পরিবেষ্টক গোলক, ৪. সহগোলক, ৫. বিশ্বের কেন্দ্র, ৬. বিকেন্দ্রিক গোলকের কেন্দ্র

তলের ভিতরে অবস্থিত। এই দুইটি গোলক আবার অন্য দুইটি গোলকের গোলককে স্পর্শ করে। এই শেষোক্ত গোলক দুইটির কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত। এই দুইটি গোলকের অন্তর্বর্তী স্থানকে তিনি আল-মুমাত্তাল বলে অভিহিত করেছেন।

বিষুবনের অগ্র-পশ্চাৎ গতি বা আন্দোলন গতি আছে, টলেমীর এই মতবাদকে অনেক মুসলিম জ্যোতির্বিদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এঁদের মধ্যে

আল-জাজমিনি অন্যতম। আল-সুফী, আল-বাত্তানী এবং আবুল ফারাজও এই আন্দোলন গতি স্বীকার করেন নাই।

আল-জাজমিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুইখানা বই লেখেন। এর একখানার নাম "আল-মুলাখখাস ফিল হাইবা"। এই গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন মতবাদ লিপিবদ্ধ করা আছে। দ্বিতীয় বইখানা জ্যোতিষ সম্বন্ধীয়।

১৩৪৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম যুগের শেষ অধ্যায়

জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল-কাশী

আল-কাশীর জীবনের সর্বপ্রথম যে দিনের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটি হলো ১৪০৬ সনের ২রা জুন। ঐদিন মধ্য-ইরানে তাঁর জন্মভূমি কাশানে তিনি একটা চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। পরে ঐখানে তিনি আরো দুইটি চন্দ্রগ্রহণ দেখেছিলেন।

'সুল্লামা সামা রিসালাতে কামালিয়া' নামে আরবীতে প্রণীত তাঁর গ্রন্থখানিতে তিনি খ-বস্তুসমূহের অবস্থান ও আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই বইখানি ১৪০৭ সনের ১লা মার্চ তারিখে শেষ করা হয় বলে অনেকের ধারণা। ইরানের মেশেদ শহরের পুস্তকাগারে রক্ষিত একটা কপি থেকে তারাতারাবি এরূপ ধারণা করেন। এই সময়েই উল্লিখিত চন্দ্র-গ্রহণ দুইটি সংঘটিত হয়। সেজন্য মনে করা হয় যে, বইখানার লেখা কাশানেই শেষ করা হয়।

তাঁর প্রধান যে দুইখানা পুস্তকের জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ, তার প্রথম খানি 'খাকানি জিজ'। পারসী ভাষায় এই বইখানি তিনি ১৪১৩-১৪ সনে সমাপ্ত করেন। এ বইয়ের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন যে, ইরাকের বিভিন্ন স্থানে এবং অধিকাংশ সময় কাশানে তিনি এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ-কাজ চালান; এবং এই সময়ে অত্যন্ত দারিদ্র্য ও কষ্টের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবন যাপন করতে হয়। তিনি আরো লিখেছেন যে, সম্রাট উলুগ বেগের সহানুভূতি ও বদান্যতা ছাড়া তাঁর পক্ষে ঐ 'জিজ' সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর ছিল না। তার এই গ্রন্থখানি তিনি উলুগ বেগকেই উৎসর্গ করেন। শিরাজ শহরের দ্রাঘিমাকে ভিত্তি করেই তিনি এই তালিকা

প্রণয়ন করেন। অবশ্য অনেকে এতে মনে করেন যে তিনি অধিকাংশ পর্যবেক্ষণ শিরাজেই করেছিলেন। কিন্তু তা' ঠিক নয়; সে সময় শিরাজ-নগর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিল, এবং অনেকদিন থেকেই সেখানে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করা হতো। এজন্য কাশী শিরাজ-শহরকেই তাঁর তালিকাব ভিত্তিস্থান বলে স্বীকার করে নেন।

এর পরে তিনি পারসীতে একখানা ছোট বই লেখেন। বইখানা জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ সম্বন্ধে লিখিত। এই বইখানা তিনি কোন এক সুলতান ইসকান্দারকে উৎসর্গ করেন। কে এই সুলতান ইসকান্দার, এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বর্তমানে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে ইনি আজারবাইজান ও মেসোপটেমিয়ার 'কালো ভেড়া' টার্কোমান বংশের দ্বিতীয় শাসক কা'রা ইউসুফের ছেলে। এই ইসকান্দার দুইবার উলুগ বেগের পিতা শাহরুখের নিকট পরাজিত হন।

এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এই জ্যোতির্বিদ তাঁর দুইখানা বই দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার নামে উৎসর্গ করেন। অনেকে মনে করেন যে, আল-কাশীর সময়ে ইসকান্দার ও শাহরুখের ভিতর যুদ্ধ চলছিল। কে জিতে তার কিছুই ঠিক ছিল না। তা ছাড়া কিছুদিন আগেই জ্যোতির্বিদ আল-কাশী উলুগ বেগকে একখানা বই উৎসর্গ করেছেন। এখন যদি ইসকান্দার জিতে যায়, তা হলে তিনি তাঁর বিষদৃষ্টিতে পড়বেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ছোট একখানা বই লিখে তিনি ইসকান্দারকে উৎসর্গ করলেন। দরিদ্র জ্যোতির্বিদের এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

এরপরে ১৪১৬ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি 'নুজহাতোল হাদায়েক' বইখানা সম্পূর্ণ করেন। এ বইখানাও পারসীতে লেখা। এতে তিনি গ্রহ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য একটি সহজ যন্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহার-পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। এ বইখানা কাউকে উৎসর্গ করা হয় নাই। এরপরে তিনি সমরকন্দে উলুগ বেগের মানমন্দিরে যোগ

দেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুঈনউদ্দিন আল-কাশীও তাঁর সঙ্গে উলুগ বেগের দরবারে আসেন।

সমরকন্দে আসবার পরে জ্যোতির্বিদ আল-কাশী তাঁর পিতাকে একখানা চিঠি লেখেন। এই পত্রখানা থেকে উলুগ বেগের দরবার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। চিঠিখানার সারমর্ম নীচে দেওয়া গেল ঃ

যথারীতি আল্লাহ তা'লার গুণাগুণ ক'রে কাশী তাঁর পিতাকে লিখছেন যে, মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ-কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তিনি পিতাকে আগে চিঠি লিখতে পারেন নাই। তিনি আরো লিখছেন যে, সুলতান অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি; কোরান, আরবী, ব্যাকরণ, গণিত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুলতান অত্যন্ত পারদর্শী। উদাহরণ-স্বরূপ সুলতান একবার কিভাবে ঘোড়ার পিঠে বসেই সূর্যের অবস্থান অতি সূক্ষ্মভাবে মিনিট পর্যন্ত শুদ্ধ করে নির্ণয় করেন, তার উল্লেখ করেছেন। সে সময়ে সমরকন্দে ৬০।৭০ জন গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন; এঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁকে চারটি প্রশ্ন করা হয়; এই চারটি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারাতেই তিনি সুলতানের দরবারে স্থান লাভ করেন। প্রথম প্রশ্নটি ছিল, এক হাত ব্যাসের একটি অ্যাস্ট্রলাবের উপরে কিভাবে ১০১২টি স্থির তারার প্রক্ষেপ করা যায়। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, একটি হেলানো দেয়ালের উপরে পতিত নমনের ছায়া দ্বারা কিভাবে সময় নির্দেশ করা যায়। তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল, একটি দেয়ালে এমন একটি গর্ত করতে হবে, যা'তে কেবলমাত্র আছরের নামাজের সময় সূর্যের আলো প্রবেশ করবে। চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, পৃথিবীপৃষ্ঠে সাড়ে তিন হাত লম্বা মানুষের প্রকৃত দিগন্তের ব্যাসার্ধ ডিগ্রীতে নির্ণয় করা। আল-কাশী তাঁর পিতাকে লেখেন, তিনি এ সমস্ত প্রশ্ন অতি সহজেই সমাধান করেন; এবং অন্যান্য গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ যে সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, তিনি সে সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে অতি সত্বর সুলতানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

এই চিঠি থেকে জানা যায় যে, সুলতানের দরবারের অন্যান্য জ্যোতির্বিদ সম্বন্ধে আল-কাশীর ধারণা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তিনি মনে করতেন যে, তাঁদের অধিকাংশই বিশেষ কিছু জানে না। কিন্তু আল-কাশীর এই অপবাদ সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। কেননা উলুগ বেগ তাঁর দরবারে অনেক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের সমাবেশ করেন, আর সেজন্যই সমরকন্দ তখন বিদ্যার পীঠস্থান বলে পরিগণিত হতো। আল-কাশী কাদিজা-দাহা-ল রুমি নামে একজন জ্যোতির্বিদের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কিছুটা উন্নত ধারণা পোষণ করতেন বলে মনে হয়। কিন্তু এই কাদিজ-দাহাকেও তিনি দুইবার কিভাবে অপদস্থ করেন, তার বিশদ বিবরণও তিনি পিতাকে দিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, সে সত্ত্বেও কাদিজ-দাহের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব আছে, কাদিজ-দাহাই একমাত্র লোক, আল-মাজেস্ট সম্বন্ধে যাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে; তবে তিনি পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি যে মোটেই জানেন না, এ কথাও আল-কাশী তাঁর পিতাকে জানিয়েছেন। কাদিজ-দাহা নিজে আল-কাশী সম্বন্ধে কি মনে করতেন সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তবে উলুগ বেগ তাঁর জিজে কাদিজ-দাহার নাম সসম্মানে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

সমরকন্দের মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি নির্মাণকার্যে কতদূর অগ্রগতি হয়েছেন, সে সম্বন্ধেও কাশী তাঁর পিতাকে বিশদভাবে লিখেছেন। গ্রহাদি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণ যে দুই-এক বৎসরে সমাপ্ত করা সম্ভব নয়, এজন্য যে অনেক সময়ের প্রয়োজন, এ কথাও তিনি তাঁর পিতাকে জানিয়েছেন।

১৪২৪ সনে আল-কাশী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে গ্রীক 'π'-এর মান নির্ণয় করেন। যে প্রামাণ্য গ্রন্থে এই মান নির্ণয় করা হয়েছে, তার নাম "আল-রিসালাতুল মুহিতিয়া"। বইখানা আরবীতে লিখিত। জার্মাণ এবং রুশ ভাষায় এই বইখানির অনুবাদ করা হয়েছে। এ বইখানিও কাউকে উৎসর্গ করা হয় নাই।

তাঁর দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ বই 'মিফতাহ' প্রণয়ন সমাপ্ত হয় ১৪২৭ সনের ২রা মার্চ তারিখে। এ বইখানাও উলুগ বেগকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

উপরে যে সমস্ত বইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও কাশী প্রণীত নিম্নলিখিত বইগুলির সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

'রিসালাত আল-ওযাতার ওয়াল জাইব': বইখানা 'রিসালা ফি ইসতি-খারাজ জাযব ফারাজাও ওয়াহিদা' নামেও পরিচিত। আল-কাশী নিজে এ বইখানার প্রণয়ন সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নাই। তাঁর মৃত্যুর পরে কাদিজ-দাহ বইখানার প্রণয়ন শেষ করেন। এক ডিগ্রীর সাইন, যে কোন অঙ্ক পর্যন্ত অতি শুদ্ধভাবে নির্ণয় করবার প্রণালী এই বইখানাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বইয়ের কোন অনুবাদ না হলেও, রুশ, ফরাসী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এ বই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হয়েছে।

'জিজ আত-তাসিলাত': গ্রহসমূহের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কাশী 'জিজ আল-খাকানি'তে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, এ বইখানিতে তার সহজ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'মিফতাহ অল-আসবাব ফি ইলমেল জিজ' বইখানার নামও পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

রিসালা দার সাখতে আস্তাবলাব,
রিসালা ফি মা'রেফাত সামত আল-কিবলাহ মিন দায়রাতে হিন্দিয়া,
রিসালা আমাল আল-দারব বিত-তাখত ওয়াত-তুরাব,
'আর-রিসালা আল-ইকলিনামিনাহ'
বইগুলি সম্বন্ধেও উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

'জিজ' প্রণয়নের জন্য পর্যবেক্ষণ-কাজ যে দুই-এক বৎসরে বা অল্প সময়ে শেষ হয় না, কাশীর ক্ষেত্রে এমনকি 'জিজ আল-খাকানী'র ক্ষেত্রে

সে কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। 'জিজ আল-খাকানী'র ভূমিকায় সুলতান উলুগ বেগ দুঃখ করে বলেছেন, কাশী তাঁর পর্যবেক্ষণ-কাজ শেষ করবার পূর্বেই মারা যান এবং তাঁর সহকর্মী ও প্রতিদ্বন্দ্বী কাদিজ-দাহ তাঁর পর্যবেক্ষণ-কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু প্রয়োজনীয় সমস্ত পর্যবেক্ষণ শেষ করবার পূর্বেই তিনিও মারা যান। ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত 'জিজ আল-খাকানী'র কপির প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা আছে, "সমরকন্দের বাইরে মানমন্দিরে ৮৩২ হিজরীর ১৯শে রমজান (১৪২৯ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুন) মহান প্রভু গিয়াস আল-মিল্লাহ ওযাল-দীন জামশিদ পরলোক গমন করেন।

আল-কাশীর প্রকৃতি সম্বন্ধে 'হাফতে ইকলিমে' বলা হয়েছে যে, তিনি সুলতানের দরবারের আদব-কায়দা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার জন্য সুলতান এই অজ্ঞতা উপেক্ষা করতেন। তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর সমসাময়িক জ্যোতির্বিদ সম্বন্ধে যা জানা যায়, তাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সমরকন্দের মানমন্দিরে আল-কাশী সকলের চেয়ে দক্ষ ছিলেন। পর্যবেক্ষণ ও গণনাকার্যে আর কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তাঁর উদ্ভাবিত ইকুয়েটেরিয়াম এই জাতীয় যন্ত্রের ভিতরে সর্বোৎকৃষ্ট। সে সময় পর্যন্ত যত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার ভিতরে গ্রহের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এই যন্ত্র সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সহজে প্রয়োগক্ষম ছিল।

উলুগ বেগ

মুসলিম যুগের জ্যোতির্বিদগণের ভিতরে সর্বশেষ জ্যোতির্বিদ হলেন উলুগ বেগ। একজন রাজাকে দিয়েই এ যুগের অবসান ঘটে, এবং এ অবসান রাজকীয় ভাবেই ঘটে। উলুগ বেগ ছিলেন সমরকন্দের অধিপতি, এবং তাঁর তারা-তালিকাই ছিল পূর্ববর্তী ও তদানীন্তন তারা-তালিকাসমূহের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রায় প্রত্যেক মুসলিম জ্যোতির্বিদ আকাশের নানা বিষয় পর্যবেক্ষণ করে একটি করে তালিকা প্রণয়ন

করে গেছেন। কিন্তু তারাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে তাদের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি নির্ণয় করবার কাজে এর পূর্বে আর কোন মুসলিম জ্যোতির্বিদ হস্তক্ষেপ করেন নাই। হিপার্কাস ও টলেমীর তারা-তালিকা ছিল চৌদ্দ-পনর শ' বৎসর পর্যন্ত একমাত্র তারা-তালিকা। উলুগ বেগের তারা-তালিকার পরে অবশ্য ডেনিস জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে একটি তারা-তালিকা প্রণয়ন করেন; এরপরে বেয়ার আর একটি সংশোধিত তারা-তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকাগুলি অনেকটা আধুনিক কালের।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গের পুত্র শাহরুখ মির্জা। উলুগ বেগ এই শাহরুখ মির্জার ছেলে। এতে দেখা যায় যে, অত্যন্ত প্রসিদ্ধ রাজবংশে তাঁর জন্ম। পিতামহ তৈমুরলঙ্গ দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও অত্যাচারী বিজয়ী হিসাবেই সাধারণতঃ পরিচিত। কিন্তু এই সমস্ত মুসলিম শাসকের জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁরা বিভিন্ন দেশ থেকে জ্ঞানী পণ্ডিতগণকে কেড়ে নিয়ে আসতেন, এবং নিজের দেশের জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন। এইভাবে তৈমুরলঙ্গও তাঁর রাজধানী সমরকন্দকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করেন। সমরকন্দের বিবিখানম বিশ্ববিদ্যালয় সে সময়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈমুরলঙ্গের মহিষী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৈমুরলঙ্গের পুত্র শাহরুখ মির্জা ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে সমরকন্দে একটি মানমন্দির তৈরী করেন। উলুগ বেগ তখন তুর্কীস্তানের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার এই মানমন্দিরেই উলুগ বেগ নিজে গবেষণা করেন। সমরকন্দের অধিপতি হয়ে সমস্ত রাজকার্যের ভিতর ব্যাপৃত থেকেও উলুগ বেগ এই মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণকার্য পরিচালনা এবং তাঁর সহকর্মীদের সহযোগিতায় প্রায় ২০ বৎসর পরিশ্রমের পরে তাঁর তালিকা প্রণয়ন করেন।

উলুগ বেগের তারা-তালিকা 'জিজ-ই-উলুগ বেগ', 'জিজ-ই-সুলতানী', 'জিজ-ই-সুলতানী কারমানী', 'জিজ-জাদিদে কারমানী' প্রভৃতি নামে

পরিচিত। এই তালিকার ভূমিকাতে গ্রন্থকার বলেছেন যে, তাঁর গুরু সালাহউদ্দিন মুসা (ইনি কাজী-জাদা রুমী নামেই পরিচিত) প্রথম এই তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টা করেন; এবং এজন্য তিনি পর্যবেক্ষণ-কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর সঙ্গে গিয়াসউদ্দিন জামশীদ আল-কাশীও অনেক পর্যবেক্ষণ করেন। এই পর্যবেক্ষণ-কাজ শেষ হওয়ার অনেক আগেই গিয়াসউদ্দিন মারা যান, এবং তার কিছুদিন পরেই কাজী-জাদাও মারা যান। এরপর উলুগ বেগ তাঁর তরুণ সহকর্মী আলি বেন মোহাম্মদ কুশাজীর সহযোগিতায় পর্যবেক্ষণ-কাজ ও তালিকা প্রণয়ন শেষ করেন। এই কুশাজীকে উলুগ বেগ অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং অনেক জায়গায় তাঁকে 'আমার ছেলে কুশাজী' বলে উল্লেখ করেছেন। মঈনউদ্দিন নামে আরো একজন জ্যোতির্বিদ সুলতান উলুগ বেগকে সাহায্য করেন বলে জানা যায়।

উলুগ বেগের তারা-তালিকা তুর্কী, পারসী ও আরবী এই তিন ভাষার মধ্যে কোন্ ভাষায় সর্বপ্রথম প্রণীত হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, এবং এ নিয়ে অনেক বাক-বিতণ্ডাও হয়ে গেছে। এই তালিকার কোন তুর্কী পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই। গু হারবেলো বলেন, মূল তালিকাটি আরবী ভাষায় প্রণয়ন করা হয়; পরে ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে মাহমুদ বেন মোহাম্মদ সেখানা পারসীতে অনুবাদ করেন। সেডিলো এ বিষয়ে বিশদভাবে অনুসন্ধান করেন, এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মূল তালিকাটি পারসী ভাষায় লিখিত এবং পরে সেখানা আরবীতে অনুবাদ করা হয়। Bibliotheque Nationale-এ উলুগ বেগের তালিকার চারটি অনুলিপি রক্ষিত আছে; এ চারখানাই আরবীতে লেখা। এগুলি পারসী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে বলে সবাই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, এই তালিকার বর্ণনা ইত্যাদি আরবীতে অতি সুন্দরভাবে লিখিত আছে, কিন্তু তালিকায় তারাসমূহের দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি পারসীতে লিখিত। এই তালিকা-অংশটি অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন, এবং

জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ কোন লোকের পক্ষে এগুলি অনুবাদ করা সম্ভবও নয়। সেজন্য বর্তমানে মনে করা হয় যে, মূল তালিকাটি পারসীতেই লিখিত ছিল; পরে সেখানা আরবীতে অনুবাদ করা হয় এবং তালিকা অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে তালিকাটি মূল পারসীতেই রেখে দেওয়া হয়। উলুগ বেগের মৃত্যুর (১৪৪৯ খ্রীস্টাব্দে) পরে শামসুদ্দিন বেন আবুল ফাতাহ আল-সুফির অনুরোধে ইয়াহিয়া বেন আলী আল-জামানী এই গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেন; কিন্তু এতে তারা-তালিকা সন্নিবেশ করা হয় নাই।

উলুগ বেগের এই তালিকাটির ভূমিকা চার অংশে বিভক্ত। এই অংশ-গুলির নাম নীচে দেওয়া গেল :

ভূমিকা

তারা-তালিকা ও তারা-জ্ঞানের ভূমিকা।

প্রথম অংশ

১। যুগ, মাস এবং তাদের বিভক্তির ব্যাখ্যা।
২। হিজরী নামে পরিচিত আরবী যুগ নির্ণয়।
৩। গ্রীক যুগ নির্ণয়।
৪। পারসিক যুগ নির্ণয়।
৫। যুগসমূহের সমন্বয়।
৬। মৌলিক যুগ সম্বন্ধে আলোচনা।
৭। খাতায়েন (চীন) এবং অয়গুর (তুর্কী) যুগ।
৮। বৎসর ও তার বিভক্তি নির্ণয়।
৯। মেদখাল (বৎসরের প্রথম দিন) নির্ণয়।
১০। গড়গতি থেকে মেদখাল বা মাসের প্রথম দিন নির্ণয়।
১১। সূর্য ও চন্দ্রের অংশ নির্ণয়।
১২। সূর্য-সমীকরণ নির্ণয়।

১৩। চন্দ্র-সমীকরণ নির্ণয়।

১৪। যে কোন বৎসরে মাসের প্রারম্ভ দিন নির্ণয় এবং চীনের মলমাস বৎসরের কোন্ মাসে পড়ে, তা নির্ণয়।

১৫। চতুর্থ চক্র নির্ণয়।

১৬। পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের সমন্বয়।

১৭। বিভিন্ন যুগের ফেরিয়াল দিবস সম্বন্ধে আলোচনা।

দ্বিতীয় অংশ

১। তালিকাতে অন্ত-স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা।

২। সাইন এবং ভার্স'াইন্ সম্বন্ধে আলোচনা।

৩। ছা' সম্বন্ধে আলোচনা।

৪। সূর্যপথ ও বিষুব-বৃত্তের ছেদ-কোণ সম্বন্ধে আলোচনা।

৫। বিষুববৃত্ত থেকে তারার দূরত্ব নির্ণয়।

৬। তারার উন্নতি ও অবনতি নির্ণয়।

৭। বিষুব সহ-উন্নতি নির্ণয়।

৮। দিবা-সমীকরণ, অর্ধদিবা-কোণ এবং দিনের ঘণ্টা নির্ণয়।

৯। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থানের সহ-উন্নতি নির্ণয়।

১০। সহ-উন্নতির বিপরীত গণনা (সহ-উন্নতি থেকে উন্নতি গণনা)।

১১। তারার মধ্যরেখা অতিক্রমণের ডিগ্রী ও সহ-উন্নতি নির্ণয়।

১২। তারার উদয় ও অস্ত-বিন্দুর সহ-উন্নতি নির্ণয়।

১৩। উন্নতির সাহায্যে দিগংশ নির্ণয়।

১৪। দিগংশের সাহায্যে উন্নতি নির্ণয়।

১৫। মধ্যরেখা অঙ্কন।

১৬। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়।

১৭। দিগন্তের উপরে সূর্যপথ মেরুস্থ উন্নতি নির্ণয়।

১৮। দুইটি তারা বা দুইটি গ্রহের ভিতরে দূরত্ব নির্ণয়।

১৯। কেবলার দিগংশ ও নতি নির্ণয়।

২০। উন্নতি থেকে বিষুবাংশ নির্ণয়।

২১। বিষুবাংশ থেকে উন্নতি বা নতি নির্ণয়।

২২। সময় থেকে বিষুবাংশ নির্ণয়।

তৃতীয় অংশ

১। দিবা সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা।

২। গ্রহসমূহের গড় দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়।

৩। সাতটি গ্রহের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়; ড্রাগনের মাথা ও লেজ নির্ণয়, অর্থাৎ চন্দ্রের পাতবিন্দুদ্বয় নির্ণয়।

৪। চন্দ্র ও গ্রহসমূহের অক্ষাংশ সম্বন্ধে আলোচনা।

৫। বিশ্বকেন্দ্র থেকে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয়।

৬। গ্রহস্থান ও পরিবর্তন অঙ্কন সম্বন্ধে আলোচনা।

৭। দ্রাঘিমাংশে ও অক্ষাংশে গ্রহসমূহের কৌণিক গতির অন্তঃস্থাপন।

৮। গ্রহসমূহের স্থির তারার প্রত্যাবর্তনের সময়।

৯। চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা।

১০। সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা।

১১। নূতন চাঁদ ওঠার সময় নির্ণয়; গ্রহসমূহের উদয় ও অস্তের সময় নির্ণয়।

১২। বারোটি খ-গৃহ নির্ণয়।

১৩। স্থির তারাসমূহের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ নির্ণয়।

চতুর্থ অংশ

স্মৃতি ও জাতক সম্বন্ধে তালিকাসমূহ :

০ ডিগ্রী থেকে ৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত অক্ষাংশে তারামণ্ডলসমূহের উদয়-তালিকা।

বিষুব অঞ্চলের মণ্ডলসমূহের উদয়-তালিকা।

সমরকন্দের অক্ষাংশে মণ্ডলসমূহের উদয়-তালিকা।

সূর্য-গতির তালিকা।

রাশিচক্রের প্রত্যেক রাশির জন্য সূর্য-সমীকরণ তালিকা।

দুই বৃত্তের কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী অংশের তালিকা।

সূর্যোদয়ের পরিবর্তন-তালিকা।

দিবা-রাত্রি সমীকরণ।

উচ্চ-পাতবিন্দু বা ড্রাগনের মাথার অনুপাতে মাস ও বৎসরে চন্দ্রের গড় গতির তালিকা।

চন্দ্রের দ্বিতীয় সমীকরণ তালিকা।

শাহী তালিকা (নাসিরুদ্দিন তুসীর 'জিজ-ই-ইলখানি') থেকে লওয়া বিভিন্ন শহরের দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ ও দৈর্ঘ্যকতার তালিকা।

সূর্যের ৩০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ থেকে দিনের ঘণ্টা-তালিকা।

৮৫০ হিজরীতে ড্রাগনের মাথার গতি (ইবনে আলালাম কর্তৃক)।

মকর-রাশির আরম্ভ থেকে নতিসহ খ-বস্তুসমূহের উদয়-তালিকা (ইবনে ইউনুস কর্তৃক)।

সাইন তালিকা।

প্রথম ছায়া-তালিকা ; এই ছায়াকে বিপরীত ছায়া বা লম্ব-ছায়াও বলা হয়।

দ্বিতীয় ছায়া-তালিকা।

প্রথম নতি-তালিকা।

দ্বিতীয় নতি-তালিকা।

সমরকন্দের অক্ষাংশে মধ্যাহ্ন সময়-তালিকা।

বিভিন্ন দেশের শহরসমূহের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের তালিকা।

গ্রহ-প্রভাব তালিকা (জ্যোতিষ)।

চন্দ্রগ্রহণ তালিকা।

বিভিন্ন অক্ষাংশে ও দ্রাঘিমাংশে চন্দ্রোদয়।

সূর্যগ্রহণ তালিকা।

শনির গড় গতি তালিকা।

বৃহস্পতির গড় গতি তালিকা।

মঙ্গলের গড় গতি তালিকা।

শুক্রের গড় গতি তালিকা।

বুধের গড় গতি তালিকা।

বিভিন্ন গ্রহের সাথে চন্দ্রের সংযোগ তালিকা।

সমবকন্দের পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত প্রথম ও দ্বিতীয় নতি-তালিকা।

সাইন তালিকা।

গ্রহসমূহের সংযোগ তালিকা।

তারা-তালিকা।

মেলিকি তালিকা।

স্থির তারাসমূহের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ কি পদ্ধতিতে নির্ণয় করেছেন, সে সম্বন্ধে তিনি ভূমিকার তৃতীয় অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তার কিছু অংশ নীচে লিপিবদ্ধ করা গেল:

"টলেমীর পূর্বে ১০২২টি স্থির তারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। 'আল-মাজেস্টে'র একটি তালিকাতে টলেমী সেগুলো সন্নিবেশিত করেন। সেখানে তারাসমূহকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে; সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাগুলিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ও সর্বাপেক্ষা অনুজ্জ্বল তারাগুলিকে ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শ্রেণীকে আবার তিন অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। তারা চিনবার জন্য ৪৮টি চিত্র বা মণ্ডলের পরি-কল্পনা করা হয়েছে। এদের ২১টি সূর্যপথের উত্তরে, ১২টি সূর্যপথের রাশিচক্রে এবং ১৫টি সূর্যপথের দক্ষিণে অবস্থিত। অধিকাংশ তারাই এই চিত্রসমূহের ভিতরে অবস্থিত। অন্যান্য তারাগুলি চিত্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলি মণ্ডলের অগঠিত তারা।

আবদুর রহমান সূফী তারা সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন; প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এই গ্রন্থখানিকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করেছেন। আমরা নিজে পর্যবেক্ষণের পূর্বে এই গ্রন্থ অনুযায়ী তারাসমূহকে একটি গোলকে

নির্দেশ করেছি, এবং লক্ষ্য করেছি যে, এদের অধিকাংশ তারার অবস্থানই আকাশে ঐ সমস্ত তারার প্রকৃত অবস্থান থেকে পৃথক। এ থেকে আমরা আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ ও সাহায্য স্মরণ করে নিজে পর্যবেক্ষণ দ্বারা ঐ সমস্ত তারার প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করতে ইচ্ছা করি। এর ফলে আমরা দেখতে পাই যে, সুফীর গ্রন্থে তারাসমূহের যে অবস্থান দেখানো হয়েছে, সে অবস্থান থেকে তারাগুলি এগিয়ে গেছে। অতএব সাধারণ পর্যবেক্ষণে তাদের প্রকৃত অবস্থান স্থাপন করার পরে দেখা যায় যে দৃশ্য-অবস্থান ও প্রকৃত অবস্থানে কোন পার্থক্য নাই।

এই নীতির উপরে ভিত্তি করে যে সমস্ত তারার অবস্থান আগে থেকেই দেওয়া আছে, তাদের মধ্যে ২৭টি তারা ব্যতীত আমরা অন্য-গুলি পুনরায় পর্যবেক্ষণ করেছি। এই ২৭টি তারা এত দক্ষিণে যে, সমরকন্দ থেকে এগুলি দেখা যায় না। এদের মধ্যে আরা (বেদী) মণ্ডলে ৭টি, আর্গোনভিস (অর্ণবযান) মণ্ডলে ৮টি (৩৬ নং থেকে ৪১ নং পর্যন্ত, এবং ৪৪ নং ও ৪৫ নং), সেণ্টরাসে (মহিষাসুর) ১১টি (২৭ নং থেকে শেষ পর্যন্ত); এবং শার্দুল মণ্ডলে একটি (দশম) তারা। আবদুর রহমান সুফীর তালিকা থেকে এই ২৭টি তারার অবস্থান নিয়ে যুগ পরিবর্তনের জন্য তাদের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই ২৭টি তারা ব্যতীত আরো ৮টি তারা টলেমী পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বলে আবদুর রহমান সুফী তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সুফী নিজে এই ৮টি তারা দেখতে পান নাই, এবং অনেক চেষ্টা করে আমরাও দেখতে পাই নাই। সেজন্য বর্তমান তালিকাতে আমরা এই ৮টি তারার উল্লেখ করি নাই। টলেমীর এই তারাগুলো হলো, অরিগার চতুর্দশ তারা, শার্দুলের একাদশ তারা, এবং দক্ষিণ মীনের ছয়টি অগঠিত তারা।

আমাদের তালিকাতে ৮৪১ হিজরীর প্রারম্ভে তারাসমূহের অবস্থান নির্দেশ করেছি; প্রতি ৭০ সৌরবৎসরে তারাসমূহ ১ ডিগ্রী এগিয়ে

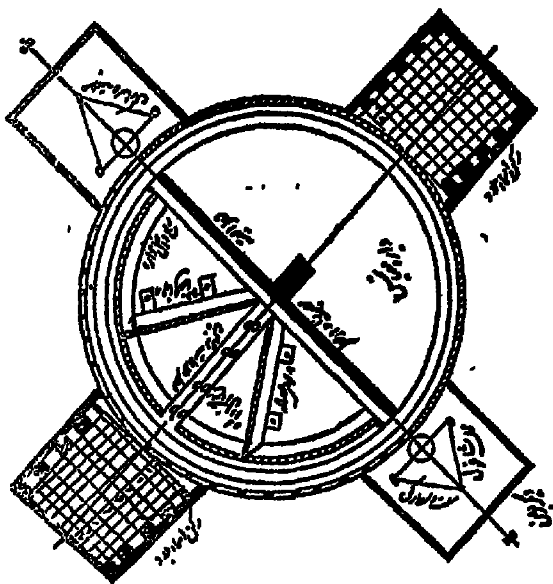
যায়, এই স্বীকার্যকে ভিত্তি করে, আমরা ঐ তারাসমূহের অন্যান্য সময়ের অবস্থানও নির্ণয় করতে পারি।"

উলুগ বেগের তারা-তালিকাতে মোট ১০১৮টি তারার অবস্থান দেওয়া আছে। এর মধ্যে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী ১৭টি তারা তিনি পর্যবেক্ষণ করেন নাই। টলেমীর তালিকা থেকে ঐ তারাগুলির দ্রাঘিমাংশে একটি ধ্রুবক সংখ্যা যোগ ক'রে তিনি ঐগুলিকে নিজ তালিকাভুক্ত করেছেন। বর্তমানে উলুগ বেগের তালিকা বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখা যায় যে, আরো চারটি তারার দ্রাঘিমাংশও উলুগ বেগ নিজে পর্যবেক্ষণ করেন নাই, টলেমীর তালিকার দ্রাঘিমাংশ যথারীতি পরিবর্তন করে নিজ তালিকাতে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া আরো ৮২ জোড়া তারা ঐ তালিকাতে স্থান পেয়েছে, যাদের একটির অক্ষাংশ সমরকন্দের মানমন্দিরে নির্ণীত হয়েছে, এবং অন্যটির অক্ষাংশ টলেমীর তালিকাতে প্রদত্ত অক্ষাংশের পরিবর্তন করে নিজ তালিকাভুক্ত করেছেন। এইভাবে দেখা যায় যে, উলুগ বেগ নিজে বা তাঁর সহকর্মিগণ ৯০০টি দ্রাঘিমাংশ এবং ৮৭৮টি অক্ষাংশ পর্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করেন।

টলেমীর মত উলুগ বেগও মণ্ডল অনুযায়ী তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি সুফীর তারা-তালিকাই (টলেমীর তালিকার অনুবাদ) অনুসরণ করেন; অন্যভাবে বা বিশৃঙ্খলভাবে পর্যবেক্ষণ করেন নাই। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণই সমরকন্দের মানমন্দিরে করা হয়। উলুগ বেগ নিজে এই মানমন্দিরের অক্ষাংশ নির্ণয় করেন, এবং তাঁর গণনা মতে এই অক্ষাংশের পরিমাণ ৩৯°৩৭′ উত্তর; বর্তমান মতে (ট্রুভ কর্তৃক নির্ণীত) এই অক্ষাংশের পরিমাণ ৩৯°৩৮′৫০″।

কি প্রক্রিয়াতে উলুগ বেগ তাঁর পর্যবেক্ষণ-কাজ চালান, কোন আরবী বা পারসী গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি নাসিরুদ্দিন আল-তুসীর 'জিজ-ই-ইলখানি'কে ভিত্তি করেই তাঁর তালিকা প্রণয়ন করেন। আবদুল মুমিন আমিনি

কর্তৃক পারসী ভাষায় লিখিত একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে আলেকজান্দ্রিয়া, মারাঘা ও সমরকন্দের মানমন্দিরে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো তার বিবরণ দেওয়া আছে। অতি সুন্দরভাবে চিত্রের সাহায্যে এই সমস্ত যন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম বিবরণ দেওয়া আছে। তারাসমূহের দিগংশ ও উন্নতি নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হতো তার একটি চিত্র নীচে দেওয়া গেল। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষুদ্র বিভক্তির জন্য মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ ডায়াগোনাল স্কেল ব্যবহার করতেন। কিন্তু কোন বইতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।



রেখাচিত্র ৩৯ঃ উলুগ বেগ কর্তৃক দিগংশ ও উন্নতি নির্ণয় যন্ত্র

উলুগ বেগ বলেছেন যে, যে ২৭টি তারার দ্রাঘিমাংশকে তিনি টলেমী প্রদত্ত দ্রাঘিমাংশের পরিবর্তন করেছেন, সেই পরিবর্তন তিনি ৭০ বৎসরে ১ ডিগ্রী হিসাবে করেছেন। অবশ্য ইবনে আলালাম,

ইবনে ইউনুস এবং নাসিরুদ্দিনও ঠিক এই ভিত্তিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তারাব তালিকা থেকে দেখা যায যে, সুফীর তালিকাতে প্রদত্ত দ্রাঘিমাংশেব সঙ্গে ৬°৫৯′ যোগ ক'বে তিনি ঐ ২৭টি তারাব দ্রাঘিমাংশ নির্ণয করেছেন। সুফী নিজেও টলেমীর তালিকাতে প্রদত্ত দ্রাঘিমাংশের সঙ্গে ১২°৪২′ যোগ ক'বে ৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে নিজ তালিকা প্রণয়ন কবেন, এবং উলুগ বেগের তালিকা তৈবী হয় ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দে। এই দুই তালিকা প্রণযনের ভিতরে সময়ের পার্থক্য ৪৭৩'৫ বৎসর। এই সময়ে দ্রাঘিমাংশেব পার্থক্য ৬°৫৯′ হলে, বার্ষিক অগ্রগতিব পরিমাণ হয ৫১'৪৩″, অর্থাৎ প্রতি ৬৮ বৎসবে ১ ডিগ্রী। এই অসামঞ্জস্যের একটি-মাত্র ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পাবে। উলুগ বেগ এই অগ্রগতিব পরিমাণ বলেছেন, "হেফতেত আশ-শামসি" অর্থাৎ ৭০ সৌরবৎসব; সুফী ও উলুগ বেগেব সময়ের হিজরী বৎসবেব পার্থক্য ৮৪১ – ৩৫৩ = ৪৮৮ হিজবী বৎসব। মনে হয যে, উলুগ বেগেব সহকর্মিগণ এই ৪৮৮ বৎসরকে সৌববৎসরে পরিণত না কবেই এর উপবে প্রতি ৭০ বৎসবে ১ ডিগ্রী অগ্রগমন করে নিয়েছেন। এই হিসাবে দ্রাঘিমাংশের পবিবর্তন হয ৬°৫৮′১৮″।

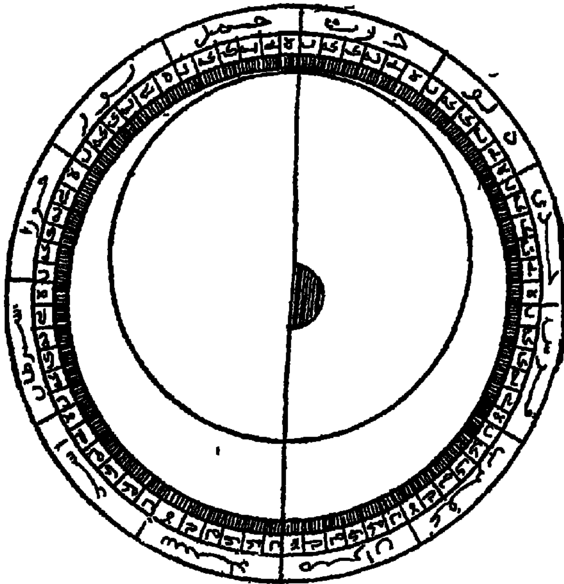
উলুগ বেগের তাবা-বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে সুফীব তাবা বর্ণনাব অনুবাদ; আবাব সুফীব বর্ণনাও টলেমীব বর্ণনার হুবহু অনুবাদ। অবশ্য দুই-এক জাযগায কিছু ভুলও আছে। উলুগ বেগ নিজে কোন তাবার উজ্জলতা নির্ণয কবেন নাই। তিনি সুফীব তালিকাতে প্রদত্ত উজ্জলতাই ব্যবহাব কবেছেন। সুফী প্রত্যেকটি তাবার উজ্জলতা সংখ্যায না লিখে কথায বর্ণনা দিয়েছেন; উলুগ বেগ এগুলি সংখ্যাতে লিখেছেন।

১৪৪৯ খ্রীস্টাব্দেব ২৭শে অক্টোবর উলুগ বেগ তাঁর পুত্র আবদুল লতিফ কর্তৃক নিহত হন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের গণনা-প্রণালী

মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ নিজস্ব গণনা-প্রণালী প্রচলন করেন ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। এর পূর্বে তাঁরা কোন্ পদ্ধতিতে গণনা করতেন সে



রেখাচিত্র ৩২ : তাবাকোল মানাতেক বা আকাশ-ফলক

সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পরবর্তী যুগে যে পদ্ধতি তাঁরা প্রয়োগ করতেন, তার বিশেষ একটি পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা

করা যাবে। এই পদ্ধতির প্রবর্তকের নাম জামশিদ গিয়াসউদ্দিন আল-কাশী। এঁর জীবনী ও কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আল-কাশী তাঁর গণনা-কার্যের সহায়তার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি এই যন্ত্রটির নাম দেন 'তাবাকোল মানাতেক' (طبق المناطق) বা আকাশ-ফলক। এর সাহায্যে তিনি গ্রহসমূহের গতি, তাদের অবস্থান, অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও দূরত্ব নির্ণয়, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের তারিখ ইত্যাদি নির্ণয় করতেন। তাঁর পদ্ধতি অনেক জায়গায় গ্রীক পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম ফল প্রদান করত। বর্তমান অধ্যায়ে এই আকাশ-ফলক গঠন-প্রণালী ও তার সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনার নির্ণয়-পদ্ধতি আলোচনা করা হবে।

আকাশ-ফলক নির্ণয় প্রণালী

এই যন্ত্রটিতে তামা, পিতল অথবা কাঠের তৈরী একটি বিম্ব (disc, قرص) থাকে। এই বিম্বটির ব্যাস অন্ততঃপক্ষে এক হাত; এর চেয়ে বেশী ব্যাস হলে যন্ত্রটি আরো অধিক সূক্ষ্ম হয় বলে আল-কাশী বর্ণনা করেছেন। বিম্বটি একটি বলয়ের (Ring, حلقه) ভিতরে আবদ্ধ থাকে এবং এর ভিতরে বিম্বটিকে ঘুরিয়ে যে কোন অবস্থায় স্থির রাখা যেতে পারে। বিম্ব ও বলয় উভয়ে একত্রে একটি সমতল গঠন করে। ফলকের পরিধি হতে একটি সরু জিহ্বা বেরিয়ে থাকে। বলয়ের অবতলে একটি গর্ত কাটা হয়; ফলকের জিহ্বা এই গর্তের ভিতরে ঠিকভাবে বসতে পারে। রুলার এবং ওলন-দড়ি দিয়ে এই সমতল যাচাই করে দেখা হয়। নীচের চিত্রে আকাশ-ফলকের গঠন-প্রণালী দেখানো হয়েছে। বিম্বের কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে বলয়ের উপরে পাঁচটি বৃত্ত আঁকা হয় (চিত্রে ৪টি বৃত্ত দেখানো হয়েছে)। প্রথম বৃত্তটিকে বারো অংশে ভাগ করা হয়; এতে পাঁচটি বৃত্তই বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃত্তের মাঝখানে এই বারো অংশে রাশিচক্রের বারোটি রাশির নাম লেখা

হয়। দ্বিতীয় বৃত্তটিকে বাহাত্তর অংশে ভাগ করা হয়; প্রত্যেক অংশে পাঁচ ডিগ্রী পরিমিত স্থান থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃত্তের মাঝখানে

রেখাচিত্র ৩৩ : বলয় ও ফলক (আল-কাশী)

সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তৃতীয় বৃত্তটিকে তিনশত ষাট অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক অংশ এক ডিগ্রীর সমান। চতুর্থ বৃত্তটিকে ডিগ্রীর ভগ্নাংশে বিভক্ত করা হয় এবং পঞ্চম বৃত্তকে আরো ক্ষুদ্রতর

ভগ্নাংশে বিভক্ত করা হয়। এর প্রত্যেকটি অংশের জন্য একটি করে ছিদ্র থাকে এবং বিম্বের জিহ্বারও ছিদ্র করতে হয়। এই ছিদ্রগুলি একটি বৃত্তের পরিধির উপরে পড়ে। একটি পাতলা কাঠি রাখতে হয়। এই কাঠি ছিদ্রের ভিতরে ঢুকিয়ে বলয়টিকে রাশিচক্রের সাথে আটকিয়ে রাখা হয়।

আরবীয় পদ্ধতিতে অক্ষর দ্বারা সংখ্যা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। অক্ষরের বিভিন্ন সংযোগে বিভিন্ন পূর্ণসংখ্যা গঠিত হয়। ভগ্নাংশ নির্দেশ করতে ষষ্টিক প্রথার ব্যবহার করা হয়। অক্ষর দ্বারা সংখ্যা, কমা দ্বারা ষষ্টিক পূর্ণসংখ্যা এবং সেমিকোলন দ্বারা ষষ্টিক বিন্দু নির্দেশ করা হয়। কোন চাপ নির্দেশ করতে ৩০ ডিগ্রীর একক ব্যবহার করা হয়। অক্ষর দ্বারা রাশিচক্রের প্রত্যেকটি রাশি এক-একটি ৩০ ডিগ্রীর এককরূপে ব্যবহার করা হয়। আমরা এরূপ স্থলে s ব্যবহার করব। যেমন $৯^{s}২৩\,;\,৭,০,৫৪^{\circ}$ অথবা $২৯৩\,;\,৭,০,৫৪^{\circ}$ এই সংখ্যা দ্বারা $২৯৩+\frac{৭}{৬০}+\frac{০}{৬০^{২}}+\frac{৫৪}{৬০^{৩}}$ ডিগ্রী বুঝায়।

অপভু, কেন্দ্র, ডেফারেন্ট, বিপরীত বিন্দু ও ইকোয়াণ্ট অঙ্কন প্রণালী

বিম্বটির পরিধির উপরে যে কোন একটি বিন্দুকে সূর্যের অপভূ (اوج شمس) মনে করা হয় এবং সেখান থেকে প্রত্যেক গ্রহের অপভূর দূরত্ব-বিন্দুগুলি নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করা হয় এবং প্রত্যেকটি

সূর্যের অপভূ থেকে পাঁচিশটি গ্রহের অপভূর কৌণিক দূরত্ব				
শনি ♄	বৃহস্পতি ♃	মঙ্গল ♂	শুক্র ♀	বুধ ☿
$৫^{s}১০\,;\,২৮^{\circ}$	$২^{s}২৯\,;\,১৬^{\circ}$	$১^{s}১৬\,;\,৫^{\circ}$	$১১^{s}১৯\,;\,১৫^{\circ}$	$৪^{s}২\,;\,৪০^{\circ}$

বিন্দুতে একটি করে দাগ দিতে হয়। এর প্রত্যেকটি দাগকে কেন্দ্রের সাথে যোগ করতে হয়। বৃত্ত-গঠন সম্পূর্ণ হলে এই দাগগুলি মুছে

ফেলা হয়। ফলকের কেন্দ্র হতে, সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য গ্রহের অপভূর দিকে দুইটি কেন্দ্রের দূরত্বের সমান অংশ কেটে নেওয়া হয় এবং সেখানে একটি দাগ দেওয়া হয়। সূর্যের বেলায় ফলকের কেন্দ্র থেকে সূর্যের অপভূর দিকে এবং চন্দ্রের বেলায় বিভক্তির আরম্ভ-বিন্দুর দিকে ঐ দূরত্বের সমান অংশ কেটে নিয়ে দাগ দেওয়া হয়। এই দাগগুলি ঐ গ্রহসমূহের ডেফারেন্টের কেন্দ্র।

গ্রহসমূহের ডেফারেন্ট বৃত্তের কেন্দ্রের দূরত্ব						
সূর্য	চন্দ্র	শনি	বৃহস্পতি	মঙ্গল	শুক্র	বুধ
☉	☾	♄	♃	♂	♀	☿
২ ; ৬, ৯	১০ ; ১৯	২ ; ৫৮	২ ; ৩২	৪ ; ৩৩	১ ; ২	৪ ; ৫২

এই বিন্দুগুলিকে কেন্দ্র করে এবং নিম্নলিখিত ব্যাসার্ধ নিয়ে প্রত্যেক গ্রহের ডেফারেন্ট বৃত্ত আঁকা হয়ঃ

☾	♄	♃	♂	♀
৪৯ ; ৪১	৫২ ; ২	৫৫ ; ২৮	৪৫ ; ৪৭	৫৮ ; ৫৮

সূর্যের এবং বুধের ডেফারেন্টের কোন প্রয়োজন হয় না, কেননা ফলকের পরিধিকেই সূর্যের পথ বলে মনে করা হয়। ফলকের চিহ্নিত কেন্দ্রটিকে সূর্যের ডেফারেন্টের কৃত্রিম কেন্দ্র বলা হয়। বুধের জন্য চিহ্নিত কেন্দ্রকে বুধের গতি-পরিবর্তন বিন্দু বলে। এই বিন্দুতে বুধের অপ-দূরক রেখার উপরে একটি লম্ব অঙ্কিত করে উত্তরদিকে ৫;৮ পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই দূরত্বে দুইটি দাগ দেওয়া হয়। এই দুইটি দাগের প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করে ৫১ ; ২৩ ব্যাসার্ধ নিয়ে দুইটি চাপ

আঁকা হয়। এতে একটি উপবৃত্তাকার চিত্রের উদ্ভব হয়। এই উপ-বৃত্তের বৃহত্তর অক্ষার্ধ ৫১ ; ৮ এবং ক্ষুদ্রতর অক্ষার্ধ ৪৬ ; ১৫। ইহাই বুধের এপিসাইকেলের কেন্দ্রের ভ্রমণ-কক্ষ, অর্থাৎ বুধের ডেফারেন্ট। বিভিন্ন গ্রহের ডেফারেণ্ট বিভিন্ন রং-এ আঁকা হয়ে থাকে ; ব্যবহারের সময় এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। প্রত্যেকটি বহির্গ্রহের ও শুক্রের ডেফারেণ্টের বৃত্ত হতে অপভূর দিকে এবং চন্দ্রের বেলায় ফলকের কেন্দ্র হতে বিভক্তির আরম্ভের বিপরীত দিকে অর্থাৎ তুলারাশির দিকে, ফলকের কেন্দ্র হতে প্রত্যেক গ্রহের কেন্দ্রের সমান দূরত্বে কতক-গুলি বিন্দু চিহ্নিত করা হয়। বুধের বেলায় ফলকের কেন্দ্র ও গতি-পরিবর্তন বিন্দুর অর্ধেক দূরত্বে একটি বিন্দু চিহ্নিত করা হয়। এই বিন্দু-গুলিকে ইকুয়ান্ট কেন্দ্র বলে।

ডেফারেণ্ট, খ-দ্রাঘিমাংশ ও খ-অক্ষাংশ অঙ্কন

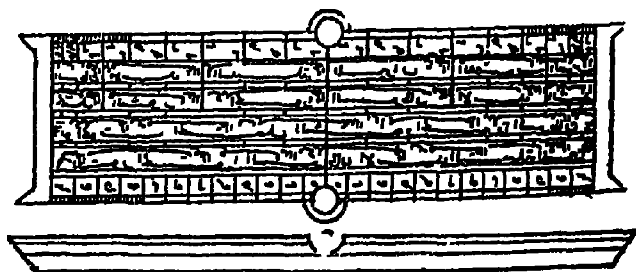
বিভক্তির আরম্ভ হতে ফলকের একটি ব্যাস আঁকা হয়। একে সমীকরণ-ব্যাস (Equating diameter, قطر استواء) বলে। সমীকরণ-ব্যাসের উপরে ফলকের কেন্দ্র হতে নিম্নলিখিত দূরত্বে এবং তুলারাশির প্রথম বিন্দুর নিকটে শনির জন্য দুইটি, বৃহস্পতির জন্য দুইটি, মঙ্গলের জন্য দুইটি, শুক্রের জন্য একটি এবং বুধের জন্য একটি, এই মোট আটটি বিন্দু চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্নগুলি গ্রহসমূহের খ-অক্ষাংশ। অন্তর্গ্রহ দুইটির জন্য একটি করে চিহ্ন নেওয়ার কারণ, তাদের প্রান্ত দুইটি নয়। শুক্রের এপিসাইকেলের প্রান্ত সবচেয়ে উত্তরে এবং বুধের এপিসাইকেলের প্রান্ত সবচেয়ে দক্ষিণে।

পাঁচটি গ্রহের অক্ষাংশ-রেখার দূরত্ব

♄		♃		♂		♀	☿
৫৩ ; ৫৫	৫০ ; ১	৫৭ ; ৪৬	৫৩ ; ৯	৫০ ; ০	৪০ ; ৫৪	৫৮ ; ৫৮	৪৬ ; ০

আলিদাদ ও কলার গঠন সম্পর্কে

তামা, পিতল অথবা কাঠ দিয়ে দুইটি কলার তৈরী করা হয়। এর একটি আস্তারলাবের আলিদাদের মত একদিকে সমান; দৈর্ঘ্যে ফলকের ব্যাসের বেশী, কিন্তু বলয়ের বহির্ব্যাসের কম। আর একটির দুই দিকেই দাগ কাটা থাকে (মুহাররাফ)। এক দিকের দাগ দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের জন্য এবং অন্যদিকের দাগ অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য। এজন্য দুইটি আলিদাদ একসঙ্গে জোড়া লাগানো বলে মনে হয়। প্রত্যেকটি দিকের মাঝখানে খুব ছোট একটি অর্ধবৃত্তাকার অংশ থাকে।



রেখাচিত্র ৩৪ : আলিদাদ ও কলার

দুই ধারের প্রথমটিকে ব্যাস-ধার (হারফুল কাতর) বলা হয়। এটিকে ফলকের ব্যাসের ৬০ ভাগে বিভক্ত করতে হয়; সেগুলিকে আরো যত সম্ভব ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা হয়। এই অংশগুলিকে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় ধারটিকে চাপ-ধার (হারফুল কাসি) বলা হয়। এতে চারটি বিভিন্ন প্রকার দাগ কাটা থাকে। প্রত্যেক প্রকার দাগের সঙ্গে আলিদাদের দাগের সম্বন্ধ আছে। আলিদাদের চারটি বিভিন্ন অবস্থানের জন্য এই চার প্রকার দাগ কাটা থাকে। এই চারটি অবস্থানের জন্য আলিদাদকে চাপ-ধারের গর্তে আটকানো থাকে। চাপ-ধারের উত্তরের অংশকে মাথা এবং দক্ষিণের অংশকে লেজ বলে। চাপ-ধারের মাথা থেকে মেষাদি-বিন্দু

পর্যন্ত চাপের পরিমাণ যদি θ হয়, তা হলে বলয়ের উপরে যে বিন্দুর দ্রাঘিমাংশ λ, সেই বিন্দু চাপ-ধারের উপরে $\cos(\lambda+\theta)$ বিন্দুতে যেয়ে মিশবে। θ-এর চারটি বিভিন্ন মানের জন্য আলিদাদের চারটি বিভিন্ন অবস্থান নির্দেশ করে। এই অবস্থান চারটি হলো ঃ

(১) θ=৯০, চন্দ্রের অক্ষাংশ এবং অন্তঃগ্রহসমূহের দ্বিতীয় অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য।

(২) θ=০, মঙ্গলের দ্রাঘিমাংশ এবং অন্তঃগ্রহসমূহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য।

(৩) θ=৮০, শনির অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য।

(৪) θ=১০, বৃহস্পতির অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য।

উপরে বর্ণিত দুইটি বলয়ের প্রথমটিকে আলিদাদ এবং দ্বিতীয়টিকে কলার বলে। আলিদাদের একদিকে, সূর্য ব্যতীত অন্য ছয়টি গ্রহের জন্য ছয়টি দাগ কাটা থাকে। এই দাগগুলিকে অন্তর দাগ বলে। ফলকের কেন্দ্র থেকে এই দাগগুলির দূরত্ব নীচে দেওয়া হলো ঃ

☾	♄	♃	♂	♀	☿
৫ ; ১৭	৫ ; ৩৮	১০ ; ৩৮	৩০ ; ৩২	৪২ ; ২৫	১৮ ; ১৩

ফলকের কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে এবং এই দূরত্বসমূহকে ব্যাসার্ধ নিয়ে ছয়টি বৃত্ত আঁকা হয়। এই বৃত্তগুলিকে অন্তরবৃত্ত বলে। দ্বিতীয় কলারের মাথা থেকে ৬৩ অংশ দূরে একটি চিহ্ন দেওয়া হয়। এই চিহ্নটিকে চন্দ্রগ্রহণ চিহ্ন এবং তেত্রিশ অংশ দূরের আর একটি চিহ্নকে সূর্যগ্রহণ চিহ্ন বলে। উনত্রিশ অংশ দূরে আর একটি চিহ্ন দেওয়া হয়। এই চিহ্নটি পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের স্থায়িত্বকাল নির্দেশ করে। এই উনত্রিশ অংশ এবং তেষট্টি অংশকে বারো ভাগে বিভক্ত করে চন্দ্রগ্রহণ-সংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

ক্লায়েরের বিভক্তির আবম্ভ থেকে অন্যদিকের তেত্রিশ অংশকে বারো ভাগে বিভক্ত করে সূর্যগ্রহণ-সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। এই সংখ্যাগুলি কেন্দ্রের দিক থেকে লেখা হয়। এরপরে দুইটি ক্লায়েরকে একটি পাতলা শিকল দিয়ে আটকানো হয়। এই শিকলের দৈর্ঘ্য ব্যাসার্ধের সমান।

গড় গতির তালিকা প্রণয়ন

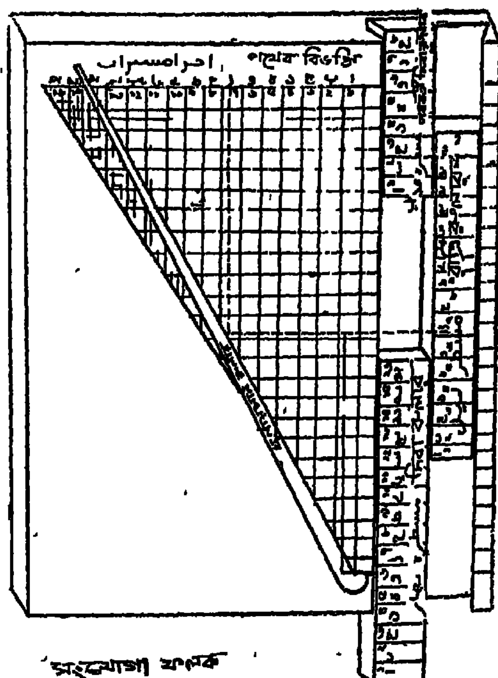
ফলকের পিছনের দিকে একটি ছক আঁকা হয়। এই ছকে এগারোটি কলম থাকে। প্রথম কলমে সংখ্যা, পাঁচটি কলমে সূর্য, চন্দ্র ও বহির্গ্রহ-সমূহের গড়-গতি এবং অবশিষ্ট পাঁচটি কলমে সূর্যের অপভূ, চন্দ্রকোণ, চন্দ্রের পাতবিন্দুর গড়-গতি এবং অন্তর্গ্রহ দুইটির মিশ্রকোণ (সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশ এবং অন্তর্গ্রহের গড় কোণের যোগফলকে মিশ্রকোণ বলে) দেওয়া থাকে। এই ছকে মোট ৫৮টি সারি থাকে। তিনটি সারির কলম-হেডিংয়ের জন্য ক্রমিক দশটি অসম্পূর্ণ ইযাজদিগার্দ বৎসরে গ্রহসমূহের গড়-গতির জন্য দশটি সারি, পরবর্তী উনিশটি সারি নয়টি দশকের, নয়টি শতকের এবং একটি সহস্রের জন্য, বারো মাসের জন্য, অধিমাসের পাঁচ দিনের জন্য মোট তেরটি সারি, একক দিন ও দশক দিনের জন্য বারোটি সারি এবং ঘণ্টার জন্য একটি সারি থাকে (চিত্র ৩৫)। ছকে দেখা যায় যে, প্রথম সারিতে ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, . . . ৮৬০ ইযাজদিগার্দ বর্ষের প্রারম্ভে যে গড়-দ্রাঘিমাংশ বা কোণ ছিল, সেইগুলি দেওয়া আছে। ৮৫১ ইযাজদিগার্দ বর্ষের প্রথম দিনকে (১৬ই নভেম্বর, ১৪৮১) ঐ যুগের আরম্ভ মনে করা হয়। ঐ দিনে সুলতান দ্বিতীয় বায়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন্ সময়ে গড়-দ্রাঘিমাংশ বা কোণ কত হয়েছে, অন্যান্য সারিতে সে সমস্ত দেখানো হয়েছে। এই সময় ১০, ২০, ৩০, . . . ১০০, ২০০, ৩০০, . . . ১০০০ ইয়াজদিগার্দ বর্ষে এবং পরে মাস, দিন ও ঘণ্টায় দেখানো হয়েছে। ছকভুক্ত সংখ্যা সমস্তই রাশি-সংখ্যা, ডিগ্রী ও মিনিটে লেখা হয়েছে।

[illegible]	⊙	
	গড়	ভ
৮৫১	৮ [৫] ৪,২২°	৬[৫]
৮৫২	৪,৭	৬
৮৫৩	৬,৫৩	
৮৫৪	৬.৬৯	
৮৫৫	৬,২৪	
৮৫৬	৬,১০	
৮৫৭	২;৫৬	
৮৫৮	২,৪১	
৮৫৯	২ ২৭	
৮৬০	৮ ২,১৩	৬
১০	১১ ২৭.৩৭	০
২০	২৫.৯৬	
৩০	২২·৫০	
৪০	২০;২৬	
৫০	১৮,৩	
৬০	১৫,৪০	০
৭০	১৩,৩৭	০
৮০	১০,৫০	

যাগ'ফলক গঠন প্রণালী

এক হাত লম্বা এবং ⅔ হাতের বেশী চওড়া কাঠের, তামার অথবা তলের একটি ফলক লওয়া হয়। ফলকের পৃষ্ঠদেশ যতদূর সম্ভব ান করা হয়। ফলকটির উপরে একটি সমকোণী ত্রিভুজ এমনভাবে কা হয়, যেন ত্রিভুজটির দুইটি বাহু ফলকের দুইটি ধারের সমান্তরাল ।। ত্রিভুজের বড় বাহু বা ভূমিকে ঘণ্টার জন্য ২৪ ভাগে বিভক্ত রা হয়; এদের প্রত্যেক ভাগকে আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। াট বাহুটি ১৬ ভাগে ভাগ করা হয় এবং এ ক্ষেত্রেও প্রত্যেক ভাগকে ০ ভাগে ভাগ করা হয়। দুই বাহুর প্রত্যেক বিভক্তি-বিন্দু থেকে ন্য বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা আঁকা হয় এবং এই রেখাগুলি বাড়িয়ে ন্য রেখাগুলির সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। দুই বিভিন্ন প্রকার রেখা বিভিন্ন রং-এ আঁকলে চিনবার সুবিধা হয়। ত্রিভুজটির বৃহত্তর বাহুর বাইরে, ফলকের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত একটি পানির পাত্র তৈরী করা হয়। এই পাত্রটির ভিতরের অংশ ত্রিভুজের পাশের অংশের চেয়ে বড় করা হয়। এই পাত্রটির পাশে আর একটি পানির পাত্র থাকে। দ্বিতীয় পাত্রটি প্রস্থ এবং উচ্চতায় প্রথম পাত্রটির সমান; এর দৈর্ঘ্য ত্রিভুজের ভূমির ⅓ পর্যন্ত হয়ে থাকে। দুইটি পাত্র একত্রে যোগ করলে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়। এরপরে কাঠের অথবা পিতলের তিনটি রুলার তৈরী করা হয়। প্রত্যেকটি রুলারের বেধ উপরের পানির পাত্রের প্রস্থের সমান এবং একটি রুলারের দৈর্ঘ্য ত্রিভুজের ভূমির এক-তৃতীয়াংশ। এই রুলারটিকে পরবর্তী-দিবস রুলার বলা হয়। অন্য দুইটি রুলারের দৈর্ঘ্য ত্রিভুজের ভূমির দুই-তৃতীয়াংশ। এদের একটিকে দিবস-রুলার এবং অন্যটিকে রাত্রি-রুলার বলা হয়। রাত্রি-রুলারটিকে দ্বিতীয় পানি-পাত্রে রাখা হয়; দিবস-রুলার ও পরবর্তী দিবস-রুলার প্রথম পাত্রে এমনভাবে রাখা হয়, যেন পরবর্তী দিবস-রুলারের সমকোণের পাশে থাকে। পাত্রের ভিতরে রুলার তিনটিকে নড়ানো

যেতে পারে, কিন্তু ফলকের উপরে তোলা যায় না। এই ফলকের চিত্র নীচে দেওয়া গেল।



রেখাচিত্র ৩৬ : সংযোগ ফলক

পরবর্তী দিবস-কলার আট ভাগে এবং অন্য দুইটি কলাবের প্রত্যেকটিকে ষোলভাগে ভাগ করা হয়। পানির পাত্র ও ফলকের পরিধির মাঝখানে ঘণ্টা এবং সূক্ষ্মকোণ থেকে সমকোণ পর্যন্ত ত্রিভুজের ভূমিতে প্রতি পাঁচ-মিনিট অংশ লেখা হয়। সমকোণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রহ-কক্ষের বিভক্তির সংখ্যা লেখা হয়। সূক্ষ্মকোণের যে জায়গা থেকে ঘণ্টার সংখ্যা আরম্ভ হয়, সেখানে একটি ছিদ্র ক'রে সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ত্রিভুজের অতিবাহুর সমান একটি সুতা ঢুকানো হয়।

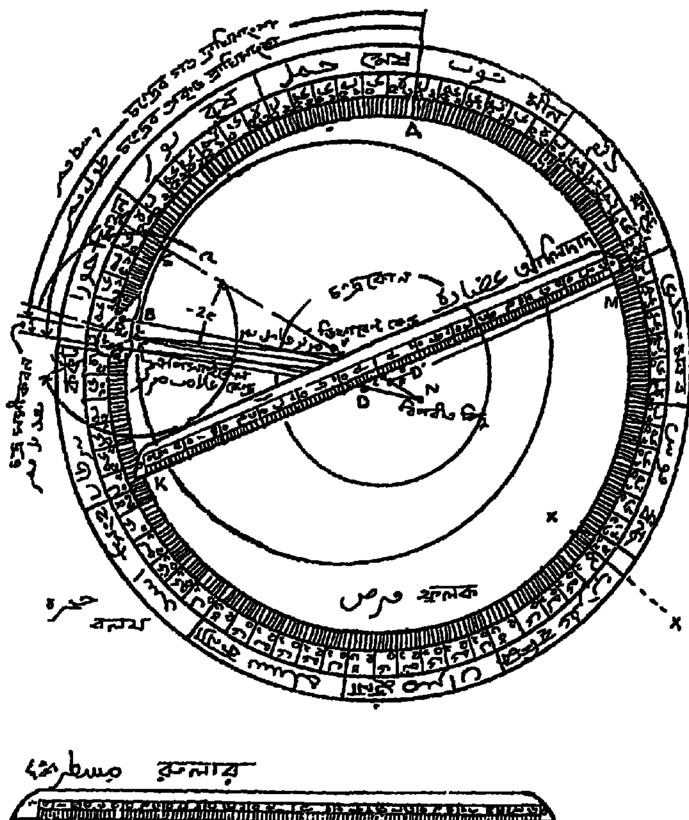
গড়-অবস্থান নির্ণয়

ফলকের উপরে সূর্যের অপভূর অবস্থানকে বলযের উপরে অবস্থিত সূর্যের অপভূব অবস্থানের বিপরীতে রাখা হয। এই অবস্থার ছিদ্রের ভিতরে কাঠি দিযে আটকানো হয়; কিছু সময় পরে অপভূব স্থান পরিবর্তন হলে ফলককে অনুরূপভাবে ঘুরাতে হয়।

কোন সময়ে কোন গ্রহের গড় অবস্থান জানতে হলে, পারস্যদেশীয় পঞ্জিকা থেকে সেই সময় ঠিক করে নেওয়া হয। ঐ সময় যদি ছকের নির্দিষ্ট কোন বর্ষের প্রারম্ভে হয, তা হলে ঐ গ্রহের বিপরীতে যে সংখ্যা লেখা থাকে, সেই সংখ্যাই নেওয়া হয। আর ঐ সময় বর্ষ আরম্ভের আগে বা পরে হলে, নির্দিষ্ট সময় এবং ছকের উপরে দেওযা কোন বর্ষের আরম্ভের ভিতরে যত পরিমাণ চাপ অতিক্রান্ত হয, দুইটি রুলার ও গড় গতির স্কেলের সাহায্যে সেই পরিমাণ চাপ ভিতরের বলযের উপরে নেওযা হয। তারপরে ভিতরের বলযটি এমনভাবে ঘুরানো হয, যেন চিহ্নিত চাপের প্রথম বিন্দু স্থির-বিন্দুটির বিপরীতে পড়ে। চাপের শেষ বিন্দুর বিপরীতে বাইরের বলযের চিহ্নই গ্রহটির গড় অবস্থান নির্দেশ করে। অবশ্য এই অবস্থান কনস্টান্টিনোপোলের দ্রাঘিমাংশের এবং দুপুর বারোটার সময়ে ঐ গ্রহের অবস্থান। কনস্টান্টিনোপালের দ্রাঘিমাংশ ৬০ ; ০। অন্য দ্রাঘিমাংশ হতে গ্রহসমূহের গড অবস্থান নির্ণয় করতে হলে, দুই জাযগার দ্রাঘিমাংশের অন্তরকে ঘণ্টা, মিনিটে পরিবর্তিত ক'রে প্রতি ঘণ্টায় গড়-গতি দ্বারা গুণ করতে হয। নির্দিষ্ট স্থানের দ্রাঘিমাংশ ৬০ ডিগ্রীর কম হলে, উপরের গুণফলকে ৬০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের বেলা বারোটার গড় গতি দ্বারা বৃদ্ধি করতে হয এবং দ্রাঘি-মাংশ ৬০ ডিগ্রীর বেশী হলে, হ্রাস করতে হয। একইভাবে বেলা বারোটা ছাড়া অন্য সময়ে এই গড়-অবস্থান নির্ণয় করতে হলে, ঐ সময় থেকে বেলা বারোটার পার্থক্যকে প্রতি ঘণ্টার গড়-গতি দ্বারা গুণ ক'রে বেলা বারোটার নির্ণীত অবস্থানের সঙ্গে যোগ অথবা বিয়োগ করতে হয।

সূর্যের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়

সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশ অনুযায়ী বলয়ের বিভক্তিসমূহের উপরে একটি দাগ দেওয়া হয়। এই দাগটিকে গড়-দাগ বলে। তারপর রুলারের



রেখাচিত্র ৩৭ : বলয় ও ফলকের সাহায্যে সূর্যের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়

এক ধার এই গড়-দাগ ও কৃত্রিম কেন্দ্রের বরাবর এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যেন গড়-দাগের উপরে রুলারের বিভক্তির আরম্ভ-স্থান

পড়ে। তারপরে আলিদাদের ধার কলারের সমান্তরাল করা হয়। এতে দুই কলারের মাঝখানে যে দুইটি চাপের সৃষ্টি হয়, সেই দুইটি চাপ সমান হয়। এই অবস্থায় গড় দাগের নিকটে বলয়ের বিভক্তিতে আলিদাদের যে অবস্থান হয়, সেখানে একটি দাগ দেওয়া হয়। এই দাগটিই প্রকৃত অবস্থান। মেষাদি বিন্দু হতে এই প্রকৃত অবস্থানের দূরত্বই প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ। এবং গড় দাগ ও প্রকৃত অবস্থানের ভিতরের কৌণিক দূরত্বই সমীকরণ। কৃত্রিম কেন্দ্র হতে গড়-দাগ পর্যন্ত কলারের বিভক্তির পরিমাণ বিশ্বের কেন্দ্র হতে সূর্যের দূরত্ব।

এখানে ফলকের পরিধিই সূর্যের ডেফারেন্ট; অপভূ, ফলকের জিহ্বাতে পূর্বেই নির্দিষ্ট করা থাকে। কৃত্রিম কেন্দ্র বিশ্বের কেন্দ্র নির্দেশ করে। ফলকের কেন্দ্র ও কৃত্রিম কেন্দ্রের ভিতরের দূরত্বই সৌর-বিকেন্দ্রিকতা। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার চিত্রে এই দূরত্ব CF দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের পরে বলয়ের বিভক্তিসমূহের উপর এই দ্রাঘিমাংশের সমান AM অংশে ছেদ করা হয়। এই M বিন্দুটিই আল-কাশীর গড-দাগ। F বিন্দু হতে বিষুবন-বিন্দুর দিকে M যে কোণে দেখা যায়, সেইটাই সূর্যের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ। এই কোণের মান নির্ণয় করতে কলারের ধার FM-এর বরাবর রেখে আলিদাদকে ঘুরিয়ে কলারের সমান্তরাল করা হয়। AF চাপটি সূর্যের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ এবং কলারের উপরে FM-এর দূরত্ব, সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব নির্দেশ করে।

চন্দ্রের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়

চন্দ্রের গড় হতে সূর্যের গড় বিয়োগ করলে যে দূরত্ব পাওয়া যায়, উহাই চন্দ্রের দ্রাঘণ; এই দূরত্বের দ্বিগুণের সাহায্যে চন্দ্রের কেন্দ্র পাওয়া যায়। চন্দ্রের ডেফারেন্ট ও আলিদাদের ছেদ-বিন্দুতে কাঁটা-টিকে বলয়ের বিভক্তি চন্দ্রের কেন্দ্র অনুযায়ী স্থাপন ক'রে একটি দাগ দিতে হয়। এই দাগটি চন্দ্রের এপিসাইকেলের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের দাগ ও এর বিপরীত বিন্দু বরাবর কলারের একটি ধার রাখা হয়।

তারপর আলিদাদকে রুলারের সমান্তরাল করলে, আলিদাদের কাঁটা বলযের যে দাগের উপর পড়ে, সেই দাগটিকে চিহ্নিত করা হয়। এখান থেকেই কোণের গতির আরম্ভ। এরপর আলিদাদকে রাশি-চক্রের রাশিসমূহের বিপরীত দিকে চান্দ্রকোণ পরিমাণ ঘুরিয়ে দাগ দিতে হয়। এই দাগটিকে চন্দ্রের অন্তর্দাগ বলা হয়। রুলারটিকে কেন্দ্রের দাগ ও অন্তর্দাগের বরাবর বসিয়ে আলিদাদকে আবার রুলারের সমান্তরাল করতে হয়। কাঁটা কেন্দ্রের দাগের নিকট যে জায়গায় পড়ে, সেই জায়গায় বলযের বিভক্তিতে একটি দাগ দিতে হয়। এই দাগই চন্দ্রের প্রকৃত অবস্থান নির্দেশ করে। মেষাদি বিন্দু ও প্রকৃত অবস্থানের দূরত্বকে চন্দ্রের গড় ও কেন্দ্রের আধিক্য পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেই চন্দ্রের প্রকৃত দ্রাঘি-মাংশ পাওয়া যায়।

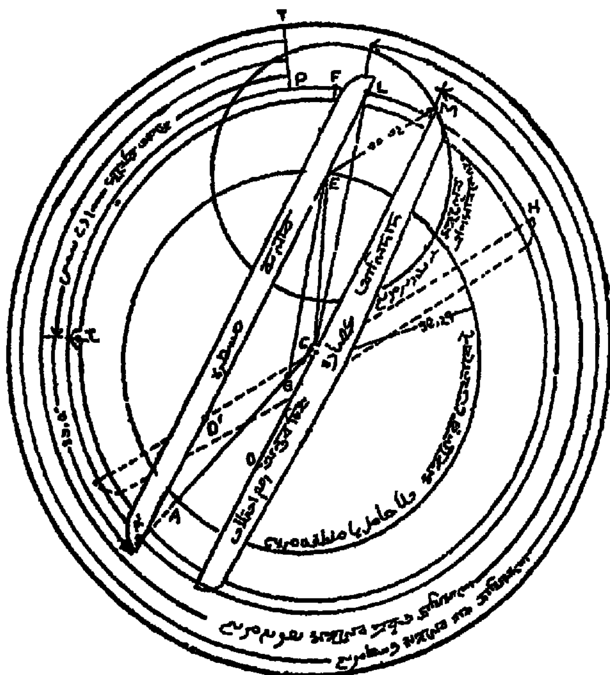
উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, সূর্যপথের উপরে চন্দ্রের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করতে, প্রথমে কয়েকটি গড়-গতি নির্ণয় করতে হয়: (১) চন্দ্রের গড় দ্রাঘিমাংশ, (২) চন্দ্রের গড় কোণ এবং (৩) সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশ। বলয়ের ধারে চন্দ্রের গড় অবস্থান P-তে দাগ দিতে হয়। উপরের (১) এবং (৩)-এর অন্তর চন্দ্রের দ্রাঘণের সমান। একে e দ্বারা নির্দেশ করলে P হতে শুরু করে দক্ষিণাবর্তে বলযের ধারে $2e$-এর সমান PS চাপের পরিমাপ করা হয়। তারপর ফলকটিকে ঘুরিয়ে এর জিহ্বাকে S-এর বিপরীত দিকে এনে, একটি কাঠি দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হয়। CP এবং চন্দ্রের ডেফারেন্টের ছেদবিন্দু E-কে আলিদাদের সাহায্যে চিহ্নিত করতে হয়। এই E-কেই আল-কাশী কেন্দ্রদাগ আখ্যা দিয়েছেন। রুলারকে E এবং তার বিপরীত N-এর বরাবর স্থাপন করে আলিদাদকে ঘুরিয়ে রুলারের সমান্তরাল করতে হয়। আলিদাদের ধার ও রুলারের ধারের ছেদবিন্দু B থেকেই গড় কৌণিক গতির পরিমাপ করা হয়। এতে CB এবং NE সমান্তরাল হয়। দক্ষিণাবর্তে আলিদাদকে উপরের (২)-এর সমান পরিমাণ BK চাপ ঘুরাতে হয়। এই গণনা সম্পূর্ণ করবার জন্য E থেকে সঠিক পরিমাণে ও সঠিক দিকে এপিসাইকলের

ব্যাসার্ধের সমান অংশ ছেদ করতে হয়। প্রান্ত-বিন্দু L চন্দ্রের প্রকৃত অবস্থান নির্দেশ করে। এখানে একটি অসুবিধা এই হতে পারে যে, L সম্পূর্ণরূপে ফলকের বাইরে পড়তে পারে। কিন্তু L-এর অবস্থানের জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহ নাই। CL ভেক্টরের দিকই আমাদের প্রয়োজন। আমরা জানি যে, এপিসাইকেলের ধারে কেন্দ্র থেকে এপিসাইকেলের ব্যাসার্ধের দূরত্বে চন্দ্রের অন্তর্দাগ চিহ্নিত করা হয়। এখানে বিশেষভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, আলিদাদকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে, যেন অন্তর্দাগ কৌণিক গতির প্রান্তবিন্দুর বিপরীত দিকে পড়ে। অর্থাৎ, D যদি অন্তর্দাগ হয়, তা হলে CD ভেক্টরের দিক, EL ভেক্টরের দিকের বিপরীত হবে। ফলকের উপর D দাগ চিহ্নিত ক'রে DE বরাবর রুলার স্থাপন করতে হয়। এক্ষণে DE ভেক্টর CE এবং EL ভেকটরের সমষ্টির সমান; সুতরাং আলিদাদকে ঘুরিয়ে রুলারের সমান্তরাল করলে, বলয়ের ধারের সাথে এর ছেদবিন্দু G, চন্দ্রের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্দেশ করে।

গ্রহসমূহের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়

গড় দ্রাঘিমাংশ অনুসারে আলিদাদের কাঁটাটিকে বলয়ের বিভক্তির উপরে বসিয়ে রুলারের ধার ইকুয়াণ্টের পাশ দিয়ে আলিদাদের সমান্তরাল করা হয়। তারপর রুলারের ধার ও প্রত্যেক গ্রহের ডেফারেন্টের ছেদ-বিন্দুতে দাগ দেওয়া হয়। এই দাগ গ্রহের কেন্দ্র-দাগ। প্রত্যেক বহির্গ্রহের ক্ষেত্রে আলিদাদের কাঁটার মাথা সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশে স্থাপন করতে হয় এবং বলয়ের উপরে প্রত্যেক অন্তর্দাগে একটি ক'রে দাগ দিতে হয়। এই দাগগুলি গ্রহসমূহের দ্রাঘিমাংশের অন্তর্দাগ। প্রত্যেক বহির্গ্রহের অন্তর্দাগ সর্বদা কেন্দ্র ও সূর্যের গড়-দ্রাঘিমাংশের বিপরীত বিন্দু সংযোজক সরলরেখার বরাবর হতে হবে। অন্তর্গ্রহের ক্ষেত্রে আলিদাদের কাঁটা প্রত্যেক গ্রহের মিশ্রকোণ বরাবর স্থাপন করা হয় এবং এই অন্তরের প্রান্তে ফলকের উপরে দাগ দিতে হয়।

এই দাগটিই ঐ গ্রহের অন্তর্দাগ। এটি মিশ্রকোণের বিপরীত দিকে পড়ে। তারপর রুলারের ধার, কেন্দ্রদাগ এবং প্রত্যেক গ্রহের অন্তর্দাগের বরাবর স্থাপন ক'রে আলিদাদের সমান্তরাল করা হয়। কেন্দ্রের দাগের নিকটে আলিদাদের কাঁটার অবস্থানে একটি দাগ দিতে হয়। এইটিই গ্রহের প্রকৃত অবস্থান। মেষাদি বিন্দু থেকে প্রকৃত অবস্থানের দূরত্বই গ্রহের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ।



রেখাচিত্র ৩৮ : বলয় ও ফলকের সাহায্যে মঙ্গলের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, গ্রহের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতে চন্দ্রের মত একই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। প্রথমতঃ গড় গতির তালিকা থেকে যে সময়ে গ্রহের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের

প্রয়োজন, সেই সময়ের সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশ, বহির্গ্রহসমূহের গড়-দ্রাঘিমাংশ এবং অন্তর্গ্রহসমূহের মিশ্রকোণ নির্ণয় করতে হয়। ফলকটিকে বলয়ের ভিতরে এমনভাবে বসাতে হয়, যেন সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের অপভূসমূহের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ থাকে। আলিদাদকে এমনভাবে ঘুরাতে হয়, যেন ইহার ধার গড় দ্রাঘিমাংশে বলয়ের বিভক্তি L-এ অবস্থান করে। কলারকে এমনভাবে স্থাপন করতে হয়, যেন এর ধার গ্রহের ইকুয়ান্ট কেন্দ্রে G-এর বরাবর বসে এবং আলিদাদের ধারের সমান্তরাল হয়। কলার ও ডেফারেন্টের ছেদবিন্দু E, গ্রহের কেন্দ্র-দাগ। এই কেন্দ্র-দাগই ঐ সময়ে এপিসাইকেলের কেন্দ্রের অবস্থান নির্দেশ করে। বহির্গ্রহের ক্ষেত্রে আলিদাদকে এমনভাবে ঘুরাতে হয়, যেন যেদিকে অন্তর্দাগ দেওয়া হয়েছে তার বিপরীত দিকের মাথা সূর্যের গড় দ্রাঘি-মাংশ H-এ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে অন্তর্দাগ D যে জায়গায় পড়ে সেই জায়গায় একটি দাগ দেওয়া হয়। এখন কলারটিকে এমনভাবে স্থাপন করতে হয়, যেন এর ধার, D′ এবং E-এর বরাবর পড়ে। আলিদাদকে ঘুরিয়ে কলারের সমান্তরাল করতে হয়। এতে আলিদাদের মাথা বলয়ের বিভক্তিকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেই M বিন্দুই গ্রহটির প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্দেশ করে। দিকে এবং পরিমাণে D′C ভেক্টরটিকে গ্রহের এপিসাইকেলের ব্যাসার্ধ EM ভেক্টরের সমান ক'রে আঁকা হয়। CD′EM এর সামান্তরিকের CM বাহু CE এবং DC-এর ভেক্টর সমষ্টি নির্দেশ করে। অন্তর্গ্রহ বুধ এবং শুক্রের জন্য প্রায় একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এদের গড় দ্রাঘিমাংশ সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশের সমান। এখানে L সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশ এবং PA′H চাপ মিশ্রকোণ।

সমীকরণ কেন্দ্র ও সুগঠিত কোণ নির্ণয়

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে 'সমীকরণ' (তা'দিল) শব্দটি সাধারণতঃ কোন ঘটনা-নির্দেশক অপেক্ষকের সংশোধন অর্থে ব্যবহার করা হতো।

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাতেও 'কাল-সমীকরণ' বা 'কাল-শোধন' (equation of time) শব্দটি ঠিক এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কোন গ্রহের দ্রাঘিমাংশের সমীকরণ অর্থে ঐ গ্রহের গড় দ্রাঘিমাংশ ও প্রকৃত দ্রাঘিমাংশের অন্তর বুঝায়। এই সমীকরণকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম সমীকরণ বা কেন্দ্র-সমীকরণ বিকেন্দ্রিক ইকুয়াণ্টের জন্য সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় সমীকরণ সংঘটিত হয় এপিসাইকেলের উপরে গ্রহের গতির জন্য। প্রথম ও দ্বিতীয় সমীকরণের সমষ্টিকেই গ্রহ-সমীকরণ বলা হয়। প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজন বলেই, প্রত্যেক জিজে এই দুই সমীকরণই লিপিবদ্ধ করা হতো। এ ছাড়াও, দ্বিতীয় সমীকরণ প্রথম সমীকরণের উপর নির্ভরশীল বলে, এই প্রভাব কতটা ব্যাপক, তা নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অন্তঃক্ষেপেরও প্রয়োজন হতো। আল-কাশীর এই যন্ত্রের সবচেয়ে সুবিধা এই ছিল যে, কোন সমীকরণ ছাড়াই এই যন্ত্র দ্বারা গ্রহের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা সম্ভব হতো। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি কেউ সমীকরণের সাহায্যে প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতে ইচ্ছুক হতো, তা হলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হতো, আল-কাশী তারও বিবরণ দিয়েছেন।

আল-কাশী বলেন, যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের জন্য এই সমস্ত সমীকরণের কোন প্রয়োজন হয় না; তবুও যদি কেউ এইগুলি ব্যবহার করতে চায়, তা হলে বলয়ের উপরে একটি দাগ দিতে হয়। আলিদাদের ধার এপিসাইকেলের কেন্দ্রের পাশে স্থাপন ক'রে গড়-দ্রাঘিমাংশের দিকে আলিদাদের কাঁটার নিকটে আর একটি দাগ দিতে হয়। দুইটি দাগের মধ্যবর্তী স্থান বলয়ের বিভক্তিতে পরিমাপ করলে, পূর্বের সমীকরণ ও গ্রহের প্রথম সমীকরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দাগ ও কৌণিক গতির প্রারম্ভের দাগের মধ্যবর্তী অংশ চন্দ্রের প্রথম সমীকরণ নির্দেশ করে। দ্বিতীয় দাগ এবং গ্রহের প্রকৃত অবস্থানের মধ্যবর্তী অংশ গ্রহের দ্বিতীয় সমীকরণ। সুগঠিত গড় হতে প্রত্যেক গ্রহের অপভূর দ্রাঘিমাংশ বাদ দিলে, সেই গ্রহের সুগঠিত কেন্দ্র অবশিষ্ট

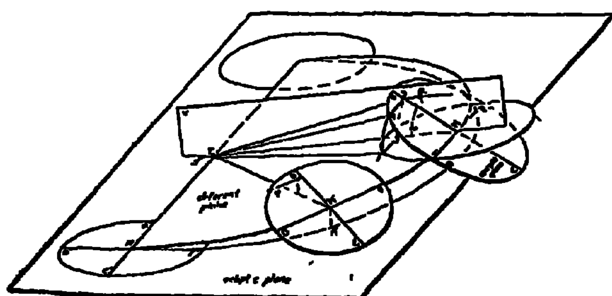
থাকে। আর প্রত্যেক বহির্গ্রহের সুগঠিত গড় দ্রাঘিমাংশ হতে সূর্যের গড় দ্রাঘিমাংশ বাদ দিলে, এবং প্রত্যেক অন্তর্গ্রহের সুগঠিত গড়-দ্রাঘিমাংশ থেকে মিশ্রকোণ বাদ দিলে, ঐ গ্রহের সুগঠিত কোণ পাওয়া যায়।

অক্ষাংশ নির্ণয়

গ্রহসমূহের অক্ষাংশ নির্ণয়, দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় অপেক্ষা অনেক জটিল। সেজন্য এর গণনা পদ্ধতিও দীর্ঘ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন।

যে কোন সময়ে গ্রহের অক্ষাংশ তিনটি অংশের দুইটির বীজগণিতীয় সমষ্টির সমান। প্রথম অক্ষাংশ (β_1), দ্বিতীয় অক্ষাংশ (β_2), এবং অন্তর্গ্রহসমূহের জন্য আর একটি অক্ষাংশের (β_3) প্রয়োজন হয়। এই অংশ তিনটির সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য আরো কয়েকটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়াপ্রয়োজন।

এপিসাইকেলের প্রকৃত অপদূরক-রেখা, অর্থাৎ এপিসাইকেলের প্রকৃত অপভূ ও অনুভূর সংযোজক ব্যাসকে প্রথম ব্যাস বলে। নীচের চিত্রে BC, B'C' এবং B"C" প্রথম ব্যাসের তিনটি অবস্থান। প্রথম ব্যাসের

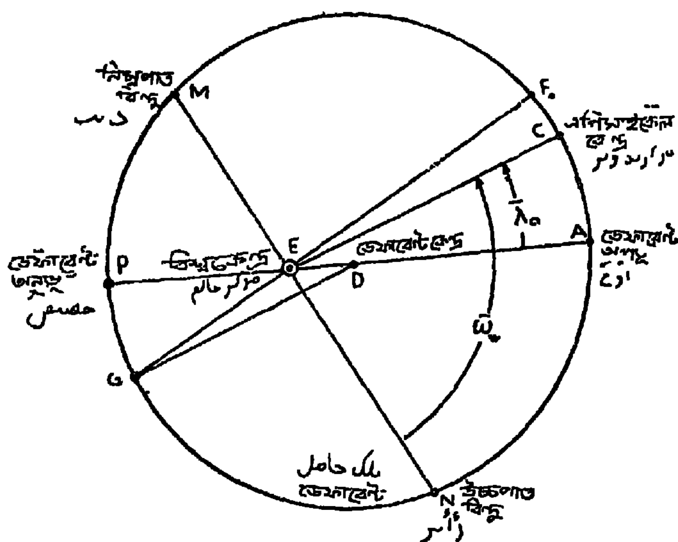


রেখাচিত্র ৩৯ : আনত ডেফারেন্ট ও এপিসাইকেল

উপর লম্ব-ব্যাসকে এপিসাইকেলের দ্বিতীয় ব্যাস বলে। DF, D'F', D"F" দ্বিতীয় ব্যাসের তিনটি অবস্থান।

এপিসাইকেল কেন্দ্র ও বিশ্বকেন্দ্র সংযোজক-রেখা সূর্যপথ-সমতলকে যে কোণে ছেদ করে, তাকে প্রথম অক্ষাংশ বলে। অর্থাৎ ডেফারেন্ট ও সূর্যপথ-সমতলের মাঝখানে পাতবিন্দু সংযোজক-রেখাতে বিচ্যুতি কোণ (i)-এর জন্য প্রথম অক্ষাংশ (β_1) সংঘটিত হয়।

নতির জন্য অক্ষাংশের যে অংশ পাওয়া যায়, তাকে দ্বিতীয় অক্ষাংশ (β_2) বলে। বহির্গ্রহের ক্ষেত্রে এপিসাইকেলের দ্বিতীয় ব্যাসকে সূর্যপথ-সমতলের সাথে সমান্তরাল রাখলে যে নতি পাওয়া যায়, তাহা দ্বিতীয় অক্ষাংশ। অন্তর্গ্রহের ক্ষেত্রে ক্রান্তিকোণের জন্য তৃতীয় অক্ষাংশ সংঘটিত হয়।



রেখাচিত্র ৪০ : গ্রহের পাতবিন্দু

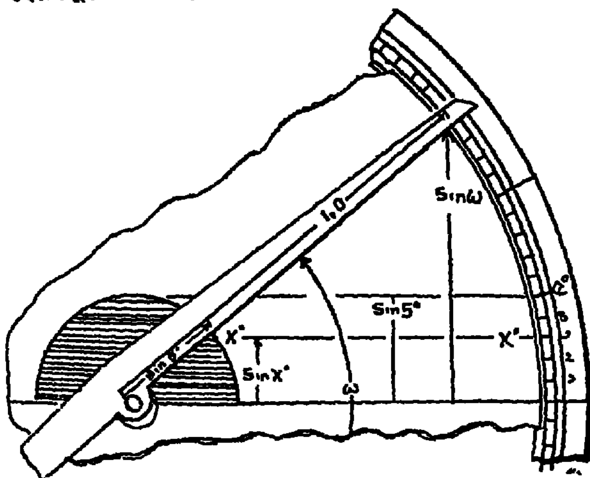
অক্ষাংশ-কেন্দ্র নামে আর একটি শব্দের প্রয়োজন হয়। কোন গ্রহের উচ্চ-পাতবিন্দু থেকে সূর্যপথের উপরে এপিসাইকেলের কেন্দ্রের দূরত্বকে অক্ষাংশ কেন্দ্র বলে। একে ω দিয়ে নির্দেশ করা হয়। উপরের চিত্রে,

$$\omega = \angle NEC = \angle NEA + \angle AEC$$

$\angle AEC$-কে সুগঠিত কেন্দ্র বলা হয় এবং একে λ_a দ্বারা নির্দেশ করা হয়। অন্তগ্র'হের ক্ষেত্রে $\omega_a = \lambda_a + 90°$; কেননা এক্ষেত্রে অপদূরক রেখা এবং পাত রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব।

চন্দ্রের অক্ষাংশ নির্ণয়

পাতবিন্দুদ্বয়ের গড় দ্রাঘিমাংশকে চন্দ্রের প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ দ্বারা বৃদ্ধি করলে, চন্দ্রের অক্ষাংশের argument পাওয়া যায়। এই অনুযায়ী আলিদাদের কাঁটা বলয়ের বিভক্তির উপরে স্থাপন করা হয়। আলিদাদের ধার চন্দ্রের অক্ষাংশ-বৃত্তের সাথে যে স্থানে ছেদ করে, সেই ছেদবিন্দুর বিভক্তিই চন্দ্রের অক্ষাংশ। অক্ষাংশের argument



রেখাচিত্র ৪১ : গ্রহের অক্ষাংশ নির্ণয়

ছয় রাশির কম হলে, এই অক্ষাংশ উত্তর দিকে এবং ছয় রাশির বেশী হলে দক্ষিণ দিকে থাকে।

চন্দ্রপথ সূর্যপথকে প্রায় ৫ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে। এই ছেদবিন্দু-দ্বয়ের বা পাতবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক-রেখা স্থির নয়। এই রেখা বিষুবনের

সঙ্গে ধীর গতিতে দক্ষিণ দিকে ঘোরে। মনে করা যাক, β চন্দ্রের অক্ষাংশ, λ চন্দ্রের দ্রাঘিমাংশ এবং λ_n চন্দ্রের উচ্চ পাতবিন্দুর দ্রাঘিমাংশ। তা হলে আমরা জানি,

$$\sin \beta = \sin 5^\circ \sin (\lambda - \lambda_n) = \sin 5^\circ \sin \omega$$

এখানে, ω = অক্ষাংশের argument

= উচ্চ পাতবিন্দু থেকে সূর্যপথের উপর চন্দ্রের দূরত্ব।

টলেমী উপরের সমীকরণ ব্যবহার না করে, $\beta = 5^\circ \sin \omega$ ব্যবহার করেন। β ছোট হলে দুইটি সমীকরণ প্রায় এক।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার চিত্র থেকে দেখা যায় যে, সমানুপাতিক ত্রিভুজের সাহায্যে

$$\frac{\sin x}{\sin \omega} = \frac{\sin 5^\circ}{১;০}$$

অথবা, $\sin x = \sin 5^\circ \sin \omega$

এই ফলের সঙ্গে আল-কাশীর ফলের আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে।

অন্তর্গ্রহসমূহের প্রথম অক্ষাংশ নির্ণয়

আলিদাদের কাঁটা অক্ষাংশ কেন্দ্রে বা তার বিপরীতে স্থাপন করা হয়। আলিদাদের ধার ঐ গ্রহের অক্ষাংশ-বৃত্তকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেই বিন্দু বলয়ের যে বিভক্তিতে অবস্থিত, সেখানে একটি দাগ দেওয়া হয়। আলিদাদকে সমীকরণ ব্যাসের সাথে লম্বভাবে ঘুরালে যে বিভক্তিতে ছেদ করে সেখানেও একটি দাগ দিতে হয়। এইটাই অক্ষাংশ দাগ। আলিদাদকে আবার ঘুরিয়ে অক্ষাংশ-বৃত্তের কেন্দ্রে বা কেন্দ্রের বিপরীতে স্থাপন করলে, যে দাগে ছেদ করে, সেইটাই ঐ গ্রহের প্রথম অক্ষাংশ। শুক্রের প্রথম অক্ষাংশ সর্বদা উত্তরে থাকে এবং বুধের প্রথম অক্ষাংশ সর্বদা দক্ষিণে থাকে।

পূর্বের চিত্রে (চিত্র ৩৯) জ্যামিতিকভাবে দেখা যায় যে, ডেফারেন্ট-সমতলের বিচ্যুতি (i) নীচের রাশিমালাতে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$\iota = \iota_m \sin \omega, \quad \iota_m = \begin{cases} 0 ; ১০ & \text{শুক্রের জন্য} \\ -0 ; ৪৫ & \text{বুধের জন্য} \end{cases}$$

চিত্রে H′ যদি কোন সময়ে এপিসাইকেল কেন্দ্রের অবস্থান নির্দেশ করে, তা হলে NH′K গোলকীয় ত্রিভুজে H′K চাপ প্রথম অক্ষাংশ (β_1) নির্দেশ করবে।

সমীকরণ-ব্যাস থেকে আলিদাদকে ω কোণে উন্নীত করলে, এবং আলিদাদ অক্ষাংশ-বৃত্তকে যে অক্ষাংশ-রেখায় ছেদ করবে, তাকে x দ্বারা নির্দেশ করলে নীচের রাশিমালা পাওয়া যায়ঃ

$$\sin x = \sin i_m \sin \omega$$

উপরের অনুচ্ছেদে দেখা গিয়াছে যে, চন্দ্রের অক্ষাংশ নির্ণয়েও ঠিক একই রাশিমালা পাওয়া যায়। এরপরে আলিদাদকে সমীকরণ-ব্যাসের উপর লম্বভাবে স্থাপন করলে x অক্ষাংশ-রেখা যে বিন্দুতে ছেদ করবে, সেই ছেদবিন্দু থেকে ফলকের কেন্দ্র sin x-এর সমান। এরপরে আলিদাদকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হলে সমীকরণ-ব্যাসের সঙ্গে ω কোণের সৃষ্টি করবে। দাগটি যদি y অক্ষাংশের উপরে পড়ে, তা হলে y ঐ গ্রহের প্রথম অক্ষাংশ।

অন্তর্গ্রহসমূহের দ্বিতীয় অক্ষাংশ এবং বহির্গ্রহসমূহের অক্ষাংশ নির্ণয়

বহির্গ্রহসমূহের অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য, প্রত্যেক গ্রহের অপভূ ও উচ্চ পাতবিন্দুর ভিতরের নিম্নলিখিত দূরত্বকে সঠিক কেন্দ্র দ্বারা বর্ধিত করলে যে ফল পাওয়া যায়, সেগুলিকে অক্ষাংশের কেন্দ্র বলে।

বহির্গ্রহের অপভূ ও উচ্চ পাতবিন্দুর দূরত্ব		
♄	♃	♂
১৪০ ; ০	৭০ ; ০	৯৫ ; ০

অন্তর্গ্রহের জন্য সঠিক কেন্দ্রের আর কোন পরিবর্তনের দরকার হয় না। আলিদাদের কাঁটা সঠিক কোণ অনুসারে বলয়ের বিভক্তিতে স্থাপন করতে হয় এবং ফলকের উপরে অন্তরদাগের নিকটে আর একটি দাগ দেওয়া হয়। এটিকে প্রথম দাগ বলে। আলিদাদকে সমীকরণ-ব্যাসের লম্ব ক'রে রুলারের ধারকে প্রথম দাগের পাশে বসিয়ে আলিদাদের সমান্তরাল করা হয়। রুলারের ধার ও সমীকরণ-ব্যাসের ছেদবিন্দুতে আর একটি দাগ দিতে হয়। এটিকে দ্বিতীয় দাগ বলে। তারপর আলিদাদকে ঘুরিয়ে সমীকরণ-ব্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় দাগটিকে আলিদাদে স্থানান্তর করা হয়। বিভক্তির প্রারম্ভ থেকে আলিদাদকে এপিসাইকেলের অপভূ ও অনুভূব সংযোজক-এপিসাইকেল-ব্যাসের চরম নতি পর্যন্ত ঘুরাতে হয়।

গ্রহসমূহের এপিসাইকেল ব্যাসের চরম নতি				
♄	♃	♂	♀	☿
৪ ; ৩০	২ ; ৩০	২ ; ১৫	(−)২ ; ৩০	৬ ; ১৫

এরপরে আলিদাদের ধারে যে দ্বিতীয় দাগ আছে, তার পাশে ফলকের উপরে আর একটি দাগ দেওয়া হয়। এইটা তৃতীয় দাগ। বহির্গ্রহের জন্য ডেফারেন্ট-সমতলের পার-ইক্লিপটিক থেকে প্রত্যেক গ্রহের চরম নতি অনুসারে স্থাপন করা হয় এবং রুলারের ধার তৃতীয় দাগের পাশে বসিয়ে আলিদাদের সমান্তরাল করে স্থাপন করতে হয়।

পার-ইক্লিপটিক থেকে ডেফারেন্ট-সমতলের চরম নতি				
♄	♃	♂	♀	☿
২ ; ৩০	১ ; ৩০	১ ; ০	০ ; ১০	০ ; ৪৫

কলাবের ধারে তৃতীয় দাগের জায়গা থেকে গ্রহের অন্তরদাগের সমান ক'রে ফলকের উপরে বিভক্তির প্রারম্ভে একটি রেখা আঁকা হয়। এই রেখাটিকে নতি-রেখা বলে। অন্তর্গ্রহের জন্য, কলাবের ধার তৃতীয় দাগের পাশে স্থাপন ক'রে কলাবকে সমীকরণ-ব্যাসের সমান্তরাল করা হয় এবং তৃতীয় দাগ থেকে ফলকের উপরে বিভক্তির প্রারম্ভের দিকে অন্তরদাগের সমান নতি-রেখা টানা হয়। তারপর সমীকরণ-ব্যাসের নিকট এমন একটা দাগ দিতে হয়, দ্বিতীয় দাগ থেকে যার দূরত্ব অক্ষাংশ-বিন্দু থেকে তৃতীয় দাগের দূরত্বের সমান। এই দাগটিকে অক্ষাংশ-বিন্দুর প্রতিভূ বলা হয়। নতি-রেখার উপরে এমন একটি বিন্দু নেওয়া হয়, অক্ষাংশ-বিন্দুর প্রতিভূ থেকে যে বিন্দুর দূরত্ব প্রথম দাগ থেকে প্রতিভূ-বিন্দুর দূরত্বের সমান। এই আমাদের উদ্দিষ্ট বিন্দু। এই উদ্দিষ্ট-বিন্দু ও প্রতিভূ-বিন্দুর পাশ দিয়ে কলাব স্থাপন ক'রে আলিদাদকে কলাবের সমান্তরাল করা হয়। আলিদাদের কাঁটা বলয়ের বিভক্তিতে যে জায়গায় পড়ে, সমীকরণ-ব্যাস থেকে সেই জায়গার দূরত্ব ডেফারেণ্ট-সমতল থেকে ঐ গ্রহের এপিসাইকেলের চরম নতি। এরপরে আলিদাদকে সমীকরণ-ব্যাসের লম্বভাবে স্থাপন করলে, আলিদাদের ধার চরম নতির সমান অক্ষাংশ-রেখার সাথে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেই বিন্দুতে একটি দাগ দেওয়া হয়। এইটি অক্ষাংশ দাগ। আলিদাদের কাঁটা অক্ষাংশ-বিন্দু অনুসারে যে অক্ষাংশ-রেখার উপরে পড়ে, সেইটাই উদ্দিষ্ট অক্ষাংশ। বহির্গ্রহের অক্ষাংশ-কেন্দ্র ছয় রাশির কম হলে, অক্ষাংশ উত্তর দিকে হয় এবং ছয় রাশির বেশী হলে দক্ষিণ দিকে হয়। অন্তর্গ্রহের সঠিক কেন্দ্র ছয় রাশির কম হলে এবং সঠিক কোণ তিন রাশির কম বা নয় রাশির বেশী হলে, শুক্রের দ্বিতীয় অক্ষাংশ উত্তর দিকে এবং বুধের দ্বিতীয় অক্ষাংশ দক্ষিণ দিকে হয়। বিপরীতক্রমে শুক্রের দ্বিতীয় অক্ষাংশ দক্ষিণ দিকে এবং বুধের দ্বিতীয় অক্ষাংশ উত্তর দিকে হয়।

পূর্ববর্তী চিত্রে (চিত্র ৩৯) একটি গ্রহের এপিসাইকেলের তিনটি অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই তিন অবস্থানে N, H এবং H′ এপিসাইকেলের কেন্দ্র। প্রথম অবস্থানে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে এপিসাইকেলের কেন্দ্র সংযোগকারী রেখার সাথে প্রথম ব্যাসের নতি (j) শূন্য ডিগ্রী। দ্বিতীয় অবস্থানে এই নতির পরিমাণ সর্বোচ্চ (j_m), এবং তৃতীয় অবস্থান এই দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী। তিনটি অবস্থাতেই দ্বিতীয় ব্যাসকে (D″F″, DF এবং D′F′) সূর্যপথ-সমতলের সমান্তরাল দেখানো হয়েছে। অতএব β_3 এবং ক্রান্তিকোণ শূন্য। বিভিন্ন গ্রহের জন্য j_m-এর মান উপরে দেওয়া হয়েছে। ডেফারেন্টের সমস্ত অবস্থানের জন্যই j-এর মানের বর্ণনা নীচের রাশিমালাতে দেওয়া যায়ঃ

$$j(\lambda_a) = j_m \sin \lambda_a = j_m \sin(\omega - 90) = -j_m \cos \omega$$

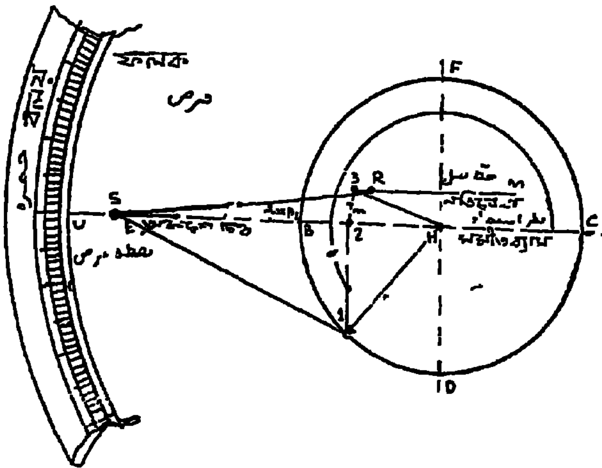
এবং অন্তর্গ্রহের জন্য,

$$j(\omega) = j_m \sin \omega$$

অন্তর্গ্রহের ক্ষেত্রে এপিসাইকেলের কেন্দ্র পাত-রেখার উপরে পড়লে চরম নতি সংঘটিত হয়।

আল-কাশীর যন্ত্রের সাহায্যে β_1-এর চরম মান নির্ণয়পদ্ধতি অতি সুন্দর। ডেফারেন্ট-সমতল (চিত্রে প্রদর্শিত V-সমতল) এবং এপি-সাইকেল-সমতল উভয়েই যন্ত্রটির সমতলে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। সমীকরণ-ব্যাস (চিত্র ৪২-এর UC), V-সমতল এবং ডেফারেন্ট-সমতলের ছেদ-রেখা, এবং যন্ত্রটির কেন্দ্র H, এপিসাইকেলের কেন্দ্র নির্দেশ করে। E, গ্রহের অক্ষাংশ-বিন্দু; অতএব EH, বিশ্বের কেন্দ্র থেকে গ্রহের ডেফারেন্ট-সমতলের দূরত্বের সমান। V-সমতলকে EH-এর উপর এমনভাবে ফলকের সমতলে ভাঁজ করা হয় যে, এপিসাইকেল-সমতলের সঙ্গে এর চিহ্ন H,3-অবস্থানে আসে। এবং এই এপিসাইকেল সমতল দ্বিতীয় ব্যাসের বিপরীত j_m কোণে ঘুরিয়ে ডেফারেন্ট-সমতলে আনা হয়; ফলে এর প্রথম ব্যাস BC অবস্থানে আসে।

এখন যদি PE-এর প্রকৃত দৈর্ঘ্য, এবং P থেকে ডেফারেন্ট-সমতলের উপর লম্ব আঁকা যায়, তা হলে প্রশ্নের সমাধান প্রায় হয়ে যায়। কেননা PE-কে অতিভুজ এবং উপরের লম্বটিকে উচ্চতা নিয়ে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলে, ভূমিসংলগ্ন সূক্ষ্মকোণটিই β_2-এর চরম মান। এজন্য আলিদাদকে এমন ভাবে স্থাপন করা হয়, যেন আলিদাদের কাঁটা বলয়-বিভক্তিকে α-কোণে ছেদ করে। আলিদাদের



রেখাচিত্র ৪২ : গ্রহ-অক্ষাংশ গঠন

ধারের স্থায়ী অন্তরদাগ অনুযায়ী তখন ফলকের উপরে প্রথম দাগ দেওয়া হয় (চিত্র ৪২-এর 1)। এর ফলে HI, গ্রহটির এপিসাইকেলের ব্যাসের সমান হয়। সমীকরণ-ব্যাসের উপরে প্রথম দাগের প্রক্ষেপ 'দ্বিতীয় দাগ'। (চিত্র ৪২-এর 2)। আলিদাদের সাহায্যে ফলকের উপরে 'তৃতীয় দাগ' (চিত্র ৪২-এর 3) দেওয়া হয়। এতে 3H2 কোণ $= i_m$ এবং H2 = H3। 3 বিন্দু দিয়া সমীকরণ-ব্যাসের সমান্তরাল একটি সরলরেখা M3 টানা হয়। এই দুইটি সমান্তরাল রেখার ভিতরের দূরত্বই সমকোণী ত্রিভুজটির উচ্চতা। ত্রিভুজটির অতিভুজ

নির্ণয় করবার জন্য সমীকরণ-ব্যাসের উপরে অক্ষাংশ-বিন্দু বিকল্প বিন্দু S-কে এমনভাবে বসাতে হয়, যেন S2=E3 হয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, এপিসাইকেলকে ঘুরিয়ে যখন ডেফারেণ্ট-সমতলের উপর ফেলা হয়, তখন সমকোণী ত্রিভুজ EP3 ডেফারেণ্ট-সমতলের উপরে পড়ে এবং এর আয়তনের কোন পরিবর্তন হয় না। E শীর্ষবিন্দুটি EH বরাবর বাইরের দিকে সরে যায়, 3 বিন্দুটি 2-এর অবস্থানে এবং P বিন্দুটি 1-এর অবস্থানে যায়। উপরের চিত্রে S1-এর দৈর্ঘ্য EP-এর দৈর্ঘের সমান (চিত্র ৪২)।

তারপরে S-কে কেন্দ্র করে, S1-কে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি চাপ আঁকা হয়। এই চাপটি M3-কে R বিন্দুতে ছেদ করে। এক্ষণে RSH কোণটিই $\beta_2(\alpha)$-এর চরম মান। আলিদাদকে S-এর সমান্তরালভাবে স্থাপন করলে আলিদাদের কাঁটা বরাবর যে বিভক্তি নির্দেশ করে, তা থেকেই এই কোণের পরিমাপ করা যায়।

এরপরে চন্দ্রের অক্ষাংশ নির্ণয়-পদ্ধতি অনুসারেই অগ্রসর হতে হয়। তবে চন্দ্রের ক্ষেত্রে অক্ষাংশ-বৃত্তের ব্যাস নেওয়া হয় sin 5°; আর বর্তমান ক্ষেত্রে এই ব্যাসার্ধ $\sin \beta_2(\alpha)_{\text{চরম}}$ । অতএব নীচের রাশিমালা থেকে β_2-এর মান নির্ণয় করা যায়ঃ

$$\sin \beta_2(\lambda_a, \alpha) = \sin \beta_2(\alpha)_{\text{চরম}} \cdot \sin \lambda_a$$

টলেমীর গণনাতে এই রাশিমালা নিম্নলিখিতরূপ হয়,

$$\beta_2(\lambda_a, \alpha) = \beta_2(\alpha)_{\text{চরম}} \sin \lambda_a$$

টলেমীর গণনা অপেক্ষা আল-কাশীর গণনা অনেক উন্নততর।

বিয়োগবোধক সংখ্যা সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় গণিতবিদগণের কোন ধারণা ছিল না। সেজন্য কোন সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ অক্ষাংশ-উত্তর এবং অক্ষাংশ-দক্ষিণ বলে আখ্যা দিতেন। পার-ইক্লিপ্টিক বলে একটি কথা ব্যবহার করা হয়েছে। এই কথাটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আরবীতে এখানে 'মুমাত্তাল' শব্দ ব্যবহার

করা হয়েছে। এই শব্দটি 'আল-ফালাক আল-মুমাত্তাল লে-ফালাক আল-বুরুজ'-এর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। প্রত্যেক গ্রহের জন্য এক একটি পৃথক নির্দেশীকরণ বৃত্ত আছে ; এই বৃত্ত সূর্যপথের সমতলে অবস্থিত এবং বিশ্বের কেন্দ্রেই এই বৃত্তের কেন্দ্র।

অন্তর্গ্রহসমূহের তৃতীয় অক্ষাংশ নির্ণয়

শুক্রের দ্বিতীয় সমীকরণকে $\frac{1}{8}$ দিয়ে গুণ করলে ক্রান্তিকোণ পাওয়া যায়। আর বুধের বেলায়, ডেফারেন্টের কেন্দ্রের যেদিকে এপিসাইকেলের কেন্দ্র থাকে, অপভূও যদি সেইদিকেই থাকে, তা হলে ৭ মিনিট দিয়ে এবং তার বিপরীত দিকে থাকলে ৮ মিনিট দিয়ে গুণ করলে বুধের ক্রান্তিকোণ পাওয়া যায়। ক্রান্তিকোণ অনুযায়ী অক্ষাংশ-রেখা নির্ণয় ক'রে সমীকরণ-রেখার উপরে আলিদাদকে লম্বভাবে স্থাপন করলে যে বিভক্তি পাওয়া যায়, সেখানে একটি দাগ দেওয়া হয়। ঐ দাগটি অক্ষাংশ-দাগ। তারপরে প্রত্যেক গ্রহের সঠিক কেন্দ্রকে ৯° ডিগ্রী বৃদ্ধি করলে যে বিন্দু পাওয়া যায়, তাকে অক্ষাংশ-কেন্দ্র বলে। আলিদাদের কাঁটাকে এই অক্ষাংশ-কেন্দ্রের বরাবর স্থাপন করলে যে বিভক্তিতে কাঁটা পড়ে সেইটাই গ্রহের তৃতীয় অক্ষাংশ। গ্রহের সঠিক কেন্দ্র তিন রাশির কম বা নয় রাশির বেশী হলে শুক্রের তৃতীয় অক্ষাংশ দক্ষিণে এবং বুধের তৃতীয় অক্ষাংশ উত্তর দিকে হয়।

টলেমীর পদ্ধতি হতে এ পদ্ধতি অনেক উন্নত। এই তৃতীয় বা শেষ অংশের উপর অক্ষাংশ যে অনেকটা নির্ভর করে, টলেমী সে বিষয়ে কোন খেয়ালই করেন নাই। নীচের চিত্রে (চিত্র ৪৩) এপিসাইকেলের উপরের অর্ধাংশ, BPC-এর প্রথম ব্যাসের (BC) উপরে কাত হয়ে আছে দেখা যায়। EON′ সমতলকে ডেফারেন্টের বা সূর্যপথের সমতল মনে করা যেতে পারে। E বিশ্বকেন্দ্র। এবং, ∝-কেন্দ্রে গ্রহের একটি সাধারণ অবস্থান P-তে দেখানো হয়েছে ; EM′ এপিসাইকেলের স্পর্শক। সমকোণী গোলকীয় ত্রিভুজ OM′N′ খ-গোলকের একটি অংশ ; M′

বিন্দুটি সূর্যপথের চাপ ON′-এর উপরে M-এর প্রক্ষেপ-বিন্দু। সূর্যপথের উপরে এর প্রক্ষেপ OM, গ্রহটির দ্বিতীয় সমীকরণ OM′N′ কোণটি ক্রান্তিকোণ; ডেফারেণ্টের উপর H-এর ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই কোণেরও

রেখাচিত্র ৪৩ : তৃতীয় অক্ষাংশ নির্ণয়ে চালু
এপিসাইকেলের ব্যবহার

পরিবর্তন হয়। H যখন পাতবিন্দুতে থাকে, তখন এই কোণের মান শূন্য, এবং H যখন অপভূতে থাকে, তখন এই কোণের মান চরম বা অবম হয়। MON এবং M′ON′ ত্রিভুজ দুইটিকে টলেমী সমতলীয় ত্রিভুজ বলে মনে করেন এবং সেইভাবেই গণনা করেন। এর ফলে আল-কাশীর নির্ণীত মান টলেমীর নির্ণীত মানের সঙ্গে প্রথম ষষ্টিক স্থানেই পৃথক হয়।

বিশ্বকেন্দ্র (পৃথিবী) থেকে গ্রহের দূরত্ব নির্ণয়

প্রত্যেক গ্রহের কেন্দ্র-দাগ থেকে ঐ গ্রহের অন্তরদাগ পর্যন্ত দূরত্ব, ঐ গ্রহের কেন্দ্র-দাগ থেকে বিশ্বের কেন্দ্রের দূরত্বের সমান; এবং গ্রহের কেন্দ্র-দাগ থেকে ফলকের কেন্দ্রের দূরত্ব ঐ গ্রহের এপিসাইকেল-কেন্দ্র হতে বিশ্বকেন্দ্রের দূরত্বের সমান। এই দূরত্বগুলি এমনভাবে নির্ণয় করা হয়, যেন ফলকের ব্যাসার্ধ দুইটি কলাবের পাশ থেকে ৬০ বিভক্তি দূরে থাকে। সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করতে ডেফারেণ্টের ব্যাসার্ধও ৬০ বিভক্তি হতে হয়। চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় করতে আনত ব্যাসার্ধও

৬০ বিভক্তি হতে হয়। এই আপাত বিভক্তি হতে প্রকৃত বিভক্তি জানতে হলে নীচের সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়।

০	৫	৮	৭	♂	♀	☿
১; ০, ০	১; ০, ০	১,৯,১১	১;৪,৫৫	১;১৯,১২	১ ; ১৩	১;১,৩,৫৬

যে কোন সময়ে চন্দ্র ও পৃথিবীর দূরত্ব (চিত্র ৩৭) DE দ্বারা নির্দেশ করা যায়। অনুরূপভাবে পৃথিবী ও অন্য কোন গ্রহের দূরত্ব (চিত্র ৩৮) D′E দ্বারা নির্দেশ করা যায়। এই দূরত্বসমূহকে ফলকের ৬০ বিভক্তিতে গণনা করা হয়। এগুলিকে প্রত্যেক গ্রহের ডেফারেন্ট-ব্যাসের তুলনায় নির্ণয় করতে প্রত্যেকটি দূরত্বকে উপরের সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়।

গ্রহগতি, অগ্রগতি, বক্রগতি ও স্থির অবস্থান

রাশিচক্রে কোন গ্রহের যখন কোন গতি থাকে না, তখন তাকে 'মুকিম' বা স্থির বলে। আবার গ্রহ যখন রাশিচক্রের পিছনের দিকে চলতে থাকে, তখন সে 'মাকামে রাজাযাত' বা পশ্চাদবস্থানে থাকে। আবার যখন সামনের দিকে চলতে থাকে, তখন সে 'মাকামে এসতে-কামাত' বা অগ্রাবস্থানে থাকে।

কোন গ্রহের 'রাজাযাত', 'ইসতিকামাত' ও 'আকামাত' নির্ণয় করতে পরপর কয়েকদিন ঐ গ্রহের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতে হয়। যখন প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ বৃদ্ধি পায়, গ্রহটি তখন অগ্রগতিতে (ইসতিকামাতে) থাকে; যখন প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ হ্রাস পায়, তখন পশ্চাৎ-গতিতে (রাজাযাতে) থাকে। আর যখন হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হয় না, তখন স্থির (আকামাতে) থাকে। সঠিক কোণ যখন অগ্র ও বক্র অবস্থানের

সীমায় পৌঁছে, তখন এই অবস্থান (অগ্র বা পশ্চাৎ) নির্ণয় করতে ফলকের ব্যাসের বিভক্তিতে গ্রহের এপিসাইকেলের কেন্দ্র হতে বিশ্বের কেন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় করতে হয়। এই দূরত্ব ফলকের কেন্দ্র হতে কেন্দ্র-দাগের দূরত্বের সমান। একে সংরক্ষিত (মাহফুজ) দূরত্ব বলে। তার-পরে ঐ গ্রহের এপিসাইকেল-কেন্দ্রের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব ব্যাসের বিভক্তিতে এইভাবে নির্ণয় করা হয়। আলিদাদকে বিপরীতভাবে ঘুরিয়ে অপভূ ও অনুভূ দিয়ে অতিক্রম করানো হয়। ফলকের কেন্দ্র হতে ঐ গ্রহের ডেফারেন্টের সঙ্গে আলিদাদের ছেদবিন্দুর দূরত্বই অপভূর দিকে সর্বোচ্চ দূরত্ব এবং অনুভূর দিকে সর্বনিম্ন দূরত্ব। বুধের বেলায় কিন্তু এই গণনা প্রয়োগ করা যায় না। এই ক্ষেত্রে অপভূ থেকে ডেফারেন্টকে তিন ভাগে ভাগ করলে, প্রথমে যে বিন্দু পাওয়া যায়, সেইটাই এর সর্বনিম্ন দূরত্ব। এরপরে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্বের পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। নীচের তালিকাতে এইগুলি দেওয়া গেল।

দূরত্ব	♄	♃	♂	♀	☿
সর্বোচ্চ	৫৫ ; ০	৫৮ ; ০	৫০ ; ০	৬০ ; ০	৫৬ ; ০
সর্বনিম্ন	৪৯ ; ৪	৫২ ; ৫৬	৪০ ; ৫৪	৫৭ ; ৫৬	৪৫ ; ৬
পার্থক্য	৫ ; ৫৬	৫ ; ৪	৯ ; ৬	২ ; ৪	১০ ; ৫৪

বহির্গ্রহ ও শুক্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দূরত্ব থেকে সংরক্ষিত দূরত্ব বিয়োগ করতে হয়; বুধের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত দূরত্ব থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব বিয়োগ করতে হব। বিয়োগফলকে অবস্থানের প্রথম ও শেষ সীমার মধ্যে গুণন করা হয়। পরপৃষ্ঠার তালিকাতে এই গুণফল দেওয়া গেল।

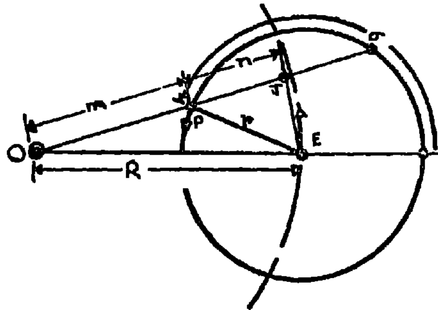
গুণফলকে দুই দূরত্বের অন্তর দিয়ে ভাগ করতে হয়। ভাগফলকে বক্র-গতি অবস্থানের আরম্ভ-সীমা দ্বারা বৃদ্ধি করলেই বক্রগতি-অবস্থান পাওয়া যায়ঃ

গ্রহ	♄	♃	♂	♀	☿
বক্রগতি-অবস্থানের আরম্ভ-সীমা ও অগ্রগতি-অবস্থানের আরম্ভ-সীমা	৩^{s}২২;৪৫°	৪^{s}৭;৬°	৫^{s}৭;১৪°	৫^{s}১৫;৪৫°	৪^{s}২৪;২৯°
বক্রগতি-অবস্থানের শেষ সীমা	৩^{s}২৫;২৯°	৪^{s}১০;১১°	৫^{s}১৮;৪৮°	৫^{s}১৮;২৭°	৪^{s}২৭;১৪°
দুই সীমার অন্তর	২ ; ৪৪°	৩ ; ৫°	১১ ; ৩৪°	২ ; ৪২°	২ ; ৪৫°

আবর্ত থেকে বক্রগতি-অবস্থান বিয়োগ করলে অগ্রগতি অবস্থান পাওয়া যায়। অথবা অগ্র-অবস্থানের শেষ সীমা থেকে উপরের ভাগ-ফল বিয়োগ করলে অগ্র-অবস্থান পাওয়া যায়। আবর্ত থেকে অগ্র-অবস্থান বিয়োগ করলে বক্র-অবস্থান পাওয়া যায়। বক্র-অবস্থানকে প্রথম অবস্থান ও অগ্র-অবস্থানকে দ্বিতীয় অবস্থান বলা হয়। অগ্রগতি-সম্পন্ন কোন গ্রহের গতি কখন বক্র হবে, সে সম্বন্ধে জানতে হলে, প্রথম অবস্থান থেকে তার সঠিক কোণ বিয়োগ ক'রে বিয়োগফলকে কোণের দৈনিক গতি দ্বারা ভাগ করতে হয়। অবশিষ্ট যে সময় নির্দেশ করে, সেই সময়ের পরেই গ্রহের গতি বক্র হয়। অনুরূপভাবে গ্রহ

বক্রগতিসম্পন্ন হলে, দ্বিতীয় অবস্থান থেকে কোণ বিয়োগ ক'রে এই প্রণালীতে অগ্রগতির সময় পাওয়া যায়।

উপরের এই পদ্ধতি এপোলোনিয়াসের একটি তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। এই তত্ত্বে বলা হয় যে, যদি ডেফারেণ্টের কেন্দ্র ও বিশ্বকেন্দ্র একই জায়গায় অবস্থিত হয়, O বিন্দুর চারদিকে এপিসাইকেলের কেন্দ্র E-এর কৌণিক গতি V_e হয় এবং E-এর চারদিকে গ্রহের কৌণিক গতি V_r হয়, এবং ET-এর উপরে OT লম্ব হয়, এবং $\frac{m}{n}=\frac{V_e}{V_r}$ হয়, তা হলে গ্রহ স্থির অবস্থায় থাকে।



রেখাচিত্র ৪৪ : এপোলোনিয়াসতত্ত্বের চিত্র

উপরের সমীকরণ পাওয়া গেলে এপিসাইকেলের কোণ σ, গ্রহটির স্থির অবস্থান। উপরের চিত্রটি টলেমীর মডেল অপেক্ষা অনেক সহজ; কেননা টলেমীর চিত্রে ডেফারেণ্ট-কেন্দ্রে ও বিশ্বকেন্দ্রের দূরত্ব d। OE সাধারণতঃ ধ্রুবক নয়; ইহা ডেফারেণ্টের অপভূ হতে এপিসাইকেলের কেন্দ্রের দ্রাঘিমাংশের উপর নির্ভর করে। এই চল-ব্যাসার্ধকে $\rho(\lambda)$ দিয়ে নির্দেশ করা হয় এবং দেখা যায় যে,

$$\rho(0^\circ)=R+d \text{ এবং } e(180^\circ)=R-d$$

টলেমী এই অপেক্ষক σ-এর তিনটি মাত্র মান দিয়েছেন, $\sigma(0^\circ)$, $\sigma(180^\circ)$

এবং $\sigma(V_d)$। মধ্যবর্তী মানের জন্য তিনি নীচের পদ্ধতি ব্যবহার করেন ঃ

$$\sigma(\lambda) = \begin{cases} \sigma + \dfrac{[\rho(\lambda) - R]\ [\sigma(0^\circ) - \sigma]}{d}, & 0 \leqslant \lambda \leqslant V_d \\ \sigma + \dfrac{[\rho(\lambda) - R]\ [\sigma - \sigma(180^\circ)]}{d} & V_d \leqslant \lambda \leqslant 180^\circ \end{cases}$$

আল-কাশীর গণনা টলেমীর গণনা থেকে কিছুটা পৃথক। কাশী $\sigma(V_d)$-এর কোন ব্যবহার করেন নাই। উপরের দুইটি রাশিমালার পরিবর্তে তিনি নীচের একটিমাত্র রাশিমালা ব্যবহার করেন ঃ

$$\sigma(\lambda) = \sigma(0^\circ) + \frac{[\rho(0^\circ) - \rho(\lambda)]\ [\sigma(180^\circ) - \sigma(0^\circ)]}{2d}$$

নীচে টলেমী, আল-কাশী, উলুগ বেগ ও আল-বাত্তানী নির্ণীত মান দেখানো গেল ঃ

$\sigma(0)$

	টলেমী	আল-কাশী	উলুগ বেগ	আল-বাত্তানী
♄	৩^{s}২২ ; ৪৫	৩^{s}২২ ; ৪৫	৩^{s}২২ ; ১০	৩^{s}২২ ; ৪৫
♃	৪^{s}৪ ; ৫	৪^{s}৭ ; ৬	৪^{s}৩ ; ৪০	৪^{s}৪ ; ৫০
♂	৫^{s}৭ ; ২৮	৫^{s}৭ ; ১৪	৫^{s}৫ ; ৩৬	৫^{s}৭ ; ৩৩
♀	৫^{s}১৫ ; ৫১	৫^{s}১৫ ; ৪৫	৫^{s}১৬ ; ১২	৫s১৫ ; ৫৩
	৪^{s}২৭ ; ১৪	৪^{s}২৪ ; ২৯	৪^{s}২৭; ১৪	৪^{s}২৭ ; ১৩

☍(180°)

	টলেমী	আল-কাশী	উলুগ বেগ	আল-বাত্তানী
♄	৩^{s}২৫ ; ২৯	৩^{s}২৫ ; ২৯	৩^{s}২৪ ; ৪৯	৩^{s}২৫ ; ২৯
♃	৪^{s}৭ ; ১১	৪^{s}১০ ; ১১	৪^{s}৬ ; ৫১	৪^{s}৭ ; ১১
♂	৫^{s}১৯ ; ৯	৫^{s}১৮ ; ৪৮	৫^{s}১৯ ; ৪২	৫^{s}১৯ ; ১৪
♀	৫^{s}১৮ ; ২১	৫^{s}১৮ ; ২৭	৫^{s}১৮ ; ৪	৫^{s}১৮ ; ২১
☿	৪^{s}২২ ; ৪০	৪^{s}২৭ ; ১৪	৪^{s}২৪ ; ৪০	৪^{s}২৪ ; ৪০

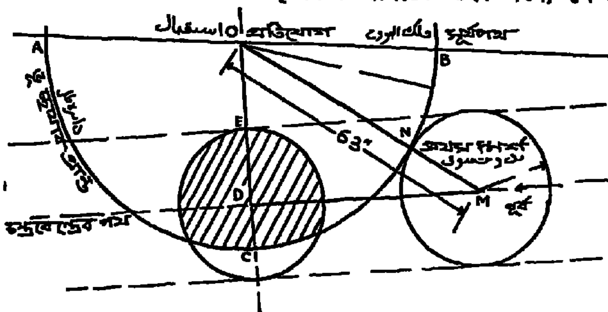
চন্দ্রগ্রহণ নির্ণয়

পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে চন্দ্র প্রবেশ করলেই চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। চন্দ্র সম্পূর্ণভাবে ছায়ার ভিতরে গেলে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হয়, আর কিছু অংশ ছায়ার ভিতরে গেলে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হয়। আল-কাশী গ্রহণ সংক্রান্ত পাঁচটি সময়-নির্ণয়-পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন : (১) ছায়ার সঙ্গে চন্দ্রের প্রথম স্পর্শ, (২) পূর্ণ গ্রহণ সংঘটনের প্রথম-ক্ষণ, (৩) পূর্ণ গ্রহণের মধ্য-ক্ষণ, (৪) পূর্ণ গ্রহণের মোক্ষ আরম্ভ-ক্ষণ এবং (৫) পূর্ণমোক্ষ। আংশিক গ্রহণক্ষেত্রের গ্রহণের আয়তনও নির্ণয় করা হয়।

সূর্য-পৃথিবী-চন্দ্র এই তিনটি খ-বস্তু কতটা পরিমাণে একই সরল-রেখায় অবস্থিত থাকে, তার উপরেই গ্রহণের আয়তন ও স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে। সুতরাং এই তিনটি খ-বস্তু একই সরলরেখায় অবস্থান না করলে, অর্থাৎ পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্র-সংযোগকারী-রেখা দুইটির

(পৃথিবী-সূর্য, পৃথিবী-চন্দ্র) অনন্তর্গত কোণ ১৮০ ডিগ্রী না হলে, অন্য কথায় চন্দ্র প্রতিযোগ-অবস্থানে না থাকলে, চন্দ্রগ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিযোগ-অবস্থানই চন্দ্রগ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা চন্দ্র সূর্যপথের উপরে ভ্রমণ করে না। চন্দ্রপথ অন্য একটি বৃহৎ বৃত্ত; এটি সূর্যপথকে প্রায় ৫ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে। এই বৃহৎ বৃত্তটি (চন্দ্রপথ) ধীর গতিতে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে; ফলে পাতবিন্দুদ্বয়ের (সূর্যপথ ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দুদ্বয়) অবস্থান বৎসরে প্রায় ১৯ ডিগ্রী পরিবর্তিত হয়। চন্দ্রের অক্ষাংশ, অর্থাৎ সূর্যপথ থেকে চন্দ্রের দূরত্ব থেকেই বোঝা যায় ঐ সময় চন্দ্রগ্রহণ সম্ভব কিনা।

আল-কাশী কতকগুলি সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তিনি চন্দ্র ও পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান মনে করতেন। সেজন্যই তিনি মনে করতেন যে, পৃথিবী থেকে চন্দ্রবিম্বকে সর্বদা একই আকারের দেখা যায়। একই কারণে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা একই থাকে মনে করবার ফলে, চন্দ্র যে স্থানে পৃথিবীর ছায়াকে ছেদ করে, সে স্থানে

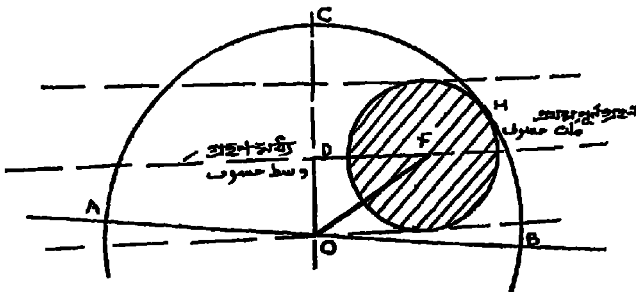


রেখাচিত্র ৪৫ : আংশিক চন্দ্রগ্রহণের চিত্র

ছায়ার গভীরতাও সর্বদা সমান মনে করা হতো। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ফলে, তিন মাত্রার প্রশ্নকে দুই মাত্রার প্রশ্নে পরিবর্তন করা হয় এবং সেজন্য সমাধানও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। উপরের চিত্রটিতে আকাশের এই অংশ দেখানো হয়েছে।

AB সূর্যপথের উপর O একটি বিন্দু ; এই অবস্থায় সূর্য ও চন্দ্র প্রতিযোগী অবস্থানে আছে। MD সরলরেখাটি চন্দ্রের কেন্দ্রপথ এবং MN চন্দ্রের আপাত ব্যাসার্ধ। প্রতিযোগী অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া ও খ-গোলকের ছেদিত অংশ ABC বৃত্ত দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। OD রেখাটি DM-এর উপরে লম্ব। যেহেতু DM সরলরেখাটি সূর্যপথের সঙ্গে পাঁচ ডিগ্রী অপেক্ষা বড় কোণ উৎপন্ন করে না, অতএব সংযোগের সময় চন্দ্রের দ্রাঘিমাংশ স্থূলভাবে OD দ্বারা নির্দেশ করা যায়। চন্দ্র যদি N বিন্দুতে পৃথিবীর ছায়াকে স্পর্শ করে, তা হলে ODM সমকোণী ত্রিভুজে OM রেখাটি চন্দ্রের আপাত ব্যাসার্ধ ও ছায়ার ব্যাসার্ধের যোগফলের সমান। DM-কে প্রথম স্পর্শের সময় এবং প্রতিযোগের সময় চন্দ্রের দ্রাঘনের পার্থক্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে ; কিন্তু এই দুই সময়ের মধ্যে চন্দ্রের দ্রাঘিমাংশ বলা সম্ভব নয়। কেননা এই অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে সূর্যপথের উপরে সূর্য এবং তার সঙ্গে পৃথিবীর ছায়াও কিছুদূর অগ্রসর হয়।

আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হলে তার আয়তন EC-কে চন্দ্র-ব্যাসের দ্বাদশ অংশের সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এখানে পূর্ণগ্রহণ আরম্ভের কাল



রেখাচিত্র ৪৬ : পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের চিত্র

নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপ অবস্থায় চন্দ্র পৃথিবীর ছায়াকে অন্তঃস্পর্শ করে। উপরের চিত্রে H বিন্দুতে এই অবস্থা দেখানো হয়েছে।

উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহণ-মধ্যকালে চন্দ্রের কেন্দ্র D বিন্দুতে উপস্থিত হয়। এই সময়েই চন্দ্র প্রতিযোগী অবস্থায় থাকে। পূর্ণগ্রহণ মোক্ষারম্ভ এবং গ্রহণ মোক্ষারম্ভ OC-এর পূর্বদিকে পূর্ণগ্রহণারম্ভ ও স্পর্শারম্ভের প্রতি সম-অবস্থায় সংঘটিত হয়।

উপরের ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আল-কাশীর গণনা-পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে।

রাত্রিতে প্রতিযোগ সংঘটিত হলে, অথবা দিবারম্ভের ২ ঘণ্টা ৪ মিনিট আগে অথবা দিবাশেষের ২ ঘণ্টা ৪ মিনিট পরে প্রতিযোগ সংঘটিত হলে, এবং চন্দ্রের অক্ষাংশ, চন্দ্রের ব্যাসার্ধ ও ছায়ার ব্যাসার্ধের যোগফলের কম হলে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটন হওয়া সম্ভব। আর চন্দ্রের অক্ষাংশ ঐ দুই ব্যাসার্ধের যোগফলের সমান হলে, কেবলমাত্র স্পর্শ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে, কোন গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে না। চন্দ্রের অক্ষাংশ ঐ দুই ব্যাসার্ধের যোগফলের বেশী হলে, কোন গ্রহণ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং যে কোন একটি পাতবিন্দু থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ১২ ডিগ্রীর বেশী হলে চন্দ্রগ্রহণ ঘটা সম্ভব নয়। আর এই দূরত্ব ১২ ডিগ্রীর কম হলে এবং সংযোগের সময় চন্দ্রের অক্ষাংশ ২৯ মিনিটের বেশী হলে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে এবং এর চেয়ে কম হলে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে। সুতরাং চন্দ্রগ্রহণ সংঘটন কাল জানতে হলে, মেষাদি-বিন্দুর বরাবর আলিদাদ স্থাপন ক'রে চন্দ্রের অক্ষাংশের পরিমাণকে ডিগ্রীতে পরিণত ক'রে ফলকের ব্যাসের বিভক্তিতে সেই অনুযায়ী দাগ দিতে হয়। তারপরে আলিদাদের কাঁটা ঘুরিয়ে একটি অয়ন বিন্দুতে নিতে হয়। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যে, আলিদাদের ধার যেন ঐ দাগের পাশে থাকে। কলাবের ধার ঐ দাগের পাশে এমনভাবে রাখতে হয় যে, কলাবের উপরে চন্দ্রগ্রহণের যে দাগ থাকে, সেটি এই দাগের উপরে পড়ে এবং কলাবের অন্য মাথা আলিদাদের ধারে বসে। কলাবের এই মাথা পূর্ণ গ্রহণারম্ভ-দাগের নিকটে থাকে। কলাবের এবং আলিদাদের ভিতরে কোণের

পরিমাণ আলিদাদের বিভক্তিতে নির্ণয় করতে হয়। একে দ্বিগুণ ক'রে ষষ্টিক স্কেলে এক ঘর পিছিয়ে দিতে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ডিগ্রীকে মিনিট বলে গণনা করলে গ্রহণারম্ভের সময় পাওয়া যায়। আর পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হলে, গ্রহণ-দাগের সাথে যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে, পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ-দাগ দিয়ে সেই সমস্ত কাজ করতে হয়। প্রতিযোগ সময়কে পাঁচ অংশে নিতে হয়। প্রথম অংশ থেকে গ্রহণ-সময় বিয়োগ করতে হয়; দ্বিতীয় অংশ থেকে পূর্ণগ্রহণ-সময় বিয়োগ করতে হয়; তৃতীয় অংশকে পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করতে হয়, আর চতুর্থ অংশের সাথে পূর্ণগ্রহণ-সময় যোগ করতে হয়। অবশেষে পঞ্চম অংশের সংগে গ্রহণকাল যোগ করতে হয়। এর ফলে গ্রহণরাম্ভ, পূর্ণ গ্রহণারম্ভ, গ্রহণমধ্য, মোক্ষারম্ভ এবং পূর্ণমোক্ষের সময় নির্ণয় করা যায়। পূর্ণগ্রহণ না হলে প্রতিযোগ-সময়কে তিন অংশে ভাগ করা হয়। প্রথমাংশ থেকে গ্রহণারম্ভ সময়, দ্বিতীয় অংশ থেকে গ্রহণমধ্য সময় এবং তৃতীয় অংশ থেকে মোক্ষ সময় নির্ণয় করা যায়। ক্লারের বিভক্তিতে চন্দ্রের অক্ষাংশের অবস্থান থেকে, পূর্ণগ্রহণ-দাগের নিকট হতে চন্দ্রগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্ত সংখ্যা ক্লারের উপরে পাওয়া যায়।

চন্দ্রগ্রহণ সীমা

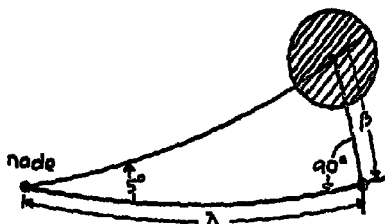
উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, গ্রহণ সংঘটনের প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হচ্ছে প্রতিযোগের সময় চন্দ্রের অক্ষাংশ (β), চন্দ্রের আপাত ব্যাসার্ধ (r_m) এবং ছায়ার ব্যাসার্ধের (r_s) যোগফলের চেয়ে কম না হয়। যদিও স্পষ্ট বলা হয় নাই, তবুও উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ণগ্রহণ সংঘটনের প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হচ্ছে,

$$r_s - r_m > \beta$$

উপরের বর্ণনা থেকে নীচের দুইটি সমীকরণও পাওয়া যায়:

$$r_s + r_m = 63', \; r_s - r_m = 29'$$

এ থেকে $r_s = 46'$ এবং $r_m = 17'$ পাওয়া যায়। টলেমী প্রদত্ত সংখ্যার সঙ্গে এই দুই সংখ্যার যথেষ্ট মিল আছে।



রেখাচিত্র ৪৭ : পূর্ণিমা বা অমাবস্যার নিকটে চন্দ্রের অক্ষাংশ

আংশিক গ্রহণের ক্ষেত্রে সূর্যপথের উপরে পাতবিন্দু থেকে প্রতিযোগী-বিন্দুর দূরত্ব সম্বন্ধে যে বিষয় বলা হয়েছে, সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে অক্ষাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। উপরের চিত্রে খ-গোলকে পাতবিন্দু, চন্দ্রের কেন্দ্র এবং সূর্যপথের উপরে ঐ বিন্দুর প্রক্ষেপ দ্বারা যে সমকোণী গোলকীয় ত্রিভুজ পাওয়া যায়, তা থেকে,

$$\sin \lambda = \frac{\beta}{5^\circ} \quad (\text{প্রায়})$$

β-এর মান 63 মিনিট নিলে আমরা পাই,

$$\lambda = \sin^{-1}\left(\frac{63}{300}\right)$$

$$= 12^\circ \ (\text{প্রায়})$$

উপরের বর্ণনাতে ঠিক এই সংখ্যার কথাই বলা হয়েছে।

উপরের বর্ণনায় প্রথমে বলা হয়েছে যে, দিনের বেলায় সূর্যোদয়ের ২ ঘণ্টা ৪ মিনিট পূর্বে, অথবা সূর্যাস্তের ২ ঘণ্টা ৪ মিনিট পূর্বে প্রতিযোগ ঘটলে, চন্দ্রগ্রহণ সম্ভব। এর বেশী হলে সম্ভব নয়। এ বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। গ্রহণকাল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হয়, যখন ৬৩ মিনিট চাপ দ্রাঘনে প্রথম স্পর্শ সংঘটিত হয়। দ্রাঘনের

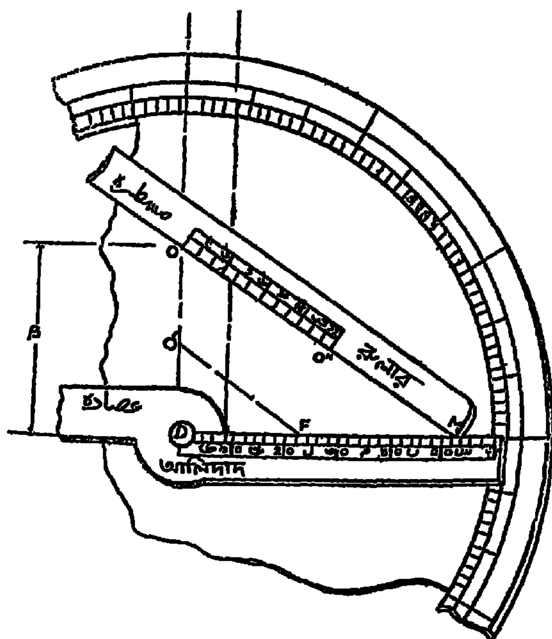
দৈনিক গড় গতি প্রায ১৩ ; ১০, ৫—০ ; ৫৯, ৮=১২ ; ১১, ২৭। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ গ্রহণের অর্ধেক সময় প্রায,

$$\frac{১ ; ৩(২৪)}{১২ ; ১১, ২৭} = ২ ; ৪ \text{ ঘণ্টা।}$$

এইভাবে হিসাব করেই উপরের ২ ঘণ্টা ৪ মিনিট সময় পাওয়া যায়।

রুলারের উপরে চন্দ্রগ্রহণের দাগ

রুলারের এক প্রান্ত থেকে ৬৩ ভাগ দূরে (ফলকের ব্যাসার্ধের ষাট ভাগের) রুলারের ধারে একটি স্থায়ী দাগ (নীচের চিত্রে O)



রেখাচিত্র ৪৮ : চন্দ্রগ্রহণ নির্ণয়ে বলয় ও ফলকের ব্যবহার

দেওয়া হয়। একই প্রান্ত থেকে ২৩ ভাগ দূরের বলয়ের উপরে আর একটি স্থায়ী দাগ—পূর্ণ গ্রহণারম্ভ দাগ—দেওয়া হয। ৪৮ নং চিত্রে এই

দাগটিকে O″ বলা হয়েছে। OO″ অংশটি দৈর্ঘ্যে ২৪ ভাগের সমান হয় এবং চন্দ্রের আপাত ব্যাসার্ধেরও সমান হয়। এই অংশটিকে ১২ অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগ এক একটি গ্রহণসংখ্যা নির্দেশ করে।

চন্দ্রগ্রহণ কাল নির্ণয়

মনে করা যাক, প্রতিযোগ কাল (t)-এর জন্য অক্ষাংশ β নির্ণয় করা হয়েছে। এবং চন্দ্রগ্রহণ সংঘটনের পক্ষে ?-এর মান যথেষ্ট পরিমাণে কম। মেষের আলিদাদ বিন্দুকে বলয়ের উপরে স্থাপন ক'রে ফলকের উপরে O বিন্দুতে বসাতে হয়। ফলকের ব্যাসার্ধের প্রতি ষষ্টিতম অংশকে এক মিনিট চাপের সমান মনে ক'রে অক্ষাংশ β-এর পরিমাপে DO অংশ নিয়ে O বিন্দুতে বসাতে হয়। আলিদাদকে ৯০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে রুলারের উপরের চন্দ্রগ্রহণ-দাগকে O-এর সঙ্গে এমনভাবে সমপাতন করতে হয়, যেন রুলারের প্রান্ত আলিদাদের ধারকে M বিন্দুতে স্পর্শ করে। পূর্ববর্তী চিত্রের (চিত্র ৪৫) DOM ত্রিভুজটিকেই যান্ত্রিক উপায়ে অাঁকা হয়েছে। অতএব যন্ত্রটির উপরে DM-এর দৈর্ঘ্য, প্রথম বা শেষ স্পর্শের সময়ে দ্রাঘনের মান মিনিটের চাপে নির্ণয় করা হয়েছে। যেহেতু স্থূলভাবে দ্রাঘনের হার প্রতি ঘণ্টায় প্রায় আধ ডিগ্রী, DM-এর দৈর্ঘ্যকে লঘুকরণের সাহায্যে দ্বিগুণ করা হলে, লব্ধফল প্রথম স্পর্শ থেকে গ্রহণ-মধ্যকাল পর্যন্ত অন্তবর্তী সময় নির্দেশ করে। লব্ধফল t-এর সঙ্গে যোগ করলে অথবা t থেকে বিয়োগ করলে, প্রথম ও শেষ স্পর্শের সময় পাওয়া যায়।

পূর্ণগ্রহণ ক্ষেত্রে, একইরূপে চন্দ্রগ্রহণ-বিন্দু O-এর পরিবর্তে প্রথম পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ-বিন্দু O″ ব্যবহার ক'রে O′FD ত্রিভুজটি (চিত্র ৪৮) আঁকা হয়। ত্রিভুজটি পূর্ববর্তী চিত্রের (চিত্র ৪৬) OFD ত্রিভুজের মত। এখান থেকে প্রথম পূর্ণগ্রহণ-সময়ের দ্রাঘন নির্ণয় করা যায়। লঘুকরণের সাহায্যে একে দ্বিগুণ ক'রে সময়ে পরিবর্তন করা যায়। লব্ধফলের সঙ্গে t যোগ করলে এবং t থেকে লব্ধফল বিয়োগ করলে পূর্ণগ্রহণের প্রথম ও শেষ সময় পাওয়া যায়।

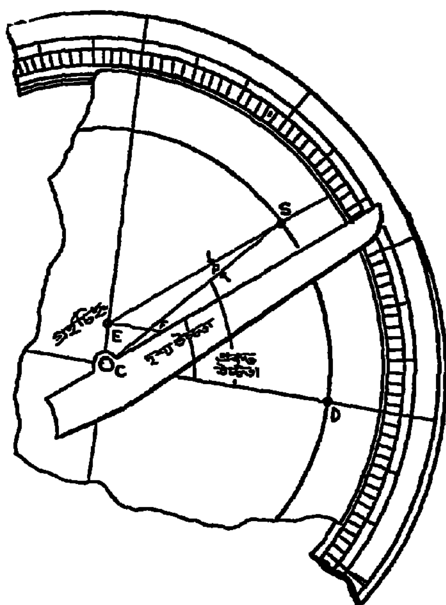
আংশিক গ্রহণের আয়তন নির্ণয় করতে, রুলারের M প্রান্তটি আলিদাদের উপরে এমনভাবে রাখতে হয়, যেন রুলারটি উপরের চিত্রে (চিত্র ৪৮) দুইটি বিচ্ছিন্ন রেখায় অবস্থানে পড়ে। রুলারের উপরে O দাগের অবস্থান গ্রহণের আয়তন নির্দেশ করে। পূর্ববর্তী চিত্রে (চিত্র ৪৫) এই পদ্ধতির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। ঐ চিত্রে দেখা যায়, গ্রহণের আয়তন নির্ণয়ে স্থূলতঃ আল-কাশীর যন্ত্রেও ঠিক একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

$$EC = ED + DC = r_m + r_s - \beta = 63' - \beta$$

আপাত উন্নতি হতে প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত উন্নতি হতে আপাত উন্নতি ও লম্বন নির্ণয়

আলিদাদের কাঁটাকে কর্কটরাশির প্রথম বিন্দুতে স্থাপন করা হয় এবং কেন্দ্র হতে চন্দ্রের ক্ষেত্র কর্কটরাশির প্রথম বিন্দুর দিকে আলিদাদের এক বিভক্তি দুই মিনিট লওয়া হয়, এবং সূর্যের ক্ষেত্রে দুই মিনিটের কিছু বেশী লওয়া হয়। শুক্রের ক্ষেত্রে দুই মিনিট নিয়ে প্রান্তের দিকে একটি দাগ দেওয়া হয়। এই দাগটিকে লম্বন-দাগ বলে। তারপর বিশ্বকেন্দ্র থেকে সূর্য অথবা চন্দ্রের দূরত্ব অনুসারে অথবা শুক্রের দূরত্বের অর্ধেক অনুসারে আলিদাদের ধারে দাগ দেওয়া হয়। এই দাগকে গ্রহের লম্বন-দাগ বলে। আপাত উন্নতি জানা থাকলে এবং প্রকৃত উন্নতি জানতে হলে, মেষের প্রথম বিন্দু থেকে রাশিচক্রের উপরে আলিদাদের কাঁটা, আপাত উন্নতির পরিমাণ সরিয়ে দিতে হয় এবং লম্বন-দাগের পাশ দিয়ে রুলার স্থাপন ক'রে আলিদাদের সমান্তরাল করে সরাতে হয় এবং ফলকের উপরে গ্রহের দাগের স্থানে রুলারের পাশে একটি সরলরেখা টানতে হয়। মেষের প্রথম বিন্দু থেকে আলিদাদের কাঁটার দূরত্ব ঐ গ্রহের প্রকৃত উন্নতি। দুই উন্নতির ভিতরে পার্থক্যই উন্নতিদ্বয়ের লম্বন।

প্রকৃত উন্নতি জানা থাকলে এবং আপাত উন্নতি জানতে হলে, মেষেব প্রথম বিন্দু হতে আলিদাদের কাঁটা বাশিসমূহের দিকে প্রকৃত উন্নতিব পবিমাণে সবাতে হব এবং আলিদাদের উপরে গ্রহের যে দাগ আছে, ফলকেব উপবে সেখানে একটি দাগ দিতে হয। তাবপব রুলাবের ধাব এই দাগ এবং লম্বন-দাগেব ববাবব বেখে রুলারের সমান্তবাল ক'রে আলিদাদকে স্থাপন কবতে হয। মেষেব প্রথম বিন্দু হতে আলিদাদের কাঁটাব দূরত্ব ঐ গ্রহের আপাত উন্নতি নির্দেশ করে।



বেখাচিত্র ৪৯ : লম্বন নির্ণযে বলয ও ফলকেব ব্যবহার

মনে কবা যাক ৪৯ নং চিত্রে পার্থিব ক্ষুদ্রবৃত্তেব কেন্দ্র C এবং E বিন্দু থেকে একজন দর্শক খ-বস্তু S-এব উন্নতি পর্যবেক্ষণ করে। পৃথিবীর কেন্দ্র হতে এই উন্নতি ES, দর্শকের দিগন্ত অনুসারে অর্থাৎ গোলকের

S বিন্দুর স্পর্শক অনুসারে SEF কোণটি S-এর উন্নতি নির্দেশ করে। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্র হতে এই উন্নতি SCD কোণ দ্বারা নির্দেশ করা হয়। এই দুই কোণের ভিতরে পার্থক্য উন্নতিবৃত্তে গ্রহের লম্বন P। সহজেই দেখা যায় যে, পৃথিবী ও গ্রহের ভিতরে দূরত্ব এবং উন্নতির উপরে লম্বন P নির্ভর করে। CS যদি ধ্রুবক হয়, তা হলে উন্নতি যখন শূন্য, তখন লম্বন সর্বাধিক হবে এবং তখন লম্বনের পরিমাণ হবে $\sin^{-1}\frac{EC}{CD}$। এই বিষয়টিই যন্ত্রের সাহায্যে উপরের পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কাশীর গণনা অনুযায়ী প্রাপ্ত তিনটি গ্রহের আনুভূমিক লম্বন নীচে দেওয়া গেল :

$$☾ \quad \sin^{-1} ০ ; ১,২ = ০ ; ৫৯, ১৩^\circ$$

$$☉ \quad \sin^{-1} ০ ; ০, ২ = ০ ; ১, ৫৫^\circ$$

$$♀ \quad \sin^{-1} ০ ; ০, ৪ = ০ ; ৩, ৫০^\circ$$

এখানে সূর্য ও চন্দ্রের গড় দূরত্ব লওয়া হয়েছে ১, ০ ; ০ এবং শুক্রের গড় দূরত্ব লওয়া হয়েছে ১, ০ ; ০/২।

সূর্যগ্রহণ নির্ণয়

যদি দিবাভাগে বা রাত্রির উভয় দিকে সংযোগ সংঘটিত হয়, এবং সংযোগের সেই অংশ উচ্চপাতের পরে বা নিম্নপাতের আগে বোল ডিগ্রীর কম দূরত্বে থাকে, অথবা উচ্চপাতের আগে বা নিম্নপাতের পরে সাত ডিগ্রির কম দূরত্বে থাকে, তা হলে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হতে পারে। এইভাবে যখন সূর্যগ্রহণ সংঘটনের সম্ভাবনা থাকে তখন সংযোগের

বিপরীত অংশ নীচের লম্বন-তালিকা থেকে দূরত্বের কাল, অক্ষাংশের পার্থক্য এবং দূরত্ব-কালের পার্থক্য নিতে হয়। সংযোগ পশ্চিমে সংঘটিত

		♋		♌		♍		♎		♏		♐		♑			
		৬ ৫৭		৬৪৮		৬১৬		৬ ০		৫ (৩৪)		৫.১(১)		৫,৩			
		(মিনিটে) [illegible]	[illegible]											(মিনিটে) [illegible]	[illegible]		
অপরাহ্ণ	৭	১৪১	২৮	১৫৮	২০	১০.	৯									৭	পূর্বাহ্ণ
	৬	১৪১	২৭	১.২৭	১৮	১৩৬	৯	১২১	৪	১.০৪	৬	১.১৮	১২			৬	
	৫	১.৪০	২৬	১৪২	১৬	১.৪০	৮	১৩৫	৪	১৩৫	৭	১৪৪	১০	১.৪২	২২	৫	
	৪	১.৩৭	২১	১.৪২	১৩	১৪১	৭	১৪৭	৫	১৫৩	৫	১৪৭	১৬	১.৪০	২৭	৪	
	৩	১.২৬	১৬	১৩৬	৯	১৩৫	৬	১.৪৭	৭	১৪৭	১৩	১৪০	২০	১৩০	৩০	৩	
	২	১৭	১১	১১১	৭	১.২০	৬	১০৪	৮	১০৫	১৫	১১৮	২৬	১১১	৩৫	২	
	১	০.৩৭	৭	০৪৪	৯	০৫০	৮	১.০০	১৩	১.০৮	২২	১৭	৩১	০.৪০	৩৮	১	
মধ্যাহ্ন		০০	৫	০৭	৮	০.১৯	১৪	০.৩২	২০	০.৩৯	২৯	০.২২	৩৭	০.৪০	৪১		মধ্যাহ্ন
পূর্বাহ্ণ	১	৩৭	৭	০২৮	১২	০.৫৩	২০	০.১১	২৮	০০	২৬	০.১১	৪০	০.৪০	৩৮	১	অপরাহ্ণ
	২	১৭	১১	০৫৮	১৯	০.৫২	২৬	০.৩৩	৩৫	০.৩৬	৩৭	০.৩৫	৪৪	১১১	৩৫	২	
	৩	১২৬	১৬	১.২৬	২৪	০.৫৭	৩২	০.৫১	৩১	০৫৩	৩৮	১.১১	৪৩	১৩০	৩০	৩	
	৪	১.৩৭	২১	১১৬	২২	১৮	৩৬	১৫	৪০	১৮	৩৮	১১.	৩৩	১৪৪	২৩	৪	
	৫	১.৪০	২৩	১২১	৩৩	১১৩	৩৮	১৭	৪১	১১৩	৩৭	১.২২	৩৪	১.৪৪	২১	৫	
	৬	১৪০	২৩	১৪৪	৩৫	১১১	৩৯	১.৮	৪১	১১১	৩৯	১.১১	৩৩			৬	
	৭	১৪১	২৮	১.২৫	৩৩	১.২৯	৪০									৭	
		♋		[♊]		[♉]		[♈]		[♓]		[♒]		♑			

রেখাচিত্র ৫০ : চন্দ্রের লম্বনাংশের সংশোধিত তালিকা

হলে, এগুলি সংযোগ-সময়ের সাথে যোগ করতে হয় এবং সংযোগের পূর্বে সংঘটিত হলে, সংযোগের সময় থেকে বিয়োগ করতে হয়।

এর ফলে সূর্যগ্রহণের মধ্য-কাল পাওয়া যায়। এরপরে সূর্যগ্রহণের মধ্য-কালে চন্দ্রের অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয়। এই অক্ষাংশ উত্তরে হলে, অক্ষাংশ ও লম্বনের অন্তরফল নেওয়া হয়, এবং অক্ষাংশ দক্ষিণে হলে যোগফল নেওয়া হয়। এতে আপাত অক্ষাংশ পাওয়া যায়। ইহা ৩৩ মিনিটের কম হলে, সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়, নইলে হয় না। সূর্যগ্রহণ সংঘটনের সম্ভাবনা থাকলে, চন্দ্রের অক্ষাংশ ও চন্দ্রগ্রহণের দাগ নিয়ে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে, এখানেও সূর্যের আপাত অক্ষাংশ ও সূর্যগ্রহণ-দাগ নিয়ে ও একই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। এর ফলে চন্দ্রগ্রহণের মত সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রেও, সূর্যগ্রহণ-আরম্ভকাল, সূর্যগ্রহণের মধ্য-কাল ও সূর্যগ্রহণের মোক্ষকাল জানা যায়। এরপরে চন্দ্রগ্রহণ-সংখ্যার মত সূর্যগ্রহণ-সংখ্যাও নির্ণয় করা হয়।

কোন দর্শকের নিকট সূর্যগ্রহণ দৃশ্য হতে হলে, গ্রহণ-সময়ে সূর্য ও চন্দ্রে খ-গোলকীয় স্থানাঙ্কসমূহ যতদূর সম্ভব একই হওয়া দরকার। তা ছাড়া, দর্শক পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত থাকে, পৃথিবীর কেন্দ্রে নয়। সুতরাং সূর্য ও চন্দ্রের আপাত স্থানাঙ্ক এক হওয়া দরকার; তাদের প্রকৃত স্থানাঙ্ক এক হওয়ার দরকার হয় না। অর্থাৎ দর্শককে মূলবিন্দু মনে ক'রে, সূর্য ও চন্দ্রের যে স্থানাঙ্ক পাওয়া যায়, সেই স্থানাঙ্কসমূহ এক হওয়া দরকার। পৃথিবীর কেন্দ্রকে মূলবিন্দু মনে ক'রে যে স্থানাঙ্কসমূহ পাওয়া যায়, সেগুলি এক হওয়ার দরকার হয় না। সেজন্য পৃথিবীর কেন্দ্র অনুসারে যে স্থানাঙ্ক পাওয়া যায়, লম্বন দ্বারা সেগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন। সংশোধিত চান্দ্র-লম্বন (ইখতিলাফে মানজারে মুবাদ্দালে কামার) অর্থে চন্দ্র ও সূর্যের আপাত উন্নতির সময়ে তাদের লম্বনের পার্থক্য বুঝায়। উপরের তালিকাতে উন্নতি-বৃত্তের এই সংশোধিত লম্বনকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ, এই দুই অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় মধ্যরেখায় অথবা তার পূর্ণসংখ্যক ঘণ্টা পূর্বে বা পরে, এবং রাশিচক্রের বারোটি রাশি আদিবিন্দুতে সংযোগ সংঘটনের জন্য একটি ক'রে জোড়া অংশ-তালিকাতে দেওয়া হয়েছে। প্রতিসাম্য বিবেচনা

করলে, অবন-বিন্দু থেকে সমান দূরবর্তী দুইটি রাশির জন্য একই কলাম ব্যবহার করা যেতে পারে। একইভাবে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় কলাম সিংহ ও কন্যা উভয় রাশির জন্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য সিংহরাশির জন্য সর্বদক্ষিণ কলামের ঘণ্টাসমূহ এবং কন্যারাশির জন্য সর্ববামের কলামের ঘণ্টাসমূহ ব্যবহার করতে হয়। অক্ষাংশের পরিমাণ চাপের মিনিটে দেওয়া হয়েছে। আপাত সংযোগ এই সময়ের পূর্বে বা পরে দৃষ্ট হবে। দ্রাঘনের হার প্রতিদিন প্রায় ১২ ডিগ্রী ; সুতরাং দ্রাঘিমাংশকে দুই দিয়ে ভাগ করে চাপের মিনিটে পরিবর্তিত করা যায়। কোন রাশির আদিবিন্দুতে সূর্য থাকলে, সেইদিনের দৈর্ঘ্য, তালিকার সর্বোপরি সারিতে দেওয়া হয়েছে।

আল-কাশীর যন্ত্রের সাহায্যে যেভাবে চন্দ্রগ্রহণ নির্ণয় করা হয়, প্রায় একইভাবে সূর্যগ্রহণও নির্ণয় করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রতি- যোগের পরবর্তী সংযোগ ব্যবহার করতে হয়। পূর্বের মতই রুলারের ধারে একপ্রান্ত থেকে ফলকের ব্যাসার্ধের ৬০ ভাগের ৩৩ ভাগ দূরে একটি স্থায়ী দাগ দিতে হয়। এর অর্থ সংযোগের সময় চন্দ্রের অক্ষাংশ ৩৩ মিনিট অপেক্ষা কম হবে। এ দ্বারা আরো বোঝা যায় যে,

$$r_m + r_o = 33'$$

এখানে r_o অর্থ সূর্যবিম্বের ব্যাসার্ধ। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি, r_o-এর মান ১৭ মিনিট। অতএব দেখা যায় যে, সূর্যবিম্ব ও চন্দ্রবিম্ব প্রায় সমান আকারের ; সুতরাং, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হলেও, তার স্থায়িত্ব অত্যন্ত অল্পক্ষণ হবে। সেজন্য পূর্ণ সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্র কোন প্রথম দাগের উল্লেখ করা হয় নাই। সূর্যগ্রহণের দাগ থেকে রুলারের ধারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বারোটি সমান অংশে ভাগ করতে হয়। এই অংশগুলি সূর্যগ্রহণ-সংখ্যা নির্দেশ করে।

একটি বিশেষ বিষয়ে চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্যগ্রহণ কিছুটা পৃথক। বিষয়টি হলো, দর্শকের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য চন্দ্রগ্রহণ দর্শনে কোন অসুবিধা

হয় না। কিন্তু সূর্যগ্রহণ-ক্ষেত্রে দর্শকের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যই উপরের তালিকার সাহায্যে লম্বনের সংশোধন প্রয়োজন। লম্বনের জন্য প্রত্যেক খ-বস্তুর আপাত অবস্থান প্রকৃত অবস্থানের নীচে নামিয়ে দেয়। সুতরাং পূর্বাহ্নে সংযোগ ঘটলে, প্রকৃত সংযোগ-সময় থেকে দ্রাঘিমাংশ-সংশোধন বিয়োগ করতে হয় এবং অপরাহ্নে সংযোগ ঘটলে, যোগ করতে হয়। ঠিক একই কারণে, উত্তর দিককে যোগ-বোধক মনে ক'রে, প্রকৃত অক্ষাংশ হতে অক্ষাংশ-সংশোধন বীজগণিতীয়ভাবে বিয়োগ করতে হয়। এই সংশোধনের পরে প্রথম স্পর্শ থেকে মধ্য-গ্রহণ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময় এবং গ্রহণের আয়তন, চন্দ্রগ্রহণের মত একইভাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গণনায় মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক ব্যবহৃত আরবী ও ফারসী শব্দ

(ফারসী বর্ণমালা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে)

آلف

آلت	Instrument	যন্ত্র
اتصال (pl اتصلات)	Conjunction	সংযোগ
اجتماع	Conjunction	সংযোগ
اختلاف	Difference	অন্তর
اختلاف منظر	Parallax	লম্বন
ارتفاع	Altitude	উন্নতি
ارقام اختلاف	Difference marks	অন্তর-চিহ্ন
استقامت	Forward (motion)	অগ্র (গতি)
استقبال	Opposition	প্রতিযোগ
اسطرلاب	Astrolabe	আস্তারলাব
اصابع	Digits	সংখ্যাসমূহ
اقليم (pl اقاليم)	Climate	জলবায়ু
انجلاء	Clearance (eclipse)	মোক্ষ
انحراف	Obliquity	তীর্যকতা
انقلابين	Solstices	অয়নবিন্দুদ্বয়
اهليلجى	Elliptical	উপবৃত্তীয়
اوج (pl اوجات)	Apogee	অপভূ
اوساط	Mean	গড়

ب

بدل	Substitute	পরিবর্ত
برج (pl, بروج)	Sign	রাশি

بطی	Slow	মন্থর
بعد (pl ابعاد)	Distance	দূরত্ব
بعد مضاعف	Doubled distance	দ্বিগুণ দূরত্ব
بهت	Rate	হার
	پ	
پرگار	Compass	কম্পাস
	ت	
تاریخ	Calendar, Date	পঞ্জিকা, তারিখ
تامه	Complete	পূর্ণ
تحویل	Transfer	স্থানান্তর
تدویر	Epicycle	এপিসাইকেল
تضعیف	Doubling	দ্বিগুণকরণ
تعدیل	Equation	সমীকরণ
تعدیل الایام بلیالیها	Equation of time	কাল-সমীকরণ
تفاضل	Difference	অন্তর
تفریق	Subtraction	বিয়োগ করা
تقاطع	Intersection	ছেদ
تقویم	True longitude (celestial)	প্রকৃত খ-দ্রাঘিমাংশ
تنصیف	Halving	অর্ধেক করা
توالی بروج	Succession of signs	রাশির ক্রম
	ث	
ثقب	Hole	গর্ত
	ج	
جدول (pl جداول)	Table	তালিকা
جزء (pl اجزاء)	Part	অংশ
جمع	Addition	যোগ
جنوب	South	দক্ষিণ
جوزهر	Node, lunar	চন্দ্রের পাতবিন্দু
	ح	
حاده	Acute (angle)	কোণ

حاصل جرب	Product	গুণফল
حجره	Ring	বলয়
حرکت (pl. حرکات)	Motion	গতি
حساب	Computation	গণনা
حضیض	Perigee	অনুচ্চ
حفر	Depression	নতি
حقیقی	True	প্রকৃত
حلقه	Ring	বলয়
حمل	Aries	মেষ

خ

خارج قسمت	Quotient	ভাগফল
خارج مرکز	Eccentric	বিকেন্দ্রিক
خاصه	Anomaly	কোণ
خسوف	Lunar Eclipse	চন্দ্রগ্রহণ
خشب	Wood	কাঠ
خط (pl. خطوط)	Line	রেখা
خط اوجی	Line of apsides	অপনূরক রেখা
خطوط عرض	Latitude line	অক্ষাংশ রেখা
خیط	Thread	সুতা

د

دایره (pl. دوایر)	Circle	বৃত্ত
دایره عرض	Latitude Circle	অক্ষাংশ বৃত্ত
درجه (pl. درجات)	Degree	শ্রেণী
دور	Rotation or Revolution	আবর্তন, পরিভ্রমণ

ذ

ذراع	Cubit	হাত
ذروه	Epicycle apogee	এপিসাইকেলের অপভু

ر

راجع	Retrograde	পশ্চাৎ
ربع (pl. ارباع)	Quadrant	পাদ, চতুর্থাংশ
رجعت	Retrogradation	পশ্চাৎগমন
رفع کردن	To elevate	উন্নত কর
رقم (pl ارقام)	Numeral	সংখ্যা চিহ্ন
رقم اختلاف	Difference mark	অন্তর চিহ্ন
ریمان	String	সুতা

ز

زاویه	Angle	কোণ
زاویه قایمه	Right angle	সমকোণ
زاید	Increasing	বৃদ্ধি
زایره	Projection	প্রক্ষেপ
زبانه	Tongue	জিহ্বা
زحل	Saturn	শনি
زهره	Venus	শুক্র
زیج	Table	তালিকা, জিজ

س

سال	Year	বর্ষ, বৎসর
سال تمه	Complete year	পূর্ণ বৎসর
سریع	Fast	দ্রুত
سطح مستوی	Plane	সমতল
سفلیین	Two inferior planets	অন্তর্গ্রহ দুইটি
سقوط	Immersion	নিমজ্জন
سلسله	Chain	শৃঙ্খল
سنه (pl. سنین)	Year	সন
سوراخ	Hole	গর্ত
سیر	Movement	গতি

	ش	
شاقول	Plumb-line	ওলনদড়ি
شبانروز	Day, Nychthemeron	দিবারাত্রি
شبه	Yellow copper	তামা
شمس	Sun	সূর্য
	ص	
صفر	Brass	পিতল
صفيحه	Plate	ফলক
	ض	
ضرب	Multiplication	গুণন
	ط	
طبق المناطق	Plate of the heavens	খ-ফলক
طول	Longitude	দ্রাঘিমাংশ
طولي	Longitudinal	অনুদৈর্ঘ্য
	ظ	
ظل	Shadow	ছায়া
	ع	
عالم	Universe	বিশ্ব
عرض (pl عروض)	Latitude	অক্ষাংশ
عضاده	Alidade	অ্যালিদাদ
عطارد	Mercury	বুধ
عظم	Magnitude (of a star)	শ্রেণী (উজ্জ্বলতার)
عقده	Node	পাতবিন্দু
علامت	Mark	চিহ্ন
علم رياضي	Mathematics	গণিত
علم نجوم	Astronomy	জ্যোতির্বিদ্যা
علويه	Superior (Planets)	বহিঃস্থ
	غ	
غايت	Extreme	চরম

ف

فضل	Excess	অতিরিক্ত
فلک البروج	Ecliptic	সূর্যপথ

ق

قاعده	Base	ভূমি
قایم	Perpendicular	লম্ব
قرص	Disc	বিম্ব
قسم (pl. اقسام)	Division, part	বিভক্তি, অংশ
قطر	Diameter	ব্যাস
قطر استواء	Equating Diameter	সমীকরণ-ব্যাস
قمر	Moon	চন্দ্র
قطب	Pole	মেরু
قوس	Arc	চাপ

ک

کسور	Fractions	ভগ্নাংশ
کسوف	Solar eclipse	সূর্যগ্রহণ
کوکب (pl. کواکب)	Star, Planet	তারা, গ্রহ
کلی	Total (eclipse)	পূর্ণ (গ্রহণ)

ل

لبنتین	Sights	দৃশ্য
لوح	Plate	ফলক
لون (pl.الوان)	Colour	বর্ণ

م

مایل	Inclined	অবনত
مبسوطه	Explicit	প্রকাশ্য
مثلث	Triangle	ত্রিভুজ
مجموع	Sum	যোগফল

مجیب	Sine	সাইন
محفوظ	Preserved	সংরক্ষিত
محور	Axis	অক্ষ
محیط	Circumference	পরিধি
مدار	Orbit	কক্ষ
مربع	Square	বর্গ
مرتبه	Place	স্থান
مرفوع	Elevated	উন্নত
مرکبه	Compound	মিশ্র
مرکز (pl. مراکز)	Centre	কেন্দ্র
مرکز مدیر	Turning centre	ঘূর্ণন কেন্দ্র
مرکز مستعار	Fictitious centre	কৃত্রিম কেন্দ্র
مرئی	Apparent	আপাত
مری	Pointer	নির্দেশক
مریخ	Mars	মঙ্গল
مستعار	Fictitious	কৃত্রিম
مستقیم	Direct (motion)	অগ্র (গতি)
مسطره	Ruler	রুলার
مسمار	Peg	খুঁটি
مسیر (pl. مسیرات)	Path	কক্ষ, পথ
مشتری	Jupiter	বৃহস্পতি
مطالع	Rising	উদয়
معدل	Adjusted	সমন্বিত
معدل المسیر	Equant	ইকোয়ান্ট
معد النهار	Equator (Celestial)	খ-বিষুব
مقاسم	Divisions	বিভক্তি
مقام (pl. مقامات)	Station	নিবাস
مقوم	True position	প্রকৃত অবস্থান

مقیم	Stationary	স্থির, গতিহীন
مکث	Duration (of an eclipse)	স্থায়িত্বকাল (গ্রহণের)
مماس	Tangent	স্পর্শক
ممثل	Par-ecliptic	পার-ইক্লিপটিক
منطقه (pl مناطق)	Heavens, Deferrent	খ-ডেফারেন্ট
موازی	Parallel	সমান্তরাল
موضع	Position	অবস্থান
میزان	Libra	তুলা
میل	Inclination	নতি
	ن	
ناقص	Decreasing	ক্ষয়শীল
ناقصه	Incomplete	অসম্পূর্ণ
نحاس	Copper	তামা
نسبت	Ratio	অনুপাত
نصف النهار	Noon, Meridian	মধ্যাহ্ন, মধ্যরেখা
نصف لدایره	Semi-circle	অর্ধবৃত্ত
نطاق (pl نطاقات)	Sector	বৃত্তকলা
نظیر	Opposite	বিপরীত
نقص	Decrease	কমে যাওয়া
نقطه (pl. نقاط)	Point	বিন্দু
نقطه عرض	Latitude point	অক্ষাংশ বিন্দু
نقطه معادات	Opposite point	বিপরীত বিন্দু
نور	Light	আলোক
نیرین	Luminaries	জ্যোতিষ্ক
	و	
وتر	Chord	জ্যা
وسط (pl. اوساط)	Mean	গড়
	ی	
یزدجرد	Yazdigerd	ইয়াজদিগার্দ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উলুগ বেগের তারা-তালিকা

(১৪৩৭'৫ খ্রীস্টাব্দ)

নীচে উলুগ বেগেব বিখ্যাত তারা-তালিকা দেওযা গেল। বেয়ারের তাবা-তালিকা প্রণীত না হওযা পর্যন্ত উলুগ বেগের এই তালিকাই ছিল একমাত্র প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য তাবা-তালিকা। তালিকাটি আলোচনা করলে দেখা যায যে, এই তালিকাতে আকাশের তারাসমূহকে মণ্ডল অনুযাযী সাজানো হয়েছে এবং মণ্ডলেব চিত্রে অবস্থান অনুযাযী এক প্রান্ত থেকে আবম্ভ করে প্রত্যেক তাবার বর্ণনা দেওযা হযেছে। যে সমস্ত তারা দিযে চিত্র গঠিত, তাদেব বাইরেব অতিরিক্ত তারাসমূহও বিবেচনা করা হযেছে। এই তালিকাতে তাবাসমূহকে টলেমীব তালিকাতে দেওয়া ক্রম অনুসারেই সাজানো হযেছে। তারাব যে সমস্ত বর্ণনা দেওয়া হযেছে, সেগুলিও সম্পূর্ণরূপে টলেমীব দেওযা বর্ণনা থেকে নেওযা। টলেমী তাবাব বর্ণনা দেন গ্রীক ভাষায; আবদুব রহমান সুফী আরবীতে তাব অনুবাদ কবেন। উলুগ বেগ তাবার বর্ণনা আবদুব রহমান সুফীব বর্ণনা থেকে ফাবসীতে অনুবাদ কবেন। উলুগ বেগেব বর্ণনার অনুবাদ কবেন শেলবাপ (Schjellerup) ফরাসী ভাষায। Knoble যদিও ইংরেজীতে উলুগ বেগের তারা-তালিকা গ্রন্থ প্রণযন কবেছেন, কিন্তু ইংরেজী ভাষাতে তিনি তাবাসমূহেব কোন বর্ণনা দেন নাই; শেলরাপেব মূল ফবাসী ভাষাতেই সেগুলিব উল্লেখ কবেছেন। এই বইতে শেলরাপের ফবাসী ভাষাব বর্ণনা থেকেই বাংলায অনুবাদ করাব চেষ্টা কবা হযেছে। Knoble তাঁব বইতে টলেমীর গ্রীক ভাষায বর্ণনা, আবদুব রহমান সুফীব আববী ভাষায বর্ণনা এবং উলুগ বেগের

ফারসী ভাষায় বর্ণনা, সমস্তই তুলনামূলকভাবে সমালোচনা করেছেন। সেই সমালোচনা থেকে দেখা যায় যে, কোন সময়েই অনুবাদ ঠিক আভিধানিক হয় নাই। প্রত্যেক অনুবাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। Knoble-এর সমালোচনাকে ভিত্তি করে এই বইতে কেবলমাত্র উলুগ বেগের ফারসী বর্ণনা এবং শেলরাপের ফরাসী বর্ণনার সাথে এ বইয়ে ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় বর্ণনার সামান্য তুলনা দেখানো হয়েছে। মূল ফারসী ভাষা থেকে বর্ণনা নিতে পারলে বোধ হয় অনেক ভাল হতো। কিন্তু সেটি না পাওয়ায় শেলরাপের ফরাসী বর্ণনা থেকেই এ বইয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ফরাসী ভাষায় অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হওয়ায়, তারামণ্ডলীর চিত্রের সঙ্গে এবং আধুনিক নামের সঙ্গে মিলিয়ে কোন্ কোন্ তারার অবস্থান চিত্রে কোথায় হবে তা নির্ণয় ক'রে তার বর্ণনা দিতে হয়েছে। সে কারণে, অনেক ক্ষেত্রে ফারসী অথবা ফরাসী শব্দের আভিধানিক অনুবাদ করা হয় নাই।

নীচের তারা-তালিকার প্রথম কলামে উলুগ বেগের তালিকায় প্রদত্ত তারার ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মণ্ডলের জন্য তিনি নূতনভাবে ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করেছেন; এমনকি চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারার জন্যও তিনি নূতন ক্রমিক সংখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় কলামে চিত্রে তারার অবস্থান অনুযায়ী বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তালিকার তৃতীয় কলামে প্রত্যেকটি তারার আধুনিক কালের পরিচিত তারা-চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এই চিহ্নগুলি বেয়ারের দেওয়া। চতুর্থ ও পঞ্চম কলামে উলুগ বেগ কর্তৃক নির্ণীত প্রত্যেকটি তারার খ-দ্রাঘিমাংশ ও খ-অক্ষাংশ দেওয়া হয়েছে। তৎকালীন বিষুবনের অবস্থান অনুযায়ী এই সমস্ত স্থানাঙ্ক নির্ণীত হয়েছিল। এদের বর্তমান স্থানাঙ্ক Nautical almanac থেকে জানা যেতে পারে। ষষ্ঠ কলামে তারাসমূহের উজ্জ্বলতা দেওয়া হয়েছে। টলেমীর তালিকা থেকে আবদুর রহমান সুফী এই উজ্জ্বলতার উল্লেখ করেছেন।

উত্তর দিকের মণ্ডলসমূহ

উরসা মাইনর (শিশুমার دب اصغر)

উলুগ বেগের দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা	তারার বর্ণনা	আধুনিক তারা-চিহ্ন	উলুগ বেগ কর্তৃক নির্ণীত খ-দ্রাঘিমাংশ: রাশি	ডিগ্রী	মিনিট	উলুগ বেগ কর্তৃক নির্ণীত খ-অক্ষাংশ: ডিগ্রী	মিনিট	টলেমী প্রদত্ত উজ্জ্বলতা
১	লেজের শেষ প্রান্তেব তাবা	α	২	১০	১৯	৬৬	২৭	৩
২	এবপবে লেজের তাবা	δ	২	২২	২৫	৭০	০	৪
৩	লেজের গোডার সামনের তাবা	ε	৩	০	৫৫	৭৩	৪৫	৪
৪	চতুর্ভুজেব সামনের অংশের দক্ষিণেব তাবা	ζ	৩	১৭	৪৩	৭৫	৩৬	৪
৫	ঐ অংশেব উত্তরের তাবা	η	৩	২২	৫৫	৭৮	০	৫-৪
৬	পিছনেব অংশেব দুইটি তাবাব দক্ষিণেবটি	β	৪	৫	২৫	৭৩	০	২
৭	ঐ অংশের উত্তরের তাবা	γ	৪	১০	৫৫	৭৫	৯	৩

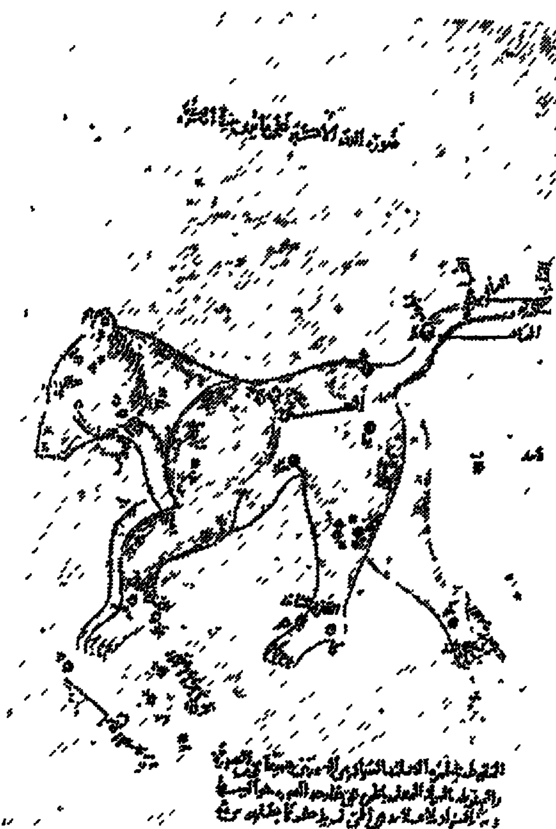
চিত্রেব বাইরের অতিবিক্ত তারা

উলুগ বেগের দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা	তারার বর্ণনা	আধুনিক তারা-চিহ্ন	রাশি	ডিগ্রী	মিনিট	ডিগ্রী	মিনিট	টলেমী প্রদত্ত উজ্জ্বলতা
১	উপবেব দুইটি তারাব সাথে একই সরলরেখায় অবস্থিত দক্ষিণেব তাবা	A	৪	০	৫৫	৭১	৪৫	৪

উরসা মেজর (সপ্তর্ষি মণ্ডল دب اکبر)

উলুগ বেগের দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা	তারার বর্ণনা	আধুনিক তারা-চিহ্ন	রাশি	ডিগ্রী	মিনিট	ডিগ্রী	মিনিট	টলেমী প্রদত্ত উজ্জ্বলতা
১	নাকের গোডাব তারা	o	৩	১৪	৫৫	৪০	১৫	৪
২	চোখের দুইটি তারার আগেরটি	A	৩	১৫	৪৩	৪৩	৪৮	৫

৩	এদেব পবেরটি	π^2	৩	১৬	৩৪	৪৩	৪৫	৫
৪	কপালের দুইটি তারাব আগেরটি	ρ	৩	১৬	২৫	৪৭	৫৪	৫



রেখাচিত্র ৫১ ঃ উলুগ বেগের মতে বৃহৎ ভল্লুকেব চিত্র

৫	তার পরেরটি	σ^2	৩	১৭	৪৩	৪৭	৫১	৫
৬	সামনেব কানেব শেষের তাবা	d	৩	১৮	২৫	৫১	৪৮	৫

৭	কাঁধের দুইটি তারার আগেরটি	τ	৩	১৯	৪০	৪৪	৪২	৪-৫
৮	এদের পরেরটি	h	৩	২২	৪৯	৪৪	৫৪	৪
৯	বুকের দুইটি তারার বেশী উত্তরেরটি	υ	৩	২৮	৩১	৪২	৩৯	৪
১০	বেশী দক্ষিণেরটি	φ	৪	১	১৯	৩৮	০	৪-৫
১১	বাঁ হাঁটুর উপরের তারা	θ	৩	২৯	২২	৩৪	৪৫	৩
১২	বাঁ পায়ের দুইটি তারার বেশী উত্তরেরটি	ι	৩	২৪	৫৫	২৯	২১	৩-৪
১৩	বেশী দক্ষিণেরটি	k	৩	২৫	৪৩	২৯	০	৩-৪
১৪	ডাইনের হাঁটুর উপরের তারা	e	৩	২৫	১৬	৩৬	০	৫-৪
১৫	ডাইনের হাঁটুর নীচের তারা	f	৩	২৫	২৫	৩৩	২১	৫-৪
১৬	পিঠের যে তারাটি চতুর্ভুজের উপরে	α	৪	৭	২৫	৪৯	২৪	২
১৭	পেটের উপরের তারাটি	β	৪	১১	৩৭	৪৫	৯	৩-২
১৮	লেজের গোড়ার তারাটি	δ	৪	২৩	২৫	৫১	৩৩	৩-৪
১৯	পিছনের বাঁ উরুর অবশিষ্ট তারা	γ	৪	২২	৩১	৪৭	১৫	৩-২
২০	পিছনের বাঁ পায়ের দুইটি তারার আগেরটি	λ	৪	১১	৪০	২৯	৪৫	৩-৪
২১	তার পরের তারাটি	μ	৪	১৩	৭	২৮	৪২	৩-৪
২২	বাঁ হাঁটুর বাঁকের উপরের তারা	ψ	৪	২০	৪৬	৩৫	১৫	৩-৪
২৩	পিছনের ডান পায়ের উপরের তিনটি তারার বেশী উত্তরেরটি	ν	৫	০	৭	২৬	০	৩-৪

২৪	ওদেব বেশী দক্ষিণেবটি	ξ	৫	০	২৫	১৪	৪৫	৩-৪
২৫	লেজেব গোডাব উপরের তিনটি তারাব প্রথমটি	ε	৫	০	৩১	৫৪	৯	২
২৬	ঐ তিনটির মাঝেবটি	ζ	৫	৮	৪	৫৬	১২	২
২৭	লেজের গোড়াব তৃতীয়টি	η	৫	১৯	১০	৫৪	৯	২

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	লেজেব নীচের আবো বেশী দূবেব তারা	12 Can.Ve.	৫	১৬	৫৫	৪০	১৫	৩
২	উপরেবটি থেকে বেশী অস্পষ্ট তাবাটি	8 Can.Ve.	৫	১০	৪	৪০	৩৯	৫
৩	যে সমস্ত তাবা ভালুকেব সামনের পাযেব এবং সিংহেব মাথার মধ্যবর্তী জাযগায আছে, তাদেব সবচেযে দক্ষিণেবটি	40 Lyn	৪	৪	১	১৭	৩৩	৪
৪	এর উত্তবেব তারাটি	38 Lyn	৪	২	৩৭	১৯	৪২	৪
৫	তিনটি অবশিষ্ট ও অস্পষ্ট তাবাব পবেবটি	10 Leo Min	৪	৫	৪০	২০	১৮	৬
৬	এব আগেবটি	IX 115	৪	৫	১০	২৩	৪৫	৪
৭	উপবেয় তারাব দূরবর্তী তাবাটি	VIII 245	৩	২৯	৩১	২০	১৫	৬
৮	সামনেব পা ও মিথুনের মধ্যবর্তী তারা	31 Lyn	৩	১৯	৩১	২৩	০	৬

ড্রাগন (تنین)

১	জিহ্বার উপরের তারা	μ	৭	১৭	৩১	৭৬	১৫	৫
২	মুখের ভিতরের তারা	ν	৮	২	৪০	৭৮	২১	৪
৩	চোখের উপরের তারা	β	৮	৩	১	৭৫	৩০	৩-৪
৪	চিবুকের তারা	ξ	৮	১৮	৫৫	৮০	০	৪-৩
৫	মাথার উপরের তারা	γ	৮	২১	৫৫	৭৫	০	২ ৩
৬	কাঁধের উপরের একই সরলরেখার তিনটি তারার উত্তরেরটি	b	৯	১৫	১০	৮২	৯	৫
৭	ঐ তারাগুলির দক্ষিণেরটি	c	৯	২৪	১০	৭৮	১৫	৫
৮	ঐ তারাগুলির মধ্যেরটি	d	৯	২০	৪০	৮০	৩৩	৫
৯	পরবর্তী বাঁকের চতুর্ভুজের পূর্বদিকের তারা	o	১০	১০	৪০	৮১	২৪	৫
১০	আগের অংশের দক্ষিণেরটি	π	১১	২৭	১	৮১	৪৫	৩-৪
১১	আগের অংশের উত্তরেরটি	δ	০	১০	১০	৮৩	০	৪
১২	পিছনের অংশের উত্তরেরটি	ε	০	২৫	১০	৭৯	৯	৪-৩
১৩	পিছনের অংশের দক্ষিণেরটি	ρ	০	১৩	৩১	৭৭	৩৬	৫-৪
১৪	পরবর্তী বাঁকে যে ত্রিভুজটি দেখা যায় তার দক্ষিণের তারাটি	σ	০	২৫	১৩	৮০	৩০	৫-৪
১৫	ত্রিভুজের অবশিষ্ট অংশের আগেরটি	υ	১	১২	৫৫	৮২	০	৫-৪
১৬	ঐ তারাগুলির পরেরটি	τ	১	১৬	৩৪	৮০	১৫	৫-৪

১৭	পূর্ববর্তী ত্রিভুজেব পবেব ত্রিভুজেব শেষেব তাবাটি	ψ	৩	৪	১৩	৮৪	১২	৪
১৮	ঐ ত্রিভুজেব অবশিষ্ট তাবা দুইটিব দক্ষিণেবটি	χ	২	৫	৫৫	৮৩	২৪	৪
১৯	অবশিষ্ট দুইটির উত্তবেবটি	φ	২	২	৩১	৮৪	৪২	৪
২০	ত্রিভুজটিব নিকটে যে দুইটি ছোট তাবা দেখা যায়, তাদেব পরেরটি	f	৪	১১	৪০	৮৭	১৫	৬
২১	ঐ দুইটি তাবাব আগেরটি	ω	৪	০	২৫	৮৬	৪৫	৬
২২	এর পবে এক সবল-বেখাব তিনটি তাবাব দক্ষিণেরটি	g	৫	২৮	১	৮১	৫৭	৫
২৩	ঐ তিনটিব মধ্যেবটি	h	৫	২৭	৩১	৮৪	০	৫
৪	ঐ তাবাগুলির উত্তরেবটি	ζ	৫	২৪	৩৪	৮৫	১৫	৩
২৫	পশ্চিমেব দিকের তাবাব পবের দুইটিব তাবাব উত্তবেবটি	η	৬	৬	৫৫	৭৮	৫৭	৩
২৬	ঐ দুইটি তাবাব দক্ষিণেবটি	θ	৬	৮	৩৭	৭৪	৩০	৪
২৭	লেজেব নিকটে বাঁকেব মধ্যেব পশ্চিমের দিকেব তাবার পরেরটি	ι	৫	২৭	৪৯	৭১	২৭	৩ ৪
২৮	ঐটি থেকে দূবেব দুইটি তারাব আগেবটি	i	৪	২৭	২৫	৬৫	২১	৫-৪
২৯	ঐ দুইটি তাবাব পবেরটি	κ	৫	০	৩৪	৬৬	২৭	৩-৪

৩০	লেজের নিকটবর্তী দুইটির পবেবটি	κ	৪	৮	৩৭	৬১	২৪	৩-৪
৩১	লেজেব গোড়াব অবশিষ্ট তাবাটি	λ	৪	২	২৫	৫৭	৯	৩-৪

সিফিয়াস (শেফালী قيفاوس)

১	ডান পাযেব উপবেব তারা	κ	১	২৪	৫৫	৭৫	৪৫	৫-৪
২	বাঁ পাযের উপরেব তারা	γ	১	২২	৩১	৬৪	৩০	৪
৩	ডান দিকেব কোমরেব নীচেব তাবা	β	০	২৭	৩৭	৭১	১৫	৪-৩
৪	ডান কাঁধের উপবেব তাবা	α	০	৪	৩৪	৬৮	৩৬	৩
৫	ডান কনুইযেব উপবেব তাবা	η	১১	২৬	২৫	৭১	৩৩	৪
৬	ঐ কনুইযেব নীচেব তারা	θ	১১	২৭	১০	৭৩	৫১	৪
৭	বুকেব উপরেব তাবা	ξ	০	১৬	১০	৬৫	৪৫	৫
৮	ডান বাহুব উপবেব তাবা	ι	০	২৫	৪	৬২	৩০	৪-৩
৯	শিরস্ত্রাণের তিনটি তাবাব দক্ষিণেবটি	ε	০	৫	৫৫	৬০	০	৫
১০	ঐ তিনটিব মধ্যেরটি	ζ	০	৭	১	৬১	১৫	৪
১১	ঐ তিনটিব উত্তরেবটি	λ	০	৮	৫৫	৬১	৪২	৬

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	শিরস্ত্রাণেব তাবাগুলির আগেবটি	μ	০	২	১০	৬৪	০	৫-৪
২	এদের পবেরটি	δ	০	৯	২৫	৫৯	৩০	৪ ৩

বুটিস (عوّا)

১	বাম কবতলেব তিনটি তাবাব আগেবটি	κ	৫	২১	৫৫	৫৮	৪৫	৫-৪
২	ঐ তিনটি তাবাব মধ্যেরটি	ι	৫	২৩	৪৩	৫৮	৫৪	৫-৪
৩	ঐ তিনটির শেষ তারাটি	θ	৫	২৫	৪	৬০	৩৩	৫-৪
৪	বাম কনুইয়ের উপবেব তাবা	λ	৫	২৮	৫৫	৫৪	৪৫	৫
৫	বাঁ কাধেব উপবের তাবা	γ	৬	৯	৫৫	৪৯	২৪	৩
৬	মাথাব উপবের তাবা	β	৬	১৬	২৫	৫৪	২৭	৪-৩
৭	ডান কাঁধেব উপবের তাবা	δ	৬	২৫	১৬	৪৯	০	৪-৩
৮	উপবেব তাবাটিব উত্তবেব তাবা, লাঠিব বাঁকের তারা	μ	৬	২৫	৪৬	৫৩	২৭	৪-৫
৯	আবো উত্তবে লাঠিব শেষেব তারা	$\frac{1}{2}(\nu^1+\nu^2)$	৬	২৫	৪	৫৭	১৫	৫-৪
১০	কাঁধের নীচের দুইটি তাবাব উত্তবেবটি	η Cor.Bor.	৬	২৭	৩৭	৪৬	২৭	৫-৪
১১	উপরের তাবা দুইটির দক্ষিণেবটি	o Cor.Bor.	৬	২৮	৩১	৪৫	৪৮	৫
১২	ডান হাতেব শেষেব তারা	c	৬	২৭	৫৫	৪১	৪৫	৫
১৩	কবজীর দুইটি তাবার আগেবটি	ψ	৬	২৬	৪৬	৪১	২১	৫
১৪	ঐ দুইটির পরেরটি	b	৬	২৬	৫৫	৪২	৪৮	৫
১৫	লাঠিব হাতলেব শেষের তাবা	ω	৬	২৭	২৮	৪৩	৪২	৫

১৬	কোমরেব তাবা ; টলেমী এই তাবাটিকে ডান উরুতে অবস্থিত বলেছেন	ε	৬	২০	৫৮	৪০	৪৮	৩
১৭	কোমবের দুইটি তারাব পরেরটি	σ	৬	১৬	১৬	৪২	১	৪
১৮	ঐ দুইটি তারাব আগেরটি	ρ	৬	১৪	৪০	৪২	৩	৪
১৯	ডান গোড়ালীব উপবেব তাবা	ζ	৬	২৫	১৯	২৮	০	৪-৩
২০	বাঁ পাযেব তিনটি তারার উত্তরেব তাবা	η	৬	১১	৪৩	২৮	০	৩
২১	ঐ তিনটি তাবার মধ্যেবটি	τ	৬	১০	১	২৬	৪৫	৪
২২	ঐ তিনটি তাবার দক্ষিণেরটি	ν	৬	১১	১৯	২৫	০	৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	দুই উরুব মধ্যেব তারা	α	৬	১৬	৩১	৩১	১৮	১

করোনা বোরিয়ালিস (উত্তর মুকুট اکلیل)

১	মুকুটেব উজ্জ্বলতম তাবা	α	৭	৪	৩৪	৪৪	৩০	২
২	এর আগেব তারাটি	β	৭	১	৪০	৪৬	২৬	৪
৩	আগেব তারাটিব আরো উত্তরের তাবা	θ	৭	১	১০	৪৮	২১	৪-৫
৪	উপরের তারাটির উত্তরেব তারা	π	৭	৩	৪০	৫০	৪৫	৬
৫	অন্ত অর্ধবৃত্তের দক্ষিণের উজ্জ্বল তাবা	γ	৭	৬	২৮	৪৪	২৭	৪

৬	এর পরের একটু উত্তরের তারা	δ	৭	৮	৪৬	৪৪	৪২	৪
৭	এর পরের আরো উত্তরের তারা	ε	৭	১০	৫৫	৪৬	০	৪
৮	ঐ অর্ধবৃত্তের সীমা নির্দেশক তারা	ι	৭	১১	৩১	৪৯	৩০	৪

হারকিউলিস (جاثي على ركبتيه)

১	মুখের উপরের তারা	α	৮	৭	৫৫	৩৭	৯	৩·৪
২	ডান কাঁধের উপরে বগলের নিকটের তারা	β	৭	২৩	৪০	৪২	৫৪	৩
৩	ডান বাহুর উপরের অংশের উপরের তারা	γ	৭	২০	৪৬	৩৯	২৭	৩-৪
৪	ডান কনুইয়ের উপরের তারা	κ	৭	১৭	৪৯	৩৭	০	৪-৫
৫	বাম কাঁধের উপরের তারা	δ	৮	৬	১৯	৪৭	৪৫	৩
৬	বাম বাহুর উপরের অংশের উপরের তারা	λ	৮	১২	৩৭	৪৯	১৫	৫
৭	বাম কনুইয়ের উপরের তারা	μ	৮	১৮	১৩	৫১	৪৮	৪
৮	বাম কব্জীর উপরের তিনটি তারার শেষ তারা	ο	৮	২৪	৪৬	৫২	২১	৪
৯	অবশিষ্ট দুইটির উত্তরেরটি	ν	৮	২২	২৫	৫৩	৩৯	৪
১০	ঐ তারাগুলির সর্ব-দক্ষিণেরটি	ξ	৮	২১	৫৫	৫২	৩৯	৪
১১	ডানদিকে অবস্থিত তারাটি	ζ	৭	২৪	১০	৫৩	৯	৩
১২	যে তারাটিকে বামদিকে দেখা যায়	ε	৮	০	২৫	৫৩	৩০	৪

১৩	বাম প্যছাব উপরে উত্তবেব তাবা	d	৮	১	৭	৫৫	৪৫	৫-৬
১৪	বাম উরুব আবস্তে যে তাবা দেখা যায়	c	৮	২	৪	৫৮	৩৬	৫-৬
১৫	বাম উরুব তিনটি তারার আগেবটি	π	৮	৪	৪৬	৫৯	৫১	৪-৩
১৬	তার পরেরটি	e	৮	৬	১	৬০	১৫	৫
১৭	তাব পবেবটি	ρ	৮	৭	৫২	৬০	১২	৪
১৮	বাম হাঁটুতে যে তারা দেখা যায়	θ	৮	২০	৪০	৬০	৫১	৪
১৯	বাঁ পাযের উপরের অংশের তাবা	ι	৮	২২	৫৫	৬৯	১৫	৪
২০	বাঁ পাযেব তিনটি তাবাব প্রথমটি	74	৮	৪	১৩	৭০	১২	৬
২১	ঐ তিনটিব মধ্যের তারা	x	৮	৫	৪৯	৭১	১৮	৬
২২	ঐ তাবাগুলিব শেষেবটি	y	৮	৯	১০	৭২	০	৬
২৩	ডান উরুব আবস্তে যে তাবা দেখা যায়	η	৭	২০	৫৫	৬০	৩৬	৪
২৪	ঐ উরুর সবচেয়ে উত্তরের তারা	σ	৭	১৫	৩১	৬৩	৯	৪
২৫	ডান হাঁটুতে যে তারা দেখা যায়	τ	৭	৬	৪৬	৬৫	৪৮	৪
২৬	ডান হাঁটুর নীচের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	f	৭	৪	৩৭	৬৩	৪৮	৪
২৭	ঐ দুইটি তারার উত্তরেরটি	υ	৭	১	২৫	৬৪	৫০	৪
২৮	ডান পায়ের উপরের তারা	X	৭	০	৫২	৬০	১৫	৫

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	ডান বাহুর তাবাব দক্ষিণের তারা	ω	৭	২৪	১৩	৩৫	১৫	৪

লাইরা (বীনা شلياق)

১	ভেগা নামে কচ্ছপের উপরে যে তারা দেখা যায়	α	৯	৮	১৯	৬২	০	১
২	পরের দুইটির উত্তরেবটি	$\frac{1}{2}(4\varepsilon^1+5\varepsilon^2)$	৯	১০	৫৫	৬২	৩০	৪·৩
৩	ঐ দুইটি তাবাব দক্ষিণেবটি	$\frac{1}{2}(6\zeta^1+7\zeta^2)$	৯	১১	১০	৬০	৪৫	৪·৩
৪	উপরেব দুইটি তাবার পবে যে তারাটি দুইটি শিং-এর গোড়ার মাঝ-খানে অবস্থিত	δ^2	৯	১৪	৫৫	৫৯	৪৮	৪
৫	কচ্ছপেব পূর্বের অংশে যে দুইটি তাবা দেখা যায় তাদেব উত্তরেরটি	η	৯	২৩	১০	৬০	৪৮	৪-৫
৬	ঐ দুইটি তারাব দক্ষিণেরটি	θ	৯	২৩	৩১	৫৯	৩০	৪-৫
৭	দণ্ডেব আগেব দুইটি তারার উত্তরেবটি	β	৯	১২	২৫	৫৬	২১	৩-৪
৮	ঐ দুইটি তাবাব দক্ষিণেবটি	ν^2	৯	১১	৫৫	৫৫	১৫	৪-৫
৯	দণ্ডেব পবের দুইটি তাবার উত্তবেবটি	γ	৯	১৫	৭	৫৫	২৪	৩
১০	ঐ দুইটি তারাব দক্ষিণেরটি	λ	৯	১৫	১০	৫৪	৩৬	৫-৬

সিগনাস (বক دجاجة)

১	যে তারাটি ঠোঁটে দেখা যায়	β	৯	২৪	২৫	৪৯	১২	৩-৪

২	এর পরের মুখের তারা	φ	৯	২৮	১০	৫০	৩৯	৩·৫
৩	গলার মাঝখানে যে তারাটি দেখা যায়	η	১০	৫	১৬	৫৪	৩০	৫
৪	বুকের উপরের তারা	γ	১০	১৮	২৮	৫৭	৫১	৩·২
৫	লেজের উজ্জ্বল তারা	α	১০	২৮	৪৬	৫৯	৪২	২
৬	ডান পাখার সংযোগ-স্থলের তারা	δ	১০	৯	৭	৬৪	৩০	৩
৭	ডান পাখার পালকের তিনটি তারার দক্ষিণেরটি	θ	১০	১২	২৫	৬৯	৪২	৪-৫
৮	ঐ তিনটি তারার মধ্যেরটি	ι	১০	১১	৫৫	৭১	৬	৪
৯	ঐ তারা তিনটির উত্তরেরটি	κ	১০	৮	৪০	৭৪	০	৪
১০	বাম পাখার সংযোগ-স্থলের তারা	ε	১০	২০	৪	৪৯	১৮	৩
১১	ঐ পাখার মাঝখানে উত্তরের তারাটি	λ	১০	২২	১৬	৫২	০	৪-৫
১২	বাম পাখার পালকের শেষের তারা	ζ	১০	২৫	৪৩	৪৩	০	৩
১৩	বাম পায়ের উপরের তারা	ν	১০	২৮	৩১	৫৫	০	৪
১৪	বাম হাঁটুর উপরের তারা	ξ	১১	৩	৩৪	৫৬	৪২	৪
১৫	ডান পায়ের দুইটি তারার আগেরটি	$\frac{1}{2}(30+31)$	১০	২১	২৮	৬৩	২৭	৪·৩
১৬	ঐ দুইটি তারার পরেরটি	o^2	১০	২২	৭	৬৪	২৪	৪

১৭	ডান হাঁটুব উপরে যে তারাটি দেখা যায় $\frac{1}{3}(\omega^1+\omega^2+\omega^3)$		১১	২	১০	৬৪	২১	৫

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	বাম পাখার নীচেব দুইটি তারাব দক্ষিণেবটি	κ	১১	০	৪৩	৫০	১২	৪·৩
২	ঐ দুইটি তারাব উত্তবেবটি	σ	১১	২	৪	৫১	২৭	৪

ক্যাসিওপিয়া (ذات الكرسى)

১	মুখের উপরেব তাবা	ζ	০·	২৮	২৮	৪৩	৪৫	৪·৩
২	বুকেব উপবেব তারা	α	১	০	২৫	৪৬	০	৩
৩	মাঝখানের উত্তরেব তাবা	η	১	৩	১০	৪৬	৩০	৪
	উরুব নিকট চেযাবেব উপরের তাবা	γ	১	৬	২৫	৪৮	৩০	৩·২
৫	হাঁটুর উপবে যে তারাটি দেখা যায	δ	১	১০	১৯	৪৪	৪৫	৩
৬	পাযের উপরেব তারা	ϵ	১	১৭	২৫	৪৬	৫১	৪
৭	পাযের গোড়ার তাবা	ι	১	২০	৪৬	৪৭	৩৬	৪·৫
৮	বাম বাহুব উপরেব অংশের যে তারা দেখা যায	θ, μ	১	৩	৩৭	৪৪	৩০	৪·৫
৯	বাম কনুইযের নীচের তাবা	ϕ	১	৭	৪৬	৪৪	৪৮	৫
১০	ডান বাহুর সামনের অংশের উপরেব তারা	σ'	০	২২	৭	৪৯	৩০	৬

১১	চেয়ারের পায়ের উপরে যে তারা দেখা যায়	κ	১	৫	২৫	৫১	৪২	৪-৫
১২	গদীর মাঝখানের তারা	β	০	২৮	১	৫০	৪৮	৩
১৩	গদির ধারের তারা	ρ	০	২৩	৪০	৫১	০	৬

পার্সিয়াস (برشاوش)

১	ডান হাতের শেষে অস্পষ্ট তারার দল	χ	১	১৬	১৯	৪০	০	নীহারিকা
২	ডান কনুইয়ের উপরের তারা	η	১	২১	২৫	৩৭	৯	৪
৩	ডান কাঁধের উপরের তারা	γ	১	২২	৩১	৩৪	৬	৩-৪
৪	বাম কাঁধের উপরের তারা	θ	১	১৭	৪	৩১	৩০	৪-৫
৫	মুখের উপরের তারা	τ	১	২০	৩৭	৩৪	০	৫
৬	দুই কাঁধের মাঝখানের তারা	ι	১	২১	৪০	৩০	৩৩	৪
৭	ডান দিকে যে উজ্জ্বল তারা দেখা যায়	α	১	২৫	৭	২৯	২১	২
৮	ঐ দিকের ঐ তারার নিকটের তিনটি তারার আগেরটি	σ	১	২৫	১৯	২৭	২৭	৪
৯	ঐ তিনটি তারার মাঝেরটি	ψ	১	২৬	৪৩	২৭	১৫	৪
১০	এর পরেরটি	δ	১	২৭	৫৫	২৬	৫৭	৩
১১	বাম কনুইয়ের উপরের তারা	κ	১	২০	৪৩	২৬	০	৪
১২	অ্যালগলের মাথার উজ্জ্বল তারা	β	১	১৮	৫৫	২২	০	২-৩

১৩	এর পরের তারা	ω	১	১৮	৪০	২০	৪৫	৪ ৫
১৪	উজ্জ্বল তারার আগেরটি	ρ	১	১৭	৩৭	২০	২১	৪·৩
১৫	ঐটির পরের আরো একটি তারা	π	১	১৬	৪০	২১	৯	৪



রেখাচিত্র ৫২ : উলুগ বেগের মতে পারসিয়াস মণ্ডলের চিত্র

১৬	ডান হাঁটুর মধ্যে যে তারাটি দেখা যায়	b	২	৪	৪৬	২৮	৫১	৪

১৭	হাঁটুব উপবে, এব আগেব তাবাটি	λ	২	২	১৬	২৮	৩৬	৪
১৮	উরুব উপবের দুই তাবাব আগেরটি	c	২	২	১০	২৫	৩৬	৪
১৯	ঐ উরুব উপবের পবেব তারাটি	μ	২	৩	৩৪	২৬	৩৯	৪
২০	ডান পাযের গোছাব মধ্যেব তাবা	d	২	৪	১০	২৪	৪৫	৫
২১	ডান হাঁটুব তাবা	e	২	৬	৭	১৮	৫৪	৫
২২	বাম উরুব তাবা	ν	১	২৬	২৮	২৯	৪৮	৪
২৩	বাম হাঁটুব উপবে যে তাবা দেখা যায	ε	১	২৮	৩১	১৮	৫৪	৩
২৪	বাঁ পাযের উপবের তাবা	ξ	১	২৭	৩৭	১৪	৩৩	৪
২৫	বাঁ গোড়ালীর উপবেব তাবা	o	১	২৪	২২	১১	৩০	৩-৪
২৬	এব পবে বাঁ পাযেব শেষেব তাবা	ζ	১	২৬	২৫	১০	৪৫	৩-৪

চিত্রের বাইবের অতিরিক্ত তারা

১	বাঁ হাঁটুর উপবেব তাবাটিব পূবেব তাবা	f	২	১	৪৯	১৮	৫৪	৫-৬
২	ডান হাঁটুর উপবেব তাবাব উত্তবেব তারা	14 cam	২	৪	৪৩	৩১	০	৫-৬
৩	আলগুলের মুখে যে সমস্ত তারা আছে, তাদের আগেবটি	p^1	১	১৪	২৮	২০	২৪	৫

অরিগা (ممسک الاعنّة)

১	মুখের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	δ	২	২২	২২	৩০	০	৪
২	মুখের উপরের উত্তরেরটি	ξ	২	২১	৫৫	৩১	০	৫
৩	বাঁ কাঁধের তারা, ক্যাপেলা	α	২	১৪	৪৩	২২	৪২	১
৪	ডান কাঁধের তারা	β	২	২৩	৫২	২১	৩০	২
৫	ডান কনুইয়ের উপরে যে তারা দেখা যায়	ν	২	২০	২৮	১৪	১৮	৫
৬	ডান কব্জীর উপরের তারা	θ	২	২২	৪৩	১৩	৩৩	৩
৭	বাঁ কনুইয়ের উপরের তারা	ε	২	১১	১	২০	৪০	৪
৮	বাঁ কব্জীর দুইটি তারার আগেরটি	η	২	১১	৩৪	১৮	৯	৪
৯	ঐ দুইটি তারার পরেরটি	ζ	২	১১	৫৫	১৮	৯	৫
১০	বাম হাঁটুর তারা	ι	২	৯	১০	১০	১২	৩-৪
১১	যে তারাটি ডান হাঁটু ও বৃষের শিং-এর সাধারণ তারা	$\gamma=\beta$ Tauri	২	১৫	১১	৫	১৫	২
১২	পায়ের পট্টির উপরের উত্তর দিকের তারা	χ	২	১৬	৪০	৮	৩০	৬
১৩	এর উত্তরে পাছার উপরের তারা	φ	২	১৬	২৫	১০	৫৪	৬

অফিয়াকাস (সর্পধারী حوا)

১	মুখের তারা	α	৮	১৫	১৩	৩৫	৫১	৩

২	ডান কাঁধের দুইটি তারাব আগেরটি	β	৮	১৭	১০	২৮	৯	৩-৪
৩	ঐ দুইটি তারার পবেবটি	γ	৮	১৮	৪৯	২৫	৩৬	৪
৪	বাঁ কাঁধেব দুইটি তারার আগেরটি	ι	৮	২	২৫	৩২	৩০	৪
৫	ঐ দুইটির তাবাব পরেরটি	κ	৮	৩	৪০	৩২	০	৪-৩
৬	বাঁ কনুইযের উপবেব তারা	λ	৭	২৮	১৩	২৩	৪৮	৪
৭	বাঁ হাতেব দুইটি তারাব আগেবটি	δ	৭	২৪	২৫	১৭	১৫	৩
৮	ঐ দুইটি তাবাব পরেবটি	ε	৭	২৫	৪৩	১৬	২৪	৩
৯	ডান কনুইযেব উপরের তাবা	μ	৮	১৬	১৬	১৪	৪৫	৫-৪
১০	ডান হাতেব দুইটি তারাব আগেরটি	ν	৮	২২	১৯	১৩	১৫	৪-৩
১১	ঐ দুইটি তাবার পরেরটি	τ	৮	২৩	৭	১৪	৩৬	৫
১২	ডান হাঁটুর উপরের তাবা	η	৮	১০	৩৭	৬	৪৫	৩
১৩	ডান পাযেব তারা	ξ	৮	১৩	৪	১	৪৮	৪-৫
১৪	ডান পাযের পাতার চারটি তারার আগেরটি	A	৮	১২	৪০	—৩	৯	৪-৫
১৫	তাব পবেবটি	θ	৮	১৩	৪৩	২	৯	৫-৬
১৬	তাবও পবেরটি	b	৮	১৪	১৯	০	১৮	৪-৫
১৭	ঐ চাবটি তাবাব অবশিষ্ট তাবাটি ; সবচেযে শেষের তাবা	c	৮	১৪	৫৫	—০	১২	৫

১৮	তার পরেব পাযের গোড়ালীব তারা	2 Sag ?	৮	১৬	১৯	১	৩০	৫-৬
১৯	বাঁ হাঁটুর তারা	ζ	৮	২	১০	১১	৪৫	৩
২০	বাঁ পাযেব একই সরল-বেখায তিনটি তাবার উত্তবেরটি	φ	৮	১	৪	৫	৩০	৫
২১	ঐ তিনটি তারার মধ্যেবটি	χ	৮	০	১৬	৩	১৮	৫
২২	ঐ তিনটি তারাব দক্ষিণেরটি	ψ	৭	২৯	৪৬	১	৪৫	৫
২৩	বাঁ পাযেব গোড়ালীব উপরে যে তাবা দেখা যায়	ω	৮	২	১৬	০	৩৯	৫
২৪	বাঁ পাযের নীচে পায়েব তলাব তারা	ρ	৮	১	৭	—০	৪৫	৫

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	ডান কাঁধেব পূর্বে একই সরল বেখায তিনটি তাবাব উত্তবেবটি	n	৮	১২	৪০	২৮	৯	৪
২	ঐ তিনটি তাবার মধ্যেরটি	o	৮	২২	৩৭	২৬	১৫	৪
৩	ঐ তিনটি তাবাব দক্ষিণেরটি	k	৮	২৩	৪	২৪	৪৫	৪
৪	ঐ তিনটি তাবার পবে, মধ্যেবটির উপরে	p	৮	২৪	১০	২৬	০	৪
৫	আবো উত্তরের একক তারাটি	s	৮	২৫	১	৩২	২১	৪

সার্পেন্‌স্‌ (সর্প (حيّة)

১	চোয়ালের প্রান্তের তারা; মুখের চারটি তারা দিয়ে যে চতুর্ভুজ গঠিত হয়, তার অংশ	ι	৭	৯	১	৩৭	৪৫	৪
২	নাকের ছিদ্রের তারা	ρ	৭	১১	৪০	৩৯	৪২	৪·৫
৩	কপাল ও কানের মাঝখানের তারা	γ	৭	১৩	৩৪	৩৫	১২	৩-৪
৪	গলার আরম্ভের তারা	β	৭	১২	১৩	৩৪	১৫	৩-৪
৫	মুখের ভিতরে চতুর্ভুজের মধ্যের তারা	κ	৭	১১	২৫	৩৭	০	৫
৬	মুখের পাশের উত্তরের তারা	π	৭	১৩	৭	৪২	০	৪·৫
৭	ঘাড়ের প্রথম বাঁকের কাছের তারাটি	δ	৭	১১	২৫	২৮	৪৫	৩-৪
৮	মাথার পিছনের পরপর তিনটি তারার উত্তরেরটি	λ	৭	১৪	২৮	২৬	৩৯	৪
৯	ঐ তিনটির মাঝেরটি	α	৭	১৪	২৫	২৫	৪৮	৩
১০	ঐ তিনটির দক্ষিণেরটি	ε	৭	১৬	৪০	২৪	২৭	৩-৪
১১	পরবর্তী বাঁকের অফিয়াকাসে বাম হাতের আগের তারাটি	μ	৭	১৮	২৫	১৬	১৫	৪
১২	ঐ হাতে অবস্থিত দুইটি তারার পরের তারা	ν Oph	৭	২৮	৪০	১৩	১২	৫
১৩	অফিয়াকাসের ডান উরুর পিছনের অংশের নিকটের তারা	ν	৮	১২	২৫	১০	২১	৪

১৪	এর পরের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	ξ	৮	১৬	৪০	৮	৬	৪-৩
১৫	ঐ দুইটি তারার উত্তরেরটি	o	৮	১৭	৪	১০	৩৬	৪
১৬	লেজের বাঁকের উপরে ডান হাতের নিকটের তারা	ζ	৮	২৩	২২	১৯	২১	৪
১৭	এর পরের লেজের তারা	η	৮	২৮	৩৪	২০	১৮	৪-৩
১৮	লেজের শেষের তারা	θ	৯	৮	৭	২৬	৫৪	৪

স্যাজিটা (বাণ سهم)

১	তীরের আগের একক তারা	γ	৯	২৯	৪৯	৩৯	১৫	৪
২	তীরের দণ্ডের তিনটি তারার শেষেরটি	ζ	৯	২৭	৩৪	৩৯	৯	৬
৩	ঐ তারাগুলির মাঝেরটি	δ	৯	২৬	২৫	৩৮	৪৫	৫
৪	ঐ তিনটি তারার প্রথমটি	α	৯	২৪	৪০	৩৮	৩০	৫
৫	পালকের প্রান্তের তারা	β	৯	২৪	১	৩৮	১২	৫

একিলা (ঈগল عقاب)

১	মুখের মাঝখানের তারা	τ	৯	২৭	৩১	২৬	৫৪	৬
২	এর আগের, ঘাড়ের উপরের তারা	β	৯	২৫	২৫	২৬	৫৫	৩-৪
৩	কাঁধের মাঝখানের উজ্জ্বল তারা	α	৯	২৪	১০	২৯	১৫	২-১
৪	উত্তরের অংশের নিকটের তারা	ξ	৯	২৪	৫২	২৮	৩৩	৫

৫	বাম কাঁধের দুইটি তারার আগেরটি	γ	৯	২৩	১৩	৩১	০	৩
৬	ঐ দুইটির পরেরটি	φ	৯	২৬	২৫	৩১	৯	৬
৭	ডান কাঁধের দুইটি তারার আগেরটি	ι	৯	১৯	৪	২৮	৩০	৬
৮	ঐ দুইটি তারার পরেরটি	σ	৯	১৯	৫৫	২৬	৩০	৬
৯	ঈগলের লেজের তারা, উপরের দুইটি তারার সাথে এক সরলরেখায় অবস্থিত	ζ	৯	২১	৩১	৩৬	১৬	৩

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	ঈগলের মুখের দক্ষিণের দুইটি তারার আগেরটি	η	৯	২৩	১	২১	১২	৩-৪
২	ঐ দুইটির পরেরটি	θ	৯	২৭	৩১	১৮	২৭	৩
৩	ঈগলের ডান কাঁধের দক্ষিণ-পশ্চিমের তারা	δ	৯	১৬	১৬	২৪	২৭	৩-৪
৪	ঐ তারাটির দক্ষিণের তারা	ι	৯	১৭	৪৯	১৯	৫১	৪-৫
৫	ঐ তারার আরো দক্ষিণের তারা	κ	৯	১৯	১	১৩	৩৯	৫
৬	এইগুলির আগের তারা	λ	৯	১০	১৯	১৬	৩০	৩-৪

ডেলফিনাস (ডলফিন دلفين)

১	লেজের উপরের তিনটি তারার আগেরটি	ε	১০	৬	২২	২৯	১২	৪-৩
২	অবশিষ্ট দুইটি তারার উত্তরেরটি	ι	১০	৮	৭	২৮	৪৫	৬

৩	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	κ	১০	৭	৪৯	২৭	৩৬	৬
৪	বৃষসের সামনের অংশে যে দুইটি তারা দেখা যায় তাদের দক্ষিণেরটি	β	১০	৮	১৬	৩১	৪৫	৩-৪
৫	সামনের অংশের উত্তরেরটি	α	১০	৯	৪৯	৩২	৫১	৩-৪
৬	চতুর্ভুজের পিছনের অংশের দক্ষিণেরটি	δ	১০	১০	৫৫	৩১	৫১	৩-৪
৭	পিছনের অংশের উত্তরেরটি	γ	১০	১১	৫২	৩২	৫৪	৩-৪
৮	লেজ এবং রম্বসের মাঝের তিনটি তারার দক্ষিণেরটি	η	১০	৭	১০	৩১	২১	৬
৯	অবশিষ্ট দুইটির আগেরটি	ζ	১০	৭	১৯	৩২	১২	৬
১০	ঐ দুইটি তারা অবশিষ্ট পরের তারাটি	θ	১০	৮	৩১	৩০	৩০	৬

পেগাসাস (فرس اعظم)

১	নাভির তারা ; এই তারাটি এই মণ্ডল এবং এনড্রোমিডার মুখের সাধারণ তারা	α And.	০	৬	২৮	২৫	২১	২-৩
২	কোমরের উপরের এবং পাখার সীমার তারা	γ	০	১	২২	১২	২৪	২-৩
৩	ডান কাঁধের উপরে এবং পায়ের আবর্তে	β	১১	২১	৩৭	৩০	৫১	২-৩
৪	কাঁধের দুইটি হাড় এবং পাখার মাঝখানে	α	১১	১৬	৫৫	১৯	০	২-৩

৫	পাখার নীচে শরীরের দুইটি তারার উত্তরেরটি	τ	১১	২৩	৫৫	২৪	৪৮	৪
৬	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	ν	১১	২৫	১	২৪	১৫	৩
৭	ডান হাঁটুর উপরের দুইটি তারার উত্তরেরটি	η	১১	১৮	৭	৩৪	৪৫	৩
৮	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	o	১১	১৭	২৫	৩৪	৯	৫
৯	বুকের উপরের দুইটি তারার আগেরটি	λ	১১	১৬	১০	২৮	৩৯	৪-৩
১০	ঐ দুইটি তারার পরেরটি	μ	১১	১৭	১৩	২৯	০	৪-৩
১১	কাঁধের উপরের দুইটি তারার আগেরটি	ζ	১১	৮	২৫	১৭	১৫	৩-৪
১২	ঐ দুইটি তারার পরেরটি	ξ	১১	১১	১৩	১৮	০	৪-৫
১৩	কেশরের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	ρ	১১	১১	৫৫	১৪	১৫	৫-৬
১৪	ঐ দুইটি তারার উত্তরেরটি	σ	১১	১০	৫৮	১৫	২১	৫-৬
১৫	মুখের দুইটি তারার উত্তরেরটি	θ	১০	২৯	২৫	১৫	৪৮	৩-৪
১৬	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	ν	১০	২৮	১৩	১৫	১৫	৫-৬
১৭	ঠোঁটের উপরের তারা	ϵ	১০	২৪	২৮	২২	০	৩
১৮	ডান পায়ের গিরার তারা	π	১১	১১	৩৪	৪১	০	৪
১৯	বাম হাঁটুর তারা	ι	১১	৬	১৯	৩৪	৯	৪
২০	বাম পায়ের গিরার তারা	κ	১১	১	৩১	৩৬	২৭	৪

এনড্রোমিডা (مرأة مسلسلة)

১	কাঁধের মাঝের তারা	δ	০	১৪	২৮	২৪	০	৩-৪

২	ডান কাঁধের উপরের তারা	π	০	১৫	৪৬	২৬	৫৪	৪
৩	বাম কাঁধের উপরের তারা	ε	০	১৩	৫৫	২২	২৪	৪
৪	ডান বাহুর উপরের অংশের তিনটি তারার দক্ষিণেরটি	σ	০	১৩	২২	৩০	৪৫	৪-৫
৫	ঐ তিনটির উত্তরেরটি	θ	০	১৩	৩৭	৩২	৩০	৪-৫
৬	ঐ তারাগুলির মাঝেরটি	ρ	০	১৪	৪০	৩১	৩০	৫-৬
৭	ডান হাতের উপরের তিনটি তারার দক্ষিণেরটি	ι	০	৮	৩৪	৪১	০	৪-৩
৮	ঐ তিনটির মাঝেরটি	κ	০	৯	৩১	৪১	৪২	৪-৩
৯	ঐ তারাগুলির উত্তরেরটি	λ	০	১০	৫২	৪৩	২৪	৪-৩
১০	বাম বাহুর উপরের অংশের তারা	ζ	০	১৩	২৫	১৭	১৮	৪-৫
১১	বাম কনুইয়ের উপরের তারা	η	০	১৫	১০	১৫	৩৬	৫-৪
১২	কোমরের উপরের তিনটি তারার দক্ষিণেরটি	β	০	২৩	১৩	২৫	৩৬	২-৩
১৩	ঐ তিনটির মাঝেরটি	μ	০	২১	৫৮	২৯	৩০	৪
১৪	ঐ তিনটির উত্তরেরটি	ν	০	২১	১	৩২	৩০	৪-৫
১৫	বাম পায়ের পাতার উপরের তারা	γ	১	৬	৩১	২৭	৩৬	৩
১৬	ডান পায়ের উপরের তারা	ρ Persei	১	৬	৫৫	৩৬	৩০	৪
১৭	ঐ তারাটির দক্ষিণের তারা	ν Persei	১	৪	৫৫	৩৫	০	৪-৩
১৮	বাম পাছার উপরের দুইটি তারার উত্তরেরটি	ν	১	১	১১	২৮	৩৯	৪-৩

১৯	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	κ	১	১	২৮	২৭	৩৬	৪
২০	ডান হাঁটুর উপরের তারা	φ	০	২৯	৫৫	৩৬	০	৫
২১	পোষাকের ধারের দুইটি তারার উত্তরেরটি	A	১	২	৪০	৩৪	১৫	৫-৬
২২	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	X	১	২	৫২	৩১	০	৫-৬
২৩	ডান হাতের তিনটি তারার বাইরের তারা	o	০	০	৪০	৪৩	৪২	৪-৩

ট্রাইঙ্গুলাম (ত্রিকোণ مثلث)

১	ত্রিভুজের শীর্ষের তারা	α	০	২৯	৪০	১৬	৬	৩
২	ভূমির তিনটি তারার আগেরটি	β	১	৫	১০	২০	১৫	৩
৩	ঐ তিনটির মাঝেরটি	δ	১	৬	৭	১৯	১২	৫-৬
৪	ঐ তিনটির শেষেরটি	γ	১	৬	৩৭	১৮	১২	৩-৪

রাশিচক্রের মণ্ডলসমূহ

এরিস (মেষ حمل)

১	শিংয়ের উপরের দুইটি তারার আগেরটি	γ	০	২৬	১৩	৬	৩৬	৩
২	ঐ দুইটি তারার পরেরটি	β	০	২৭	৭	৭	৫১	৩
৩	নাকের উপরের দুইটি তারার উত্তরেরটি	η	১	০	২৮	৭	৯	৫-৬
৪	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	θ	১	০	৫৮	৫	৩৬	৫-৬
৫	গলার উপরের তারা	ι	০	২৬	১	৫	৬	৫
৬	কোমরের তারা	ν	১	৬	৫৫	৫	৪৫	৬
৭	লেজের গোড়ার তারা	ε	১	১০	৩১	৩	১২	৫

৮	লেজের তিনটি তারার আগেরটি	δ	১	১৩	৫৫	১	৩৯	৪
৯	ঐ তিনটির মাঝেরটি	ζ	১	১৪	৫৫	২	৩০	৪
১০	ঐ তিনটির পরেরটি	τ^2	১	১৬	৩১	১	৩৯	৪
১১	পিছনের উরুর তারা	$\frac{1}{2}(45\rho^2+44\rho^3)$	১	৮	৩৪	১	১২	৫
১২	পাছার উপরের তারা	σ	১	৭	৪০	−১	২৪	৫
১৩	পিছনের পায়ের প্যাতার তারা	μ Ceti	১	৪	৫৫	−৫	০	৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	মুখের উপরের তারা, যেটি হিপারকাস নাকের উপরে বসিয়েছিলেন	α	১	০	৪৩	৯	৩০	৩·২
২	কোমরের উপরের চারটি তারার পরের এবং উজ্জ্বলটি	c	১	১১	১	১০	০	৪
৩	অবশিষ্ট তিনটি অস্পষ্ট তারার উত্তরেরটি	39	১	১১	২২	১২	০	৫
৪	ঐ তিনটির মাঝেরটি	35	১	৯	৪০	১০	৫৪	৫
৫	ঐ তিনটির দক্ষিণেরটি	33	১	৮	৫৫	১০	৩৬	৫·৬

টরাস (বৃষ ثور)

১	বাঁকের চারটি তারার উত্তরেরটি	f	১	১৬	১০	−৬	২৪	৪
২	ঐ তারাটির নিকটের তারাটি	s	১	১৫	৪৯	৭	৪২	৪
৩	ঐ শেষের তারাটির আরো নিকটেরটি	ξ	১	১৪	৩৪	৮	৫৪	৪·৩

৪	ঐ চারটির দক্ষিণেরটি	o	১	১৩	৫২	৯	৩৯	৪-৩
৫	এর পরের তারা, ডান কাঁধের হাড়ের উপরের তারা	e	১	১৯	৫৫	৯	০	৬
৬	বুকের তারা	λ	১	২৩	৪৩	৮	২১	৩
৭	ডান হাঁটুর উপরের তারা	μ	১	২৬	২৫	১২	৪২	৪
৮	ডান পায়ের গিরার তারা	ν	১	২৩	২২	১৪	৪৫	৪-৩
৯	বাম হাঁটুর উপরের তারা	c^1	২	১	৪০	৯	৪২	৪
১০	সামনের বাম পায়ের তারা	d	২	১	১৩	১২	১৫	৪
১১	মুখের পাঁচটি তারার ভিতরের নাকের ভিতরের তারা	γ	১	২৮	৫৫	৬	৯	৩-৪
১২	ঐটি ও উত্তরের চোখের মাঝখানের তারা	δ	১	২৯	৪৩	৪	৯	৩-৪
১৩	দক্ষিণের চোখ ও ঐটির মাঝখানের তারা		২	১	৪	৬	১৫	৩-৪
১৪	দক্ষিণ চোখের লাল উজ্জ্বল তারা, আল দাবরান	α	২	২	৩১	৫	১৫	১
১৫	উত্তর চোখের তারা	ε	২	১	১৩	২	৫৪	৩-৪
১৬	দক্ষিণ শিং ও কানের গোড়ার তারা	ι	২	৬	২৫	৪	২৭	৫
১৭	দক্ষিণ শিংএর দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	m	২	৯	১৬	৪	৩৩	৫
১৮	ঐ দুইটি তারার উত্তরেরটি	l	২	৯	২৫	৩	০	৫
১৯	দক্ষিণ শিং-এর প্রান্তের তারা	ζ	২	১৭	১	—২	৪২	৩

২০	উত্তর শিং-এব গোড়ার তারা	τ	২	৪	৩৪	০	৩০	৪
২১	উত্তব কানের নিকটেব দুইটি তারার উত্তরেবটি	υ^1	২	০	৪৯	১	০	৪
২২	ঐ দুইটিব দক্ষিণেরটি	κ	২	০	২৫	০	৩৯	৪
২৩	গলাব উপরে ছোট দুইটি তারাব আগেরটি	A^1	১	২৬	৪	০	৩৯	৫
২৪	ঐ দুইটিব পরেবটি	ω^2	১	২৯	৪	—১	০	৬
২৫	গলার চতুর্ভুজেব সামনেব অংশের দুইটি তারাব দক্ষিণেরটি	p	১	২৭	৪৩	৪	৪৮	৫
২৬	সামনের অংশের দুইটি তারাব উত্তবেরটি	41	১	২৭	১৯	৬	১৮	৫-৬
২৭	পিছনেব অংশের দুইটি তাবাব দক্ষিণেরটি	χ	২	০	৪৩	৩	৩০	৫
২৮	পিছনের অংশের দুইটি তারাব উত্তবেবটি	φ	২	০	২৫	৫	৩৬	৫
২৯	সুবাইযাব সামনেব অংশেব উত্তব সীমাব তাবা	Taygeta	১	২২	১	৩	৪৫	৫
৩০	সুবাইযাব সামনেব অংশেব দক্ষিণ সীমাবটি	Merope	১	২২	১৬	৩	৩০	৫
৩১	সুবাইযাব পবেব প্রান্তেব তাবা	Atlas	১	২২	৪৯	৩	৪৫	৫
৩২	সুরাইযাব উত্তবেব অংশেব বাইরেব একটি ছোট তারা	170	১	২২	৫৮	৪	৯	৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	ডাইনের পা এবং গোড়ালীর নীচের তারা	10	১	১৪	৪৩	—১৯	৩০	৪
২	দক্ষিণ শিং-এর উপরের তিনটি তারার আগেরটি	*i*	২	৯	১০	—১	১৫	৫
৩	ঐ তিনটি তারার মাঝেরটি	n	২	১২	৪৩	—১	৯	৫
৪	ঐ তারাগুলির শেষেরটি	*o*	২	১৪	৪৬	১	৩০	৫
৫	দক্ষিণ শিং-এর প্রান্তের নীচের দুইটি তারার উত্তরেরটি	126	২	১৭	৩৪	৬	৫৪	৫
৬	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	129	২	১৮	৪৯	—৮	০	৬-৭
৭	উত্তর শিং-এর নীচের পাঁচটি তারার আগেরটি	121	২	১৬	১৬	১	১৫	৫
৮	এর পরেরটি	125	২	১৭	৪৩	২	৩০	৫
৯	এরও পরেরটি	132	২	১৯	৫৭	১	৪৮	৫
১০	এর পরের অবশিষ্ট দুইটির উত্তরেরটি	136	২	২০	১৩	৩	৪২	৫
১১	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	139	২	২১	২৮	২	২০	৫

জেমিনি (মিথুন (توأمين)

১	সামনের জনের মুখের তারা	α	৩	১২	৪৩	৯	৫৪	২
২	পিছনের জনের মুখের লাল মত তারা	β	৩	১৫	৫৫	৬	৩০	২

৩	সামনের জনের বাহুব সম্মুখেব তারা	θ	৩	৩	২৫	১০	৪৫	৪-৩
৪	ঐ বাহুর উপরের অংশের তাবা	τ	৩	৭	৫৫	৭	৩০	৪
৫	দুই কাঁধেব মাঝখানের তারা	ι	৩	১১	২৮	৫	৩০	৪
৬	ঐ জনেব ডান কাঁধের উপরেব তাবা	υ	৩	১৩	৩৯	৪	৫৪	৪
৭	পিছনেব জনেব কাঁধের তাবা	κ	৩	১৬	১	২	৪৫	৪ ৩
৮	সামনেব জনেব ডান দিকের তাবা	A	৩	১১	১	২	৪৫	৫-৬
৯	পিছনের জনেব বাম দিকের তারা	$\frac{1}{2}(64b^1+65b^2)$	৩	১১	৫৫	৫	৪৫	৫·৪
১০	সামনের জনেব বাম হাঁটুব তাবা	ε	৩	২	১৩	১	৫১	৩ ৪
১১	পিছনের জনেব বাম তলপেটের তাবা	δ	৩	১০	৪৩	−০	২১	৩
১২	পিছনের জনের বাম হাঁটুর উপবেব তাবা	ζ	৩	৬	৫৮	২	১৮	৪-৩
১৩	ঐ জনেব ডান হ'াটুর বাঁকের উ'পরের তারা	λ	৩	১০	৫৮	৬	০	৩-৪
১৪	সামনের জনের প্রথম পাযেব পাতার তাবা	η	২	২৫	৫৫	১	৩০	৪-৩
১৫	ঐ পাযেব পাতার পবেব তাবা	μ	২	২৭	৩৯	১	১৫	৪-৩
১৬	সামনের জনের ডান পাযেব পাতার তারা	ν	২	২৯	২৫	৩	২৪	৩ ৪
১৭	পিছনের জনেব বাম পাযের পাতার তারা	γ	৩	১	৩৯	৭	১২	৩

১৮	পিছনের জনের ডান পায়ের পাতার তারা	ξ	৩	৩	৩১	—১০	১২	৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	সামনের জনের প্রথম পায়ের পাতার আগের তারা	h	২	২৩	১৩	—০	৪৫	৪-৫
২	সামনের হাঁটুর আগের উজ্জ্বল তারা	κ Aur	২	২৫	৫৫	৬	০	৪-৫
৩	পিছনের জনের বাম হাঁটুর আগের তারা	d	৩	৪	৪	—২	০	৫-৬
৪	পিছনের জনের বাম হাতের পরে একই সরলরেখায় তিনটি তারার উত্তরেরটি	85	৩	১৯	১	—১	২০	৫-৬
৫	ঐ তিনটির মাঝেরটি	g	৩	১৭	১৩	৩	০	৫-৬
৬	ঐ তারাগুলির দক্ষিণেরটি	f	৩	১৫	৪৬	৪	১৫	৫-৬
৭	উল্লিখিত তারা তিনটির পরের উজ্জ্বল তারা	ζ Canc	৩	২১	১০	—২	৪৫	৪-৫

ক্যান্সার (কর্কট سرطان)

১	অস্পষ্ট স্তূপের বুকের ভিতরে	ε	৩	২৯	৪৬	১	০	৪
২	মেঘের পাশের চতুর্ভুজের আগের দুইটি তারার উত্তরেরটি	η	৩	২৭	২৫	১	২১	৪-৫
৩	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	θ	৩	২৭	৪০	—১	১৫	৪-৫
৪	চতুর্ভুজের পরের দুইটি তারার উত্তরেরটি	γ	৩	২৯	৩৪	৩	৬	৪
৫	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	δ	৪	০	৪৩	—০	১৫	৪

৬	দক্ষিণ চিমটার তারা	α	৪	৫	৪০	−৫	২১	৪
৭	উত্তর চিমটার তারা	ι	৩	২৮	৭	১০	১৫	৪
৮	পিছনের উত্তর থাবার তারা	μ	৩	২৩	৩৭	০	৫৪	৫·৬
৯	পিছনের দক্ষিণ থাবার তারা	β	৩	২৬	৪৩	−১০	৩০	৩·৮

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	দক্ষিণ চিমটার জোড়ার উপরের তারা	$\frac{1}{2}(62o^1+63o^2)$	৪	৪	১০	−২	১৫	৪·৫
২	দক্ষিণ চিমটার শেষ প্রান্তের তারা	κ	৪	৭	৫৫	−৫	৪৮	৪·৫
৩	মেঘের উপরের দুইটি তারার আগেরটি	ν	৪	২	২৯	৭	০	৫
৪	ঐ দুইটি তারার পরেরটি	ξ	৪	৪	৫৫	৫	০	৫

লিও (সিংহ اسد)

১	নাকের আগার তারা	κ	৪	৮	১০	১০	৯	৪
২	মুখের ভিতরের তারা	λ	৪	১০	১০	৮	০	৪
৩	মুখের দুইটি তারার উত্তরেরটি	μ	৪	১৩	২৫	১২	২১	৩·৪
৪	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	ε	৪	১৩	৭	৯	৪৫	৩·২
৫	গলার উপরের তিনটি তারার উত্তরেরটি	ζ	৪	২০	২৫	১১	৩৩	৩
৬	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	γ	৪	২১	৫৮	৯	০	২
৭	ঐ তারাগুলির দক্ষিণেরটি	η	৪	২০	১৯	৪	৪৮	৩

৮	বুকেব উপরেব তারা	α	৪	২২	১০	০	৯	৯
৯	বুকের উপবের ঐ তাবাটির দক্ষিণের তারা	A	৪	২২	২২	—১	২৭	৪
১০	বুকেব উপবের তারাটির একটু আগেব তারা	ν	৪	১৯	৫৫	—০	১২	৫
১১	ডান হাঁটুব উপরেব তাবা	φ	৪	১৬	৫৫	-০	৬	৬
১২	সামনেব ডান থাবাধ তারা	ξ	৪	১৪	২২	—৩	৯	৬
১৩	সামনেব বাম থাবার তারা	o	৪	১৬	২২	৩	৫৭	৪-৩
১৪	বাম হাঁটুব তারা	π	৪	২১	৪০	৪	০	৪
১৫	বাম বগলের তারা	ρ	৪	২৮	৩৭	—০	৯	৪
১৬	পেটের উপরের তিনটি তারার আগেরটি	ι	৪	২৬	২৫	৪	১৫	৬
১৭	অবশিষ্ট পরের দুইটির উত্তবেরটি	κ	৫	০	১	৫	৩৬	৬
১৮	ঐ তাবাগুলিব দক্ষিণেরটি	λ	৫	২	১৯	২	৬	৬
১৯	কোমরেব দুইটি তাবাব আগেরটি	b	৫	১	১৯	১০	৬	৫-৪
২০	ঐ দুইটির পবেরটি	δ	৫	৩	২৮	১৪	৯	২
২১	পাছার দুইটি তারার উত্তবেবটি	72	৫	২	৪০	১৬	৪৫	৫
২২	ঐ দুইটিব দক্ষিণেবটি	θ	৫	৫	৪০	৯	২৪	৩
২৩	পিছনেব উরুব উপরের তাবা	ι	৫	৯	৫৮	৬	৯	৩-৪
২৪	পিছনের জোড়ার উপরের তারা	σ	৫	১১	১৬	১	১৫	৪-৩

২৫	ঐটির দক্ষিণে পায়ের তারা	p^5	৫	১১	৩১	−৫	০	৪
২৬	পিছনের থাবার উপরের তারা	ν	৫	১৭	৪	−৩	১৫	৫
২৭	লেজের প্রান্তের তারা	β	৫	১৩	৪৯	১২	০	১

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	পিঠের উপরের দুইটি তারার আগেরটি	41Leo.Min.	৪	২৫	৪০	১৪	০	৫
২	ঐ দুইটির পরেরটি	54	৪	২৭	৫৫	১৬	৩০	৫
৩	তলপেটের নীচের তিনটি তারার উত্তরেরটি	χ	৫	৬	৪৩	১	১৫	৪·৫
৪	ঐ তিনটি তারার মধ্যেরটি	c	৫	৬	১৯	−০	৩০	৫
৫	ঐ তারাগুলির দক্ষিণেরটি	d	৫	৭	১৬	−৩	০	৫
৬	সিংহ এবং বৃহৎ ভল্লুকের মাঝখানের নীহারিকা-স্তূপের উত্তর অংশ	15 Com.Ber	৫	১৬	৪	২৮	১২	৫
৭	ঐ নীহারিকার দক্ষিণের দুইটি অতিরিক্ত তারার আগেরটি	h	৫	১৬	২৫	২৩	৩০	৫
৮	পরের তারাটি, আইভি পাতার আকারের	k	৫	২০	২৮	২৪	০	৫

ভার্জো (কন্যা عذرا)

১	মাথার শীর্ষের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	ν	৫	১৬	৩১	৪	৩৯	৫
২	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	ξ	৫	১৬	২৫	৬	১৫	৫

৩	এর পবে মুখেব দুইটি তাবার উত্তরেবটি	o	৫	২০	৩১	৮	২৪	৫
৪	ঐ তারাগুলিব দক্ষিণেরটি	π	৫	২০	১৯	৬	৯	৫
৫	বাম ডানা ও দক্ষিণেব সীমাব তাবা	β	৫	১৮	৩১	০	১০	৩
৬	বাম ডানাব চাবটি তাবাব আগেবটি	η	৫	২৭	৭	১	৩০	৩
৭	এব পবেবটি	γ	৬	২	১৩	২	৫৪	৩
৮	এবও পরেবটি	46	৬	৬	২২	৩	০	৬
৯	ঐ চাবটিব শেষ তাবা	θ	৬	১০	২৫	১	৩৬	৪
১০	কোমরেব নীচেব ডান পাশেব তাবা	δ	৬	৪	১	৮	৪৫	৩
১১	ডান ডানাব তিনটি তারাব আগেবটি	ρ	৫	২৭	৪৬	১৩	৩০	৫-৬
১২	অবশিষ্ট দুইটি তারাব দক্ষিণেবটি	d^2	৬	০	১	১১	১৮	৬
১৩	ঐ দুইটিব উত্তবেবটি	ϵ	৬	১	১৯	১৬	১৫	৩
১৪	বাম হাতেব তাবা, শস্যগুচ্ছ	α	৬	১৬	১০	−২	৯	১-২
১৫	কোমবের নীচেব ডান পাছাব তাবা	ζ	৬	১৪	৫৫	৮	৪৫	৩-৪
১৬	বাম উরুব চতুর্ভুজেব সামনেব অংশেব উত্তবেবটি	ι^2	৬	১৬	১৬	৩	১২	৫-৬
১৭	সামনেব অংশেব দক্ষিণেবটি	h	৬	১৭	১৯	−০	২৪	৬
১৮	পিছনেব অংশেব দুইটিব উত্তবেবটি	m	৬	১৮	৫৫	১	৯	৫-৬
১৯	পিছনেব অংশের দক্ষিণেরটি	86	৬	২১	১৩	−১	৩০	৫-৬

২০	বাম হাঁটুর উপবের তাবা	126	৬	১৮	২৫	−২	৫৪	৫·৬
২১	বাম উরুব পিছনেব অংশেব তারা	p	৬	১৮	৫৮	৮	৪৫	৫
২২	পোষাকের সীমাব তিনটি তারার মধ্যেরটি	ι	৬	২৫	৪৯	৭	১৫	৪
২৩	ঐ তারাগুলির দক্ষিণেরটি	κ	৬	২৬	৫২	৩	০	৪
২৪	ঐ তিনটিব উত্তরেরটি	φ	৬	২৭	৪০	১১	৪৫	৪·৫
২৫	বাম পায়ের পাতায় দক্ষিণ দিকের তারা	λ	৬	২৯	৭	০	৪২	৪
২৬	ডান পায়ের পাতায় উত্তব দিকের তাবা	μ	৭	২	৩৭	৯	৫৯	৪·৩

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	বাম বাহুর সামনের অংশের এক সরল-রেখায় তিনটি তারার আগেরটি	χ	৬	৪	১০	−৩	৪২	৫
২	ঐ তারাগুলির মধ্যেরটি	ψ	৬	৮	১০	৩	২৪	৫
৩	ঐ তিনটির পরেরটি	g	৬	১১	১১	৩	২১	৫
৪	ধানের শীষ তারার নীচে প্রায় এক সরল-রেখায় তিনটি তারাব আগেরটি	53	৬	১৬	৭	৮	০	৬
৫	ঐগুলির মধ্যেরটি, জোড়া তারা	$\frac{1}{2}(61+63)$	৬	১৭	১৯	৮	৩৬	৫
৬	ঐ তিনটিব পরেরটি	89	৬	২৪	১০	−৭	৪২	৬

লিব্রা (তুলা [illegible])

১	দক্ষিণের প্রান্তের দুইটি তারার উজ্জলটি	α	৭	৭	৫২	০	৪৫	৩·২

২	ঐটির উত্তরের এবং ঐটির চেয়ে অনুজ্জ্বল তারা	μ	৭	৬	৩১	১	৪৫	৫-৬
৩	উত্তরের প্রান্তের দুইটি তারার উজ্জ্বলটি	β	৭	১১	৫৮	৮	৪৫	৩-২
৪	ঐ দুইটির আগেরটি, একটু অস্পষ্ট	δ	৭	৭	৫৮	৮	৩৬	৫ ৬
৫	দক্ষিণের মাঝের তারা	ι	৭	১৩	১৬	—১	৪৬	৪
৬	দক্ষিণের ঐ তারার আগেরটি	ν	৭	১০	৪৬	১	৯	৫-৬
৭	উত্তরের মাঝের তারা	γ	৬	১৭	৪৯	৪	৪৫	৪
৮	উত্তরের ঐ তারার পরেরটি	θ	৭	২২	৪	২	৫৭	৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	উত্তরের তিনটি তারার আগেরটি	37	৭	১৫	৫১	৮	৪২	৫
২	অবশিষ্ট দুইটির দক্ষিণেরটি	ψ	৭	২২	৪৬	৬	৩০	৪-৫
৩	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	ξ Scorp	৭	২৩	২৫	৮	৫৪	৪ ৫
৪	দুইটি পাল্লার মাঝখানের তিনটি তারার পরেরটি	λ	৭	২২	২৫	০	৩৬	৬
৫	অবশিষ্ট দুইটির উত্তরেরটি	η	৭	১৯	৪০	৩	১২	৬
৬	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	κ	৭	২০	২৫	—১	২৪	৪
৭	দক্ষিণের তিনটি তারার আগেরটি	γ Scorpii	৭	১৩	১৯	৭	৩০	৩·৪
৮	অবশিষ্ট দুইটির উত্তরেরটি	39	৭	২০	৫৫	৮	১৫	৪
৯	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	O Scorp.	৭	২১	৪৩	—১০	০	৪

স্করপিয়াস (বৃশ্চিক عقرب)

১	মাথার তিনটি তারার উত্তরেরটি	β	৭	২৫	২২	১	২০	৩
২	ঐ তারাগুলির মধ্যেরটি	δ	৭	২৪	৫৮	−২	৩	৩
৩	ঐ তিনটির দক্ষিণেরটি	π	৭	২৪	৪০	৫	২৭	৩
৪	পায়ের উপরের তারার চেয়েও দক্ষিণের তারা	ρ	৭	২৪	৫৫	−৮	৫১	৩·৪
৫	উত্তরের উজ্জ্বল তারার নিকটের দুইটি তারার উত্তরেরটি	ν	৭	২৬	২৮	১	৪৫	৪
৬	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	$\frac{1}{2}(9\omega^1+10\omega^2)$	৭	২৫	১০	০	৩০	৪
৭	শরীরের তিনটি উজ্জ্বল তারার আগেরটি	σ	৮	০	২৮	−৩	৪৫	৩·৪
৮	মধ্যের লাল মত তারা	α	৮	২	১৬	৪	৩০	২
৯	ঐ তিনটি তারার পরেরটি	τ	৮	৩	৪০	৬	২১	৩
১০	এদের নীচের দুইটি তারার আগেরটি	c^2	৭	২৮	৩১	৬	৫৭	৫·৬
১১	ঐ দুইটির পরেরটি	d	৭	২৯	২৫	৭	১২	৫·৬
১২	প্রথম জোড়ার উপরের তারা	ε	৮	৬	৪৯	−১২	০	৩
১৩	দ্বিতীয় জোড়ার উপরের তারা	$\frac{1}{2}(\mu^1+\mu^2)$	৮	৭	৫৫	−১৫	১৫	৩
১৪	তৃতীয় জোড়ার দুইটি তারার উত্তরেরটি	ζ^1	৮	৯	১৯	১৮	৫১	৩
১৫	ঐ দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	ζ^2	৮	৯	২৫	১৯	১৫	৪
১৬	চতুর্থ জোড়ার উপরের তারা	η	৮	১৩	১	২০	০	৩·৪

১৭	পঞ্চম জোড়ার উপরের তারা	θ	৮	১৭	৫৫	১৯	২১	৩
১৮	ষষ্ঠ জোড়ার উপরের তারা	ι	৮	১৯	২৮	১৬	১৮	৩-৪
১৯	সপ্তম জোড়া ও হুলের মধ্যের তারা	κ	৮	১৮	৩১	১৬	০	৩
২০	হুলের মধ্যের দুইটি তারার পরেরটি	λ	৮	১৬	৩১	১৩	৩৩	৩
২১	ঐ দুইটির আগেরটি	υ	৮	১৫	৫৫	-১৩	৫৪	৩-৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	হুলের নিকটের নীহারিকার মত তারা	γ Teles	৮	১৯	৫৫	−১৩	৩৯	৪ ৫
২	হুলের উত্তরের দুইটি তারার আগেরটি	d Oph.	৮	১৫	৭	৬	৪৫	৫
৩	ঐ দুইটির পরেরটি	3 Sag.	৮	১৯	৩১	—৪	১৫	৫

স্যাজিটারিয়াস (ধনু رامی)

১	তীরের মাথার তারা	γ	৮	২৩	৪৯	—৭	১২	৩-৪
২	বাম হাতের কব্জীর তারা	δ	৮	২৬	৫৮	৬	৪৫	৩
৩	ধনুকের দক্ষিণ অংশের তারা	ε	৮	২৭	১৩	১১	১২	৩-২
৪	ধনুকের উত্তর অংশের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	λ	৮	২৮	২৫	—২	০	৩
৫	ঐ দুইটির উত্তরেরটি, ধনুর প্রান্তের তারা	$\frac{1}{2}(54\mu^1+55\mu^2)$	৮	২৫	৫২	২	৮	৪
৬	বাম কাঁধের তারা	σ	৯	৪	৩১	—৩	৪৫	৩
৭	তীরের ফলার তারা	φ	৯	২	১৯	৩	৫৪	৪-৩

৮	চোখেব উপরে নীহারিকার মত তাবা	$\frac{1}{2}(32v^1+35v^2)$	৯	৫	৭	০	৫	নীহারিকা
৯	মাথাব উপবের তিনটি তাবাব আগেবটি	ξ^2	৯	৫	৪০	২	০	৪
১০	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	o	৯	৭	৩১	১	১৫	৪
১১	ঐ তিনটিব পবেরটি	π	৯	৮	৫৫	২	০	৪·৩
১২	মাথাব কাপড়ের উত্তবের আলগা ফিতাব উপবেব তিনটি তাবাব দক্ষিণেরটি	d	৯	১০	৪৯	৩	১৫	৫·৬
১৩	ঐ তিনটিব মধ্যেবটি	ρ	৯	১১	২৫	৪	৬	৪·৫
১৪	ঐ তিনটিব উত্তরেবটি	ν	৯	১১	৫৫	৬	১৫	৪ ৫
১৫	ঐ তিনটির পবেব অস্পষ্ট তাবা	$\frac{1}{2}(13e^1+15e^2)$	৯	১৫	১৩	৫	২৪	৬
১৬	মাথার কাপড়েব দক্ষিণে আলগা ফিতাব উপরের দুইটি তাবাব উত্তরেবটি	g	৯	১৯	১০	৬	০	৫·৬
১৭	ঐ দুইটির দক্ষিণেবটি	f	৯	১৭	৭	১	৪৮	৬
১৮	ডান কাঁধেব উপরের তাবা	$\frac{1}{2}(47X^1+49X^2)$	৯	১২	১৬	−১	৫৪	৫·৬
১৯	ডান কনুইয়েব উপবেব তারা	$\frac{1}{2}(51h^1+52h^2)$	৯	১৪	৪০	৩	৬	৪·৫
২০	পিঠের তিনটি তারাব যেটি দুই কাঁধেব মাঝখানে	ψ	৯	৯	১	২	১৮	৫·৬
২১	ঐ তিনটিব মাঝেবটি, কাঁধেব হাড়ে	τ	৯	৬	৩১	৫	০	৪·৩
২২	পরেরটি, বগলেব নীচে	ζ	৯	৫	৩১	৭	০	৩

২৩	বাম পায়ের গিরার তারা	$\frac{1}{2}(\beta^1+\beta^2)$	৯	৭	৪৬	২২	১৮	৪-৫
২৪	ঐ পায়ের হাঁটুর তারা	α	৯	৮	৪৩	১৮	৩৬	৪-৫
২৫	ডান পায়ের গিরার তারা	η	৮	২৫	৫৫	১৩	১৮	৩-৪
২৬	বাম ঊরুর তারা	$\frac{1}{2}(\kappa^1+\kappa^2)$	৯	১৬	৫৫	১৩	২১	৪-৫
২৭	ডান পায়ের পিছনের তারা	ι	৯	১৪	২৫	২০	৩৯	৪-৫
২৮	লেজের আরম্ভের চারটি তারার উত্তর অংশের আগেরটি	ω	৯	১৮	৭	৫	৩০	৫
২৯	উত্তর অংশের পরেরটি	A	৯	১৮	৫৫	৫	৫০	৫
৩০	দক্ষিণ অংশের আগেরটি	b	৯	১৮	২৫	৬	৯	৫
৩১	দক্ষিণ অংশের পরেরটি	c	৯	১৯	৭	—৭	০	৫

ক্যাপ্রিকর্নাস (মকর جدي)

১	পিছনের শিং-এর তিনটি তারার উত্তরেরটি	$\frac{1}{2}(5\alpha^1+6\alpha^2)$	৯	২৬	৩১	৬	৪২	৩-৪
২	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	ν	৯	২৬	৪৯	৬	২৭	৫-৬
৩	ঐ তিনটির দক্ষিণেরটি	β	৯	২৬	১০	৪	৪৫	৩-৪
৪	সামনের শিং-এর তারা	$\frac{1}{2}(1\xi^1+2\xi^2)$	৯	২৪	৫৫	৭	৩০	৬-৭
৫	নাকের তিনটি তারার দক্ষিণেরটি	o	৯	২৭	৩১	০	৪২	৬
৬	অবশিষ্ট দুইটির আগেরটি	π	৯	২৭	১৯	১	৩৯	৬
৭	ঐ দুইটির পরেরটি	ρ	৯	২৭	৩১	১	২১	৬
৮	ডান চোখের নীচের তিনটি তারার আগেরটি	σ	৯	২৫	১০	০	৩৬	৬

৯	গলার দুইটি তারার উত্তরেরটি	$\frac{1}{2}(13\tau^1+14\tau^2)$	১০	০	২২	৩	২৭	৬
১০	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	υ	১০	০	১০	০	৫৪	৬
১১	ডান হাঁটুর নীচের তারা	ψ	৯	২৯	২৫	−৭	০	৪
১২	গোঁটানো বাম হাঁটুর তারা	ω	১০	০	১	৮	৪৫	৪
১৩	বাম কাঁধের তারা	A	১০	৩	৫৫	৮	৬	৪·৫
১৪	পেটের নীচের পাশাপাশি দুইটি তারার আগেরটি	ζ	১০	৯	১৬	৭	০	৪ ৫
১৫	ঐ দুইটির পরেরটি	b	১০	৯	৩৪	৬	১২	৪-৫
১৬	শরীরের ভিতরের তিনটির তারার পরেরটি	φ	১০	৬	৫৫	৪	৩৬	৬
১৭	অবশিষ্ট দুইটির আগের অবশিষ্ট তারাটি	χ	১০	৫	১	৪	১৮	৬
১৮	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	η	১০	৪	৫৫	২	৪২	৫-৬
১৯	পিঠের দুইটি তারার আগেরটি	θ	১০	৬	১	০	০	৪
২০	ঐ দুইটির পরেরটি	ι	১০	৯	৫৫	০	৪৮	৪
২১	দক্ষিণ শাখার দুইটি তারার আগেরটি	ϵ	১০	২২	৩৪	৫	১৫	৪
২২	ঐ দুইটির পরেরটি	κ	১০	১৪	৭	৫	০	৪-৫
২৩	লেজের গোড়ার দুইটি তারার আগেরটি	γ	১০	১৪	১৩	২	৩০	৩·৪
২৪	ঐ দুইটির পরেরটি	δ	১০	১৫	২৮	−২	১৫	৪
২৫	লেজের উত্তর অংশের চারটি তারার আগেরটি	d	১০	১৫	৪৩	০	১৫	৫-৬

২৬	অবশিষ্ট তিনটির দক্ষিণেরটি	μ	১০	১৮	১০	০	০	৫
২৭	ঐ তারাগুলির মধ্যেরটি	λ	১০	১৬	৩১	২	৪৮	৫
২৮	ঐ তারাগুলির উত্তরেরটি, লেজের প্রান্তে	c^1	১০	১৭	৩৪	৪	০	৫

একোয়ারিয়াস (কুম্ভ دلو)

১	মাথার তারা	d	১০	২০	১৩	১৫	১৫	৬-৭
২	ডান কাঁধের দুইটি তারার উজ্জ্বলটি	α	১০	২৫	৩১	১০	৯	৩-৪
৩	ঐটির নীচে অস্পষ্ট তারাটি	o	১০	২৪	৩৪	৮	৪২	৫
৪	বাম কাঁধের উপরেরটি	β	১০	১৫	৪৩	৮	৪৮	৩-৪
৫	আগেরটির নীচে, পিছনে প্রায় বগলের নীচে	ξ	১০	১৬	৪০	৬	৪৫	৫
৬	বাম হাতের তিনটি তারার পরেরটি	7	১০	৬	৭	৭	৬	৬
৭	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	μ	১০	৫	২২	৮	৯	৫-৬
৮	ঐ তিনটির আগেরটি	ε	১০	৩	৪৯	৮	৯	৪-৩
৯	ডান বাহুর তারা	γ	১০	২৯	১৩	৮	০	৩-৪
১০	ডান হাতের তিনটি তারার আগেরটি	π	১১	০	৫	১০	৯	৪-৩
১১	অবশিষ্ট দুইটির দক্ষিণেরটি	ζ	১১	১	৭	৮	৪৮	৩-৪
১২	ঐ দুইটির পরেরটি	η	১১	২	৫৫	৮	০	৩-৪
১৩	উরুর গোড়ার পাশাপাশি দুইটি তারার আগেরটি	θ	১০	২৫	৪০	১	৪৮	৪

১৪	ঐ দুইটির পরেরটি	ρ	১০	২৬	১০	২	১৮	৫·৬
১৫	ডান নিতম্বের তারা	σ	১০	২৮	১	—১	১৫	৪·৫
১৬	বাম নিতম্বের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	ι	১০	২১	৩৭	—১	৫৪	৪·৫
১৭	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	30	১০	২৩	১০	৪	৪৫	৬·৭
১৮	ডান পায়ের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	δ	১১	১	৫৫	—৮	১৩	৩
১৯	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	τ	১১	১	৩৭	৫	৪৫	৪
২০	বাম উরুর পিছনের তারা	f	১০	২৪	৪৩	৬	৯	৬
২১	বাম পায়ের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	g^2	১০	২৮	৩৪	১১	০	৫·৬
২২	ঐ দুইটি তারার উত্তরেরটি	g^1	১০	২৭	৪৯	—১০	৬	৫·৬
২৩	হাত থেকে নদীর স্রোতের তারাগুলির প্রথমটি	λ	১১	৪	৩১	০	১৮	৪
২৪	এর পরের দক্ষিণের তারা	h	১১	৭	৪	—১	১০	৪·৫
২৫	এর পরেরটি, নদীর বাঁকের নিকট	φ	১১	৮	৫৮	০	৩০	৪·৫
২৬	ঐ তারাটিরও পরের তারা	χ	১১	৯	২৫	২	০	৪ ৫
২৭	উপরের বাঁকের দক্ষিণের বাঁকের তারা	ψ^1	১১	৮	৫৫	৩	২৪	৪
২৮	ঐটির দক্ষিণের দুইটি তারার উত্তরেরটি	ψ^2	১১	৯	৩৪	৪	০	৪
২৯	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	ψ^3	১১	৯	১৯	৫	০	৪
৩০	দক্ষিণ দিকে দূরের একক তারা	94	১১	৭	৩৪	৮	৪৮	৫·৬

৩১	এর পরে পাশাপাশি দুইটি তাবাব আগেবটি	ω^1	১১	১১	৫৫	১১	৩০	৫
৩২	ঐ দুইটিব পবেবটি	ω^2	১১	১২	৭	১১	০	৫
৩৩	পবেব বাঁকের তিনটি তাবাব উত্তবেবটি	$\frac{1}{2}(103A^1+104A^2)$	১১	১০	৫৫	১৪	৩০	৫
৩৪	ঐ তিনটিব মধ্যেবটি	i^1	১১	১১	৩৪	১৫	৬	৫
৩৫	ঐ তিনটিব পরেরটি	i^2	১১	১২	২৫	১৫	৪২	৫
৩৬	একই বাঁকে উপবেব তিনটিব পরেব তিনটি তাবার উত্তরেবটি	b^1	১১	৬	৪৩	১৫	০	৪
৩৭	ঐ তিনটিব মধ্যেবটি	b^2	১১	৭	১৬	১৫	৫৪	৪
৩৮	ঐ তিনটিব দক্ষিণেরটি	b^3	১১	৮	৭	১৬	৪৫	৪
৩৯	তৃতীয় বাঁকের তিনটি তাবাব আগেবটি	c^1	১১	১	১৩	১৬	৫৭	৪
৪০	অবশিষ্ট দুইটিব দক্ষিণেরটি	c^3	১১	২	৪	১৬	৫১	৪
৪১	ঐ দুইটিব উত্তরেবটি	c^2	১১	২	৫৫	১৪	৪৮	৪
৪২	নদীর শেষেব তাবা, দক্ষিণ মীনের মুখের তাবা	α Pis Aus	১০	২৬	১৯	—২১	২৪	১

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	নদীব বাঁকেব পবের তিনটি তাবাব আগেরটি	2 Ceti	১১	১৬	৪০	—১৬	৩৩	৪·৩
২	অবশিষ্ট দুইটির উত্তরেরটি	6 Ceti	১১	১৯	১০	—১৫	৪৫	৪·৩
৩	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	7 Ceti	১১	১৮	২৮	—১৯	১৮	৪·৩

পিসেস (মীন حوت)

১	সামনের মাছের মুখের তারা	β	১১	১০	৪৬	৮	৫৪	৪
২	ঐ মাছের মাথার দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	γ	১১	১৩	৪৯	৭	১২	৪-৫
৩	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	b	১১	১৫	২৫	৮	৪২	৪-৫
৪	পিঠের দুইটি তারার আগেরটি	θ	১১	১৭	৪৯	৮	৪৮	৪
৫	ঐ দুইটির পরেরটি	ι	১১	১৯	৪৯	৭	০	৪
৬	পেটের দুইটি তারার আগেরটি	κ	১১	১৫	১৬	৪	০	৪
৭	ঐ দুইটির পরেরটি	λ	১১	১৯	২২	৩	০	৪
৮	ঐ মাছের লেজের তারা	ω	১১	২৫	৭	৬	১৮	৪
৯	সুতা ও মাছের লেজের মাঝখানের দুইটি তারার প্রথমটি	d	০	০	৫০	৫	২৪	৬
১০	ঐ দুইটির পরেরটি	51	০	২	৪৯	৩	০	৬
১১	এর পরের তিনটি তারার আগেরটি	δ	০	৬	৫৫	১	৫৫	৪
১২	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	ε	০	১০	৩১	১	১২	৪
১৩	ঐ তিনটির পরেরটি	ζ	০	১২	৫৫	−০	১০	৪
১৪	বাঁকের দুইটি ছোট তারার উত্তরেরটি	e^3	০	১২	২২	১	৩৯	৬
১৫	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	f	০	১২	৫৫	৪	৫৪	৫
১৬	বাঁকের পরের তিনটি তারার আগেরটি	μ	০	১৬	৫৫	২	৩০	৪-৫

১৭	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	ν	০	১৮	২৫	৫	০	৪
১৮	ঐ তিনটির পরেরটি	ξ	০	১৯	৪৯	৮	৪৫	৪
১৯	দ্বিতীয় সুতার গিঁঠের তারা	α	০	২১	৫৫	৯	৩০	৩-৪
২০	গিঁঠ থেকে উত্তর দিকে যে সুতা গিয়েছে তার প্রথম তারা	o	০	২০	২৫	−২	১২	৪
২১	ঠিক এর পরের তিনটি তারার দক্ষিণেরটি	π	০	২০	৪	১	৪৮	৫-৬
২২	ঐ তারাগুলির মধ্যেরটি	η	০	১৯	৪৬	৫	০	৩-৪
২৩	ঐ তিনটির উত্তরেরটি, লেজের প্রান্তের তারা	ρ	০	২০	১০	৮	৩৬	৫
২৪	পিছনের মাছের মুখের দুইটি তারার উত্তরেরটি	g	০	২১	২২	২২	৯	৫
২৫	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	τ	০	২০	৪৬	২১	২১	৫-৪
২৬	মাথার তিনটি ছোট তারার পরেরটি	h	০	১৭	৩৪	২০	৪৫	৫-৬
২৭	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	κ	০	১৬	৩৪	১৯	৪২	৬-৭
২৮	ঐ তিনটির আগেরটি	ι	০	১৫	৪০	২০	৩০	৬-৭
২৯	পিছন দিকের ডানার তিনটি তারার আগেরটি, এনড্রোমিডার কনুইয়ের তারার নিকটের তারা	ψ^1	০	১৬	১৯	১২	৫১	৪
৩০	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	ψ^2	০	১৬	২৮	১১	৫৪	৪
৩১	ঐ তিনটির পরেরটি	ψ^3	০	১৬	৪৬	১০	৫৭	৪
৩২	পেটের দুইটি তারার উত্তরেরটি	υ	০	২০	৫৫	১৮	০	৪
৩৩	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	φ	০	১৯	২৮	১৪	৪৫	৪

৩৪.	লেজের নিকটের ডানার তারা	χ	০	১৭	১০	১২	০	৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	সামনের মাছের নীচের চতুর্ভুজের উত্তরের দুইটি তারার আগেরটি	27	১১	২০	৪৬	−৩	১২	৪
২	ঐ দুইটির পরেরটি	29	১১	২১	১০	৩	০	৪
৩	দক্ষিণের অংশের আগেরটি	30	১১	২১	২৫	৬	১২	৪
৪	দক্ষিণের অংশের পরেরটি	33	১১	২২	১৩	−৬	১২	৪

দক্ষিণের মণ্ডলসমূহ

সিটাস (তিমি قيطس)

১	নাকের প্রান্তের তারা	λ	১	৭	৩১	−৮	১৮	৪
২	চোয়ালের প্রান্তে মুখের তিনটি তারার পরেরটি	α	১	৬	৫৫	২২	৫১	৩
৩	ঐ তিনটির মাঝেরটি, মুখের মাঝখানে	γ	১	২	১০	১২	১৮	৩
৪	ঐ তিনটি তারার আগেরটি, গালের উপরের	δ	১	০	২২	১৪	৪২	৩·৪
৫	চোখের ভ্রূর তারা	ν	০	২৯	৪৬	৮	৯	৪
৬	এর উত্তরের তারা	μ	১	৩	৭	৬	৩০	৪
৭	এর আগেরটি	ξ^1	০	২৬	৫৫	৪	২৪	৪·৫
৮	বুকের উপরের চতুর্ভুজের সামনের অংশের উত্তরেরটি	ρ	০	২২	৩৭	−২৫	৪২	৪

৯	সামনের অংশের দক্ষিণেরটি	σ	০	২৩	৪	−২৯	১৫	৪
১০	পিছনের অংশের উত্তরেরটি	ε	০	২৬	২৫	২৬	১৫	৪
১১	পিছনের অংশের দক্ষিণেরটি	π	০	২৬	৪৩	২৮	৫১	৪-৩
১২	শরীরের তিনটি তারার মধ্যেরটি	τ	০	১০	৫৫	২৫	৩০	৩-৪
১৩	ঐ তিনটির দক্ষিণেরটি	υ	০	১২	৭	৩১	০	৪
১৪	ঐ তিনটির উত্তরেরটি	ζ	০	১৪	৩৭	২১	৯	৩-৪
১৫	লেজের গোড়ার নিকটের দুইটি তারার পরেরটি	θ	০	৮	৫৫	১৬	১৫	৩-৪
১৬	ঐ দুইটির আগেরটি	η	০	৪	৪০	১৬	৪২	৩-৪
১৭	লেজের গোড়ার চতুর্ভুজের পিছনের অংশের উত্তরেরটি	φ^2	০	০	১৯	১৫	৬	৬
১৮	পিছনের অংশের দক্ষিণেরটি	198	১১	২৮	৪০	১৭	১২	৬
১৯	সামনের অংশের উত্তরেরটি	φ^1	১১	২৮	৪০	১৫	২১	৫-৬
২০	সামনের অংশের দক্ষিণেরটি	161	১১	২৮	১৩	১৬	৬	৫-৬
২১	লেজের দুই শাখার দুইটি তারার উত্তরের শাখার তারা	ι	১১	২৩	৫৫	১৩	৩০	৩-৪
২২	দক্ষিণের শাখার তারা	β	১১	২৫	২৫	−২১	০	৩-২

অরায়ন (কাল পুরুষ جبار)

১	ফারসী 'ছে' অক্ষরের নোক্তার মত, কাল পুরুষের মাথার পাশাপাশি তিনটি অস্পষ্ট তারার মাঝের নীহারিকা	λ	২	১৬	৩১	−১৩	৩০	নীহারিকা

২	ডান কাঁধের উপরের লাল মত উজ্জ্বল তারা	α	২	২১	১৩	১৬	৪৫	১-২
৩	বাম কাঁধের উপবের তারা	γ	২	১৩	৩৪	১৭	১৫	২
৪	ঐটির নীচের পরের তারা	A	২	১৪	৪০	১৭	৩১	৪-৫
৫	ডান কনুইয়েব তারা	μ	২	২২	৪০	১৪	০	৪
৬	ডান বাহুর সামনের অংশের তারা	κ	২	২৬	১৬	১১	১৫	৬
৭	ডান হাতের দক্ষিণের অংশের পরেরটি	ξ	২	২৫	৩৭	৯	১৫	৫
৮	দক্ষিণের অংশের আগেরটি	ν	২	২৫	৪	৮	৪২	৫
৯	উত্তরের অংশের পরেরটি	f^2	২	২৬	৪	৭	১৫	৬
১০	উত্তবের অংশের আগেরটি	f^1	২	২৫	১০	৭	১৫	৬
১১	লাঠিব দুইটি তারার আগেরটি	χ^1	২	২১	৭	০	২৪	৫
১২	ঐ দুইটির পরেরটি	χ^2	২	২৩	১৬	০	৪৫	৫-৬
১৩	পিঠের প্রায় একই সরল-রেখায় চারটি তারার পরেরটি	ω	২	২৬	৫৫	১৯	২৪	৪
১৪	এব আগেবটি	π^2	২	১৬	১৬	১৯	৪২	৬
১৫	ঐটিরও আগেরটি	π^1	২	১৪	১৩	২০	৯	৬
১৬	ঐ চারটির সামনের দিকের পরেরটি	ψ^2	২	১৩	৩১	২০	৩০	৫
১৭	বাম বাহুর উপরে রাখা চামড়ার নয়টি তারার উত্তরেরটি	y^2	২	৯	৪০	৭	৪৫	৪
১৮	উত্তর থেকে দ্বিতীয় তারা	y^1	২	৮	৪৬	৭	৫৪	৪

১৯	উত্তর থেকে তৃতীয়টি	o^2	২	৮	১৩	১০	৬	৪
২০	উত্তর থেকে চতুর্থটি	π^1	২	৫	৪০	১২	৪২	৪
২১	উত্তর থেকে পঞ্চমটি	π^2	২	৪	৪৩	১৪	১৮	৪
২২	উত্তর থেকে ষষ্ঠটি	π^3	২	৪	১৩	১৫	৩০	৩-৪
২৩	উত্তর থেকে সপ্তমটি	π^4	২	৪	৩৪	১৬	৪৫	৩-৪
২৪	উত্তর থেকে অষ্টমটি	π^5	২	৪	৪৬	২০	১৮	৩ ৪
২৫	চামড়ার উপরে সবচেয়ে দক্ষিণের নবম তারাটি	π^6	২	৫	৪৯	−২১	১২	৪
২৬	কোমরের তিনটি তারার আগেরটি	δ	২	১৪	৩৪	−২৩	৫৭	২
২৭	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	ε	২	১৬	১০	২৪	৩৬	২
২৮	ঐ তিনটির পরেরটি	ζ	২	১৭	৪	২৫	২৪	২
২৯	তরবারির হাতলের তারাটি	η	২	১১	৫৫	২৫	৩৯	৩-৪
৩০	তরবারির ফলকের মত তিনটি তারার উত্তরেরটি	$\frac{1}{2}(42\ \theta^1 + 45\ \theta^2)$						
৩১	ঐ তিনটির মাঝেরটি	$\frac{1}{2}(41\ \theta^1 + 43\ \theta^2)$	২	১৫	১৩	২৭	৫৪	৪
৩২	ঐ তিনটির দক্ষিণেরটি	ι	২	১৫	১৯	২৮	২৭	৩-৪
৩৩	তরবারির ফলকের নীচের দুইটি তারার পরেরটি	d	২	১৫	৩৪	২৯	১২	৩-৪
৩৪	ঐ দুইটির আগেরটি	υ	২	১৬	২৫	৩০	৪২	৪-৫
৩৫	নদীর আরম্ভে বাম পায়ের উজ্জ্বল তারা	β	২	৯	২৫	৩১	১৮	১
৩৬	ঐটির উত্তরের তারা	τ	২	১০	৩৭	৫০	২৪	৪ ৩

৩৭	বাম গোড়ালীর নীচে বাইরের তারা	e	২	১২	১	৩১	১৫	৪
৩৮	ডান হাঁটুর তারা	κ	২	১৮	৪০	−৩৩	২১	৩·২

এরিডেনাস (যামী نهر)

১	কাল পুরুষের পায়ের কাছে, নদীর আরম্ভের তারা	λ	২	৭	৫৫	−৩১	৫৪	৪
২	ঐটির উত্তরে, কাল পুরুষের গুলফের নিকটে বাঁকের ভিতরের তারা	β	২	৮	৭	২৮	১২	৪
৩	এর পরেই যে দুইটি তারা আছে, তাদের পরেরটি	ψ	২	৫	৪০	২৯	৫৪	৪ ৫
৪	ঐ দুইটির আগেরটি	ω	২	৩	৪৩	২৭	৪৮	৪ ৫
৫	এর পরে আরো দুইটির পরেরটি	μ	২	২	১	২৫	৪৮	৪
৬	ঐ দুইটির আগেরটি	ν	১	২৯	১৬	২৫	২৪	৪
৭	এর নিকটে তিনটি তারার পরেরটি	ξ	১	২৫	১৯	২৬	০	৫-৬
৮	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	o^2	১	২২	৫৫	২৮	১৫	৪
৯	ঐ তিনটির আগেরটি	o^1	১	২১	৪০	২৭	৩৯	৪
১০	এর পরের চারটি তারার পরেরটি	γ	১	১৬	৪০	৩৩	১৫	৩·৪
১১	এর আগেরটি	π	১	১৩	৩১	৩১	১৫	৪
১২	এরও আগেরটি	δ	১	১৩	১০	২৯	০	৩-৪
১৩	ঐ চারটির আগেরটি	ε	১	১০	৪৬	২৭	৪৮	৩-৪

১৪	এইভাবে এর পরের চারটি তারার পরেরটি	ζ	১	৬	৩৪	২৬	৯	৪
১৫	এর আগেরটি $\frac{1}{2}(9\ \rho^2+10\ \rho^3)$		১	৪	৭	২৩	৫৪	৫
১৬	এরও আগেরটি	η	১	১	১৬	২৪	৩০	৪-৩
১৭	এই চারটির আগেরটি	788	১	০	১৪	২৪	১২	৫-৬
১৮	নদীর বাঁকে তিমির বুক স্পর্শ করে যে তারা	τ^1	০	২৪	৪০	৩৩	০	৪
১৯	এর পরেরটি	τ^2	০	২৫	২৫	৩৫	৩৯	৪·৫
২০	এর পরের তিনটি তারার আগেরটি	τ^3	০	২৭	৪০	৩৮	৪৫	৪ ৩
২১	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	τ^4	১	৩	৭	৩৮	৩০	৪
২২	ঐ তিনটির পরেরটি	τ^5	১	৬	৪৯	৩৯	২৭	৪
২৩	ট্রাপিজিয়াম আকাশের চতুর্ভুজের সামনের অংশের উত্তরেরটি	τ^6	১	১০	২৫	৪১	৩০	৪
২৪	সামনের অংশের দক্ষিণেরটি	τ^7	১	১০	৩৭	৪২	৩০	৫-৬
২৫	পিছনের অংশের আগেরটি	τ^8	১	১১	১	৪৪	০	৪
২৬	ঐ তারাগুলির পরের এবং শেষেরটি	τ^9	১	১৩	১০	৪৪	৬	৪
২৭	একটু দূরে পুবের দিকের দুইটি তারার উত্তরেরটি	50	১	২১	৪৩	−৫০	৪২	৪·৫
২৮	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	52	১	২২	১০	−৫১	৪৫	৪
২৯	বাঁকের নিকটে পরের দুইটি তারার পরেরটি	43	১	১৬	২৫	৫৪	৩০	৪
৩০	ঐ দুইটির আগেরটি	41	১	১৪	১	৫৪	৯	৪·৩

৩১	এর পরের তিনটি তারার পরেরটি	189	১	৪	১	৫৪	৩	৪
৩২	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	182	১	২	৪০	৫৫	৩৯	৪
৩৩	ঐ তিনটির আগেরটি	149	১	০	২৫	৫৫	০	৪
৩৪	নদীর শেষের উজ্জ্বল তারা	θ	০	১৫	৪০	—৫৩	৪৫	১

লেপাস (শশক ارنب)

১	কানের চতুর্ভুজের সামনের অংশের উত্তরেরটি	ι	২	৭	৪০	—৩৫	০	৫
২	সামনের অংশের দক্ষিণেরটি	κ	২	৭	৩১	৩৬	০	৪
৩	পিছনের অংশের উত্তরেরটি	ν	২	৯	৫৫	৩৫	৩০	৫
৪	পিছনের অংশের দক্ষিণেরটি	λ	২	৯	৪৩	৩৬	১৮	৫
৫	চিবুকের তারা	μ	২	৭	১০	৩৯	৩০	৪-৩
৬	সামনের বাম পায়ের তারা	ϵ	২	৪	১০	৪৫	৫০	৪-৩
৭	শরীরের ভিতরের দিকের তারা	α	২	১০	১	৪১	১৮	৩ ৪
৮	পেটের নীচের তারা	β	২	১১	৪০	৪৪	১২	৩ ৪
৯	পিছনের পায়ের দুই তারার উত্তরেরটি	δ	২	১৯	১০	৪৪	৯	৪-৩
১০	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	γ	২	১৬	৪৩	৪৬	৯	৪ ৩
১১	কোমরের তারা	ζ	২	১৭	৫৮	৩৮	৩০	৪-৩
১২	লেজের প্রান্তের তারা	η	২	২০	৩৪	—৩৮	০	৪-৩

ক্যানিস মেজর (মৃগব্যাধ کلب اکر)

১	মুখের অতি উজ্জ্বল তারা, শে'রা নামে পরিচিত	α	৩	৬	১৯	—৩৯	৩০	১
২	কানের তারা	θ	৩	৮	৫৫	৩৪	৪৫	৪-৫
৩	মাথার তারা	μ	৩	৯	২৫	৩৬	১৫	৫
৪	গলার দুইটির তারার উত্তরেরটি	γ	৩	১২	২৫	৩৮	০	৪
৫	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	ι	৩	১১	৪০	৩৯	৪৫	৪
৬	বুকের উপরের তারা	π^1	৩	৭	২৫	৪০	০	৫
৭	ডান হাঁটুর দুই তারার উত্তরেরটি	ν^3	৩	৪	৪০	৪১	১৯	৫
৮	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	ν^2	৩	৪	৩১	৪২	৩০	৫
৯	সামনের পায়ের প্রান্তের তারা	β	২	২৯	২৫	৪১	৩০	৩
১০	বাম হাঁটুর দুই তারার আগেরটি	ξ^1	৩	৩	৪	৪৬	৩৬	৫
১১	ঐ দুইটির পরেরটি	ξ^2	৩	৪	৪০	৪৬	০	৫
১২	বাম কাঁধের দুইটির পরেরটি	o^1	৩	১০	১৯	৪৬	১৫	৪
১০	ঐ দুইটির আগেরটি	o^1	৩	১০	৭	৪৬	৪৮	৫
১৪	বাম উরুর আরম্ভের তারা	δ	৩	১৫	১০	৪৮	২১	৩
১৫	দুই উরুর মাঝখানে পেটের নীচের তারা	ϵ	৩	১২	৪০	৫১	৫২	৩
১৬	পিছনের ডান পায়ের বাঁকের তারা	κ	৩	১০	২৫	৫৫	১৫	৪

১৭	ঐ পায়ের প্রান্তের তারা	ζ	৩	০	৭	৫৩	৪৫	৩
১৮	লেজের তারা	η	৩	২১	২৫	−৫০	৪৫	৩·৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	মাথার শীর্ষের উত্তরের তারা	22 Mon.	৩	১১	৩১	−২২	৪২	৪
২	পিছনের পায়ের নীচে এক সরলরেখায় চারটি তারার দক্ষিণেরটি	θ Col.	২	২৫	১	−৬০	৪৫	৪
৩	ঐটির উত্তরেরটি	κ Col.	২	২৮	৫৫	−৫৮	৪৫	৫
৪	এরও উত্তরেরটি	δ Col.	৩	১	৭	৫৬	৫১	৪
৫	ঐ চারটির শেষেরটি, সবার উত্তরেরটি	λ	৩	২	২৫	৫৫	৪৮	৫
৬	ঐ চারটি তারার পশ্চিমে একই সরলরেখায় তিনটি তারার আগেরটি	μ Col.	২	১৬	৪০	৫৫	২১	৪ ৫
৭	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	λ Col.	২	১৯	৩১	৫৭	১৫	৪ ৫
৮	ঐ তিনটির পরেরটি	γ Col	২	২০	৫৫	৫৮	৩০	৪·৫
৯	ঐগুলির নীচে উজ্জ্বল দুইটি তারার পরেরটি	β Col.	২	১৭	৫৫	৫৯	৩০	৩
১০	ঐ দুইটির আগেরটি	α Col.	২	১৪	২৫	৫৭	২৪	৩
১১	শেষের দক্ষিণের তারা	ϵ Col.	২	১০	২৫	−৫৮	৩০	৪·৫

ক্যানিস মাইনর (শূনী کلب اصغر)

১	গলার তারা	β	৩	১৪	২৫	−১৩	৫৪	৪
২	পিছনের উজ্জ্বল তারা	α	৩	১৮	২২	−১৬	০	১

আর্গোনভিস (অর্ণব যান سفينة)

১	অর্ণব যানের প্রান্তের দুইটি তারার আগেরটি	e	৩	২৯	২৬	—৪২	৪২	৫
২	ঐ দুইটির পরেরটি	ρ Pup	৪	৩	১০	৪৩	৩৩	৩
৩	পিছনের ছোট নিশানের উপরে পাশাপাশি দুইটি তারার উত্তরেরটি	ξ Pup	৩	২৮	১৩	৪৫	১২	৪-৩
৪	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	220	৩	২৭	৪৩	৪৬	২১	৫
৫	ঐ দুইটির আগে যে তারাটি আছে	173	৩	২৪	২২	৪৬	২৪	৫-৬
৬	ছোট নিশানের মাঝের উজ্জ্বল তারা	175	৩	২৫	১৩	৪৭	৪২	৪-৩
৭	ছোট নিশানের নীচের তিনটি তারার আগেরটি	163	৩	২৪	৫৩	৪৯	৯	৪
৮	ঐ তিনটির পরেরটি	3 Pup	৩	২৭	৩৪	৪৯	২৪	৪
৯	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	1 Pup	৩	২৭	১৯	৪৯	৬	৫
১০	জাহাজের পিছনের দিকের গলার তারা	277	৪	১	৫৫	৪৯	৪৮	৪-৫
১১	জাহাজের পিছনের দিকের তলার দুইটি তারার উত্তরেরটি	137	৩	২০	৫৫	৫১	৫৪	৫-৬
১২	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	π f Pup	৩	২৩	১	৫৮	৩০	৫
১৩	জাহাজের পিছনের দুই ডেকের মাঝখানের উপরের তারা	f Pup	৩	২৯	৭	৫৫	৩০	৫
১৪	এর পরের তিনটি তারার আগেরটি	½(d¹+d²+d³)	৪	০	৫৫	৫৯	০	৫

১৫	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	c Pup	৪	২	২৫	৫৭	৫৭	৪
১৬	ঐ তিনটির পরেরটি	b Pup	৪	৫	৪৩	৫৮	৯	৪
১৭	এর পরে ডেকের উজ্জ্বল তারা	ζ Pup	৪	১০	১০	৫৮	৩৬	২
১৮	ঐ উজ্জ্বল তারাটির নীচে দুইটি অস্পষ্ট তারার আগেরটি	a Pup	৪	৬	৪৩	৬০	০	৫
১৯	ঐ দুইটির পরেরটি	Lac 3128	৪	১০	৪০	৫৯	৫১	৫
২০	ঐ উজ্জ্বল তারাটির উপরের দুইটির আগেরটি	h¹ Pup	৪	৯	৫৫	৫৭	২১	৫
২১	ঐ দুইটির পরেরটি	h² Pup	৪	১১	২৫	৫৭	৪৯	৫
২২	প্রায় মাস্তুলের কাছে নিশানের তিনটি তারার উত্তরেরটি	Bri sb. 2249	৪	২৫	২৬	৫২	৩০	৪
২৩	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	d Vel	৪	২২	২৫	৫৭	০	৪
২৪	ঐ তিনটির দক্ষিণেরটি	e Vel.	৪	২২	৫৫	৫৯	০	৪
২৫	ঐ তিনটির নীচে পাশাপাশি দুইটি তারার উত্তরেরটি	a Vel.	৪	২৮	২৫	৬০	১৫	৪-৩
২৬	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	b Vel.	৪	২৮	১৯	৬১	২৪	৪-৩
২৭	মাস্তুলের মাঝের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	β Pyx.	৪	১৮	৪৬	—৫১	২৪	৪
২৮	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	α Pyx.	৪	১৮	৩৪	—৪৯	৬	৪
২৯	মাস্তুলের প্রান্তের দুইটি তারার আগেরটি	γ Pyx.	৪	১৭	২২	৪৩	৩৯	৪-৫
৩০	ঐ দুইটির পরেরটি	δ Pyx.	৪	১৮	৫৫	৪৩	১৫	৪-৫

৩১	নিশানের তিনটি তাবাব নীচেব তারা	λ Vel.	৫	৩	৪	৫৬	৯	২
৩২	ডেকের ভাঙ্গা জাযগার তাবা	ψ Vel.	৫	৬	৪০	৫১	১৫	৩
৩৩	জাহাজের তলা ও হালেব মধ্যেব তাবা	σ Pup	৪	০	১০	৬০	৫৪	৪-৩
৩৪	এব পরেব অস্পষ্ট তাবা	P. Pup	৪	১০	১৬	৬৫	২৪	৬
৩৫	এব পবে ডেকের নীচেব উজ্জ্বল তাবা	γ Vel.	৪	১৯	১৩	৬৪	১৫	২
৩৬	এব দক্ষিণে জাহাজেব তলাব উজ্জ্বল তারা	X Car.	৪	২৮	১১	৬৯	৪০	৪
৩৭	এর পবেব তিনটি তারার আগেবটি	O Pup	৫	৪	৫১	৬৫	৪০	৩
৩৮	ঐ তিনটিব মধ্যেরটি	δ Vel	৫	১০	২১	৬৫	৫০	৩
৩৯	ঐ তিনটির পরেবটি	f Car	৫	১৫	৪১	৬৬	২০	৩
৪০	এব পবে ডেকেব ভাঙ্গা জাযগাব দুইটি তারার আগেবটি	κ Vel	৫	২০	৪১	৬২	৫০	৪
৪১	ঐ দুইটির পরেরটি	N Vel.	৫	২৭	৪১	৬২	১৫	৪-৩
৪২	উপবের তারা এবং হালেব মাঝখানের দুইটি তারার আগেবটি	η Col.	২	২২	১৩	৬৬	৯	৪
৪৩	ঐ দুইটির পরেবটি	ν Pup	৩	৮	৩১	৬৬	১২	৩-৪
৪৪	এব পরেব হালেব দুইটি তারার আগেরটি	α Arg.	৩	৬	৫১	৭৫	০	১
৪৫	ঐ দুইটিব পরেরটি	τ Pup	৩	১৮	৪১	−৭১	৪৫	৩-৪

হাইড্রা (হ্রদসর্প شجاع)

১	মাথা এবং নাকের পাঁচটি তারার আগের দুইটির দক্ষিণেরটি	σ	৪	৩	২৮	—১৪	৩৩	৪·৫
২	চোখের উপরের উত্তরেরটি	δ	৪	২	২৫	১২	৩০	৪·৫
৩	এর পরের দুইটি তারার উত্তরেরটি	ε	৪	৪	২৮	১১	১৫	৪
৪	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি, মুখের তারা	η	৪	৪	২৫	১৪	৯	৪
৫	এর পরেরটি, চোয়ালের মধ্যের তারা	ζ	৪	৬	০৫	১১	৯	৪·৩
৬	গলার আরম্ভের কাছাকাছি দুইটি তারার আগেরটি	ω	৪	৯	৪০	১২	৯	৬
৭	ঐ দুইটির পরেরটি	θ	৪	১২	২৮	১৩	০	৪
৮	এরপরে গলার ভাঁজের তিনটি তারার মধ্যেরটি	τ^2	৪	১৮	১	১৫	৯	৪·৫
৯	ঐ তিনটির পরেরটি	ι	৪	১৯	২৮	১৪	৩৯	৪·৫
১০	ঐ তিনটির দক্ষিণেরটি	τ^1	৪	১৭	৫৫	১৬	৪২	৪·৫
১১	দক্ষিণের অংশের পাশাপাশি দুইটি তারার উত্তরের অস্পষ্ট তারাটি	439	৪	১৮	৪১	২১	৪২	৬-৭
১২	ঐ দুইটির উজ্জলটি	α	৪	৯	৩১	২২	৩০	২
১৩	বাঁকের নিকটে পরের তিনটি তারার আগেরটি	υ^1	৪	২৮	১০	২৬	০	৪
১৪	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	υ^2	৫	০	১৩	২৩	১৫	৪
১৫	ঐ তিনটির পরেরটি	λ	৫	১	১০	২২	০	৪·৩

১৬	পরের সরলরেখার তিনটি তারার আগেরটি	μ	৫	৭	৫	২৪	৪৫	৩-৪
১৭	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	φ	৫	১০	১	২৩	৩৬	৪-৫
১৮	ঐ তিনটির পরেরটি	ψ	৫	১২	৩৭	২২	০	৩
১৯	পরের ক্রেটার (বাতিয়ার) পায়ের নিকটের দুইটি তারার উত্তরেরটি	β	৫	২০	৪৬	২৫	৩৯	৪
২০	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	χ^1	৫	২১	১০	৩০	২১	৪
২১	এর পরের ত্রিভুজের তিনটি তারার আগেরটি	ξ	৬	০	১	−৩১	৪২	৪-৩
২২	ঐ তিনটির দক্ষিণের এবং মধ্যেরটি	o	৬	৩	১০	−৩৩	৪৮	৪
২৩	ঐ তিনটির পরেরটি	β	৬	৫	১০	৩১	১৫	৩
২৪	কাকের লেজের তারা	γ	৬	১৮	৫৫	১৩	৪৫	৩-৪
২৫	লেজের প্রান্তের তারা	π	৭	১	১০	−১৩	৯	৩-৪

চিত্রের বাইরের অতিরিক্ত তারা

১	মাথার দক্ষিণের তারা	30 Mon.	৪	২	১৬	−২২	৩৯	৩
২	গলার তারা	α Sex.	৪	২৯	৪	−১০	১২	৪

ক্রেটার (কাংস্য باطيه)

১	(ক্রেটারের) বাতিয়ার ভূমির তারা	α	৫	১৫	৫৫	−২২	৪২	৪
২	পাত্রের ভিতরের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	γ	৫	২১	৫৫	১৯	৪৫	৪
৩	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	δ	৫	১৯	১	১৭	৪২	৪

৪	দক্ষিণ মুখের তারা	ζ	৫	২৫	৩৭	১৮	৩৩	৫-৬
৫	উত্তর দিকের তারা	ε	৫	১৮	২২	১৩	২১	৪-৫
৬	দক্ষিণ হাতলের তাবা	η	৫	২৭	৫৫	১৬	১৮	৪-৫
৭	উত্তর হাতলের তারা	θ	৫	২০	৫৫	—১১	২৪	৪-৫

করভাস (করতল غراب)

১	ঠোঁটেব তারা	α	৬	৪	১৩	—২২	০	৩-৪
২	মাথার নিকটে গলাব তারা	ε	৬	৩	৫৮	১৯	১৫	৩
৩	বুকেব তারা	ζ	৬	৬	২৫	১৮	১৫	৫
৪	ডান ও সামনের পাখার তারা	γ	৬	২	৪৬	১৪	১৮	৩
৫	পিছনের পাখার দুইটি তাবার আগেরটি	δ	৬	৫	৩১	১২	০	৩
৬	এই দুইটির পবেবটি	η	৬	৬	১	১১	৩৯	৪
৭	পাযেব শেষের তারা	β	৬	৯	৪০	—১৭	৪৯	৩

সেণ্টরাস (قنطورس)

১	মুখেব চাবটি তারার দক্ষিণেরটি	g	৭	০	২৫	—২২	৯	৫
২	ঐ চারটিব উত্তরেবটি	h	৬	২৯	৩৭	১৯	৬	৫
৩	অবশিষ্ট দুইটিব আগেরটি	i	৬	২৯	১৬	২০	৪৮	৪
৪	ঐ দুইটিব পবেবটি, চারটিব শেষেরটি	k	৭	০	১	২০	০	৫
৫	বাম কাঁধের তাবা	ι	৬	২৫	১৩	২৫	৪৮	৩
৬	ডান কাঁধেব তারা	θ	৭	৪	৪০	২১	৫৭	৩

৭	ডান অংস-ফলকের তাবা	d	৬	২৮	২৫	২৭	৪৫	৫
৮	দ্রাক্ষালতাব চারটি তারাব আগেব দুইটির উত্তবেরটি	ψ	৭	৭	২৫	২৩	০	৪·৫
৯	ঐ দুইটিব দক্ষিণেরটি	a	৭	৮	৩৪	২৪	০	৪
১০	অবশিষ্ট দুইটি তারাব যেটি দ্রাক্ষালতাব প্রান্তে	c^1	৭	১১	১৬	—১৮	৬	৪
১১	ঐ দুইটিব পবেবটি, দক্ষিণেরটি	b	৭	১১	৩৭	—২৯	৪৫	৪
১২	ডান অংশেব তিনটি তাবাব আগেবটি	ν	৭	২	৪৪	২৮	৪৫	৪·৩
১৩	ঐ তিনটির মধ্যেবটি	μ	৭	৩	৪৩	২৯	২৪	৪·৩
১৪	ঐ তিনটির পবেরটি	φ	৭	৪	৫৫	২৭	৪৫	৪
১৫	ডান বাহুব উপবেব অংশেব তারা	χ	৭	৬	৭	২৬	৪২	৪·৩
১৬	ডান বাহুর সামনেব তারা	η	৭	১২	২২	—২৫	৩৩	৩
১৭	ডান হাতেব প্রান্তেব তারা	κ	৭	১৬	৪৬	—২৪	১৫	৪-৩
১৮	মানুষেব শরীব আরম্ভেব উজ্জ্বল তাবা	ζ	৭	৬	৫৫	৫২	৪৮	৩
১৯	এইটিব উত্তবেব দুইটি তাবাব অস্পষ্টটি, পবেরটি	ν^2	৭	৬	৪৩	৩০	৪৮	৫
২০	ঐ দুইটিব পবেবটি	ν^1	৭	৫	৫৫	৩০	০	৫
২১	পিঠেব আরম্ভেব তাবা	ω	৭	১	৫৫	৩৪	৫৪	৫
২২	এব আগেবটি, ঘোড়াব পিঠের তারা	f	৬	২৮	১	৩৭	৪২	৫
২৩	কোমরেব তিনটি তারাব পরেবটি	γ	৬	২৪	৪৩	৪৩	১২	৩

২৪	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	τ	৬	২৩	৪৬	৪০	০	৫
২৫	ঐ তিনটির আগেরটি	σ	৬	২১	৫৫	৪১	০	৫-৪
২৬	ডান উরুর পাশাপাশি দুইটি তারার আগেরটি	δ	৬	২২	৪	৪৬	৬	৩
২৭	ঐ দুইটির পরেরটি	ρ	৬	২৩	১১	৪৮	১৫	৫
২৮	ঘোড়ার বগলের নীচে বুকের তারা	M	৭	৮	১	৪০	৪৫	৫-৬
২৯	পেটের নীচের দুইটি তারার আগেরটি	ε	৭	৬	১	৪৩	০	৩
৩০	ঐ দুইটির পরেরটি। টলেমী এখানে তৃতীয় শ্রেণীর একটি তারার কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা এখানে কোন তারা দেখি নাই।							
৩১	ডান পায়ের গোছার উপরের তারা	γ Crucis	৬	২৯	৪১	৫১	১০	২
৩২	ঐ পায়ের গিরার তারা	β Crucis	৭	৫	১	৫১	৪০	২
৩৩	বাম পায়ের গোছার নীচের তারা	δ Crucis	৬	২৬	১	৫৫	১০	৩-৪
৩৪	ঐ পায়ের ক্ষুরের পিছনের তারা	α Crucis	৭	০	৫১	৫৫	২০	২
৩৫	ঘোড়ার সামনের ডান পায়ের প্রান্তের তারা	α Centari	৭	২৮	১	৪১	১০	১
৩৬	বাম পায়ের হাঁটুর তারা	β "	৭	১৩	৫১	৪৫	২০	২-১
৩৭	পিছনের ডান পায়ের নীচে বাইরের তারা	μ Crucis	৭	৪	২১	−৪৯	১০	৪-৫

লুপাস (শার্দূল)

১	সেন্টরাসের হাতের কাছে, শার্দূলের পায়ের প্রান্তের তারা	β	৭	১৭	৭	—২৫	০	৩
২	ঐ পায়ের উরুর তারা	α	৭	১৫	২৫	৩০	৩	৩
৩	অংসফলকের দুইটি তারার আগেরটি	δ	৭	২১	৪	২১	১৮	৪-৩
৪	ঐ দুইটির পরেরটি	γ	৭	২৩	২৫	২১	১৮	৩-৪
৫	শরীরের ভিতরের তারা	ε	৭	২৭	৩৭	২৫	১২	৪-৩
৬	পাঁজরের নীচে পেটের তারা	λ	৭	১৯	১৯	২৭	৩০	৫
৭	উরুর তারা	π	৭	২০	৭	২৯	১২	৫
৮	উরুর আরম্ভের দুইটি তারার উত্তরেরটি	μ	৭	২২	৩১	২৯	০	৫
৯	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	κ	৭	২২	৪	২৯	৫৭	৫
১০	কোমরের প্রান্তের তারা	ζ	৭	২৫	২১	৩৩	১০	৪-৫
১১	লেজের প্রান্তের তিনটি তারার দক্ষিণেরটি	Lac 5709	৭	৯	৪১	৩১	২০	...
১২	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	ι	৭	১১	১০	৩০	৩৬	৪-৫
১৩	ঐ তিনটির উত্তরেরটি	$\frac{1}{2}(\tau^1+\tau^2)$	৭	১২	২৫	২৯	২৪	৫
১৪	গলার দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	η	৭	২৮	১	১৭	১৮	৪
১৫	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	θ	৭	২৮	১৯	১৫	৪৫	৫
১৬	মুখের দুইটি তারার আগেরটি	χ	৭	২৪	৫৫	১৩	২১	৫-৪

১৭	ঐ দুইটির পরেরটি	ξ	৭	২৬	১	১৩	৩০	৫·৬
১৮	সামনের পায়ের দুইটি তারার দক্ষিণেরটি	1	৭	১৬	৪০	১৩	৬	৬
১৯	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	2	৭	১৬	৫৮	−১১	৩০	৫·৬

আরা (বেদী مجمرة)

১	ভূমির দুইটি তারার উত্তরেরটি	σ	৮	১৭	২১	−২২	৪০	৬
২	ঐ দুইটির দক্ষিণেরটি	θ	৮	২০	১	২৫	৪৫	৪
৩	উপরের অংশের মাঝের তারা	α	৮	১৫	৫১	২৬	৩০	৪·৩
৪	উনুনের তিনটি তারার উত্তরেরটি	ϵ^1	৮	১০	২১	৩০	২০	৫·৬
৫	অবশিষ্ট পাশাপাশি দুইটির দক্ষিণেরটি	γ	৮	১৪	৫১	৩৪	১০	৪·৫
৬	ঐ দুইটির উত্তরেরটি	β	৮	১৪	৪১	৩৩	২০	৪
৭	জ্বলন্ত আগুনের প্রান্তের তারা	ζ	৮	১০	৩১	−৩৪	০	৪

করোনা অস্ট্রালিস (দক্ষিণ কিরীট اكليل جنوبي)

১	দক্ষিণ চাপের প্রান্তের ও আগের তারা	$\frac{1}{2}(\delta^1+\delta^2)$Tel	৮	২৮	৭	−২২	০	৪
২	তার পরেরটি	$\frac{1}{2}(\eta^1+\eta^2)$	৯	১	৩৪	২১	১৮	৬
৩	ঐটিরও পরেরটি	Lac 7909	৯	২	১৬	২০	৩০	৬
৪	তারও পরেরটি	ζ	৯	৩	৫২	১৯	৫১	৫
৫	ধনুর হাঁটুর সামনের তারা	δ	৯	৫	১৬	১৮	১৮	৫·৬

৬	ঐটির উত্তরের তারা	β	৯	৬	১০	১৭	১৮	৫
৭	এরও উত্তরেরটি	κ	৯	৬	১	১৬	১২	৫
৮	এরও উত্তরেরটি	γ	৯	৫	৩৪	১৫	১৫	৫
৯	উত্তরের চাপের আগের দুইটি তারার পরেরটি	ε	৯	৪	১৬	১৫	১২	৬
১০	ঐ দুইটি অস্পষ্ট তারার আগেরটি	ν	৯	৪	১	১৪	৩৯	৬
১১	ঐ দুইটির তারার আগের অন্য তারাটি	λ	৯	১	২৫	১৫	০	৫–৬
১২	ঐটিরও আগেরটি	Lac 7748	৮	২৯	৭	১৬	০	৫–৬
১৩	দক্ষিণের সর্বশেষ তারা	θ	৮	২৮	১	—১৮	৩৬	৫

পিসিস অস্ট্রিনাস (দক্ষিণ মীন حوت جنوبی)

১	মাথার দক্ষিণের বাঁকের তিনটি তারার আগেরটি	β	১০	২০	৪০	—২১	৩০	৪
২	ঐ তিনটির মধ্যেরটি	γ	১০	২৪	১০	২৩	৩০	৪
৩	ঐ তিনটির পরেরটি	δ	১০	২৪	৫৫	২৩	৪৮	৪
৪	পেটের তারা	ε	১০	২৪	৪৬	১৭	৪৫	৪
৫	পিঠের দক্ষিণের পাখনার তারা	μ	১০	১৫	৫৫	২১	০	৫
৬	পেটের দুইটি তারার পরেরটি	ζ	১০	২২	৭	১৬	৪৫	৫-৬
৭	ঐ দুইটির আগেরটি	λ	১০	১৮	৪৭	১৬	১৫	৫

৮	দক্ষিণের পাখনার তিনটি তারার পরেরটি	η	১০	১৫	২২	১৬	৩০	৫
৯	ঐ তিনটির মাঝেরটি	θ	১০	১১	১৯	১৬	৫৪	৫-৬
১০	ঐ তিনটির আগেরটি	ι	১০	১০	২৫	১৮	৩০	৫
১১	লেজের প্রান্তের তারা	γ Gruis	১০	১০	২৫	−২৩	১৫	৩-৪

উলুগ বেগের তারা-তালিকায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ

[বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত নয়। উলুগ বেগের তালিকার মণ্ডল অনুযায়ী সন্নিবেশিত]

উলুগ বেগের ব্যবহৃত শব্দ	শেলবাপের ব্যবহৃত শব্দ	এই বইয়ে ব্যবহৃত শব্দ
دنبال	queue	লেজ
ان	vacine	গোড়া
پیش	avant	সামনে, আগে
پیشانی, پیشین	antérieur	সামনে, আগে
پسین	posterieur	পিছনে, পরে
ضلع	coté	বাহু, অংশ
استقام	droite	সরল
سر	bout	মাথা, গোড়া
انفی	museau	নাক
چشم	yeux, oeil	চোখ
تالی	suivante	পরের
متقدّم	précedente	আগের
طرف	extremité	প্রান্তে
گوشی	oreille	কান
گردن	cou	গলা
سینه	poitrine	বুক
زانو, رکبه	genou	হাঁটু
قدم	pied	পায়ের পাতা
پشت	dos	পিঠ
چپ	gauche	বাম

راست	droit	ডান
بلای	au-dessus	উপরে
شیب	au-dessous	নীচে
شکم	ventre	পেট
فخذ	cuisse	উরু
باقی	restante	অবশিষ্ট
موخّر	derrier	পিছনের
مابض	plié	হাঁটুর বাঁক
برزیر	au-dessous	নীচে
از سوی ,در سوی	loin	দিকে
تاریک	obscure	অস্পষ্ট
میان ,ما بین	entre	মাঝখানে
خفی	obscure	অস্পষ্ট
زبان	langue	জিহ্বা
دهان	gueule	মুখ
زلخ	mâchoire	চিবুক
خط مستقیم	ligne droite	সরল রেখা
عطف	courbure	বাঁক
مشرق	orientale	পূব
مثلث	triangle	ত্রিভুজ
اتلد	suivante	পরে
تابع	suivante	পরে
خرد	petite	ছোট
کمر	ceinture	কোমর
پهلو	côté	পাশে
مماس	touche	স্পর্শ
منکب	epaule	কাঁধ
مرفق	conde	কনুই

بازو	bras	বাহু
کلاه	mitre	মাথার কাপড়, পাগড়ী
دست	main	হাত
کلاب	houlette	লাঠির বাঁক
مشترک	commune	সাধারণ
معصم ,ورنجن	poignet	কব্জী
مقبض	houlette	হাতল
گفته	dit	বলেছেন
ازار	peignoir	আবরণী
پاشنه	talon	গোড়ালী
ساق	jambe	পা
خواندن	lire	পড়া
روشن	brilliante	উজ্জ্বল
نیّر	brilliante	উজ্জ্বল
دیگر	autre	অন্য
نیم	demi	অর্ধ
دائره	circle	বৃত্ত
کنار	extremité	প্রান্ত
رخنه	brisure	ভাঙা
سرون	fesse	নিতম্ব
حرقفه	fesse	নিতম্ব
ران	cuisse	উরু
پسی	pied	পায়ের পাতা
کعْب	cheville	হাঁটু
کعُب	poitrine	বুক
خزف	ecaille	কচ্ছপের খোলা
متوالی	suivent	পরের

قريب	voisine	নিকটে
منشا	racine	গোড়া
قرن	cornes	শিং
شرق	oriental	পূব
نظير	jointure	সংযোগস্থলে
جناح	aile	পাখা
عشاره	plumes	পালক
كرسى	chaise	চেয়ার
ساعد	avant-bras	বাহুর উপরের অংশ
مسند	cuisse	গদি
وسط	milieu	মাঝখানে
سحاب	nebuleux	নীহারিকা, মেঘ
غضالة	mollet	পায়ের গোছা
لفافة	enveloppe	পট্টি
كف	main	হাতের তালু
اخمص	plante	পায়ের তলা
زنخ	machoire	চোয়াল
سوراخ بينى	narine	নাকের ছিদ্র
جهت	dehors	পাশে
نرولا	successivement	পরপর
پيكان	pointe	তীরের আগা
قبضه	roseau	তীরের দণ্ড
مجره	voie lactee	ছায়াপথ
معين	rhomboide	রম্বস
ناف	nombril	নাভি
كتف	omoplate	কাঁধের হাড়
جحفله	lèvre	ঠোঁট

قاعده	base	ভূমি
سرو	corne	শিং
خطم	museau	নাক
بطن	rein	কোমর
قطع	interruption	বাঁক
منخر	naseaux	নাক
سرخ	rouge	লাল
ثريّا	pleiedes	কৃত্তিকা
زبانى	pince	চিমটা
قلب	coeur	বুক
زايد	accessoires	অতিরিক্ত
لبلاب	lierre	আইভি
تارک	sommet	শীর্ষ
اخر	dernier	পিছনের
مقدّم قطاف	Previndemiatrix	—
سنبلة	spica	চিত্রা, শস্যগুচ্ছ
ان دو الاربعه اضلاع	quadrilatère	চতুর্ভুজ
سماک	élevé	উঁচু
اعزل	sans arme	অস্ত্রহীন, বর্শাহীন
ـ اک اعزل	—	চিত্রা, অস্ত্রহীন উঁচু তারা
رامح	lance	বর্শা
سماک رامح	Arcturus	স্বাতী, বর্শা সমেত উঁচু তারা
مضعف	double	জোড়া
جبهة	front	কপাল
خرزه	articulation	জোড়া
نيش	aiguillon	হুল
سوفار	fleche	তীরের ফলা

ذوابة	ruban flottant	আলগা কাপড় বা ফিতা
عصاب	bandeau	সুতা, ফিতা
سوكة	branche	শাখা
ميزاوزد	courant	প্রবাহ
ضمى	sinuosité	বাঁক
مفرد	isoleé	একাকী, একক
ماهى	pisces	মাছ
خيط	noeud	সুতা
عطفه	courbure	বাঁক
عقده	noeud	সুতা
لحى	machoire	চোয়াল
ابرو	sourcil	ভ্রূ
موى	poil	চুল
يش	crimiére	কেশর
شعبه	branche	শাখা
مانده	resemblent	মত
نقطة	point	বিন্দু
ايسر	gouche	বাম
زده	massue	স্তূপ
استين	cuir	হাতের উপরে রাখা চামড়া
شمشير	sabre	তরবারি
مجتمع	ressemblés	একত্রিত
مبداء	commencement	আরম্ভ
گشت	detour	বাঁক
همچنان	encore	একই রূপ
مسافت	intervalle	দূরত্ব
ترس	pavois	নিশান
كوثل	poupe	জাহাজের পিছন দিক

قرش	entrepont	ডেকের উপর
دقل	mat	মাস্তুল
منقطع	interruption	বাধা
سکّان	rame	নোঙর, হাল
عروة	anse	হাতল
کناره	bord	সীমা
منقار	bec	ঠোঁট
قضیب	cep	দণ্ড
کرم	vigne	দ্রাক্ষা
انسان ,مردم	humain	মানুষ
رسغ	safot	পায়ের শিরা
ستور	cheval	ঘোড়া
سرّه	ventre	পেট
اتش	feu	আগুন
زبانه	ardent	শিখা
استدارت	circonference	পরিধি

তৃতীয় ভাগ

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা

সূচনা

প্রাচীন কালে যে সমস্ত দেশ উন্নত ও সভ্য বলে পরিচিত ছিল, সেগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। অন্যান্য দেশের মধ্যে গ্রীস, মিশর, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশও অত্যন্ত উন্নত ছিল। এ সমস্ত দেশ বর্তমানেও এই একই নামে পরিচিত। এইরূপ পরিচিত দেশ ছাড়া আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, ক্যালডিয়া প্রভৃতি প্রাচীন কালের অতি সভ্য ও উন্নত দেশসমূহ আজ আর সেই সমস্ত নামে পরিচিত নয়। মো-হেন-জো-দারো, হারাপ্পা প্রভৃতি প্রাচীন দেশেও সভ্যতার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়; অবশ্য এই সমস্ত দেশ সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ সমস্ত দেশের শিল্প, সাহিত্য, গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল কিনা এবং থাকলেও এ জ্ঞানের মান কি পর্যায়ে ছিল, সে সম্বন্ধে এখনও বিশেষ গবেষণা হয় নাই। ভারতবর্ষের এই সমস্ত আদিম অধিবাসীদের বিষয় জানা গেলে, তবে আদি ও অকৃত্রিম ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রকৃত মান জানা যাবে। বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ ইত্যাদি থেকে যে সমস্ত বিষয় জানা যায়, সে সমস্তই বহিরাগত আর্য জাতির সভ্যতা। গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি দেশের সভ্যতার সঙ্গে এ সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ সমৃদ্ধশালী ও উন্নত দেশ বলে খ্যাত ছিল। একটি অনুন্নত বর্বর দেশকে জয় করবার জন্য আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। খ্যাতিমান ও শক্তিশালী দেশ বলেই সে দেশকে জয় করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক হুইয়েন-ৎ সিয়াং বা ফা-হিয়েন কেবলমাত্র দেশ দেখার জন্যই ভারতবর্ষে আসেন নাই, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানলাভ করা। ভারতবর্ষের

ধনসম্ভার সম্বন্ধে যেমন খ্যাতি ছিল, সে দেশের দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে খ্যাতি ছিল ততোধিক। এ দেশের ধনভাণ্ডার লুঠ করবার জন্য বহিরাগত নানাজাতি এদেশ আক্রমণ করেছে, কিন্তু এর জ্ঞানভাণ্ডার লুঠ করবার আকাঙ্ক্ষা কোন জাতির ছিল বলে মনে হয় না। ইউরোপীয় বণিকগণ এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্যই এসেছিল, এ দেশের দর্শন বা বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মত মন তাদের ছিল না।

ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করেন বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর। অষ্টম শতাব্দীতে তিনি ভারতবর্ষ থেকে কঙ্ক নামে একজন জ্যোতির্বিদকে তাঁর দরবারে নিয়ে যান। এবং তাঁর সাহায্যে সিন্দহিন্দ নামে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্ম-স্ফুটসিদ্ধান্তকেই সিন্দহিন্দ নামে অনুবাদ করা হয়। এ ছাড়া আরকন্দ (খণ্ড-খাদ্যক) এবং আল-আরজাওয়াদ (আর্যভট্ট?) নামে দুইখানা বইও আরবীতে অনুবাদ করা হয়। মোট-কথা ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান বহির্জগতে প্রবেশ করে মুসলিম শাসকদের কল্যাণে, খলিফা-আল মনসুরের সময়ে, অষ্টম শতাব্দীতে।

খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান ইয়ামীনউদ্দৌলা মাহমুদের (যিনি সাধারণতঃ সুলতান মাহমুদ নামে পরিচিত) সভাসদ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও পণ্ডিত আবু রায়হান আল-বেরুনী ভারতবর্ষে আসেন এবং দীর্ঘ বারো বৎসর তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি বিশদভাবে পাঠ করেন। এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সংস্রবে আসেন এবং তাঁদের সাথে সমস্ত বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনাও করেন। গ্রীক বিজ্ঞান এবং দর্শনেও আল-বেরুনী সুপণ্ডিত ছিলেন। এর ফলে তিনি গ্রীক ও ভারতীয় উভয় দেশের দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলকভাবে সমালোচনা করতে সক্ষম হন। ভারতবর্ষ হতে গজনীতে ফিরে যাওয়ার পর, আল-বেরুনী

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানাকে সংক্ষেপে 'কিতাবুল হিন্দ' বলা হয়। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশদ আলোচনা করেছেন এবং গ্রীক ও তদানীন্তন মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বার্লিনের রয়াল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এডওয়ার্ড সাকাও আল-বেরুনীর এই গ্রন্থখানির প্রথম জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে ইংরেজীতেও অনুবাদ করেন। প্রধানতঃ এই বইখানার এই দুই অনুবাদের ভিতর দিয়েই ভারতবর্ষের জ্ঞান-গরিমা পাশ্চাত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুদের জাতীয় জীবনের সমস্ত দিকই এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার বিবরণ সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস, আল-বেরুনীর এই বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ Al-Beruni's India.

প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অত্যন্ত গোঁড়া ও সংরক্ষণশীল ছিলেন। তাঁদের এই গোঁড়ামীর ফলে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত অনিষ্টকরভাবে শিকড় গেড়ে বসে। মনুর অনুশাসনে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, যে ব্যক্তি কোন বিশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন, সে শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যেন কোন কথা না বলেন বা কোন ব্যবস্থা না দেন। অনুরূপভাবে কোন ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ না করা পর্যন্ত সেই ব্যবসা পরিচালনা না করার জন্যও নির্দেশ ছিল। মনুর এই অনুশাসন বিকৃত করবার ফলেই পরে বিষময় জাতিভেদ প্রথা গড়ে ওঠে। যিনি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতেন, তিনি গোপনীয়তার সাথে তাঁর লব্ধ জ্ঞান রক্ষা করতেন। তিনি মনে করতেন যে, দেবতারাও সেই জ্ঞান লাভের যোগ্য নয়। এর ফলে এই জ্ঞান, এবং এমনিভাবে ভারতীয় জ্ঞান ও দর্শনের অন্যান্য শাখারও প্রচার ও উন্নতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বংশপরম্পরায় মুখে মুখে নানাভাবে বিকৃত হয়ে কয়েকটি বিশেষ পরিবারের মধ্যেই এই সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন কিছু প্রচারের আবশ্যক হলেই

রূপকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এইভাবে সাধারণ লোককে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের আদেশ-নির্দেশ দিয়েই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ক্ষান্ত ছিলেন। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বা উৎসব কি জন্য পালন করতে হবে সে সম্বন্ধে কতকগুলি আজগুবী উপকাহিনী রচনা করেই জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখা হতো। স্বদেশেই যখন এই সমস্ত জ্ঞানের প্রচার এইভাবে বন্ধ করে রাখা হয়, তখন বিদেশে এর প্রচার কল্পনাও করা যায় নাই। যে সমস্ত বিদেশীয়গণ নানাভাবে এ দেশের সংস্পর্শে এসেছিলেন, হিন্দু পণ্ডিতগণ তাঁদিগকে ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণাই করতেন। তাঁদের বিদেশী-বিদ্বেষ এত বেশী ছিল যে, তাঁরা মনে করতেন যে বিদেশীয়গণ অস্পৃশ্য, তাদের স্পর্শ করলেই অপবিত্র হতে হয় এবং স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। যে শাস্ত্র দেবতারাও জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য নয়, বিদেশীয়গণের পক্ষে সে শাস্ত্র সম্বন্ধে জানা কল্পনাতীত ছিল। এইরূপ যখন অবস্থা, তখন আল-বেরুনীর পক্ষে ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অসম্ভব ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান মাহমুদের সভাসদ। সুলতান মাহমুদের উপর্যুপরি ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষ তখন পর্যুদস্ত ও সন্ত্রস্ত। এহেন লোকের সভাসদকে উপেক্ষা করবার মত সাহস নিশ্চয়ই কারো ছিল না। সে জন্যই তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত বিশদভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মুসলমান শাসন আমলে মুসলমানেরা এদেশের অধিবাসী হয়েছিলেন, তবু তাঁদের ম্লেচ্ছ অপবাদ ঘোচে নাই। বরং যবন শব্দটি কেবলমাত্র গ্রীস দেশবাসীদের জন্যই প্রযুক্ত না হয়ে, মুসলমানেরাও যবন নামে অভিহিত ও ঘৃণিত হতে থাকে। মুসলমান বাদশাহগণ হিন্দুদের ধর্ম-কর্মে কোনদিনই বাধা দেন নাই; আর তাদের অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল ভেদ ক'রে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করাও মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই কারণেই ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে নানাকর্মে নিযুক্ত কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং এ সমস্ত বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। যে সমস্ত বিষয়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, সে সব সম্বন্ধেই তাঁরা বেশী অনুসন্ধিৎসু হন। ভারতীয়গণ যে পৃথিবীর আদিম সভ্য জাতির অন্যতম, এ সম্বন্ধে সকলেরই প্রায় একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহের জন্য উপরোক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তৎপর হয়ে ওঠেন এবং অতি আদিম যুগ থেকে ভারতবর্ষের সভ্যতার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুসমাজের নিকট হ'তে এ বিষয়ে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই। নানাপ্রকার আজগুবী কাহিনী ও উপকথার ভিতরে তাঁরা নিজেদের অতীতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, বর্তমান কলিযুগে মানুষ অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এই যুগে তাকে অশেষ দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল অতীত যুগের সমস্তই ছিল মহিমান্বিত ও সুখময়। সত্য ও ত্রেতা যুগের লোকদের কোন রোগ, শোক, কষ্ট কিছুই ছিল না, তারা সম্পূর্ণ সুখী ছিল। যুগের সংজ্ঞা অনুসারে ভারতীয় সভ্যতা লক্ষ লক্ষ বৎসরের প্রাচীন বলেই দাবী করা হয়। 'লক্ষ লক্ষ বৎসর' না হলেও এই সভ্যতা যে অতি প্রাচীন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না এবং এই সভ্যতার বয়স ও উপকরণ নির্ণয়ের জন্য উপরোক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সচেষ্ট হন। পুরাতন পুঁথিপত্রে যে সমস্ত নৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ আছে, সেগুলির সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার যুগ নির্ণয়ে তাঁরা চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু-কাহিনীসমূহ এমন অস্পষ্ট এবং অলৌকিক উপকথায় আবৃত যে, সে সমস্ত থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

সমস্ত প্রাচীন সভ্য জাতিই দাবী করে যে, নিজেদের দেশের বা জাতির সভ্যতা, অন্য যে কোন দেশ বা জাতির সভ্যতার চাইতে

প্রাচীন। বনেদীয়ানায় কে কত বড, এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা বরাবরই চলে এসেছে। ভারতবর্ষের ন্যায় মিশর, চীন এবং পারস্যও নিজেদের সভ্যতাকেই প্রাচীনতম বলে দাবী করে থাকেন। এই সমস্ত জাতি তাদের সভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে সমস্ত অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করে, সেগুলি হয়তো বা কোন পূর্বপুরুষের বীরত্বগাথা বা প্রেম-কাহিনী বংশপরম্পরায় তাদের কাছে প্রচারিত হয়ে আসছে। আবার এমনও হতে পারে যে, এমন কোন ঘটনা সত্যভাবে কোনদিনই ঘটে নাই, কোন কাহিনীকারের মনগড়া কাহিনীই যুগ যুগ পরে সত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এইরূপ কাহিনীতে যখন কোন নৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, গণনা করে সেই ঘটনার কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। এতে সেই নৈসর্গিক ঘটনার কাল হয়তো নির্ণীত হতে পারে, কিন্তু সেই সভ্যতার প্রাচীনতার কাল এতে নির্ণীত হয় কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রাচীনতার সন্ধান পাশ্চাত্য জগতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে। Memoirs of Academy of Science-এ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার কতকগুলি নির্ঘণ্ট প্রকাশের ফলেই, পাশ্চাত্য জগত সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সন্ধান পায়। এই নির্ঘণ্টকে শ্যাম দেশীয় নির্ঘণ্ট বলা হয়। এরপরে ভারতবর্ষে অবস্থিত ফরাসী মিশনারিগণের নিকট থেকে আরো দুই প্রস্থ নির্ঘণ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত এই নির্ঘণ্টগুলি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্বিদ 'ল্য জঁ্যতাঁ' এই নির্ঘণ্টের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন। তিনি নিজে যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, তখন ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট থেকে গ্রহণ-কাল নির্ণয়ের ভারতীয় পদ্ধতি শিক্ষা করেন এবং তাঁদের নিকট থেকে কতকগুলি নিয়মাবলী প্রাপ্ত হন। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে 'ল্য জঁ্যতাঁ' উপরোক্ত একাডেমীতে এই নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। এই নির্ঘণ্ট ত্রিভোলীয় নির্ঘণ্ট নামে পরিচিত।

'ম'শিযে বেলী' নামে অন্য একজন ফবাসী জ্যোতির্বিদ "Traite de l' Astronomie Indienne" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে তিনি উপবোক্ত নির্ঘণ্টসমূহের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বেলীর এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক প্লেফেযার এডিনবরার রযাল সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে তিনি বলেন যে, "তিনি নিজে নূতনভাবে সমস্ত গণনা কবিযা দেখিযাছেন যে, গ্রন্থকার যাহা বলিযাছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। নানাপ্রকাব নির্ঘণ্ট ও তালিকাদিব সাহায্য লইযা দেখা গিযাছে যে, ত্রিভোলীর নির্ঘণ্ট-কালের যে আবম্ভ ধরা হইযাছে, তাহা খ্রীস্টপূর্ব ৩১০২ অব্দের ১৭ এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যবাত্রি।"

এই সমস্ত গণনা দ্বাবা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা যায়:

(১) যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভাবতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি গঠিত, সেগুলি থেকে মনে হয় যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কোন এক সময়কে কালের আদি বলে মনে করতেন।

(২) ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক নির্ঘণ্টসমূহে এত প্রাচীন উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত নির্ঘণ্টে যে সমস্ত ঘটনা ও বিধি-বিধানের সন্ধান পাওযা যায়, সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের।

(৩) যে সমস্ত নির্ঘণ্ট পাওযা গেছে, সেগুলি একই মূল থেকে গৃহীত।

(৪) এই সমস্ত নির্ঘণ্ট প্রণযনের জন্য যথেষ্ট পবিমাণ জ্যামিতি, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যাব জ্ঞানের প্রযোজন। অতএব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, যে সমস্ত পণ্ডিত এই নির্ঘণ্ট প্রণযন করেছিলেন, তাঁরা এই সমস্ত শাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন এবং এই সমস্ত শাস্ত্রের ঐ সমযে যথেষ্ট উন্নতি সাধনও

হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ঐ সমস্ত নির্ঘণ্ট অনেকটা আধুনিক কালে প্রণয়ন করা হয়।

বেলীর গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে, খ্রীস্টপূর্ব ৩১০২ অব্দে মেষরাশির আদিতে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের সংযোগ হয়েছিল। এই সময়ে এদের খ-দ্রাঘিমাংশ ছিল ১০ রাশি ৬ ডিগ্রী এবং হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই দ্রাঘিমাংশে নির্ণয় করেছিলেন বলে দাবী করেন। কিন্তু এই মতবাদ অনেকেই খণ্ডন করেছেন। খ্রীস্টপূর্ব ৩১০২ অব্দে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের কোন সংযোগ হয় নাই, তবে সেগুলি যথেষ্ট নিকটবর্তী ছিল। হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ প্রত্যক্ষভাবে এই সংযোগ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়তো পরবর্তী যুগে গণনার সাহায্যে তাঁরা ঐ সময় পেয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই কালের আদি বলে কল্পনা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিঃ ব্রেন্নাণ্ড ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন। তিনি স্যার উইলিয়াম জোন্স্, মঁশিয়ে বেলী, ডেভিস, কোলব্রুক, বেণ্টলী, উইলফোর্ড, ম্যাক্স্মুলার প্রভৃতি মনীষিগণের গ্রন্থ ও রচনা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, যে ভাবেই উক্ত নির্ঘণ্টসমূহ প্রণয়ন করা হউক না কেন, খ্রীস্টীয় যুগের বহু পূর্বেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন এবং অতি সূক্ষ্মভাবে গণনা করবার দক্ষতাও লাভ করেন। পরবর্তী যুগের হিন্দু জ্যোতির্বিদগণের গ্রন্থে এমন অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়, যার ফলে মনে হয় যে, অনেক প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ বিষুব-চলন সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন এবং এই চলনের গতিও তাঁরা নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু এই মতবাদ সমর্থন করবার মত কোন প্রমাণ কোন গ্রন্থকারই দিতে পারেন নাই। বরং যে সমস্ত গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে, সেগুলি সমস্তই খ্রীস্টীয় যুগের পরে, আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের অনেক

পরে। এ সমস্ত তত্ত্ব যে গ্রীক জ্যোতির্বিদগণের নিকট থেকে পাওয়া, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আর কোন অবকাশ নাই।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম অংশে কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিত প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহশীল হন। অবশ্য এঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল এক; যে ভাবেই হউক হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার অতি-প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা। ম্যাক্‌স্‌মুলার, থিব প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সমস্ত ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, সে সমস্ত ক্ষেত্রে এঁরা অতি কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, খ্রীস্টীয় যুগের বহু বৎসর পূর্ব থেকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ সে সমস্ত ক্ষেত্রে দক্ষতা লাভ করেছিলেন। এই প্রমাণের জন্য তাঁরা যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন, তার অধিকাংশই হাস্যকর। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে। যাই হোক, হিন্দু-জ্যোতির্বিদ্যা তথা হিন্দু-সভ্যতার অতি প্রাচীনতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত পণ্ডিতগণ যথেষ্ট গবেষণা ও মস্তিষ্ক চালনা করেছেন। এঁদের মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় তাঁর The Orion-এ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী এবং শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতও এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ করেছেন তদানীন্তন কটক কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়। উড়িষ্যার অন্তর্গত কেওঞ্ঝরাধিপতি শ্রীমন মহারাজ ধনুর্জয় নারায়ণ ভঞ্জদেব মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, সংহিতা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিশেষভাবে অনুসন্ধান ক'রে তিনি ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার উৎস

যে সমস্ত উৎস হতে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায়, এখানে সেই সমস্ত উৎস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হবে।

বেদ

ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগবেদ। এই ঋগবেদ হতেই যজু ও সামবেদের উৎপত্তি হয়। এই তিন বেদকে একত্রে ত্রয়ীবেদ বলা হয়। এর অনেক পরে অথর্ববেদ প্রণীত হয়। অবশ্য হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, বেদ কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। দেবতাদের নিকট হতে মুনি-ঋষিগণ এই সমস্ত বেদ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন এবং শিক্ষা লাভও করেন। সেজন্য এগুলিকে শ্রুতিও বলা হয়। প্রত্যেক বেদ দুই অংশে বিভক্ত: সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতায় বেদমন্ত্র অর্থাৎ দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনা লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্মের বিধি-বিধান এবং নানা প্রকার আখ্যান দেওয়া আছে। ঋগবেদে দুইখানি ব্রাহ্মণ আছে, ঐতরেয় বা আশ্বালায়ন এবং কৌষীতকী বা সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ। যজুর্বেদে তৈত্তিরীয় ও শতপথ এই দুইখানি ব্রাহ্মণ এবং সামবেদে আটখানি ব্রাহ্মণ আছে। অথর্ব বেদে গোপথ নামে একখানি মাত্র ব্রাহ্মণ আছে।

বেদাঙ্গ

বেদের আনুষঙ্গিক ছয় প্রকার শাখা আছে। এগুলিকে বেদাঙ্গ বলে। এগুলি শ্রুতিরই অঙ্গবিশেষ। সেজন্য এদের ও বেদের মত

মান্য দেওয়া হয়। এই বেদাঙ্গগুলির পঞ্চম বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ। এতে গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া আছে। জ্যোতিষ বেদাঙ্গ হওয়াতে এবং হিন্দুদের যাবতীয় ধর্ম-কর্মে গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান জানার প্রয়োজন হওয়াতে, হিন্দুদের সকল শাস্ত্রেই জ্যোতিষের উল্লেখ আছে এবং প্রায় সকল যুগেই জ্যোতিষের চর্চা করা হয়েছে। অবশ্য এখানে চর্চা অর্থে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় মাত্র বুঝানো হয়েছে, তার বেশী কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। এই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ, সংহিতা এবং সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে জ্যোতিষের আলোচনা করা হয়েছে।

জ্যোতিষ

ভারতীয় জ্যোতিষ তিন শাখায় বিভক্ত : গণিত, হোরা এবং সংহিতা। যে শাখায় গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকে গণিতশাস্ত্র বা তন্ত্র বলে। হোরা শাস্ত্রে গ্রহগণের অবস্থান ও লগ্ন অনুযায়ী যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতির শুভাশুভ নির্ণয় করা হয় এবং জন্মকালে গ্রহগণের অবস্থান দৃষ্টে জাতকের কোষ্ঠী নির্ণয় করা হয়। যে শাস্ত্রে জ্যোতিষের সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়, তাকে সংহিতা বলে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণিত-শাখা আবার দুই প্রকার : সিদ্ধান্ত ও করণ। সিদ্ধান্তে প্রমাণাদি প্রয়োগের পরে প্রত্যেকটি গণনার ফল নির্ণয় করা হয়। করণে কেবল-মাত্র গণনা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকে। অবস্থান বিষয়ক সূত্র দ্বারা গ্রহের অবস্থান নির্ণয় করা যায়, কি উপায়ে সেই সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে, করণে তার কোন উল্লেখ নাই। সম্পূর্ণরূপে করণের উপরে নির্ভর করবার ফলেই, ভারতবর্ষ থেকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চা বিলুপ্ত হয় এবং কালক্রমে জ্যোতির্বিদ্যার পরিবর্তে জ্যোতিষের আবির্ভাব হয়। তথা-কথিত জ্যোতিষীগণ কোষ্ঠী ইত্যাদি প্রণয়ন এবং করণের সাহায্যে নানাবিধ গণনা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই।

পুরাণ

হিন্দু-ধর্মে বেদের পরেই পুরাণের স্থান। পুরাণ অর্থ প্রাচীন। প্রাচীন কালের উপাখ্যান ও জনশ্রুতি দিয়েই পুরাণ গঠিত। বেদ এবং উপনিষদের তত্ত্বকথা নানা গল্প ও কাহিনীর আকারে জনসাধারণ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেই পুরাণ প্রণয়ন করা হয়, অনেকেরই এই ধারণা। প্রত্যেক পুরাণেই শিব অথবা বিষ্ণুর উপাখ্যান আছে। অনেক স্থলে একই উপাখ্যান বিভিন্ন পুরাণে একই আকারে উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক সময় এই সমস্ত উপাখ্যানের ভাষা পর্যন্ত এক। এতে মনে হয়, সমস্ত পুরাণেরই উৎস এক। কোন কোন পুরাণে কোন উপাখ্যানের কেবলমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করা হয় নাই। এতে মনে হয়, অনেক উপাখ্যানই জনসাধারণের নিকট এত বেশী প্রচলিত ছিল যে, সেগুলির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন বলে মনে করা হয় নাই।

পুরাণের মোট সংখ্যা আঠারো। অধিকাংশ পুরাণের জন্মকাল প্রাচীন হতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন যুগে বহুবিধ অনুলিপিকার দ্বারা পুরাণ লিখিত হয়েছে। অনুলিপিকারগণ তদানীন্তন মতবাদ অনুযায়ী নানাবিধ নূতন বিষয় ও ঘটনা বিভিন্ন পুরাণে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অনেক সময় প্রাচীন কাহিনীর পরিবর্তে নূতন কাহিনীর প্রচলন করেছেন। এজন্য অধিকাংশ পুরাণই তাদের প্রাচীনত্ব হারিয়ে ফেলে। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বায়ু পুরাণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়; এবং একমাত্র বিষ্ণুপুরাণেই পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিবরণে প্রায় সকল পুরাণই একমত, এমনকি স্থানে স্থানে শ্লোক পর্যন্ত এক।

পুরাণে জ্যোতিষ

পুরাণে জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা আছে বটে, তবে সে সমস্তই রূপক ও কাহিনী দ্বারা আচ্ছন্ন। সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের গতির বর্ণনা দিতে নানাপ্রকার রূপকের আশ্রয় লওয়া হয়েছে। তারামণ্ডল সম্বন্ধে

আলোচনা করতে যেযে নানাপ্রকার কাহিনী রচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক খ-পদার্থে মানুষের স্বভাব আরোপ করা পুরাণ মাত্রেরই বিশেষত্ব। সূর্য ভ্রমণ করে, কিন্তু সূর্যের মত শক্তিশালী মহিমান্বিত কোন মানুষ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে পারে না ; অতএব সূর্যের ভ্রমণের জন্য রথের কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু রথ তো আপনা-আপনি চলতে পারে না, সেজন্য সে রথ টানার জন্য অশ্বের কল্পনাও করা হয়েছে। সেই অশ্বের সংখ্যা কারোর মতে সাত, আবার অনেকের মতে বারো। গ্রহগণ আকাশে বিচিত্র গতিতে চলাফেরা করেন, পৃথিবীর ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং পৃথিবীর মানুষ ও ঘটনাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। পুরাণে গ্রহসমূহের জন্মবৃত্তান্ত, হিংসা, প্রেম ইত্যাদি মানবীয় গুণসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে।

সংহিতা

সংহিতা অর্থ সংকলন গ্রন্থ। হিন্দুদের যাবতীয় কাজ-কর্মের বিধি-বিধান সংহিতাতে লিপিবদ্ধ থাকে। সংহিতাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি ব্যবহারিক ভাগ, অন্যটি ফলভাগ। তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী কাজ করবার বিধানসমূহ যে ভাগে লিপিবদ্ধ থাকে, তাকে ব্যবহার-ভাগ বলে ; আর যে ভাগে নৈসর্গিক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে কর্মের শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, তাকে ফলভাগ বলে। ফলভাগের উপর নির্ভর করেই গণক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবহার-ভাগের জন্য জ্যোতি-র্বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ যদিও এ সমস্ত বিষয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা করে গেছেন এবং এতে দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী যুগে এই সমস্ত মনীষীকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁদের বর্ণিত বিষয়সমূহকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয় এবং ফলভাগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেজন্য ভারতবর্ষে জ্যোতিষী অর্থে সাধারণতঃ কোষ্ঠী প্রস্তুতকারক, গণক এবং গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দৃষ্টে ভবিষ্যদ্বক্তাকেই বোঝায়। ফল গণনায়

মানুষকে যত আকৃষ্ট করে, আর কিছুই ততো করে না। সেজন্য অতি প্রাচীন কাল থেকেই ফল-গণনার যথেষ্ট প্রসার লাভ করে এবং অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই ফল-গণনা দ্বারা মানুষ জীবিকা অর্জনের পন্থা অবলম্বন করে। মনুসংহিতাতে পর্যন্ত ফল-গণকের প্রতি তীব্র তিরস্কার করা হয়েছে। নক্ষত্রসূচক অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের সাহায্যে ফল গণনাকারী অধঃশিরা নামক নরকে গমন করে, বিষ্ণু-পুরাণে এরূপ উল্লেখ আছে। মনে হয়, এই সমস্ত ফল-গণনাকারীর উপদ্রব ও অনিষ্টকারিতা লক্ষ্য করেই এই সমস্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতিষ চর্চার প্রতি কোথাও কোন নিষেধ আরোপ করা হয় নাই এবং এই শাস্ত্রের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা বোধে 'তপস্বীর ন্যায় একাগ্রচিত্তে' জ্যোতিষ চর্চা করতে বলা হয়েছে।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতীয় জ্যোতিষ সংহিতার আকার ধারণ করে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার যাবতীয় জ্ঞান সংহিতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত প্রাচীন সংহিতার কোন সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না। কোন কোন সংহিতা পরে সিদ্ধান্ত নামেও আখ্যাত হয়। আবার কোন কোন গ্রন্থ পরবর্তী যুগের লেখকদের কল্যাণে নূতন নামে ও নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার টীকাকার উৎপলভট্ট খ্রীস্টাব্দ দশম শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাঁর সময়ে যে সমস্ত জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাদের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে। তিনি ঋষিপুত্র, বৃহস্পতি, বলভদ্র, ভানুভট্ট, ব্যাস, সিদ্ধসেন, বীরভদ্র প্রভৃতি অনেকের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এঁদের কোন গ্রন্থের কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

মনুসংহিতা, গর্গ-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতার নাম পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে বরাহমিহির বৃহৎ-সংহিতা রচনা বা সংকলন করেন। ভট্টোৎপল এই সংহিতার টীকা লেখেন। কাশীর রাজকীয় প্রধান সংস্কৃত পাঠশালার জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় নানাস্থান থেকে ভট্টোৎপলের টীকা

সম্বলিত বৃহৎ-সংহিতার উদ্ধার করেন এবং বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নের পর এর একটি সংকলন প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ গণিতের একটি শাখা। এতে প্রমাণাদি দ্বারা গণনা করা হয়। সিদ্ধান্তেই ভারতীয় জ্যোতিষ পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তী যুগে সিদ্ধান্তসমূহকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করবার জন্যই হিন্দুগণ জ্যোতিষ-চর্চা পরিত্যাগ করেন এবং ফল-গণনা, কোষ্ঠী রচনা, শুভাশুভ নির্ণয় ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকেন। সিদ্ধান্তই ভারতীয় জ্যোতিষের শেষ উৎস।

ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পাঁচখানি সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির নাম (১) সূর্যসিদ্ধান্ত, (২) বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, (৩) পৌলিশ সিদ্ধান্ত, (৪) রোমক সিদ্ধান্ত ও (৫) ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত। আল-বেরুনীর মতে এ সমস্ত সিদ্ধান্তই পৈতামহ সিদ্ধান্ত থেকে গৃহীত। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তকেই পৈতামহ সিদ্ধান্ত বলা হয়।

সূর্যসিদ্ধান্ত

অনেকে সূর্যসিদ্ধান্তকেই প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন যে, স্বয়ং সূর্যদেব এই গ্রন্থের রচয়িতা। ময়াসুরের স্তবে তুষ্ট হয়ে সূর্য তাঁকে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। বর্তমানে প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্তের প্রথমেই লেখা আছে, "সত্য যুগ অল্প" অবশিষ্ট থাকতে ময়াসুরকে স্বয়ং সবিতা এই গ্রহ চরিত দান করেন। বরাহমিহির সূর্য-সিদ্ধান্তকে প্রথম সিদ্ধান্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। আল-বেরুনী বলেন, সূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতার নাম লাটদেব। লাট শব্দটি অভারতীয়। অনেকে এই শব্দটিকে বিদেশীয় (টলেমী) বলে মনে করেন। বরাহমিহির বলেছেন, লাটাচার্য যবনপুরের (গ্রীসের) সাথে সংস্রব রাখতেন। যে ময়কে সূর্যসিদ্ধান্ত অর্পণ করা হয় তিনি একজন অসুর। সুতরাং তিনি অভারতীয়

না হলেও অনার্য তো বটেই! কিন্তু আর্যগণের পূর্বে যে অতি সভ্য অনার্য জাতি ভারবর্ষের অধিবাসী ছিল, তাদের সভ্যতার কোন চিহ্ন আর্যগণ কোথাও রাখেন নাই বা উল্লেখও করেন নাই। অবশ্য রাবণের স্বর্ণ-লঙ্কা ইত্যাদির উল্লেখ ছাড়া, অনার্যদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কোন কথা কোথাও বলা হয় নাই। সেজন্য ময় ভারতীয় অনার্য এমন মনে করবার কোন সম্ভাবনা নাই। অনেকে মনে করেন সূর্য-সিদ্ধান্তের অসুর ময় এবং গ্রীক টলেমী একই ব্যক্তি। জ্ঞান-ভাস্কর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ময় রোমকপুরের অধিবাসী। অশোকলিপিতে টলেমীকে তুরময় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনেকের মতে, এই তুরময় শব্দই পরে ময়তে পরিণত হয় এবং অ-ভারতীয় ও অনার্য-বোধে টলেমীই শেষ পর্যন্ত অসুর-ময়তে পরিণত হন। এমন ধারণা করাতে যোগেশ-চন্দ্র রায় মহাশয় উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন যে, 'এরূপ অনুমানে সাহস প্রকাশ পায় বটে, তবে সাহস অর্থে প্রগলভতাও বুঝায়।

বর্তমানে প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্তে যে সমস্ত তালিকা দেখা যায়, সেগুলি খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নয়। এর পূর্বে এই সিদ্ধান্তের কী রূপ ছিল, জানবার কোন উপায় নাই। অতএব এই সিদ্ধান্তের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যত কথাই প্রচার করা হোক না কেন, এতে যে গ্রীক টলেমীর প্রভাব আছে, তাতে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ নাই।

অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত যথেষ্ট প্রাচীন এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। আল-বেরুনী বলেন যে, 'ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের রচয়িতা ব্রহ্মগুপ্ত। তাঁর পিতার নাম জিষ্ণু। মুলতান ও অনিলওয়ালার মধ্যবর্তী গ্রাম ভিন্নমালায় তাঁর জন্ম হয়'। ডক্টর থিব মনে করেন, এই সিদ্ধান্তখানি বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, গর্গ-সংহিতা প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন। এরূপ মনে করার কারণ, বেদে যেমন পাঁচ বৎসরের একটি কালের উল্লেখ আছে, এই সিদ্ধান্তেও সেইরূপ আছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের ন্যায় এই সিদ্ধান্তেও ধনিষ্ঠাকে আদি নক্ষত্র বলে মনে করা হয়েছে। সেজন্য মনে হয়, বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হওয়ার কিছু পরেই ব্রহ্মসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল।

বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধান্ত দুই-খানি গ্রীক বা রোমীয় জ্যোতিষ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

ভারতীয় জ্যোতিষের কাল

ভারতীয় জ্যোতিষের উৎস আলোচনা কালে দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় আর্যদের সর্ব-প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, তারপরে ব্রাহ্মণ, পুরাণ, সংহিতা ও সিদ্ধান্ত। অতএব ভারতীয় জ্যোতিষের কালকে সাধারণ ভাবে এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়।



রেখাচিত্র ৫৩ : ঋগবেদে বর্ণিত পিনাক-পাণি রুদ্র

বেদ রচনার কাল

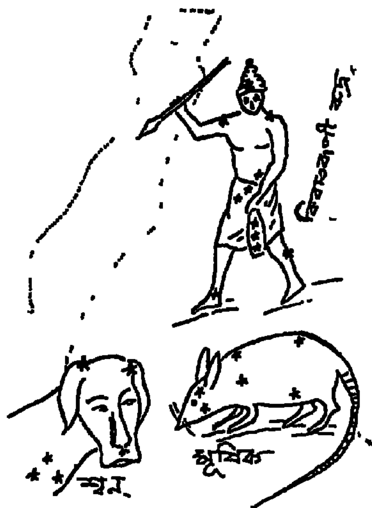
ঋগবেদের নানাবিধ ঋক ব্যাখ্যা করে লোকমান্য গঙ্গাধর বাল তিলক এবং অধ্যাপক জেকবী এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, ঋগবেদে যে সমস্ত

ঘটনার উল্লেখ আছে, সে সমস্ত আলোচনা করলে মনে হয় যে, সেই সময়ে বিষুবন-বিন্দুর অবস্থান ছিল মৃগশিরা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। এই হিসাবে বেদে উল্লিখিত ঘটনাবলীর সংঘটনের কাল খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭০ অব্দের নিকটবর্তী কোন সময় বলে মনে হয়। তবে ঐ সমস্ত ঘটনা সংঘটন কালে বেদ রচিত হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণের কাল

বেদের পরেই ব্রাহ্মণের কাল আসে। ঋগবেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে অনেক জ্যোতিষ-তত্ত্ব উপাখ্যান আকারে বর্ণিত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "একদা প্রজাপতি স্বীয় কন্যা উষার প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাতে উপগত হইবার সংকল্প করিলেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া দেবতাগণ নিজেদের ঘোরতম অংশ একত্রিত করিয়া ভূতবানের সৃষ্টি করিলেন। সেই ভূত-বান প্রজাপতি, অকৃতকে শরবিদ্ধ করিয়া আকাশে গমন করিলেন। লোকে তাহাকে মৃগ ও মৃগব্যাধ বলে। প্রজাপতি দুহিতা রোহিত নামক মৃগে রূপান্তরিত হইলেন; আকাশে তাহা রোহিণী নক্ষত্র হইল।" এই উপাখ্যানের ব্যাখ্যা ক'রে অনেকেই ব্রাহ্মণ রচনার কাল নির্ণয় করেছেন। এই ব্যাখ্যা কতটা যুক্তিসহ সেটা বিবেচনার বিষয়। এই সমস্ত ব্যাখ্যাকারিগণ বলেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এমনকি মহাভারতেও আছে যে, যজ্ঞই প্রজাপতি এবং যজ্ঞই সম্বৎসর। সম্বৎসর ব্যাপী সত্র নির্বাহ হতো, এজন্য যজ্ঞের নাম সম্বৎসর। আবার যজ্ঞ না করলে প্রজা সৃষ্টি হয় না, এজন্য যজ্ঞই প্রজাপতি। অতএব উপরের উপাখ্যানে প্রজাপতি অর্থে সম্বৎসর বোঝানো হয়েছে বলেই এই সমস্ত ব্যাখ্যাকারীর ধারণা। উপরের উপাখ্যান থেকে এও বোঝা যায় যে, রোহিণী নক্ষত্র প্রজাপতির কন্যা। প্রজাপতি অর্থ বৎসর; বৎসরের কোন একটি অংশে সূর্যের রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান করাকেই,

রোহিণীকে প্রজাপতির কন্যা বলে ব্যাখ্যা করা হয়। 'নিজ কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাতে উপগত হইত' এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে,



রেখাচিত্র ৫৪ : অথর্ববেদে বর্ণিত কিরাতরূপী রুদ্র

সেই সময়ে রোহিণী নক্ষত্রে বিষুবনের অবস্থান ছিল। বেদ-বেদাঙ্গ যুগে মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবনের অবস্থান ছিল; হিন্দু পণ্ডিতগণ বেদ পাঠে সে কথাই অবগত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-যুগে তাঁরা পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখলেন যে, বিষুবন মৃগশিরা নক্ষত্রে সংঘটিত না হয়ে রোহিণী নক্ষত্রে সংঘটিত হচ্ছে। এটাকে তাঁরা প্রকৃতির বা সম্বৎসর রূপী প্রজাপতির অন্যায় আচরণ বলে মনে করলেন এবং নিজ কন্যার উপর উপগত হওয়া উপাখ্যান তৈরী করলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা করে অনেকে প্রতিপাদন করেন যে, ব্রাহ্মণ রচনার সময় বিষুবনের অবস্থান ছিল রোহিণী নক্ষত্রে। বিষুবন-চলন সম্বন্ধে ঋষিগণ অজ্ঞ ছিলেন বলেই ঐ উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়। বিষুবন-চলনের হিসাব করে গণনা করলে দেখা যায় যে, ঐ

উপাখ্যান রচনা বা বিষুবনের মৃগশিরা থেকে রোহিণী নক্ষত্রে স্থানান্তরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় খ্রীস্টপূর্ব ২৩১০ অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে। অবশ্য এই হিসাবে যথেষ্ট গোলমাল আছে। প্রতি নক্ষত্রে ৮০০ সেকেণ্ড পরিমিত স্থান এবং ঐ স্থান অতিক্রম করতে বিষুবনের প্রায় ৯৬০ বৎসর সময় দরকার হয়। অতএব মৃগশিরা বা রোহিণী নক্ষত্রে বিষুবন সংঘটিত হতো, এ দ্বারা ঐ নক্ষত্র দুইটির ঠিক কোন্ জায়গায় বিষুবনের অবস্থান ছিল, সম্যক বোঝা যায় না। অতএব এতে দেখা যায়, বেদ ও ব্রাহ্মণ রচনার সম্ভাব্য যে কালের কথা উপরে বলা হয়েছে, প্রকৃত কাল তার চেয়ে এক হাজার বৎসর কম হতে পারে। অতএব বেদ রচনার কাল খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ এবং ব্রাহ্মণ রচনার কাল খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, সে সময় রোহিণী নক্ষত্র বলতে রোহিণী তারা বা আলদাবরানকেই বুঝানো হতো। তাহলে ব্রাহ্মণ রচনার কাল খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ই হয়।

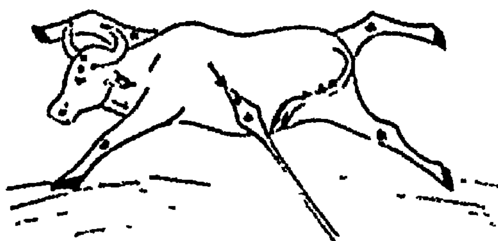


রেখাচিত্র ৫৫ : ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কালপুরুষ কাহিনী

তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে কৃত্তিকা নক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র বলে গণ্য করা হয়েছে। ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে মঘা নক্ষত্রে শীতায়নের

শেষ হবে, অর্থাৎ এক দেড় মাস পরেই শীত ঋতুতে বসন্ত বিষুব সংঘটিত হবে। এই হিসাবে বৈদিক ঋষিদের ঋতু গণনার সঙ্গে বর্তমান ১৫০০ বছরের বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষে আছে, শ্রবিষ্ঠা (ধনিষ্ঠা) নক্ষত্রের আদিতে সূর্য উত্তর দিকে এবং অশ্লেষার (অর্ধাংশে) দক্ষিণ দিকে গমন করে। এই উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গতি সর্বদা মাঘ ও শ্রাবণ মাসে সংঘটিত হয়। উত্তরায়ণ কালে দিন বৃদ্ধি ও রাত্রি হ্রাস হয়। দক্ষিণায়ন কালে এর বিপরীত হয়। দক্ষিণায়নের নির্দেশিত পরিমাণ ও মুহূর্ত অধ্যায় না, ইত্যাদি। এই সকল উক্তি হতে জানা যায় যে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচনার সময় সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হতো ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আদিতে এবং শেষ হতো অশ্লেষায়। আরো জানা যায় যে, উত্তরায়ণ আরম্ভ কালে চন্দ্র ও সূর্য একত্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে একযোগে অবস্থান করতো, তখন থেকেই বৎসরের আরম্ভ হতো। এর পূর্বে কখনও বসন্ত বিষুব আবার কখনও উত্তরায়ণের শেষ হতেই বৎসর গণনা করা হতো। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হতে নূতন বৎসর গণনার



লেখচিত্র ৫৬ ঃ মৃগকে শরাঘাত করা হয়েছে।
এ আকাশের সেই মৃগশিরা

রীতি পরিবর্তিত হয়েছিল। পূর্বে পূর্ণিমা থেকে চান্দ্রমাস গণনা করা হতো। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় অমাবস্যা হতে চান্দ্রমাস গণনার

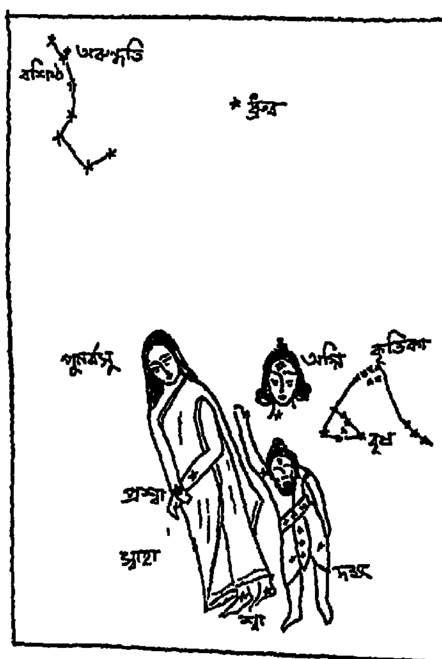
রীতি প্রচলিত হয়। যখন অশ্লেষার অর্ধাংশে সূর্যের উত্তরায়ণ শেষ হতো, তখনই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এতে হিসাব করলে পাওয়া যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হয়।

ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গ কাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাল নির্ণয় করতে যেয়ে ডক্টর মার্টিন হগ বলেছেন, "ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে আর্যগণ জ্যোতিষে যথেষ্ট জ্ঞানবান ছিলেন। প্রত্যেক যজ্ঞ আরম্ভ করিবার নির্দিষ্ট সময় ছিল। কোন্ মাসের কোন্ নক্ষত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে, ব্রাহ্মণে তাহার বিধান দেওয়া থাকিত। রবির দক্ষিণায়ন সময়ে কোন যজ্ঞই আরম্ভ করিবার নিয়ম ছিল না। সংবৎসর ব্যাপী, ষষ্টিবৎসর ব্যাপী, শতবর্ষ ব্যাপী (এমনকি সহস্রবর্ষ ব্যাপী) যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইত। সংবৎসর ব্যাপী যজ্ঞগুলি সূর্যের গতি অনুসরণ করিত। এই প্রকার যজ্ঞ দুইভাগে বিভক্ত হইত। প্রত্যেক ভাগ শেষ করিতে ত্রিশ দিনের মাসের ছয়মাস সময় লাগিত এবং মধ্যভাগে বিষুবন থাকিয়া উভয় ভাগকে পৃথক করিত। ব্রাহ্মণ রচনার বহু পূর্ব হইতেই যজ্ঞসমূহ প্রচলিত ছিল। ইহাতে বিস্ময়েরও কিছু নাই। কারণ, খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ রবির অয়নান্ত কাল নিরূপণ করিতে পারিত। অতএব অধিকাংশ ব্রাহ্মণ খ্রীস্টপূর্ব ১২০০-১৪০০ সনের ভিতরের রচনা বলা যাইতে পারে। তবে কোন কোন মন্ত্র আরো কয়েক শত বৎসরের পুরাতন হইতে পারে। এজন্য বৈদিক সাহিত্যের আরম্ভকাল খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ২৪০০ সনের ভিতরের বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।"

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় এবং তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম নক্ষত্রসমূহের নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া নক্ষত্রসমূহের দেবতা এবং কোন কোন নক্ষত্রের নামের ব্যুৎপত্তি ও দেবতা আছে। এ ছাড়া আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে নক্ষত্র

গণনায় কৃত্তিকাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। হিন্দু পণ্ডিতগণ, বিশেষ করে যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে, ঐ সময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবন ছিল, সেজন্যেই এরূপ করা হয়েছে। ডক্টর থিব এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, "কৃত্তিকায় বিষুবন থাকিত বলিয়াই যে কৃত্তিকাকে আদি নক্ষত্র বলিয়া গণ্য করা হইত, ইহার কোন প্রমাণ নাই। বিষুবন হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।"



রেখাচিত্র ৫৭ : স্বাহা, অগ্নি ও সপ্তর্ষিমণ্ডল

সংহিতা কাল

সংহিতা রচনার কোন কাল নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। নানা-প্রকার বর্ণনা দ্বারা অনেকটা হেঁয়ালীর মত অবস্থার সৃষ্টি করা হয়।

কোন কোন বর্ণনা অত্যন্ত প্রাচীন কালের, আবার কোন কোন বর্ণনা বেশ আধুনিক কালের। কেহ কেহ বলেন, পরাশরই আদি সংহিতা রচয়িতা। কোন সময়ে পরাশরের আবির্ভাব হয়েছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার টীকাকার ভট্টোৎপল অগস্ত্য-তারার উদয়াস্ত কাল গণনা পরাশর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মতে, পরাশর বলেছেন, 'হস্তানক্ষত্রে সূর্য প্রবেশ করিলে অগস্ত্য-তারা দৃশ্য হন এবং রোহিণীতে প্রবেশ করিলে অগস্ত্যতারা অদৃশ্য বা অস্তগত হন।' বরাহমিহির অন্য এক জায়গায় বলেছেন, "পূর্বের শাস্ত্র-সমূহে উল্লেখ আছে যে অশ্লেষার অর্ধে রবির দক্ষিণায়ন এবং ধনিষ্ঠার আদিতে রবির উত্তরায়ণ হইত।" 'পূর্বশাস্ত্র' অর্থে উৎপল পরাশরের সংহিতা বুঝাতে চেয়েছেন। পরাশর তন্ত্র থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মৃগশিরার প্রথম থেকে অশ্লেষার অর্ধেক পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। সূর্যের উত্তরায়ণ শেষ হলেই গ্রীষ্মের শেষ হয়। আর্দ্রার আদিতে এখন সূর্যের উত্তরায়ণ শেষ হয়। সুতরাং পরাশরের সময় হতে এখন এক্ষণে প্রায় সাড়ে তিন নক্ষত্র পিছিয়ে পড়েছে। প্রতি নক্ষত্র অতিক্রম করতে প্রায় ৯৬০ বৎসর দরকার হয়। এইভাবে হিসাব করলে প্রায় ৩৩৬০ বৎসর পূর্বে অশ্লেষার অর্ধে গ্রীষ্মের শেষ হত। ঐ সময়েই যদি পরাশরের কাল হয়, তাহলে তিনি খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলে মনে হয়।

অন্যদিকে পরাশর তন্ত্র থেকে এও জানা যায় যে, তাঁর সময় যবন অর্থাৎ গ্রীকগণ পশ্চিম ভারতে বাস করতেন। অতএব পরাশরের আবির্ভাবের কাল নিশ্চিতভাবে আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের পরে। এতে তাঁকে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বেশী প্রাচীন বলে মনে করা যায় না।

গর্গ-সংহিতার রচয়িতা গর্গ। মহাভারতে যে গর্গের উল্লেখ আছে, তিনিই সংহিতা লেখক গর্গ। বীথি গণনার নানাপ্রকার পদ্ধতি আলো-চনা করে এবং নানাপ্রকার অতি কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে যোগেশচন্দ্র রায়

মহাশয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, গর্গ খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু গর্গের গ্রন্থে গ্রীকগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন, "যবনেরা যদিও ম্লেচ্ছ, কিন্তু বিজ্ঞানে তাহারা অতি সুপণ্ডিত। সেজন্য তাঁহারা ঋষিগণের ন্যায় সম্মানযোগ্য।" গ্রীকদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "হিংস্র বীর যবনেরা অযোধ্যা, পাঞ্চাল ও মথুরা দখলের পর কুসুমধ্বজ পর্যন্ত উপস্থিত হইবে এবং তাহারা পুরুষপুর অধিকার করিবার পরে সমস্ত দেশে অরাজকতা বিরাজ করিবে।" তিনি আরো বলেছেন, "অপরাজেয় যবনেরা মধ্য-ভারতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না। কিছুদিন পরেই তাহাদের নিজেদের ভিতরেই ভীষণ যুদ্ধ হইবে এবং অবশেষে তাহারা ধ্বংস পাইবে।" তারপরেই তিনি বলেছেন, "যবনদের পরেই শকেরা প্রতাপশালী ছিল।" এ সমস্ত বিবেচনা করলে গর্গকে প্রথম শতাব্দীর চেয়ে প্রাচীন বলে কোনমতেই অনুমান করা যায় না।

সিদ্ধান্ত কাল

সিদ্ধান্তেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা পূর্ণতা লাভ করে। সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ব্রহ্ম বা পৈতামহ সিদ্ধান্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ডক্টর থিব মনে করেন, এই সিদ্ধান্তখানি গর্গ সংহিতার ন্যায় প্রাচীন। অতএব এই সিদ্ধান্ত খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচনা বলে মনে করা যেতে পারে। ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থসমূহের ভিতরে সূর্যসিদ্ধান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এর আদি রচয়িতা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অসুর ময়কে গ্রীক টলেমী বলেই আমাদের মনে হয়। সূর্য-সিদ্ধান্ত নামে একাধিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর অনেকগুলিই অপেক্ষা-কৃত আধুনিক। এই সমস্ত সূর্যসিদ্ধান্তে যে সমস্ত তালিকা দেওয়া আছে, সেগুলি কোনক্রমেই খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন হতে পারে না।

পুরাণ কাল

অষ্টাদশ পুরাণের তালিকাতে ব্রহ্ম-পুরাণের নাম সকল তালিকাতেই প্রথম স্থানে উল্লেখ আছে। এই পুরাণকে অনেক সময় আদি পুরাণ বলা হয়। এতে সৃষ্টির বিবরণ, মন্বন্তর বর্ণনা, সূর্য-বংশ ও চন্দ্র-বংশের কাহিনী ইত্যাদি আছে। অনেক পণ্ডিতের মতে, এই পুরাণখানি খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা। জগৎ যখন স্বর্ণপদ্ম ছিল, সেই সময়ের যাবতীয় ঘটনা পদ্মপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। এই পুরাণে পাঁচটি খণ্ড এবং একটি পরিশিষ্ট আছে। মিঃ উইলসনের মতে, পদ্মপুরাণের কোন অংশই খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নয়। শেষের খণ্ডগুলি পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলেই তিনি মনে করেন। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিষ্ণু-পুরাণ যথেষ্ট প্রাচীন। একমাত্র এখানেই পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরাণের বর্তমানে যে রূপ দেখা যায়, তা খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী অপেক্ষা বেশী প্রাচীন নয়। শিব বা বায়ুপুরাণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। শিব বা রুদ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। মৎস্য ও ভগবত পুরাণ একে মহাপুরাণ বলে অভিহিত করেছেন। মিঃ উইলসন এই পুরাণের সম্ভাব্য কোন রচনা-কালের উল্লেখ করেন নাই। অন্যান্য পুরাণ অনেক পরবর্তী সময়ের রচনা।

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে জ্যোতিষের বিশেষ কোন চর্চা হয়েছিল বলে মনে হয় না। এরপরে উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ হলেন, আর্যভট্ট। ইনি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের ধারণা, এঁর জন্মকাল ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ। এর প্রায় ২৫ বৎসর পরে লল্ল তাঁর 'শিষ্যধী-বৃদ্ধি' নামে গ্রন্থখানি রচনা করেন। অনেকে মনে করেন, লল্ল আর্য-ভট্টের শিষ্য ছিলেন। তিনি আর্যভট্টের কোন কোন মতবাদ খণ্ডন করবার চেষ্টাও করেছেন। ঠিক এই সময়েই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরও জীবিত ছিলেন। তিনি নিজে কোন পৃথক গ্রন্থ না লিখে পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা নামে প্রাচীন পাঁচখানি সিদ্ধান্তের সার সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থে আর্যভট্টের নাম আছে। তাঁর অন্য আর একটি

বিখ্যাত গ্রন্থের নাম বৃহৎ-সংহিতা। এই সুবৃহৎ জ্যোতিষগ্রন্থে না আছে এমন বিষয় নাই। এতে ছাগ-বিদ্যা, গো-বিদ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রহ-গণনা পদ্ধতি পর্যন্ত আছে। অনেকের মতে, ৫০৫ খ্রীস্টাব্দে বরাহমিহিরের



রেখাচিত্র ৫৮ : কালপুরুষের নিকটবর্তী আকাশ

জন্ম হয়। এরপরে জ্যোতিষাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি ৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত। এই বইখানি খলিফা আল-মনসুরের আদেশে সিন্দহিন্দ নামে আরবীতে অনুবাদ করা হয়।

ব্রহ্মগুপ্তের আবির্ভাবের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে ভারতে পুনরায় উল্লেখযোগ্যভাবে জ্যোতিষ চর্চা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ। এঁর সময়েই ভারতীয় জ্যোতিষ পূর্ণতা লাভ করে এবং এঁর পরেই জ্যোতিষ-শাস্ত্র করণ-শাস্ত্রে পরিণত হয়। এরপরে কোষ্ঠী-গণনা, শুভাশুভ নির্ণয় ইত্যাদি কার্যেই জ্যোতিষী-গণ ব্যস্ত থাকেন। ভাস্করাচার্যের পরে আর কোন ভারতীয় পণ্ডিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র চর্চা করেন নাই। এঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণিই বর্তমানে ভারতীয় জ্যোতিষীদের একমাত্র সম্বল। এই গ্রন্থেই ভাস্করাচার্য অয়ন-চলন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং তার গতিও নির্ণয় করেছেন। তাঁর বীজগণিত ও লীলাবতী নামে পাটিগণিত সর্বজনপ্রসিদ্ধ।

ভাস্করাচার্যের তিরোধানের সাথে সাথে ভারতের জ্যোতিষ ভাস্করও অস্তমিত হয়।

ভারতীয় জ্যোতিষে খ-গোল

ভারতীয় জ্যোতিষে বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড : পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড

ভারতীয় জ্যোতিষের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে একমাত্র পুরাণেই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বেদ, ব্রাহ্মণ, সংহিতা বা সিদ্ধান্ত অন্য কোথাও বিশ্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

পুরাণ মতে সৃষ্টির আদিতে সর্বত্র পানি ছিল। এ পানি ক্রমে ঘুরতে থাকে এবং তা থেকে ফেনার উৎপত্তি হয়। এ ছাড়াও পানি থেকে আর এক প্রকার সাদা জিনিস বের হয়। সৃষ্টিকর্তা এই সাদা জিনিসটা থেকে একটা ডিম বা অণ্ড সৃষ্টি করেন। এই ডিমটি ফেটে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এই ডিমের ভিতর থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। সেজন্য একে ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই ফাটা ডিমের এক অংশ পৃথিবী এবং অন্য অংশ আকাশ। ডিমটি ফাটবার সময় যে সমস্ত টুকরা অংশ পড়ে,

পুরাণ মতে সেইগুলিই বৃষ্টি। এখানে আল-বেরুনী মন্তব্য করেছেন যে, এই ভাঙ্গা টুকরাগুলোকে বৃষ্টি না বলে পাহাড় বললেই বেশী সঙ্গত হতো।

ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন নির্ণয়ের জন্য পাতঞ্জলীর টীকাকার সর্বনিম্ন অংশ থেকে আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন:

"ব্রহ্মাণ্ডের সর্বনিম্ন অংশে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ যোজন বিস্তৃত গাঢ় অন্ধকার। ইহার পরেই নরক। নরকের বিস্তৃতি ১৩ কোটি ১২ লক্ষ যোজন। ইহার পরে আবার ১ লক্ষ যোজন অন্ধকার। এই অন্ধকারের উপরে বজ্র। কঠিন আবরণের জন্য ইহাকে বজ্র বলে। ইহার বিস্তৃতি ৩৪,০০০ যোজন। ইহার উপরে ৬০,০০০ যোজন ব্যাপী গর্ভ বা মধ্য-পৃথিবী। গর্ভের উপরে ৩০,০০০ যোজন ব্যাপী স্বর্ণ-পৃথিবী। ইহার উপরে সপ্ত পৃথিবী; ইহাদের প্রত্যেক পৃথিবীর বিস্তার ১০,০০০ যোজন। ইহার সর্বোপরি পৃথিবীতে সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত-সমুদ্র বিদ্যমান। জল-সাগরের পরে লোকালোক, সেখানে কোন প্রাণী নাই। ইহার উপরে ১ কোটি যোজন স্বর্ণভূমি। তাহার উপরে ৬১,৩৪,০০০ যোজন পিতৃলোক।

সপ্তলোকের সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড। ইহার বিস্তৃতি ১৫ কোটি যোজন। সর্বোপরি আবার গাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকারের বিস্তৃতিও সর্বনিম্ন অংশের বিস্তৃতির সমান, অর্থাৎ ১ কোটি ৮৫ লক্ষ যোজন।"

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, "ভূমণ্ডলে সাতটি পাতাল আছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, শ্রেষ্ঠ-সুতল ও পাতাল। এই পাতালের প্রত্যেকটি ১০ হাজার যোজন পরিমিত। এই সপ্ত পাতালের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ শোভিত ভূমিসকল যথাক্রমে শুক্লা, কৃষ্ণা, অরুণা, পীতা, শর্করা, শৈলী ও কাঞ্চনী। এই সকল স্থানে দানব, দৈত্য, শত শত যক্ষ এবং মহানাগ জাতি সকল বাস করে। নারদ পাতাল হইতে স্বর্গে গিয়া দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 'পাতাল সকল স্বর্গলোক অপেক্ষাও রমণীয়। সেখানে নাগ-সকলের মাথায় উজ্জ্বল ও মনোহর মণি আছে। পাতালের তুল্য স্থান অন্য কোথাও নাই। সূর্য-

কিরণ সেখানে কেবলমাত্র আলো দেয়, তাপ দেয় না। চন্দ্রকিরণের আলো ছাড়া শীতের বাহুল্য নাই। সেখানে সকলেই অতি উপাদেয় পানাহারে এবং দৈত্য দানব-কন্যা বিহারে মত্ত থাকেন। সময় বলিয়া সেখানে কিছু নাই। পাতালসমূহের সর্বনিম্নে বিষ্ণুর "শেষ" নামে যে তামসী তনু আছে, তাঁহার এক হাজার মাথা। দৈত্য, দানব, দেব, দেবতাগণ সকলেই তাঁহার পূজা করে। তাঁহার সহস্র ফনামণি দ্বারা দশদিক উজ্জ্বল করিয়া অসুরদিগকে নিবীর্য করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার ফণার উপরে ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া পাতালমূলে অবস্থিত আছেন। তিনি মস্তক নাড়িলে ভূ-মণ্ডল কম্পিত হয়।'

ভূ-মণ্ডলের এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্য-মণ্ডল; তাহার এক লক্ষ যোজন উপরে চন্দ্রমণ্ডল। তাহার এক লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল। ইহার দুই লক্ষ যোজন উপরে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহ মণ্ডল। শনিগ্রহ মণ্ডলের এক লক্ষ যোজন উপরে সপ্তর্ষি মণ্ডল। তাহার এক লক্ষ যোজন উপরে ধ্রুব মণ্ডল। এই ধ্রুব-মণ্ডলের চারদিকে সমস্ত জ্যোতিষ্ক পরিভ্রমণ করে।

পৃথিবীর যতদূর পা দ্বারা গমন করা যায়, তাহার নাম ভূর্লোক; পৃথিবী হইতে সূর্য-মণ্ডল পর্যন্ত ভুবর্লোক; সূর্য হইতে ধ্রুবমণ্ডল পর্যন্ত স্বর্লোক।

ভূ-মণ্ডল হইতে ধ্রুবলোক পর্যন্ত ত্রৈলোক্য। ধ্রুবলোক হইতে এক কোটি যোজন উপরে মহর্লোক; তাহার এক কোটি যোজন উপরে জন-লোক। তাহার আট কোটি যোজন উপরে তপঃলোক। তাহার বারো কোটি যোজন উপরে সত্যলোক। এই সত্যলোক ব্রহ্মলোক নামে খ্যাত।

এই সপ্তলোক এবং সপ্ত-পাতাল লইয়া ব্রহ্মাণ্ড। এই চৌদ্দ-ভুবন লইয়া গঠিত ব্রহ্মাণ্ডের উপরে, নীচে এবং সমস্ত দিকে অণ্ড-কটাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই অণ্ড-কটাহের বিস্তার এক কোটি যোজন। তাহার দশগুণ অম্বুবেষ্টন। তাহার পরে বহ্নি, বায়ু, আকাশ, ভূতাদি মহত্ত্ব

প্রত্যেকটি দশগুণ কবিষা বিস্তৃত। এইরূপ সাতটি আববণ দ্বারা পরিবৃত আছে। এই প্রকৃতি অনন্ত। ইহাব পবিমাণ করিতে পারা যায না। ইহাতে চৌদ্দ-ভুবন লইয়া গঠিত ব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থান কবিতেছে।" (বিষ্ণু-পুরাণ ২।৭)

উপবের বর্ণনা থেকে দেখা যায, পুরাণকাব বা পুরাণেব যুগেব পূর্বযুগেব ভারতীয জ্যোতির্বিদগণ মনে করতেন যে, চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য নিকটবর্তী এবং নক্ষত্র-মণ্ডল (মুসলিম ও গ্রীক জ্যোতির্বিদগণেব তাবা-গোলক) বুধ-মণ্ডল অপেক্ষাও নিকটবর্তী। পুরাণকারগণ সাত শব্দটিকে অত্যন্ত পছন্দ কবতেন। তাদেব প্রত্যেক বিষযে সাতের এত বেশী ব্যবহাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

আদি পুবাণে ব্রহ্মাণ্ডকে সূর্যদেবেব বিভিন্ন অঙ্গ বলে আখ্যা দেওয়া হযেছে। মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্বর্গ-লোকসমূহ এবং নাভি থেকে পাযেব পাতা পর্যন্ত সাতটি পাতাল। আল-বেরুনী থেকে নীচের তালিকা উদ্ধার কবা হলো ঃ

		পাতালসমূহের নাম		
ক্রমিক সংখ্যা	সূর্যদেবেব অঙ্গ	আদিত্য পুরাণ	বিষ্ণুপুরাণ	বায়ুপুবাণ
১	নাভি	তল	অতল	অভস্তল
২	উরুদেশ	সুতল	বিতল	ইলা (?)
৩	হাঁটু	পাতাল	নিতল	নিতল
৪	জানু	অসাল	গভস্তিমৎ	গভস্তিমৎ
৫	পাযেব নলা	বিশাল	মহাতল	মহাতল
৬	পাযের গিবা	সুতল	সুতল	সুতল
৭	পাযের পাতা	রসাতল	পাতাল	পাতাল

		লোকসমূহের নাম
১	পেট	ভূর্লোক
২	বুক	ভুবর্লোক
৩	মুখ	স্বর্লোক
৪	চোখের ভ্রূ	মহর্লোক
৫	কপাল	জনলোক
৬	কপালের উপরাংশ	তপঃলোক
৭	মস্তক	সত্যলোক

বিভিন্ন পুরাণে পাতালসমূহের নাম বিভিন্ন হলেও সমস্ত পুরাণে লোকসমূহের নাম একই।

মৎস্য-পুরাণ বলেন, "এই জগতে হাজার হাজার দ্বীপ রহিয়াছে। কেহই সমস্ত দ্বীপ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় বলিতে পারে না। তাহা হইলে ভূ-মণ্ডলকে সপ্তদ্বীপ বলা হয় কেন? মানুষের কল্পনায় যাহা আসে, তাহাই বলে। ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ নাই। যাহা অচিন্ত্য ও পরিমাণ-যোগ্য নহে, সে সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় লইতেই হয়।" আল-বেরুনী মনে করেন, হিন্দুগণ সাত সংখ্যাটিকে কোন বিশেষ কারণে পবিত্র বলে মনে করত; সেজন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই সাত সংখ্যাটির প্রাচুর্য দেখা যায়। সাত দ্বীপ, সাত সমুদ্র, সাত পাতাল, সাত লোক, সাত আবরণ ইত্যাদি। এর সঙ্গে আবার সাতগ্রহ (এবং তা থেকে সাতদিন) এবং সাত বায়ুও যোগ করা হয়েছে।

বায়ু এবং কূর্ম-পুরাণে সাত বায়ু এই প্রকার। ভূমি থেকে মেঘ পর্যন্ত আবহ বায়ু; মেঘ-মণ্ডল হ'তে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত প্রবহ বায়ু; সূর্যমণ্ডল থেকে চন্দ্রমণ্ডল পর্যন্ত উদবহ বায়ু; চন্দ্রমণ্ডল থেকে নক্ষত্র-মণ্ডল পর্যন্ত সংবহ বায়ু; নক্ষত্র-মণ্ডল থেকে গ্রহমণ্ডল পর্যন্ত বিবহ বায়ু; গ্রহমণ্ডল থেকে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পর্যন্ত পরাবহ বায়ু এবং সর্বশেষে সপ্তর্ষি-মণ্ডল থেকে ধ্রুব-মণ্ডল পর্যন্ত পরিবহ বায়ু।

নীচে ব্রহ্মাণ্ডের উপরের অংশের ছেদাংশ দেওয়া গেল। এখানে ভূ-লোক থেকে ধ্রুবলোক পর্যন্ত এক স্কেল এবং ধ্রুবলোক থেকে অণ্ডকটাহ পর্যন্ত অন্য প্রকার স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে।

রেখাচিত্র ৫৯ : ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশের ছেদাংক

ভারতীয় জ্যোতিষে পৃথিবী

বেদে পৃথিবী

বেদের ঋকসমূহ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত। বিভিন্ন পদের মধ্যে সামঞ্জস্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্য বেদের ব্যাখ্যা অত্যন্ত

দুরূহ। বিভিন্ন পণ্ডিত একই ঋকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রাচীন ঋষিগণকে সর্বজ্ঞানের অধিকারী প্রতিপন্ন করতে গিয়ে কোন কোন পণ্ডিত এত হাস্যকর কল্পনার আশ্রয় নেন যে, তাঁরা ইতিহাসের ধারা ভুলে যান। এখানে একটি ঋকের দুইটি ব্যাখ্যা উদ্ধার করে এই হাস্যকর কল্পনার উদাহরণ দেওয়া গেল।

ঋকবেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে ৯ম ঋকের অনুবাদে বেদপারগ সত্যব্রত সামশ্রমি মহাশয় বলেন:

> "পৃথিবী সূর্যকে দক্ষিণে রাখিয়া সতত ঘুরিতেছে; সূর্যশক্তি এই ঘুরানো-কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ঈদৃশ শক্তিসমূহের মধ্যস্থলে গর্ভ-দেবতা অচলভাবে স্থির রহিয়াছেন। যেন বৎস গোকে দেখিতেছে, পশ্চাৎ হাম্বারব করিতেছে। এইরূপে যোজনত্রয়ে বহুরূপতা সৃষ্টি হইতেছে।"

সামশ্রমি মহাশয় এর বিশদ ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> "দক্ষিণে বলিয়াই পৃথিবীর একটি নাম দক্ষিণা। গর্ভ—সূর্যই সৃষ্টিকর্তা। তাঁহা হইতেই জগত প্রসূত হইয়া থাকে, এজন্য সবিতাও ইহার নামান্তর। বৎস—পৃথিবীর রস পান করেন বলিয়া সূর্য পৃথিবীর বৎস। গো—পৃথিবী সতত গমনশীল বলিয়া গো শব্দে পৃথিবী। হাম্বারব—পাদ; পৃথিবীর বেগ ভ্রমণজাত শব্দ। যোজন—যোজক—পৃথিবীতে পূর্বে তিনটি যোজক বলিয়া যোজনত্রয়ে পৃথিবী। বহুরূপতা—রূপ শব্দে নানাবর্ণ এবং স্থাবর জঙ্গম সর্ববিধ উৎপন্ন বস্তুও বুঝায়। তৎসমুদয়ের উৎপত্তির বা প্রকাশের হেতুও সেই সূর্য-সংযোগ।"

অর্থাৎ, সামশ্রমি মহাশয় বলতে চান যে, বেদের এই ঋকে বলা হয়েছে যে, সূর্য স্থির এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ভ্রমণ করে। সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ অত্যন্ত আধুনিক কালের; বেদ রচয়িতাকে এই মতবাদে বিশ্বাসী বলে স্বীকার করলে, বেদ প্রাচীন বলে স্বীকার করা কঠিন। উপরের

ব্যাখ্যাতে দেখা যায় যে, এই ঋকে সূর্যকে একবার প্রসূতি বলা হয়েছে, আবার পৃথিবীর বৎসও বলা হয়েছে। এই কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা অত্যন্ত হাস্যকর।

এই একই ঋকের অনুবাদে শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখেছেন,

"মাতা (দ্যুলোক) অভিলাষ-পূরণ-সমর্থা (পৃথিবীর) ভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। গর্ভভূত (জলরাশি) মেঘ পঙতির মধ্যে ছিল। বৎস শব্দ করিল এবং তিনের যোগে বিশ্বরূপী গাভীকে দেখিল।"

এর ব্যাখ্যাতে তিনি লিখিছেন,

"বৃষ্টিজল শব্দ করিয়া পড়িল এবং তিনের যোগে অর্থাৎ মেঘ, বায়ু ও কিরণের যোগে গাভীরূপী পৃথিবী বিশ্বরূপী হইলেন অর্থাৎ নানা-প্রকার শস্যাচ্ছাদিত হইলেন।"

দুইটি ব্যাখ্যার পার্থক্য অত্যন্ত বিস্ময়কর।

পুরাণে পৃথিবী

বিষ্ণুপুরাণ বলেন,

"সাত সমুদ্র এবং তাহাদের পরিবেষ্টিত সাত সমুদ্র লইয়া পৃথিবী গঠিত। এই সকল দ্বীপের মধ্যস্থলে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত। ইহা লবণ-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ দ্বীপে একটি সুবর্ণময় পর্বত আছে, তাহার নাম মেরু পর্বত। উহা ৮৪০০০ যোজন উচ্চ; মাটির নীচে ইহার ১৬০০০ যোজন প্রোথিত আছে। ইহার উপরিভাগ ৩২০০০ যোজন বিস্তৃত এবং নিম্নভাগের বিস্তার ১৬০০০ যোজন। পৃথিবী পদ্মফুলের মত এবং মেরুপর্বত উহার কর্ণিকা বা বীজকোষ-স্বরূপ। ইহার দক্ষিণে হিমবান, হেমকুট ও নিষধ নামে তিনটি পর্বত আছে এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী নামে তিনটি পর্বত আছে। মধ্যস্থ দুই পর্বত, নীল ও নিষধ প্রত্যেকে পূর্ব-পশ্চিমে ১ লক্ষ যোজন করিয়া দীর্ঘ। হেমকুট ও শ্বেত প্রত্যেকে ৯০,০০০

যোজন করিয়া দীর্ঘ এবং হিমবান ও শৃঙ্গী প্রত্যেকে ৮১,০০০ যোজন করিয়া দীর্ঘ। প্রত্যেকটি পর্বত ২০০০ যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণ বিস্তৃত। মেরুর দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষ, তারপর কিম্পুরুষ বর্ষ এবং সর্বশেষ হরিবর্ষ। মেরুর উত্তর দিকে রম্যক, তারপর হিরণ্ময় এবং সর্বোত্তরে কুরুবর্ষ। ইহাদের প্রত্যেকটি বর্ষ ৯০০০ যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃত বর্ষে মেরুর চারিদিকে চারটি পর্বত আছে। ঈশ্বর কর্তৃক মেরুর বিকম্ভ অর্থাৎ ধারণার্থ উহার শঙ্কুস্বরূপ নির্মিত হইরা উহার চারিদিকে প্রত্যেকটি ১০,০০০ যোজন উচ্চ। পূর্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব পর্বত। এই সকল পর্বতে যথাক্রমে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বটবৃক্ষ রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ ১১০০ যোজন দীর্ঘ এবং ইহারা পর্বত শিখরে ধ্বজার মত শোভা পায়। জম্বু গাছ হইতেই দ্বীপের নাম হইয়াছে জম্বুদ্বীপ। সেই জম্বু-গাছের অতি বিরাট ফল-সকল পর্বতের উপরে পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং তাহাদের রসে জম্বু-নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। সেই নদী গন্ধমাদন হইতে বাহির হইতেছে। সেখানকার অধিবাসী-গণ উহার জল পান করে। সেই জলে কোন দুর্গন্ধ বা ময়লা নাই। উহা পানে জরা জয় করা যায় এবং অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়। মেরুর পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ। তাহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ। সুমেরুর পূর্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ বন এবং উত্তরে নন্দন বন। সুমেরুর চারিদিকে অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ এবং মানস এই চারটি সরোবর আছে। দেবতাগণ এই চারটি সরোবর নানাভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। মেরুর পূর্বদিকে শীতান্ত, ক্রমুঞ্জ, কুররী ও মাল্যবান এই চারটি পাহাড় ভূ-পদ্মের চারটি বীজস্বরূপ। এইরূপে ত্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ ও রুচক মেরুর দক্ষিণ দিকের, শিখিবাসা, বৈদূর্য, কপিল ও গন্ধমাদন পশ্চিম দিকের এবং শঙ্খকুট, ঋষভ, হংস ও নাগ উত্তর দিকের চারটি পাহাড়। মেরুর উপরিভাগে ১৪০০০ যোজন বিস্তৃত ব্রহ্মার বিখ্যাত মহাপুরী

বা ব্রহ্মপুরী। তাহার চারদিকে চার কোণে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পুরী অবস্থিত। বিষ্ণুর পা হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত চন্দ্র-মণ্ডল প্লাবিত করিয়া গঙ্গা ব্রহ্মপুরীতে পড়িতেছে। সেখান হইতে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া সীতা, অলকানন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা নামে চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। সীতা পূর্বদিকে যাইয়া এক পর্বত হইতে অন্য পর্বত বহিয়া ভদ্রাশ্ব নামে পূর্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইতেছে। অলকানন্দা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং সেখান হইতে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িতেছে। চক্ষু পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া কেতুমাল নামক পশ্চিম বর্ষে গিয়াছে এবং সেখান হইতে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। ভদ্রা উত্তর গিরি ও উত্তর কুরু অতিক্রম করিয়া উত্তর সাগরে পড়িতেছে। ... মেরুর চারিদিকে শীতান্ত যে সমস্ত কেশর পর্বত আছে, তাহাদের মধ্যে অনেক মনোরম কন্দর আছে। সেই সকল কন্দরে সুরম্য কানন পুরী আছে। সেই সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য ইত্যাদি দেবতাগণ বাস করেন। ইহা ছাড়া যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য ও দানব সকলও এই সমস্ত কন্দরে দিবারাত্রি ক্রীড়া করিতেছে। এই সকল স্থানই ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া কথিত হয়। যাহা সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে তাহার নাম ভারতবর্ষ। ইহার বিস্তার ৯০০০ যোজন। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটি পর্বত আছে। এই ভারতবর্ষের নব ভাগ আছে; ইহারা ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগ-দ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুণ এবং সাগরসংবৃত দ্বীপ। ইহার পূর্বদিকে কিরাতগণ, পশ্চিমে যবনেরা, এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করে।"

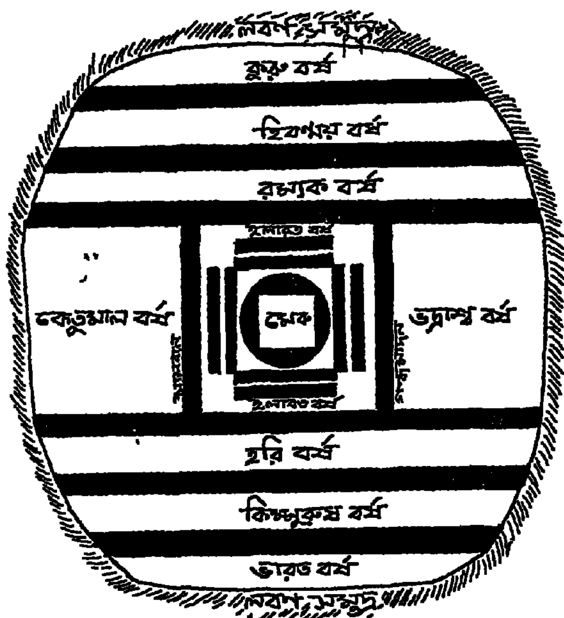
মৎস্যপুরাণ বলেন:

"মেরুপর্বত সুবর্ণময়। ইহার বর্ণ জ্বলন্ত আগুনের ন্যায়, কোন ধূম দ্বারা মলিন হয় না। ইহার চারিপার্শ্বের বর্ণ চারি প্রকারের।

পূর্বদিকের বর্ণ ব্রাহ্মণ-গাত্রবর্ণের ন্যায় সাদা, উত্তর পার্শ্বের বর্ণ ক্ষত্রিয় গাত্রবর্ণের ন্যায় লাল, দক্ষিণের বর্ণ বৈশ্য-গাত্রবর্ণের ন্যায় হলুদ এবং পশ্চিম পার্শ্বের বর্ণ শূদ্র-গাত্রবর্ণের ন্যায় কালো। ইহা ১৮০০০ যোজন উচ্চ এবং ১৬০০০ যোজন মাটিতে প্রোথিত। ইহার প্রত্যেকটি পার্শ্ব ৩৪০০০ যোজন বিস্তৃত। সুস্বাদু পানির নদী এই পর্বতে প্রবাহিত। এখানে দেবগণের নিবাস। তাঁহাদের পুরী স্বর্ণনির্মিত এবং সৌন্দর্যময়। অপসরা, অপসরী, গন্ধর্ব, কিন্নর সর্বদা দেবতাদের সভায় নাচ-গান করে। মেরু-পর্বতের চারদিকে মানস সরোবর অবস্থিত এবং তাহার চারিদিকে লোকপালগণ বাস করেন। ইঁহারা সর্বদা পৃথিবী ও পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রহরাকার্যে ব্যস্ত থাকেন। মেরু-পর্বতের সাতটি গিঠ অর্থাৎ ছোট পাহাড় আছে; তাহাদের নাম মহেন্দ্র, মলয়, সহায়, শুক্তিবাম, ঋক্ষবাম, বিন্ধ্য ও পরিয়ত্রা। ইহা ছাড়া ছোট ছোট আরো অনেক পাহাড আছে, সেগুলিতে মানুষ বাস করে। মেরুর চারিদিকে বড় বড় পর্বত আছে। ইহাদের ভিতরে হিমবন্ত পর্বত সর্বদা বরফে আচ্ছন্ন; এখানে রাক্ষস, পিচাশ ও যক্ষের অধিবাস। হেমকুট পর্বত সুবর্ণময়; এখানে গন্ধর্ব ও অপসরাদের অধিবাস। নিষধ পর্বতে সাতজন নাগরাজ বাস করেন। ইহাদের নাম অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কর্কটক, মহাপদ্ম, কম্বালা ও অশ্বতর। নীলপর্বত ময়ূরের পালকের ন্যায় নানাবর্ণে শোভিত; এখানে সিদ্ধপুরুষ ও ব্রহ্মার্ষগণ বাস করেন। শ্বেতপর্বতে দৈত্য ও দানবদের বাস এবং শৃঙ্গবন্ত পর্বত পিতৃপুরুষদের বাসস্থান। এই পর্বতের সামান্য উত্তরে অনেক গিরিপথ আছে। সেগুলি নানাবিধ মণি-মাণিক্য ও বৃক্ষাদিতে শোভিত। ইহারা এক কল্প স্থায়ী। এই পাহাড়গুলির মাঝখানে ইলাবৃত্ত সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান। হিমবন্ত ও শৃঙ্গবন্তের মধ্যবর্তী স্থানের নাম কৈলাস। ইহা রাক্ষস ও অপসরাগণের লীলাক্ষেত্র।"

প্যাতঞ্জলীর টীকাকারের মতে ঃ

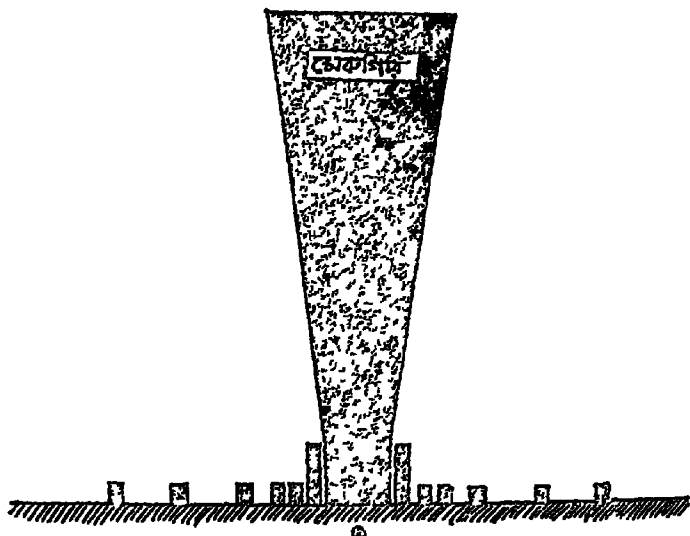
"মেরু চতুষ্কোণ এবং ইহার বিভিন্ন দিকের বিস্তার বিভিন্ন প্রকার। এক দিকের বিস্তার ১৫ কোটি যোজন এবং অন্য তিনদিকের প্রত্যেক



রেখাচিত্র ৬০ ঃ জম্বুদ্বীপের বর্ষ ও পর্বতসমূহের সন্নিবেশ

দিকের বিস্তার ৫ কোটি যোজন মাত্র। উত্তর দিকে মালব পর্বত এবং সমুদ্র; ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানের নাম ভদ্রাশ্ব। উত্তর দিকে নীল, শ্বেত, শৃঙ্গাদি পর্বত ও সমুদ্র; ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানে ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময় এবং কুরু নামে চারটি রাজ্য অবস্থিত। পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্বত ও সমুদ্র; ইহার মধ্যবর্তী স্থানে কেতুমাল রাজ্য। দক্ষিণে

অমরাবতী, নিষধ, হেমকুট, হেমগিরি পর্বত ও সমুদ্র ; ইহাদের মধ্যবর্তী স্থান ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষ ও হরিবর্ষ।"



রেখাচিত্র ৬১ : জম্বুদ্বীপের পর্বতসমূহের উচ্চতা

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, পুরাণের পৃথিবী ও আমাদের জ্ঞাত পৃথিবী এক নয়। পুরাণে অনেক জায়গায় পৃথিবী অর্থে ব্রহ্মাণ্ড বুঝানো হয়েছে। আবার অনেক জায়গায় চন্দ্র-সূর্যের কিরণ যতদূর যায়, সেই জায়গাকে পৃথিবী বলা হয়েছে। আমরা বর্তমানে যে স্থানকে পৃথিবী বলে জানি, সে স্থান পুরাণের জম্বুদ্বীপ বলে মনে হয়। তাই যদি হয়, তাহলে দেখা যায় যে, পৃথিবী গোলাকার এ ধারণা পুরাণকারদের ছিল না। তাঁদের মতে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে সুমেরু নামে একটি পর্বত আছে এবং তার চারদিকে নানাবিধ পাহাড় ও মধ্যবর্তী জায়গা আছে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে বর্ষ বলা হয়েছে। এর সর্বদক্ষিণে ভারতবর্ষ, লবণ-সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়

পর্বত। এ পর্যন্ত পৌরাণিক ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষের মিল আছে; কিন্তু তারপরে আর কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। হিমালয়ের উত্তরে কিম্পুরুষ; সেখানে কিন্নরদের বাস। কিছুদিন পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে হিমালয়ের কোন এক জায়গার অধিবাসীকে কিন্নর বলা হয়েছে। কিন্তু হিমালয়ের উত্তরে যাদের বাস, আমরা জানি যে, তারা আমাদের মতই মানুষ। কিম্পুরুষ বর্ষের উত্তরে হেমকুট পর্বত, হরিবর্ষ ইত্যাদি। পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার কোন সঙ্গতি নাই।

আমাদের 'জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' গ্রন্থে শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে, "জম্বু-দ্বীপ অর্থে পুরাণকারগণ উত্তর গোলার্ধ বলিয়াছেন এবং সুমেরু পর্বত বলিতে পৃথিবীর উত্তর মেরু বুঝাইয়াছেন।" অর্থাৎ পৃথিবী গোল, এ সম্বন্ধে পুরাণকারগণের অস্পষ্ট ধারণা ছিল, রায় মহাশয় সেই কথাই বুঝাতে চান। কিন্তু মেরুর দক্ষিণে নিষধ-পর্বত এবং বিশেষ করে মেরুর উত্তরে নীলপর্বত অর্থ কি, তা বলেন নাই। এ ছাড়া নীল ও নিষধ পর্বত প্রত্যেকে লক্ষ যোজন দীর্ঘ। পৃথিবী গোলাকার এ ধারণা থেকে এমন কল্পনা করা সম্ভব নয়। উত্তর মেরুর পরে যদি পৃথিবীর ছেদ নেওয়া যায়, তবে ছেদিত বৃত্তগুলির পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পুরাণে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মেরুর নিকটবর্তী নীল ও নিষধ পর্বতের দৈর্ঘ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক।

পুরাণে পৃথিবীকে পদ্মফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং মেরুকে তার বীজকোষস্বরূপ বলা হয়েছে। এ পদ্ম নিশ্চয়ই প্রস্ফুটিত পদ্ম; গোলাকার পদ্মকুঁড়ির বীজকোষ পদ্মদলের ভিতরে অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরিভাগ সমতল। অতএব পৌরাণিক যুগে পৃথিবীকে সমতল বলে মনে করা হতো, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

সিদ্ধান্তে পৃথিবী

সিদ্ধান্ত যুগের জ্যোতির্বিদগণ তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাথে পুরাণের বর্ণনাকে খাপ খাওয়ানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। পুরাণের

সাথে যেখানেই গবেষণার বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেখানে তাঁরা পুরাণকে শ্রদ্ধার সাথে উপেক্ষা করে নিজেদের বক্তব্য বলেছেন। কিন্তু গবেষণাতে যেখানে পুরাণের কাহিনীকে অসত্য প্রমাণ করা যায় না, সেখানে তাঁরা পুরাণ কাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছেন।

পৃথিবীর আকার

সিদ্ধান্তীদের মতে পৃথিবী গোলাকার; পৃথিবীর উত্তরার্ধ স্থলভাগ এবং দক্ষিণার্ধ জলভাগ।

পুলিশ সিদ্ধান্ত

পুলিশ সিদ্ধান্তে পৃথিবীকে গোলাকার বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং নানাস্থানে সে বিষয়ের উল্লেখ আছে। "পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; এর এক অর্ধ স্থল, অন্য অর্ধ জল। সুমেরু পর্বত স্থলার্ধে অবস্থিত। এখানে দেবতাগণ বাস করেন। ইহার শীর্ষদেশেই উত্তর মেরু। জলার্ধে বাড়ব মুখ অবস্থিত। এখানে দৈত্য ও নাগগণ বাস করেন। সেজন্য ইহাকে দৈত্যান্তরও বলা হয়।

যে রেখা দ্বারা পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত, তাহার নাম নিরক্ষরেখা। ইহার চারদিকে চারটি বিখ্যাত নগর আছে। পূর্বে যমকোটি, পশ্চিমে রোম, দক্ষিণে লঙ্কা এবং উত্তরে সিদ্ধপুর। দুই মেরুতে পৃথিবী অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ। সূর্য যখন সুমেরু পর্বত ও লঙ্কার সংযোজক রেখায় উদিত হয়, যম কোটিতে তখন মধ্যাহ্ন, সিদ্ধপুরে সন্ধ্যা এবং রোমে মধ্যরাত্রি।" আর্যভট্টও ঠিক এই কথাই বলেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত

ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ব্রহ্মসিদ্ধান্তে বলেছেন, "পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে লোকে নানাকথা বলে। বিশেষ করিয়া পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের পাঠকগণ পুরাণ কাহিনীই বিশ্বাস করেন এবং সেইরূপ মতবাদ প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, ইহা দর্পণের ন্যায় সমতল। অনেকে বলেন, ইহা

পান-পাত্রের ন্যায় বর্তুলাকার। কাহারো মতে, দর্পণের ন্যায় সমতল পৃথিবীকে বলয়াকারে সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে; আবার সেই সমুদ্রও বলয়াকার স্থলভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহা আবার বলয়াকার সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এইরূপ সাত সমুদ্র ও সাত স্থলভূমি আছে। প্রত্যেকটি দ্বীপ ও সমুদ্রের আয়তন তাহার পরিবেষ্টক সমুদ্র বা দ্বীপের আয়তনের দ্বিগুণ। এইরূপে সর্ববহিস্থ দ্বীপের আয়তন কেন্দ্রস্থ দ্বীপের আয়তনের ৬৪ গুণ এবং সর্ববহিস্থ সমুদ্রের আয়তন কেন্দ্রস্থ সমুদ্রের আয়তনের ৬৪ গুণ। কিন্তু এমন কতকগুলি ঘটনা পৃথিবী ও আকাশে ঘটিয়া থাকে, যাহাতে পৃথিবীকে গোলাকার স্বীকার না করিবার উপায় থাকে না। যেমন তারাসমূহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে উদিত হয় এবং বিভিন্ন সময়ে অস্ত যায়। যমকোটির লোকেরা যে তারাটিকে যে সময়ে পশ্চিম দিগন্তে দেখিতে পায়, সেই সময়ে ঠিক সেই তারাটিকে রোমের লোকেরা পূর্ব দিগন্তে দেখিতে পায়। আবার সুমেরু পর্বতের কোন অধিবাসী যখন কোন একটি তারাকে লঙ্কার পূর্ব দিগন্তে দেখে, লঙ্কার লোকেরা সেই তারাটিকে তখন মাথার উপরে মধ্যরেখায় দেখিতে পায়। ইহা ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যায় যে সমস্ত গণনা করা হয়, পৃথিবী গোলাকার না হইলে তাহা শুদ্ধ হইত না। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পৃথিবী গোলাকার এবং এ সম্বন্ধে অন্য যাহা কিছু যেখানেই বলা হোক না কেন, সে সমস্তই মিথ্যা।" এখানে পুরাণকে উপেক্ষা করা হয় নাই, বরং অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং তার ভাষাও বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়।

আর্যভট্ট বলেছেন, "চারটি উপাদানে পৃথিবী গঠিত; ইহারা মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস। ইহাদের প্রত্যেকটি উপাদানের আকার গোল।"

বশিষ্ঠ ও লতা বলেন, "পাঁচটি উপাদানে পৃথিবী গঠিত; ইহারা মাটি, পানি, আগুন, বাতাস ও আকাশ। এই সমস্ত উপাদানই গোলাকার।"

বরাহমিহির

বরাহমিহির বলেন, "ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবী গোলাকার ; ইহার অন্য আকার হইতে পারে না। দুই অয়স্কান্তের মধ্যবর্তী স্থানে যেমন গোলাকার লৌহ অবস্থিত থাকে, তেমনি মৃত্তিকা ইত্যাদি পাঁচটি উপাদানে গঠিত গোলাকার পৃথিবী তারাসমূহের মধ্যে বর্তুলাকারে অবস্থিত। ইহার পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষ, নগর, বন, উপবন ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। সুমেরুতে দেবতাগণের বাস-স্থান, নিম্নভাগে দৈত্যগণের বাসস্থান।"

আর্যভট্ট, পুলিশ, বশিষ্ঠ এবং লতা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, যমকোটিতে যখন মধ্যাহ্ন, রোমে তখন মধ্যরাত্রি, লঙ্কাতে তখন প্রাতঃকাল এবং সিদ্ধপুরে সায়াহ্ন। তাঁরা একথাও বলেন যে, পৃথিবী গোলাকার না হলে এরূপ হওয়া সম্ভব নয়।

লতা বলেন, "পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতেই আকাশের অর্ধাংশ মাত্র দেখা যায়। যতই উত্তরে যাওয়া যায়, সুমেরু পর্বত ও পৃথিবীর উত্তর মেরু ততই দিগন্তের উপরে উঠিতে থাকে। ইহাদের যদি আকাশের নীচের দিকে যাইতে দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দৃশ্যস্থানের অক্ষাংশ ক্রমেই দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। পৃথিবীর উত্তরার্ধের লোক কেবলমাত্র উত্তর মেরু দেখিতে পায়, দক্ষিণ মেরু দেখিতে পায় না। অনুরূপভাবে দক্ষিণ মেরুর অধিবাসীগণ দক্ষিণ মেরু দেখিতে পায়, উত্তর মেরু দেখিতে পায় না।

ভারতীয় সিদ্ধান্তীগণ অধঃ বা নিম্নদিক অর্থে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বলে স্বীকার করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বলেন, "পণ্ডিতগণ বলেন, আকাশের মধ্যস্থলে পৃথিবী অবস্থিত, দেবতাদের বাসস্থান উর্ধ্বে সুমেরু পর্বতে এবং দৈত্যদের বাসস্থান নিম্নদিকে বাড়বমুখে। 'নিম্ন' বলিতে তাঁহারা আপেক্ষিক নিম্নই বুঝাইয়াছেন। সমস্ত দিক হইতেই পৃথিবী একরূপ। পৃথিবীর সমস্ত জায়গার লোকেই মাটিতে পা দিয়া মাথা উপরে দিয়া দাঁড়ায়। ভারী জিনিস সব জায়গাতেই মাটিতে পড়ে। পানির ধর্ম যেমন প্রবাহিত

হওয়া, আগুনের ধর্ম যেমন দগ্ধ করা, তেমনি পৃথিবীর ধর্মও আকর্ষণ করা। কোন বস্তু যদি আরো নীচের দিকে যাইতে চায়, সে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে। পৃথিবীই সর্বনিম্ন স্থান। বীজ যেদিকেই উৎক্ষেপ করা যাউক না কেন, তাহারা ভূ-পৃষ্ঠেই ফিরিয়া আসে।"

বরাহমিহির বলেন, "পর্বত, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ, লতা, নগর, মানুষ ও দেবতা, সকলেই পৃথিবীর অধিবাসী। যমকোটি এবং রোম যদি একে অন্যের বিপরীত দিকে অবস্থিত হয়, তবে কেহই বলিতে পারে না, কোন্‌টি উপরে এবং কোন্‌টি নীচে। উচ্চ-নীচ বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠের কোন দিক নাই। একই কারণে যখন এক স্থানকে নিম্ন বলা যায় না, তখন অন্য স্থানকে কেন নিম্ন বলা যাইবে? সকলেই নিজে বলে, 'আমি উপরে সে নীচে।' কদম্বফুলের পাঁপড়ি যেমন কদম্বপৃষ্ঠে সংযুক্ত থাকে, সকল মানুষই সেইরূপ ভূ-পৃষ্ঠে সংযুক্ত। এমন নহে যে, কাহারো পা মাটিতে অন্য কাহারো মাথা মাটিতে। সকলেই মাটিতে পা রাখিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। পৃথিবী সকল পদার্থকেই তাহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে; সেজন্য সমস্ত জায়গা থেকেই পৃথিবীর কেন্দ্র নীচের দিকে এবং আকাশ উপরের দিকে।"

ভাস্করাচার্যও বলেন, পৃথিবী গোল এবং শূন্যে নিরবলম্ব অবস্থায় আছে। তিনি বলেন, "এই পৃথিবীর যদি কোন প্রাণীরূপ আধার থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটি আধার, আবার সেই আধারের আর একটি আধার আবশ্যক হইত। সুতরাং এই অনুমানে অনবস্থা দোষ ঘটিতেছে। যদি বলা হয় আধারের শেষ আছে, তবে সেই শেষের আধারটি নিজের শক্তিতে স্থির আছে, বলিতে হইবে। সেই আধারটিই যদি স্ব-শক্তিতে স্থির থাকতে পারে, তবে পৃথিবীই বা পারিবে না কেন? না পারিবার কোন কারণও নাই।"

পৃথিবীর আয়তন

পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্যোতির্বিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ

করেছেন। আর্যভট্ট বলেন, পৃথিবীর ব্যাস ৫০,০০০ যোজন। বরাহ বলেন, পৃথিবীর পরিধি ৩২০০ যোজন, অর্থাৎ ব্যাস প্রায় ১০১৯ যোজন। পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণে দুই জ্যোতির্বিদে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। পৃথিবীর ব্যাস লল্লের মতে ১০৫০ যোজন, পুলিশ ও সূর্যসিদ্ধান্ত মতে ১৬০০ যোজন, ব্রহ্মগুপ্ত মতে ১৫৮১ যোজন এবং ভাস্কর মতে ১৫৮১$\frac{1}{2}\frac{}{}$ যোজন।

পৃথিবীর ব্যাস সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্যোতির্বিদের বিভিন্ন মতে ভাস্করাচার্য বিস্মিত হন। তিনি বলেন "পৃথিবী একই, অথচ আর্যভট্ট প্রমুখ ঋষিগণ সেই একই পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যাস পাইয়াছেন, ইহা খুব আশ্চর্য। তবে মনে হয় তাঁহাদের যোজনের পরিমাণ এক ছিল না। বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন পরিমাণের যোজন ব্যবহার করিতেন।"

পৃথিবীর ব্যাস থেকে তার পরিধি জানতে হলে π-এর মানের দরকার হয়। পরিধি ও ব্যাসের এই অনুপাত ভারতীয় পণ্ডিতগণ নির্ণয় করেন। সূর্যসিদ্ধান্ত ইত্যাদি গ্রন্থে অনুপাত $\sqrt{১০}$: ১=৩.১৬২৩ ধরা হয়েছে। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণও এই মানই স্বীকার করে নেন। ভাস্করাচার্য এই অনুপাতকে ২২ : ৭ বলে মেনে নেন।

পৃথিবীর গতি

সিদ্ধান্তীগণের কেহ কেহ পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করতেন। মনে হয় 'পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আবর্তন' এই মতবাদ তাঁরা অন্য কোন সূত্র হতে পেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকেই একে যুক্তিযোগ্য বিবেচনা করতেন না। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ব্রহ্মসিদ্ধান্তে বলেছেন, "আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীকে যে পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়, তাহা আকাশের মধ্যরেখার গতি নয়, বরং পৃথিবীর গতি।" কিন্তু বরাহ-মিহির তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "পৃথিবী যদি পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে ঘুরিতই, তাহা হইলে কোন পাখি আপন বাসা হইতে

উডিবা পশ্চিম দিকে গেলে আর কোন দিনই সেখানে ফিবিবা আসিতে প্যাবিত না।"

ব্রহ্মগুপ্ত অন্য এক জাযগায বলেছেন, "আর্যভট্টের শিষ্যগণ বলেন, আকাশ স্থিব এবং পৃথিবী গতিশীল। অনেকে এই মতবাদ খণ্ডন কবিতে চেষ্টা কবিযাছেন। তাঁহারা বলেন, পৃথিবী যদি গতিশীল হইত, তাহা হইলে বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি পৃথিবী হইতে পড়িযা যাইত।" কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত এঁদের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, "সমস্ত ভাবী পদার্থই পৃথিবীব দিকে আকৃষ্ট হয, অতএব পৃথিবী গতিশীল হইলেও, কোন পদার্থই উহা হইতে পড়িযা যায না।"

ভারতীয় জ্যোতিষে সূর্য

বেদে সূর্য

ঋগবেদে বলা হযেছে, "সূর্য ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ কবেন। সেই সূর্য দিনেব পতাকা অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্তা; প্রত্যহ নূতন হইযা প্রভাতেব অগ্রে আসিবা থাকেন।" এখানে দেখা যায যে, বৈদিক ঋষিগণ জানতেন যে সূর্যের জন্যই ঋতুব পরিবর্তন হয়।

পুরাণে সূর্য

পূর্বেই বলা হযেছে, পুবাণকাবদের মতে সূর্যই পৃথিবীব নিকটতম গ্রহ। পুবাণে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির সাথে সূর্য এবং চন্দ্রকেও গ্রহ মনে করা হতো। এ ছাড়া চন্দ্রেব পাতবিন্দুদ্বযকেও রাহু ও কেতু নামে দুই গ্রহ বলা হতো। সূর্যোদয এবং সূর্যাস্তকালে আকাশে তারাদের অবস্থান লক্ষ্য ক'বে পৌরাণিক যুগেব ঋষিগণ বুঝতে পাবেন যে, আকাশে তারাদের ভিতবে সূর্যের কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। প্রায বাবোটি পূর্ণিমাব পরে তাবাদের ভিতরে সূর্যের অবস্থানেব পুনবাবৃত্তি হয। এইভাবে দ্বাদশ সূর্যেব কল্পনা কবা হয় এবং তাদেব জন্মকাহিনীও রচনা করা হয।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ মতে, কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র এবং মরীচির পুত্র। কশ্যপ মুনির তেরজন স্ত্রী ছিল; তাঁর এক স্ত্রীর নাম অদিতি। এই অদিতির গর্ভে বারোটি পুত্রসন্তান জন্মে; এদের নাম ইন্দ্র, উপেন্দ্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশু এবং ভগ। এঁরা দ্বাদশ আদিত্য নামে পরিচিত।

বিষ্ণুপুরাণে সূর্যকে রথে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। সূর্য পৃথিবীর মত স্থির নয়; আকাশে তারাগুলীর ভিতরে সূর্যের গতি আছে। সেই গতির জন্য রথের কল্পনা করার দরকার হয়। সূর্যের রথের চক্র এক, নাভি তিন, অর পাঁচ, নেমি ছয়, অশ্ব সাত এবং সারথী অরুণ। এখানে এক চক্র অর্থে বলা হয়েছে সূর্যপথ বা রাশিচক্র; অনেকে একে পূর্ণ এক বৎসরও বলে থাকেন। চার মাসের একটা দ্বি-ঋতুকে ভাগবত পুরাণে নাভি বলা হয়েছে; এই অর্থে এক বৎসরে বা এক রাশিচক্রে তিনটি নাভি আছে। অর অর্থে কি বুঝানো হয়েছে, বোঝা মুস্কিল। পাঁচ বৎসরে একটি অধিমাস (পাঁচটি চান্দ্র বৎসর=পাঁচ সৌরবৎসর —১ মাস) বাদ না দিলে ঋতুর ঐক্য থাকে না। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় একেই পাঁচ অর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সাত অশ্ব অর্থে বায়ু-পুরাণে সপ্তরশ্মি বলা হয়েছে। কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে, "সূর্যের সাতটি রশ্মি দ্বারা সাতটি গ্রহ আলোকিত। সুষুম্ন রশ্মি দ্বারা চন্দ্র, বিশ্বকর্মা রশ্মি দ্বারা বুধ, বিশ্বশ্রবা দ্বারা শুক্র, সংযদ বসু দ্বারা মঙ্গল, অর্বাবসু দ্বারা বৃহস্পতি এবং স্বর দ্বারা শনিগ্রহ পুষ্ট হয়। এ ছাড়া ঋষিকেশ রশ্মি দ্বারা নক্ষত্রসমূহ দীপ্তি পায়।"

সূর্যরথের যে বর্ণনা পুরাণে আছে, তা অত্যন্ত অদ্ভুত। এর কোন ব্যাখ্যা কেউ দেন নাই। পুরাণ মতে, সূর্যরথের আয়তন ৯০০০ যোজন এবং ঈষদণ্ডের পরিমাণ ১৮০০০ যোজন। রথে একখানি মাত্র চাকা, তাতে দুইটি অক্ষ। অক্ষ দুইটি অসমান; একটির পরিমাণ ১,৫৭,৫০,০০০ যোজন এবং অন্যটির পরিমাণ মাত্র ৪৫,৫০০ যোজন।

দিবারাত্র কি কারণে সংঘটিত হয়, তার ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ "প্রবহ বায়ু দ্বারা সূর্য ধ্রুবতারার সহিত নিবদ্ধ। এই প্রবহ বায়ুর সাহায্যে ধ্রুবতারা, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-তারাকে সুমেরু পর্বতের চারদিকে ঘুরাইতেছে। সুমেরু পর্বতের যে পার্শ্বে সূর্য থাকে, সেই পার্শ্বের দ্বীপসমূহে দিবা এবং এবং তাহার বিপরীত দিকের দ্বীপসমূহে রাত্রি সংঘটিত হয়। যে সমস্ত দ্বীপে মধ্যাহ্ন তাহাদের সমসূত্রে অবস্থিত বিপরীত পার্শ্বের দ্বীপসমূহে তখন মধ্যরাত্রি এবং দুই পার্শ্বের দ্বীপসমূহে প্রভাত ও সন্ধ্যা। রাত্রি শেষ হইলে যে যে স্থান হইতে সূর্যকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত স্থানের পক্ষে তাহাই সূর্যোদয় এবং যে যে স্থান হইতে সূর্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সমস্ত স্থানে সূর্যাস্ত। বস্তুতঃ সূর্যের উদয় বা অস্ত নাই। দর্শন অর্থই উদয় এবং অদর্শন অর্থই অস্ত।"

সূর্যের গতি

পুরাণ মতেও সূর্যের দুই প্রকার গতি আছে—মৌহূর্তিক ও স্বাভাবিক। মৌহূর্তিক গতিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলেই মনে হয়। এই গতিতে সূর্য এক মুহূর্তে পৃথিবীর ত্রিশ অংশ (ডিগ্রী) পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে। কোন কোন পুরাণকারের মতে ঐ সময়ে সূর্য ৫০ লক্ষ ১ হাজার যোজন পথ অতিক্রম করে। স্বাভাবিক গতি মৌহূর্তিক গতির বিপরীত।

সিদ্ধান্তে সূর্য

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ সূর্যের ব্যাস ও লম্বনের সাহায্যে তার আয়তন ও দূরত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে সূর্যের দৈনিক গতির এক-পঞ্চদশাংশ তার পরম লম্বন। এইভাবে ভাস্করের মতে সূর্যের পরম লম্বন ৩ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড। এতে সূর্যপথের ব্যাসার্ধ হল ৬৮৯৩৭৭ যোজন। ভাস্করের মতে সূর্যবিম্বের ব্যাস ৩২ ডিগ্রী ৩১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। এ থেকে তিনি সূর্যের ব্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করেন ৬৫২২

যোজন। অর্থাৎ তাঁর গণনা মতে সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ৪ গুণ মাত্র। সূর্যসিদ্ধান্ত মতে, সূর্যের ব্যাস ৬৫০০ যোজন।

ভারতীয় জ্যোতিষে চন্দ্র

বেদে চন্দ্র

চন্দ্র সম্বন্ধে ঋগবেদে বলা হয়েছে, "আদিত্য রশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ (সূর্যকিরণ) এইরূপে পাইয়াছিলেন।" এর অর্থ কি, জানা অত্যন্ত দুরূহ। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় এ থেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, "বৈদিক যুগের ঋষিগণ জানিতেন যে, সূর্যকিরণে চন্দ্র দীপ্তিমান হয়।"

পুরাণে চন্দ্র

চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে নিম্নরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে :

"একদা দুর্বাসা ঋষি পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বিদ্যাধরীর হস্তে সান্তনক পুষ্পের একটি দিব্যমালা দেখিতে পাইলেন। ঐ মালার সৌন্দর্যে ও সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ঐ বিদ্যাধরীর নিকট ঐ মালাটি প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যাধরী প্রণিপাত করিয়া উহা তাঁহাকে প্রদান করিল। দুর্বাসা ঐ মালা মস্তকে পরিধান করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার ঐরাবতে আরোহণ করিয়া দুর্বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মুনিবর সেই মালা আপন মস্তক হইতে লইয়া দেবরাজের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র ঐ মালা ধারণ করিয়া ঐরাবতের মস্তকে স্থাপন করিলেন। মালার সুবাসে আকৃষ্ট হইয়া ঐরাবত ঐ মালা আপন শুণ্ডে জড়াইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। মালার এই দুর্দশা দেখিয়া দুর্বাসা ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, 'রে দুরাত্মা বাসব! তুমি এত গর্বিত হইয়াছ যে, আমার দেওয়া মালাকে অভিনন্দন করিলে না;

ইহা প্রসাদ বলিয়া আমাকে প্রণিপাত করিলে না, বরং ইহাকে তোমার হস্তী ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া অবমাননা করিল। আমি অভিশাপ দিতেছি যে তোমার ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" (বিষ্ণুপুরাণ ১।৯)

দূর্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মী স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হযে সমুদ্রতলে প্রবেশ করেন। এর মধ্যে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। লক্ষ্মী-হারা হযে দেবতারা হতবল ও হতবুদ্ধি হযে পড়েন এবং অসুরগণের সাথে যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না। তখন নারায়ণের পরা-মর্শে দেবতাগণ অসুরদের সাথে সন্ধি করেন এবং তাদের লোভ দেখানো হয় যে, ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করলে যে অমৃত উঠবে, সেই অমৃত পান করলে অমর হওয়া যাবে। সরল অসুরগণ কুটিল দেবতাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে সন্ধি করে এবং ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করতে রাজী হয়। কুর্মের পিঠের উপর মন্দর পর্বত বেঁধে অনন্ত বাসুকীকে মন্থন-রজ্জুরূপে ব্যবহার করে। দুষ্টবুদ্ধি দেবতাগণ বাসুকীর লেজের দিকে ধরলেন আর অসুরদের দেওয়া হলো ফণার দিকে। ঘর্ষণের ফলে বাসুকীর ফণা থেকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে অসুরগণকে নির্জীব করে ফেলল। ক্রমে তা'রা যখন প্রায় মরার মত হয়ে পড়লো, তখন দেবতা বরুণ বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে তাদের সজীব ক'রে তুলে আবার ঘর্ষণের কাজে লাগিয়ে দিলেন। দেবতার কি অপার মাহাত্ম্য ! এই মন্থনের ফলে ক্ষীরোদ সাগর থেকে চতুর্থবারে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। তারপর ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, অমৃতভাণ্ড হস্তে ধন্বন্তরী এবং সর্বশেষে লক্ষ্মীর উদয় হয়। ধন, রত্ন, হস্তী, অশ্ব, যা কিছু ওঠে, দেবতারা সমস্ত আগে থেকেই হস্তগত করেন। কিন্তু যত নির্বোধ এবং সরলই হোক না কেন, অসুরগণ যখন দেখল, দেবতারা তাদের কিছুই দিচ্ছে না, তখন অমৃত-ভাণ্ড ধন্বন্তরীর হাত থেকে কেড়ে নিল। দেবতাগণ দেখলেন, বড় বিপদ ! তখন বৃন্দাবনের গোপিনীমোহন, ভগবানের অবতার, শ্রীকৃষ্ণ দেব এক মোহিনী রমণীর রূপ ধরে সেখানে উপস্থিত হলেন। একে শ্রীকৃষ্ণ, রমণীর ছলা-কলার কোন কিছুই তার অজ্ঞাত নয়, তার উপরে তিনি

ভগবান ; রমণীর রূপ যখন ধরেছেন, তখন তাঁকে দেখে ত্রিভুবন স্তব্ধ হয়ে গেল ; সবলপ্রাণ অসুর তো হতবাক। আর এই ত্রিভুবন মোহিনী নারী যখন চটুল কটাক্ষে দৈত্যদের সবাইকে আদর ক'রে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাণ্ডটা তাঁকে দিতে, তখন অসুরগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত অমৃতের ভাণ্ড তাঁর হাতেই দিল। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান! সকলের দিকেই তাঁর সমান নজর। তাই বললেন, অমৃত দেবতা-দৈত্য সবাইকে ভাগ করে দেবেন। এক সারিতে দেবতারা বসলেন, অন্য সারিতে বসলো দৈত্যরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেবতারা জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাদের দিকেই আগে অমৃত দেওয়া হবে। রমণী কটাক্ষের জয় হলো ; অসুরগণ তাতেই রাজী হলো। দেবতাদের সারিতে অমৃত বিলিয়ে দেওয়ার পরে যেটুকু অমৃত অবশিষ্ট থাকলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেটুকু পান করলেন। অর্থাৎ অসুরগণ কিছুই পেল না, ত্রিভুবন মোহিনীর বিলোল কটাক্ষ ছাড়া। বিষ্ণুপুরাণ থেকে পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা যাক—"ইতিমধ্যে দেবতাদের মধ্য হইতে সূর্য ও চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, রাহু নামে দৈত্য দেবতাদের সারিতে বসিয়া অমৃত পান করিয়াছে। ইহা শুনিয়া নারায়ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা রাহুর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যেহেতু রাহু অমৃত পান করিয়াছিলেন, সেজন্য সে অমর হইয়া রহিল। তাহার মাথার অংশ রাহু এবং দেহের অংশ কেতু হইয়া অমর হইয়া থাকিল। চন্দ্র ও সূর্য তাহাদের দেখাইয়া দিয়াছিল বলিয়া রাহু এবং কেতু এখনও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং পর্বে পর্বে তাহাদের গ্রাস করে। রাহু বিষ্ণুর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দোষে তাহার শিরশ্ছেদ করা হইয়াছে। বিষ্ণু কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে আকাশে স্থাপন করিলেন।"

কেহ কেহ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় রাহুরও শরীর আছে, কিন্তু কালো রং-এর জন্য আকাশে দেখা যায় না ; এবং আদি পিতা ব্রহ্মা আদেশ করেন যে, কেবলমাত্র গ্রহণের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় আকাশে একে দেখা যাবে না। আবার কেহ কেহ বলেন, রাহুর মাথা সাপের মাথার মত এবং লেজও সাপের লেজের মত।

দেবতা ও অসুরদের সংগ্রামে ও সন্ধিকালে নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অতি স্থূল পক্ষপাতিত্বে আমরা মর্ত্যের লোক কেবলমাত্র মর্মাহতই হই না, দেবতাদের দেবত্বে ঘোরতরভাবে সন্দিহান হয়ে পড়ি। এ সমস্ত বক্তব্য বাদ দিলেও, জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপারেও উপরের কাহিনী নেহাৎেই বাজে। চন্দ্রের উৎপত্তি বা আবিষ্কারের জন্য কোন মন্দর পর্বত দিয়ে ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করবার প্রয়োজন ছিল না। সূর্যের ন্যায় চন্দ্রের আবিষ্কারের জন্যও কোন কাহিনীর প্রয়োজন হয় না। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় নানাপ্রকার অবান্তর আলোচনা ক'রে অনেক কষ্টপ্রদ ব্যাখ্যা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করেছেন। এতে কোন কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

গ্রহণ

উপরে রাহু এবং কেতুর পৌরাণিক উপাখ্যান বলা হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে। পুরাণ মতে, রাহু ও কেতু রথে ভ্রমণ করে। রাহুর রথ ধূসর বর্ণের, তাতে আটটি কৃষ্ণবর্ণের অশ্ব আছে। কেতুর রথের আটটি অশ্ব পলাল ধূম্রের ন্যায় অথবা লাক্ষারসের ন্যায় রক্তবর্ণ। ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের অশ্ব আর পলাল ধূম্রের বর্ণের মত অশ্বকে যোগেশবাবু ছায়া বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক অর্থ দিতে যাওয়া শুধু কষ্টকল্পনা এবং গোঁড়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। চন্দ্র ও সূর্যের গতি আছে। এদের গ্রাস করতে হলে রাহু ও কেতুকে এদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হয়, অতএব এদেরও গতি আছে। আর সেই গতির জন্য রথের প্রয়োজন, আর সেই রথ টানতে অশ্বের কল্পনা করা এমন বিশেষ কিছু নয়। এর মধ্যে পৃথিবীর ছায়াকে টেনে আনবার প্রয়াসকে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টার বেশী কিছু বলা যায় না। পুরাণ মতে, রাহু ও কেতু দুইটি গ্রহ, কিন্তু ব্রহ্মার আদেশে তা'রা অদৃশ্য।

চন্দ্রের কলা

পুরাণ মতে, "দক্ষ বা প্রজাপতি প্রসূতিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের অনেকগুলি কন্যা হয়। ইহাদের ভিতরে ১০ জনকে ধর্ম, ১৩ জনকে কশ্যপ এবং ২৭ জনকে চন্দ্র বিবাহ করেন। (অন্য মতে, চন্দ্র প্রজাপতির ৩৩ জন কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহাদের মধ্যে কৃত্তিকাতে ৭ জন এবং অন্যত্র ২৬ জন।) প্রজাপতি আদেশ করেন, চন্দ্রকে এক একদিন এক এক স্ত্রীর সঙ্গে বাস করিতে হইবে। কিন্তু চন্দ্র তাঁহার সমস্ত স্ত্রীর মধ্যে রোহিণীকেই বেশী ভালবাসিতেন এবং তাহার সহিতই অধিক সময় কাটাইতেন। এজন্য অন্য স্ত্রীগণ হিংসাপরবশ হইয়া প্রজাপতির নিকট চন্দ্রের এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। প্রজাপতি চন্দ্রকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই যখন তাহার সংশোধন হইল না, তখন তাহাকে অভিশাপ দিলেন। ফলে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ (আল-বেরুনী বলেন, কুষ্ঠরোগ) হয় এবং দিনেদিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইতে থাকে। সেইজন্য পূর্ণিমার পূর্ণ-যৌবন-চাঁদের দিনদিন হ্রাস পাইতে দেখা যায়।"

চন্দ্রের কলা-পুষ্টির অন্তরূপ কারণও পুরাণে আছে। "চন্দ্রের কিরণে সুধা আছে, সেজন্য তার এক নাম সুধাংশু। পূর্ণযৌবনা চন্দ্রের সুধা দেবগণ ও পিতৃগণ পান করেন, সেজন্য তার শরীর ক্ষীণ হয়। এইভাবে সুধা পান করতে করতে মাত্র যখন দুই কলা অবশিষ্ট থাকে, তখন চন্দ্র সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। যখন সে অমা নামক সূর্যরশ্মিতে বাস করে, সেই সময়কে অমাবস্যা বলে। যখন এক কলা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সুষুম্ন নামক সূর্যরশ্মি দ্বারা চন্দ্র পরিস্ফুট হন। কৃষ্ণ প্রতিপদ থেকে আরম্ভ ক'রে দেবতাগণ চন্দ্রকে যে পরিমাণ শোষণ করেন, শুক্ল প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে সূর্য সেই পরিমাণে কিরণ দ্বারা পরিপুষ্ট করেন। এইভাবে অর্ধমাসে সঞ্চিত সুধা দেবতাগণ পান করেন। সূর্য-মণ্ডলে প্রবেশের পূর্বে চন্দ্র প্রতিদিন জলে বাস করেন, পরে লতাসমূহে অবস্থান করেন, অবশেষে সূর্যে গমন করেন। চন্দ্র যখন লতাসমূহে

অবস্থান করেন, সেই সময়ে যদি কেহ লতা ছেদন করে, এমনকি লতার একটা পাতাও ছেদন করে, তবে সে ব্রহ্মহত্যা নামক পাতক প্রাপ্ত হয়।"

সিদ্ধান্তে চন্দ্র

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় চন্দ্রের স্থান সর্বপ্রধান। পূজা, পার্বণ ইত্যাদি পালনে তিথি-নক্ষত্র বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়। সূর্যের কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় বলেই যে চন্দ্র উজ্জ্বল দেখায়, ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ এ সমস্ত জানতেন বলেই মনে হয়। অবশ্য আর্যভট্ট প্রমুখ সকল সিদ্ধান্তীই বলেন যে, চন্দ্রের শীতল পানিতে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয় বলেই চন্দ্রকিরণ শীতল। সকল সিদ্ধান্তেই বলা হয়েছে যে, চন্দ্রে পানি আছে।

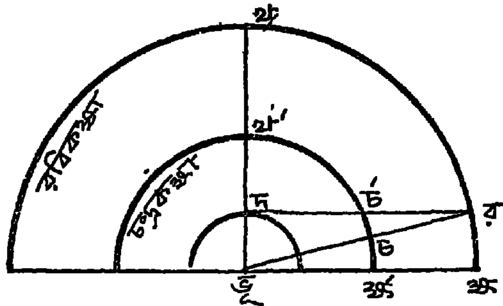
বরাহমিহির বলেন, "সূর্যের অধঃস্থ চন্দ্রের উপরে সূর্যরশ্মি পতিত হয় বলিয়া তাহার অর্ধভাগ মাত্র শুক্লবর্ণ দেখায়। রৌদ্রস্থিত কুম্ভের পশ্চাদভাগ যেমন নিজ ছায়ায় আবৃত থাকে, তেমনি চন্দ্রের অপরার্ধ নিজ ছায়াবশতঃ নিয়তঃ কৃষ্ণবর্ণ থাকে।"

এখানে চন্দ্রকে পানিপূর্ণ কলসীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও বলা হয়েছে যে, চন্দ্রের এক অর্ধ সর্বদা শুক্লবর্ণ এবং অপর অর্ধ সর্বদা কৃষ্ণবর্ণ। চন্দ্রের একই অর্ধ সর্বদা পৃথিবীর দিকে থাকে এবং আমরা সর্বদা চন্দ্রের একই অর্ধ দেখি, এ বিষয়ে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ-গণের ধারণা বিশেষ স্পষ্ট ছিল না।

চন্দ্রের পূর্বদিকের গতি বুঝতে খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তারাদের ভিতরে চন্দ্রের অবস্থান তুলনা করলেই দেখা যায়, চন্দ্র অনেকটা পূর্বদিকে সরে এসেছে। সিদ্ধান্তীগণ এই গতির পরিমাণ নির্ণয় করেছেন। সূর্যসিদ্ধান্ত মতে, ভগন-ভোগন কাল অর্থাৎ তারার মধ্যে চন্দ্রের পরিভ্রমণ কাল ২৭.৩২১৬৭ মধ্যম সাবন দিন। আধুনিক

জ্যোতির্বিদ্যা মতে, এই কালের পরিমাণ ২৭·৩২১৬৬ মধ্যম সাবন দিন। এ থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় গণনা কত সূক্ষ্ম ছিল।

লম্বনের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাস্কর নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন :
মনে করা যাক, নীচের চিত্রে,



রেখাচিত্র ৬২ : ভাস্করাচার্যের মতে চন্দ্রকক্ষ ও রবিকক্ষ

ভূ = ভূ-কেন্দ্র, পৃথিবীর কেন্দ্র।
দ = পৃথিবীপৃষ্ঠে দ্রষ্টা।
ভূখ = ঊর্ধ্বরেখা।
ভূক্ষ = তির্যকরেখা, ভূ থেকে ভূখ-এর উপরে লম্ব।
ক্ষ = তির্যকরেখা ও সূর্যপথের ছেদবিন্দু।
ক্ষ' = তির্যকরেখা ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দু।
খ = ঊর্ধ্বরেখা ও সূর্যপথের ছেদবিন্দু।
খ' = ঊর্ধ্বরেখা ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দু।
র = সূর্যপথে সূর্যের অবস্থান।
চ = চন্দ্রপথে চন্দ্রের অবস্থান।
চ' = দর-রেখা ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দু।

পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে সূর্য পর্যন্ত রেখাকে গর্ভসূত্র বলে। উপরের চিত্রে ভূর = গর্ভসূত্র।

পৃথিবীপৃষ্ঠে দ্রষ্টার অবস্থান হতে সূর্যের অবস্থান পর্যন্ত রেখাকে দৃকসূত্র বলে। উপরের চিত্রে 'দর' দৃকসূত্র।

অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য গর্ভসূত্রে অবস্থান করে, অর্থাৎ ভূ, চ, র একই সরলরেখায় অবস্থিত হয়। কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে চন্দ্রকে দৃকসূত্র হতে লম্বিত দেখা যায়। এজন্য চ-চ´ চাপকে লম্বন বলে। যখন চন্দ্র বা সূর্য খ-বিন্দুতে অবস্থান করে, তখন গর্ভসূত্র ও দৃকসূত্র এক হয়। এজন্য খ-বিন্দুতে কোন লম্বন নাই।

এইভাবে গণনা ক'রে ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ চন্দ্রের লম্বন চন্দ্রের দৈনিক গতিবেগের পঞ্চদশাংশ ($\frac{১}{১৫}$) অর্থাৎ ৪৮।৪৬ কলাদি (৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড) পেয়েছিলেন। চন্দ্রের পথ বৃত্তাকার নহে, সেজন্য তার লম্বনও সর্বত্র স্থির নহে; কোন সময়ে বেশী, আবার কোন সময়ে কম হয়। সূর্যসিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রের পরম লম্বন ৫৩ কলা (মিনিট), ২০ বিকলা (সেকেণ্ড)। এ থেকে সূর্যসিদ্ধান্তে চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণীত হয়েছে ৬৪·৬৭ ভূ-ব্যাসার্ধ। আধুনিক জ্যোতিবিদ্যা মতে, চন্দ্রের পরম লম্বন ৫৭ মিনিট ৩ সেকেণ্ড এবং দূরত্ব ৬০ ভূ-ব্যাসার্ধ।

ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রহ

অন্যান্য প্রাচীন জ্যোতিবিদ্যার মত ভারতীয় জ্যোতিবিদ্যাতে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রহ বলা ছাড়া, রাহু ও কেতু নামে আরো দুইটি গ্রহের কল্পনা করা হতো। এই রাহু এবং কেতু সূর্যপথ ও চন্দ্রপথের দুইটি ছেদবিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়। চন্দ্রের উপাখ্যানের সঙ্গে রাহু ও কেতুর কথাও বলা হয়েছে।

সূর্য, চন্দ্রকে কেন গ্রহ বলা হয়েছে, যোগেশবাবু তার নানা প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন জাতি যেখানে সূর্য, চন্দ্রকে গ্রহ বলেছেন, হয়তো বা অন্যান্য গ্রহের মত এদেরও তারাদের ভিতরে গতি দেখেই এমন মনে করা হয়েছিল, সেখানে ব্যাখ্যা দিয়ে planet এবং গ্রহের পার্থক্য বোঝানোর চেষ্টা

করার কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগেশবাবু বলেছেন, যে গতি গ্রহণ করে, সে-ই গ্রহ; অতএব এখানেও সেই একই ব্যাপার। আবার রাহু, কেতুর বেলায় গতি গ্রহণ ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনি 'গ্রহণ' অর্থে 'আক্রমণ' বলেছেন। সূর্য ও চন্দ্রকে আক্রমণ করে, সে জন্যই তা'রা গ্রহ।

বেদে গ্রহ

বেদে কোথাও 'গ্রহ' শব্দটি পাওয়া যায় না। তবে নানাস্থানে শুক্র ও ও বৃহস্পতি নামের উল্লেখ আছে। "বলবান সৃষ্টিকারক স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন করে; তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান। আমরা তাঁহার পূজা করি।" (ঋকবেদ ৫/৪৩/১২)

শুক্র এবং বৃহস্পতি এত উজ্জ্বল যে, এ দুইটি অতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈদিক যুগের ঋষিগণ আকাশ পর্যবেক্ষণ ক'রে থাকলে, এই দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন, তবে এদের যে বিশেষ গতি আছে, সে কথা জানতেন বলে মনে হয় না।

পুরাণে গ্রহ

বুধ

বুধের জন্ম সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটিতে বলা হয় যে, "কল্পের প্রথমে ব্রহ্মা ইচ্ছা করিলেন যে, তাঁহার নিজের মত একটি পুত্র হউক। এই ইচ্ছা মাত্র তাঁহার কোলে নীল-লোহিত বর্ণের একটি পুত্রের আবির্ভাব হইল। আবির্ভাব মাত্রই এই কুমার রোদন ও দ্রবণ (এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি) করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রোদন ও দ্রবণ করিতেছ কেন? কুমার উত্তর করিল, 'আমার পরিচয় কি? আমার নাম দাও।' তখন সর্বস্রষ্টা প্রজাপতি বলিলেন, 'তুমি রোদন ও দ্রবণ করিতেছ হেতু তোমার নাম হউক রুদ্র। আর রোদন করিও না। ধৈর্য অবলম্বন কর।' কিন্তু কুমার

তাহাতেও নিবৃত্ত না হইযা আরও সাতবার রোদন করাতে পিতামহ তাহাকে আরো সাতটি নাম দিলেন। এই আট নাম অনুসারে তাঁহাকে আট পত্নী, আট সন্তান এবং আট স্থান প্রদান করা হইল। এই আটটি নাম রুদ্র, ভব, সর্ব, মহেশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। ইহাদের অবস্থান হইল যথাক্রমে সূর্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও সোম। ইহাদের আটজন স্ত্রীর নাম যথাক্রমে সুবর্চলা, উমা, সুকেশী, অপরাশিবা, স্বাহা, দিক, দীক্ষা ও রোহিণী। এই আট পত্নীর গর্ভে আট পুত্রের জন্ম হয়; ইহাদের নাম যথাক্রমে শনৈশ্চর, (শনি), শুক্র, লোহিতাঙ্গ (মঙ্গল), মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তান ও বুধ।"

এইভাবে বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও শনির সৃষ্টির একটি কাহিনী পাওযা যায। রুদ্রের স্থান সূর্য এবং এগুলি রুদ্রের সন্তান। অতএব কষ্টকল্পনা ক'রে যোগেশচন্দ্র রায মহাশয এর ব্যাখ্যাতে বলেছেন, এই গ্রহ চারটি সূর্য দ্বারা উদ্ভূত এবং এদের সাথে সূর্যের সম্বন্ধ আছে।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ষষ্ঠ অধ্যাযে বুধের জন্ম সম্বন্ধে নিম্নরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে :

"ভগবান নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে সমুৎপন্ন অজ যোনী ব্রহ্মার পুত্র অত্রি। অত্রির পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রকে ভগবান নক্ষত্র, ওষধি এবং দ্বিজগণের উপরে আধিপত্য প্রদান করেন। চন্দ্র রাজসূয যজ্ঞ করেন। এই রাজসূয় যজ্ঞের প্রভাবে এবং নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজগণের উপরে আধিপত্যের প্রভাবে চন্দ্রের মনে অহংকার হয। চন্দ্র অহঙ্কারে স্ফীত হইযা দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জানাইলেন। তারাকে ফিরাইযা দিবার জন্য ব্রহ্মা চন্দ্রকে বারবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু চন্দ্র কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতি যেমন দেবতাদের গুরু, শুক্র তেমনি অসুরদের গুরু। সেজন্য বৃহস্পতির সহিত শুক্রের শত্রুতা ছিল। শুক্র চন্দ্রকে সহাযতা করিলেন এবং উৎসাহ দিতে লাগিলেন। শুক্রের সহিত সমস্ত অসুর ও দানব

চন্দ্রের পক্ষ লইল। অন্যপক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবসৈন্য লইয়া বৃহস্পতির পক্ষে দাঁড়াইলেন। বৃহস্পতি-পত্নী তারার জন্য এইভাবে ভীষণ যুদ্ধ হইল এবং সেজন্য এই যুদ্ধ 'তারকাময় সংগ্রাম' বলিয়া আখ্যাত হইল। এই ভীষণ সংগ্রামে সমস্ত লোক সন্ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মা, শুক্র, শঙ্কর, অসুর ও দেবগণকে নিবৃত্ত করিয়া তারাকে বৃহস্পতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া বৃহস্পতি তারাকে বলিলেন, আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরশজাত পুত্র ধারণ করা তোমার উচিত নহে; তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।' বৃহস্পতি এই কথা বলিলে পতি-ব্রতা তারা পতিবাক্যে সেই গর্ভ ঈষিকা স্তম্ভে পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যাক্ত হইবামাত্র গর্ভস্থ বালক স্বকীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজের অভিভব করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। তখন বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই সেই কুমারকে সন্তানরূপে পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেবগণ সন্দিহান হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে অতি সুভগে, তুমি সত্য করিয়া বল, এই সন্তান কাহার? বৃহস্পতির না চন্দ্রের?' দেবগণ এই কথা বলিলে, তারা লজ্জায় কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও দেবতাগণ যখন উত্তর পাইলেন না, তখন সেই কুমার জননীকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিল, 'অয়ি দুষ্ট স্বভাবে জননী! কেন আমার পিতার নাম প্রকাশ করিতেছ না? অলীক লজ্জাবতী! তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহ তোমার ন্যায় মন্থর ভাষিণী হইবে না।' অনন্তর ভগবান পিতামহ সেই কুমারকে নিবৃত্ত করিয়া তারাকে বলিলেন, 'বৎসে! বল এই পুত্র কাহার? চন্দ্রের না বৃহস্পতির।' এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া তারা লজ্জাজড়িত ভাবে বলিলেন, 'চন্দ্রের'। তারপর চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন 'হে বৎস! সাধু, সাধু! তুমি প্রাজ্ঞ বটে, সেইজন্যে তোমার নাম হইল বুধ'।

মঙ্গল

বুধের জন্মবৃত্তান্তে দেখা গেছে যে, আটবার রোদনে রুদ্রের আটটি নাম হয়। এই আটটি নামের একটি সর্ব, এর স্থান মহী। সর্বের স্ত্রী সুকেশীর গর্ভে লোহিতাঙ্গ বা মঙ্গলের জন্ম হয়। লিঙ্গপুরাণ বলেন, "মঙ্গল অগ্নির পুত্র; বিকেশী নাম্নী পত্নীর গর্ভে এর জন্ম। ইনি লোহিতাঙ্গ অর্থাৎ লালবর্ণের এবং যুবা।" পরাশর বলেন, "সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অতি পুরাকালে প্রজাপতি নিজের তেজ হইতে অগ্নি নির্গত করিয়া তাহা দ্বারা হোম করেন। সেই অগ্নি পৃথিবীতে গমন করিয়া পৃথিবীর সমস্ত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়াছিল। এজন্য ইহাকে প্রাজাপত্য ও ভৌম বলা হয়। ব্রহ্মার আদেশে ভৌম ভূ-চক্রে বিচরণ করিতে করিতে বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" মনে হয়, মঙ্গলের লালবর্ণ এবং গ্রহসমূহের বক্রগতি পর্যবেক্ষণের ফলেই এই সমস্ত উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়।

শুক্র

শুক্র অতি উজ্জ্বল গ্রহ, প্রায় বৃহস্পতির সমান উজ্জ্বল। সেজন্য হয়তো এই দুইটি গ্রহের একটিকে অর্থাৎ শুক্রকে অসুর বা দানবদের গুরু এবং অন্যটিকে অর্থাৎ বৃহস্পতিকে দেবতাদের গুরুর পদে বসানো হয়। মন্ত্র দ্বারা শুক্র মৃতকে জীবিত করতেন। দেব-দানব যুদ্ধে যত দানব মারা যেত তাদের সকলকেই শুক্র বাঁচিয়ে তুলতেন। কিন্তু দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির সে ক্ষমতা ছিল না। সেজন্য বৃহস্পতি তাঁর নিজের ছেলে কচকে শুক্রের শিষ্য হতে ছদ্মবেশে পাঠিয়ে দেন। সেখানে শুক্রের কন্যা দেবযানী কচের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন; কিন্তু কচ দেবযানীকে বিবাহ না করায়, দেবযানী তাকে অভিশাপ দেয় যে, মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্র কচ অন্যকে শিখাতে পারবে, কিন্তু নিজে প্রয়োগ করতে পারবে না।

বুধের জন্ম-উপাখ্যানের সাথে শুক্রের জন্মকথাও বলা হয়েছে। রোদন ও দ্রবণরত রুদ্রের দ্বিতীয় নাম ভব এবং তার আবাসস্থল জল।

তব ভৃগুকন্যা উমাকে বিবাহ করেন এবং তার গর্ভে শুক্রের জন্ম হয়। মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণ বলেন, "চন্দ্রের ন্যায় শুক্রও জলময়"। শুক্রের স্নিগ্ধ দীপ্তির জন্য এরূপ কল্পনা করা হয়েছিল বলে মনে হয়।

বৃহস্পতি

বুধের জন্মকাহিনীতে রুদ্রের যে আটটি নাম দেওয়া হয় এবং তাদের যে আটটি সন্তান হয়, তাদের মধ্যে বৃহস্পতির নাম নাই। পুরাণে বৃহস্পতির জন্ম-উপাখ্যান এইভাবে দেওয়া আছে: "ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরার শুভা নামে এক পত্নী ছিল। ইহার গর্ভে অঙ্গিরার তিন ছেলে হয়; ইহাদের নাম বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর্ত্ত। শারীরিক তেজ, মানসিক প্রতিভা, বেদজ্ঞান ইত্যাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম হয় বৃহস্পতি।" যোগেশবাবু মনে করেন, বৃহস্পতি গ্রহ অতি প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত হয়, সেজন্য একে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়েছে। এইরূপ মনে করবার কারণস্বরূপ তিনি বলেন, সূর্য ও চন্দ্রের পরেই বৃহস্পতি উজ্জ্বল। সেজন্য অতি প্রাচীন কালেই একে পর্যবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু শুক্র অনেক সময় বৃহস্পতি অপেক্ষাও উজ্জ্বল হয় এবং শুক্রকে লক্ষ্য করাও অনেকটা সহজ। কিন্তু তবুও শুক্রকে সেই রুদ্রের উপাখ্যানের সাথেই জড়িত করা হয়েছে।

শনি

বুধের জন্মবৃত্তান্তে শনিরও জন্মের উল্লেখ করা হয়েছে। রুদ্রের স্ত্রী সুবর্চলার গর্ভে শনির জন্ম হয়। আবার অন্য মতে, শনির জন্মের অন্যরূপ কাহিনীও পাওয়া যায়। সৃষ্টির আদিতে সূর্য অতি প্রখর তেজ-সম্পন্ন ছিল। "এই তেজে সমস্ত চরাচর দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। ব্রহ্মা সূর্যকে তাঁহার তেজ সংবরণ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, 'দেবতারাই তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছে না, পৃথিবীর মানুষ

কি করিয়া সহ্য করিবে?' ব্রহ্মার এই আদেশে সূর্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই ক্রোধের হেতু শনির জন্ম হইল"।

গ্রহসমূহের গতি

পুরাণে কোথাও পৃথিবীর আবর্তন বা পরিভ্রমণ স্বীকার করা হয় নাই। তবে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং তারাসমূহের পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকের গতির তাঁরা অন্য প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রই পশ্চিম দিকে গতিশীল, একমাত্র ধ্রুবতারাই স্থির। তাঁরা মনে করতেন যে, মেঘমণ্ডলের উপরে প্রবহ নামে এক প্রকার বায়ু সর্বদা পশ্চিম দিকে সমবেগে প্রবাহিত হয়। এই প্রবহ বায়ু গ্রহ-নক্ষত্রগণকে পশ্চিম দিকে তাড়িত করে। এরা প্রত্যেকে ধ্রুবতারার সাথে বায়ুরশ্মি দ্বারা আবদ্ধ। 'নদীতে যেমন সলিল দ্বারা নৌকা বাহিত হয়, তেমনি এই সকল গ্রহ বা দেবালয় বায়ুরশ্মি দ্বারা বাহিত হইতেছে। আকাশে যতগুলি তারা ততগুলি বায়ুরশ্মি।' এখানে ধ্রুব-তারাকে ঘানির সাথে তুলনা করা হয়েছে। ঘানির পেষণদণ্ড যেমন নিজে ঘোরে এবং গরু ও কাঠের উপরে রাখা সমস্ত জিনিসকে ঘুরায়, ধ্রুবও তেমনি নিজের আবদ্ধ স্থানে ঘোরে এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ককে বায়ুরশ্মি দ্বারা নিজের চারদিকে ঘুরায়।

অন্যান্য তারার ন্যায় দৈনন্দিন পশ্চিম গতি ছাড়া গ্রহসমূহের যে অন্য গতি আছে, সে সম্বন্ধে বায়ুপুরাণ বলেন, "শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল এই তিনটি গ্রহ সবার উপরে থাকিয়া বিচরণ করিতেছেন। এজন্য ইহারা মন্দগামী। ইহাদের অধোভাগে অন্য চারটি গ্রহ আছেন—রবি, সোম, বুধ ও শুক্র। এজন্য ইহারা শীঘ্রগামী। অয়নক্রমে সূর্য কখনও উচ্চে, কখনও নিম্নে দেখা যায়। দক্ষিণ মার্গস্থ হইলে সূর্য যথাকালে উদিত হন না এবং শীঘ্র অস্তগত হন। তৎকালে অমাবস্যার চন্দ্র দক্ষিণে থাকেন। কেবল বিষুবদিনে চন্দ্র ও সূর্য উভয়েই সমান

সময়ে উদিত ও অস্তগত হন। দক্ষিণায়নকালে সূর্য সকল গ্রহের নিম্নে থাকিয়া বিচরণ করেন।"

সিদ্ধান্তে গ্রহ

কোন সিদ্ধান্তেই গ্রহ সম্বন্ধে পুরাণবহির্ভূত কোন কথাই বলা হয় নাই। আকাশের জ্যোতিকমণ্ডলীকে যে পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখা যায়, বায়ুপ্রবাহই তার কারণ, সিদ্ধান্তীগণ এই কথাই বলেন।

পুলিশ বলেন, 'বায়ু প্রবাহে তারাসমূহ আবর্তিত হয়। দুই মেরুতে খ-গোলক স্থির থাকে। সুমেরু পর্বতের অধিবাসীগণের নিকট ইহা বাম হইতে দক্ষিণ গতি বলিয়া মনে হয় এবং বাড়বমুখের অধিবাসী-গণের নিকট তাহার বিপরীত গতি বলিয়া মনে হয়।'

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, আকাশের তারা-সকলকে যে আমরা পূর্বদিকে উদিত হইয়া আবর্তনক্রমে পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখি, তাহার প্রকৃত গতি কোন্ দিকে? তাহা হইলে সে এই কথাই জানুক যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে এই গতির দিক বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। সুমেরু পর্বতের অধিবাসীগণ ইহাকে বাম হইতে দক্ষিণ গতিরূপে দেখেন, বাড়বমুখের অধিবাসীগণ ইহাকে দক্ষিণ হইতে বাম দিকের গতিরূপে দেখেন, নিরক্ষবৃত্তের অধিবাসীগণ ইহাকে সম্পূর্ণ পশ্চিম দিকের গতি বলিয়া মনে করেন, মেরু ও নিরক্ষবৃত্তের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসীগণ অল্পবিস্তর অবনত অবস্থায় এই গতিকে লক্ষ্য করেন। বায়ুপ্রবাহে খ-গোলক আবর্তিত হয়; তাহার ফলেই তারা এবং গ্রহগণ পূর্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহা ছাড়াও আকাশের জ্যোতিকমণ্ডলীর প্রকৃত গতি পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে অর্থাৎ অশ্বিনী হইতে ভরণীর দিকে। কেহ যদি নক্ষত্র চেনে, তাহা হইলে সে চন্দ্রের গতি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে, কিভাবে সে সূর্যের নিকট হইতে পূর্বদিকে

সরিয়া যাইতে যাইতে আবার সূর্যের সহিত মিলিত হয়। ইহাই জ্যোতিষ্কসমূহের দ্বিতীয় গতি।'

ব্রহ্মগুপ্ত বলেন, 'বায়ুপ্রবাহে তারা এবং গ্রহ-সকল পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে একইভাবে আবর্তিত হয়। কিন্তু কুম্ভকারের আবর্তনশীল চক্রের উপরিস্থিত ধূলিকণা যেমন চক্রের আবর্তনের বিপরীত দিকে গতিশীল হয়, গ্রহগণ খ-গোলকে অবস্থিত হইলেও অতি মৃদুগতিতে তাহারা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে গমন করে।'

সূর্যসিদ্ধান্ত বলেন, 'প্রবহ বায়ুর তাড়নায় গ্রহগণ অতি দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে গমন করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহারা অন্যান্য তারা হইতে ভারী এবং তাহাদের ভ্রমণপথে 'প্রবহ বায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত কম, সেজন্য তাহার আঘাতের পরিমাণও কম, এই কারণেই গ্রহগণকে তারাসমূহের পিছনে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।' অর্থাৎ সূর্যসিদ্ধান্ত মতে, গ্রহগণের নিজস্ব কোন গতি নাই, প্রবহ বায়ুর তাড়নার পরিমাণ কম বলিয়াই তাহারা পূর্বদিকে পিছাইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্যপথ

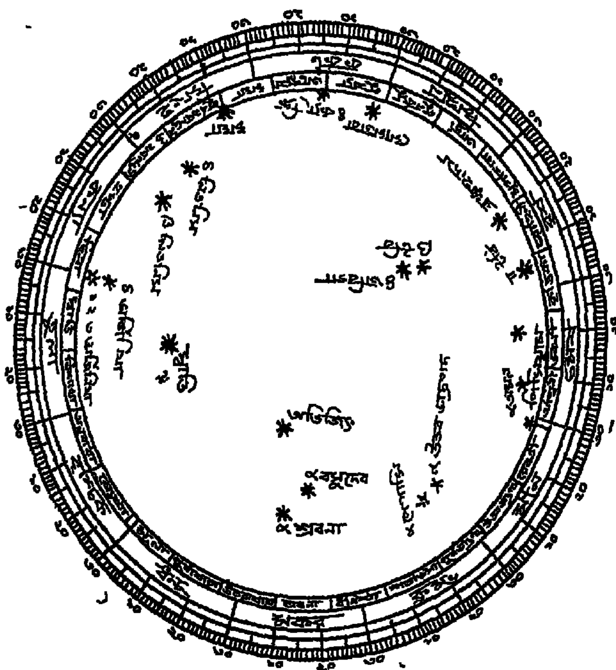
বিভিন্ন দেশের জ্যোতির্বিদ্যাতে সূর্যপথকে মেষ, বৃষ ইত্যাদি রাশিতে বিভক্ত করা হয়েছে। নানা পণ্ডিতজন এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। এখন প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, ঐ সমস্ত দেশের রাশিসমূহ একই সাধারণ উৎস হ'তে উদ্ভূত। মধ্য-এশিয়ার আদিবাসী পশুপালক যাযাবর সম্প্রদায়ই এই রাশিসমূহের উদ্ভাবক। সূর্যপথকে চন্দ্রের নিবাস হিসাবে ২৭ বা ২৮ ভাগে বিভক্ত করাও হয়তো সেই সময়েরই কাজ। মধ্য-এশিয়ার আদি বাসভূমি পরিত্যাগের পর আর্যজাতিগণ নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং জ্যোতির্বিদ্যার ধারাও বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে থাকে। ভারতবর্ষে রাশিচক্রের ভিতর দিয়ে সূর্য ও চন্দ্রের গতিবিধি নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। আদি গ্রীসে এবং ভারতবর্ষে চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা হতো সূর্যপথকে মূল বৃত্তরূপে কল্পনা ক'রে নিয়ে। পাশ্চাত্যে পরে সূর্যপথের পরিবর্তে খ-বিষুবকে মূলবৃত্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং বিষুবাংশ ও বিষুবলম্বের সাহায্যে আকাশে জ্যোতিষ্কের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় বরাবর সূর্যপথকেই মূলবৃত্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বসন্ত-বিষুবনকে আদি বিন্দু ধরে অবস্থান নির্ণয় করা হতো ঠিকই। কিন্তু খ-বিষুব-মেরুর সঙ্গে জ্যোতিষ্ককে যোগ ক'রে সেই বৃহৎ বৃত্তটি সূর্যপথকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, বিষুবন বিন্দু থেকে এই বিন্দুর সূর্যপথের উপরে দূরত্বকে বলা হ'তো ধ্রুবক আর জ্যোতিষ্কটি থেকে সূর্যপথের ছেদবিন্দু পর্যন্ত অংশকে বলা হতো বিক্ষেপ। এটা একটা গোলমেলে ব্যবস্থা।

সূর্যপথকে মূলবৃত্ত নেওযা হচ্ছে, অথচ গৌণবৃত্ত নেওযা হচ্ছে খ-বিষুবেব। যাইহোক, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূজা, পার্বণ, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদির সঠিক সময নির্ণয় কবা। এই সমস্তের দিনক্ষণ চন্দ্র-সূর্যেব অবস্থানের উপব নির্ভব করে। সেজন্য ভাবতীয জ্যোতির্বিদ্যায় প্রধানতঃ চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহসমূহেব গতিবিধিব চর্চা কবা হযেছে। জ্যোতিব আলোচনার জন্য গ্রহেব অবস্থানেব প্রযোজন হতো। অন্যান্য স্থিব তারা বা খ-গোল সম্বন্ধীয অন্য আলোচনা সেখানে পাওযা যায না।

সূর্যপথেব ১২টি বাশি ও ২৭টি নক্ষত্র ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাব প্রধান অবলম্বন। সাতাইশটি নক্ষত্রেব প্রত্যেকটি সূর্যপথের সমান স্থান অধিকাব কবে। অর্থাৎ প্রত্যেক নক্ষত্রের স্থানেব পবিমাণ ৩৬০÷২৭ ডিগ্রী= ১৩°২০′=৮০০ মিনিট। সূর্যপথে প্রত্যেকটি নক্ষত্রেব স্থান নির্দিষ্ট। এর কোন পবিবর্তন হয না। মেষবাশির আদিবিন্দু অতি প্রাচীন-কালে যেখানে ছিল, এখনও সেখানেই আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার মূলবিন্দু বসন্তবিষুবন। যদিও এই বিন্দুটি মেষবাশিব আদিবিন্দু নামে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ বিন্দু বর্তমানে মেষবাশিতে তো নাই-ই, বরং তাব পূর্বেব মীনবাশির প্রায শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। বেদ, পুবাণ, বামাযণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহের নানাবিধ ঘটনা আলোচনা ক'বে এবং সেই সমযে বিষুবনেব অবস্থান নির্ণয় ক'রে ঐ সমস্ত ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাল নির্ণযেব চেষ্টা কবা হযে থাকে।

সূর্যপথেব ২৭ নক্ষত্রেব কথা চন্দ্রেব অধ্যাযে বলা হয়েছে। চন্দ্র প্রায় ২৭ দিনে আকাশের তাবাদের মধ্যে একবাব সম্পূর্ণ সূর্যপথ ঘুরে আসে। এজন্যই সূর্যপথকে ২৭ ভাগে ভাগ কবা হযেছে। এদেব প্রত্যেকটি নক্ষত্রে একটি ক'বে তাবা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কবা হতো। ঐ তাবাটিকে ঐ নক্ষত্রেব যোগতারা বলা হতো। নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জ্বলতম তারাই সাধাবণতঃ যোগতাবারূপে নির্দিষ্ট হতো। কোন নক্ষত্রের আদিবিন্দু থেকে ঐ নক্ষত্রের যোগতাবা পর্যন্ত সূর্যপথের অংশকে ঐ নক্ষত্রের ভোগ বলে। ভাবতীয জ্যোতির্বিদ্যায নক্ষত্রেব অবস্থান নির্দিষ্ট এবং

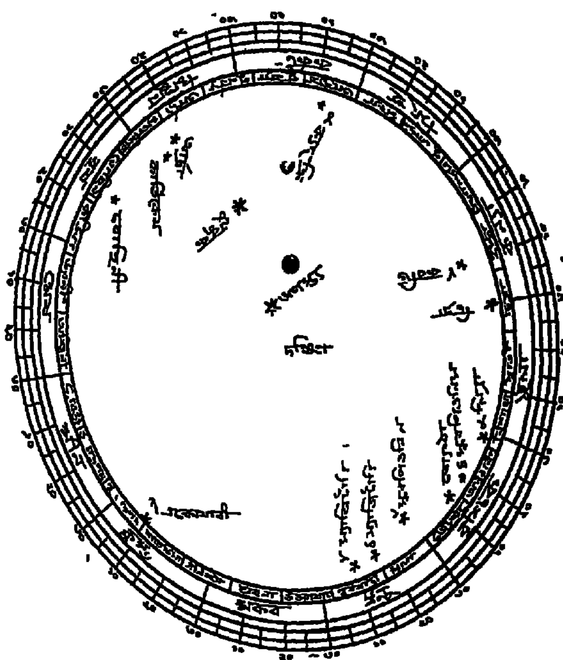
যোগতারাও স্থির। অতএব প্রত্যেক নক্ষত্রের একটি নির্দিষ্ট ভোগ আছে। কোন সময় এর পরিবর্তন হয় না। বিস্তীর্ণ রাজপথে যেমন মাঝে মাঝে দূরত্বজ্ঞাপক মাইল-ফলক প্রোথিত থাকে আকাশের সূর্য-পথেও তেমনি যোগতারাসমূহ নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেকটি নক্ষত্র ১৩°২০′ এবং নক্ষত্রের আদিবিন্দু থেকে যোগতারার দূরত্বও নির্দিষ্ট। অতএব সূর্য, চন্দ্র বা গ্রহসমূহ ঐ সমস্ত যোগতারার নিকবর্তী হলে, সূর্যপথের আদিবিন্দু থেকে তাদের দূরত্ব নির্ণয় করা কঠিন ছিল না।



রেখাচিত্র ৬৩ : ভারতীয় সূর্যপথ ও উত্তরদিকের যোগতারাসমূহ

যোগতারা সব ক্ষেত্রে সূর্যপথের ঠিক উপরে অবস্থিত নয়। কোন কোন যোগতারা সূর্যপথের উত্তরে, আবার কোন কোনটি সূর্যপথের

দক্ষিণে অবস্থিত। এমনভাবে যোগতারা স্থির করা হয়েছে, যেন সেগুলি খুব স্পষ্ট দেখা যায় এবং সূর্যপথের উপরে বা নিকটে অবস্থিত হয়। এর কারণ এই যে, কোন গ্রহের সাথে কোন যোগতারার সংযোগ হলে, অথবা গ্রহ বা চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হলে, অতি সহজেই তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। চন্দ্রপথ ও গ্রহ-কক্ষসমূহ সূর্যপথের নিকটবর্তী; সেজন্য যোগতারাসমূহও সূর্যপথের নিকটবর্তী হওয়াতে সংযোগ বা



রেখাচিত্র ৬৪ : ভারতীয় সূর্যপথ ও দক্ষিণ দিকের যোগতারাসমূহ

আচ্ছাদন অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। দুইটি চিত্র দ্বারা ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার রাশিচক্র ও যোগতারার অবস্থান দেখানো গেল।

প্রত্যেকটি তারার আধুনিক পাশ্চাত্য নাম ও প্রাচীন ভারতীয় নাম দেওয়া হলো।

যোগতারা ছাড়া সিদ্ধান্তসমূহে আরো কতকগুলি তারার উল্লেখ আছে। এদেব মধ্যে উত্তব আকাশেব ব্রহ্মহৃদয (Capella), অগ্নি (Alnath), প্রজাপতি (δ-Aurigae) এবং দক্ষিণ আকাশের লুব্ধক (Sirius), অগস্ত্য (Canopus) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্র বা গ্রহসমূহের ধ্রুবক নির্ণযেব জন্য মঘা (Regulus), পুষ্যা

বেখাচিত্র ৬৫ : ভাবতীয সূর্যপথ ও যোগতারাসমূহ

(Praesepe), রেবতী (δ-Piscium) এবং দুর্যোধন (λ-Aquarium) প্রভৃতি তাবাব সাথে তুলনা করা হতো। এদেব সাথে কোন গ্রহের

সংযোগ বা স্পর্শ হলে, ঐ সমস্ত গ্রহেব ধ্রুবক ঐ তাবার ধ্রুবকের সমান হয়। এইভাবে যখনই কোন গ্রহ এই সমস্ত তারার যে কোন একটির নিকটবর্তী হতো, তখন তাব ধ্রুবক নির্ণয় কবা সহজ হতো। অন্য সময়ও অনুপাতেব সাহায্যে ধ্রুবক নির্ণয় কবা হতো। অনুরূপভাবে কোন গ্রহের বিক্ষেপ নির্ণয় করতে চিত্রানক্ষত্রেব প্রথম তাবার সাহায্য নেওয়া হতো। সূর্যপথ থেকে দূরবর্তী স্থিব তাবাব সাহায্যেও গ্রহেব ধ্রুবক ও বিক্ষেপ নির্ণয় কবা হতো। স্থির তাবাসমূহের এই স্থানাঙ্ক দুইটি সর্বদা নির্দিষ্ট। এদেব সঙ্গে যখন কোন গ্রহেব বা চন্দ্রেব ভেদ হয়, তখন সেই গ্রহের বা চন্দ্রেব স্থানাঙ্ক নির্ণয় কবা যায়। দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনেব ফলে কোন্ সময়ে কোন্ তাবার সাথে কোন্ গ্রহের সংযোগ বা আচ্ছাদন হবে, গণনা দ্বাবা তা আগে থেকেই ঠিক কবা যেত। প্রাচীনকালে এই ভাবেই গণনা কবা হতো।

ভাবতীয় নক্ষত্রসমূহকে বিভিন্ন আকারে কল্পনা করা হয়ে থাকে। নক্ষত্রসমূহের নাম ও তাদেব আকাব দুইটি শ্লোকে বর্ণিত আছে।

নক্ষত্রসমূহ ঃ

১ ২ ৩ ৪
অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা।

৪ ৫ ৬ ৭
মৃগশীর্ষস্তথা চার্দ্রা পুনর্বসুক পুষ্যাকো॥

৯ ১০ ১১ ১২
অশ্লেষা চ মঘা পূর্বফল্গুন্যুত্তরফল্গুনী।

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চানুরাধিকা॥

১৮ ১৯ ২০ ২১
জ্যেষ্ঠা মূলং তথাষাঢে পূর্বোত্তব পদাদিকে।

২২ ২৩ ২৪ ২৫
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ শতভিষাদ্য ভাদ্রিকা॥

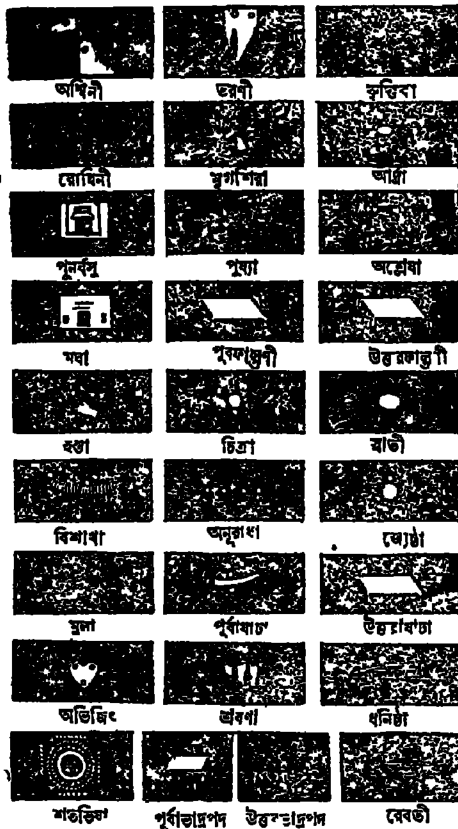
২৬ ২৭
উত্তবাদিভাদ্রপদা বেবতী ভানি চ ক্রমাৎ।

উহাদের আকার ঃ

তুরগমুখ সদৃশং যোনিরূপং ক্ষুরাভং
শকট সমমথৈণস্যোত্তমাঙ্গেন তুল্যং।
মণিগৃহ শর চক্রাভানি শালোপমাভং
শয়ন সদৃশমন্যচ্চাপি পর্য্যঙ্ক তুল্যং॥
হস্তাকার মতশ্চ মৌক্তিকসমং চান্যৎ
প্রবালোপমং ধিষ্ণ্যং তোরণবৎ স্থিতং
বলিনিভং সৎকুণ্ডলাভং পরং।
ক্রুদ্ধৎ কেসরিণ ক্রমেণ সদৃশং শয্যা সমানং পরং
চান্যদ্দন্তি বিষাণ-বৎস্থিত মতঃ শৃঙ্গাটক ব্যক্তিচ॥
ত্রিবিক্রমাভং চ মৃদঙ্গরূপং বৃত্তং ততোহন্যদ্ যমলদ্বয়াভম।
পর্য্যঙ্করূপং মুরজানুকারী চেত্যেবমশ্ব্যাদিভচক্ররূপং॥

	নক্ষত্র নাম	নক্ষত্র আকার		নক্ষত্র নাম	নক্ষত্র আকার
১।	অশ্বিনী	অশ্বমুখ	১৫।	স্বাতী	প্রবাল
২।	ভরণী	যোনী	১৬।	বিশাখা	তোরণ
৩।	কৃত্তিকা	ক্ষুর	১৭।	অনুরাধা	বলি
৪।	রোহিণী	শকট	১৮।	জ্যেষ্ঠা	কুণ্ডল
৫।	মৃগশিরা	হরিণমুণ্ড	১৯।	মূলা	সিংহপুচ্ছ
৬।	আর্দ্রা	মণি	২০।	পূর্বাষাঢা	মঞ্চ
৭।	পুনর্বসু	গৃহ	২১।	উত্তরাষাঢা	হস্তিদন্ত
৮।	পুষ্যা	বাণ	২২।	শ্রবণা	ত্রিপদ
৯।	অশ্লেষা	চক্র	২৩।	ধনিষ্ঠা	মৃদঙ্গ
১০।	মঘা	গৃহ	২৪।	শতভিষা	চক্র
১১।	পূর্বফাল্গুনী	শয্যা	২৫।	পূর্বভাদ্রপদ	যমলদ্বয়
১২।	উত্তরফাল্গুনী	খাট	২৬।	উত্তরভাদ্রপদ	শয্যা
১৩।	হস্তা	হস্ত	২৭।	রেবতী	মৃদঙ্গ।
১৪।	চিত্রা	মুক্তা			

কোন্ কোন্ বিশেষ তারার নামে এই নক্ষত্রগুলির নামকরণ করা হয়েছে, তা নির্ণয়ের জন্য কোলব্রুক অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি সূর্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত শিরোমণি, গ্রহ লাঘব, সিদ্ধান্ত সার্বভৌম ইত্যাদি



রেখাচিত্র ৬৬ : ভারতীয় নক্ষত্রের চিত্র

প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষভাবে অধ্যয়ন ক'রে তারাগুলির ধ্রুবক ও বিক্ষেপ অনুযায়ী একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। এই তালিকাতে প্রত্যেক

নক্ষত্রেব যোগতারা বা প্রধান তারা বর্তমানে কোন্ নামে পবিচিত তাও তিনি নির্ণব কবেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ কোন তাবাকে ঠিক সেই স্থানে পাওবা যায় না। হ্যতো তৎকালীন পর্যবেক্ষণ-ত্রুটির জন্যই ঠিক মান প্রদত্ত হয় নাই। সেজন্য সেই মান অনুযাবী নিকটবর্তী কোন্ তারাটিকে নির্দেশ করা হযেছে কোলব্রুক তাও নির্ণব কবেছেন। বেণ্টলীও তাঁব Hindu Astronomy-তে অনুরূপ একটি তালিকা দিয়েছেন এবং বার্জেস সূর্যসিদ্ধান্তেব অনুবাদে একটি তালিকা প্রণয়ন কবেন।

নিম্নে একটি তালিকা দেওবা হলো, এতে বিভিন্ন মতে প্রত্যেক নক্ষত্রের যোগতাবাব নাম দেওবা গেল।

নক্ষত্র	কোলব্রুক মতে যোগতাবা	বার্জেস মতে যোগতাবা	বেণ্টলী মতে যোগতাবা
১। অশ্বিনী	α Arities	β-Arities	γ অথবা β-Arities
২। ভরণী	Musca	35, 41 Arities	35 Arities
৩। কৃত্তিকা	π Tauri	Alcyone, 27 বা 28 Tauri	Alcyone
৪। বোহিণী	α Tauri	Aldebaran	Aldebaran
৫। মৃগশিবা	λ Orionis	λ Orionis	133, 116, 117 Tauri
৬। আর্দ্রা	α Orionis	α Orionis	133 Tauri
৭। পুনর্বসু	β Geminorium	Pollux	Pollux
৮। পুষ্যা	δ Cancri	δ Cancri	δ Cancri
৯। অশ্লেষা	α, 1 and 2 Cancri	ϵ Hydrae, α Cancri	49,50 Cancri
১০। মঘা	α Leonis	Regulus	Regulus
১১। পূর্ব-ফাল্গুনী	δ Leonis	δ Leonis	70,71 Leonis

১২। উত্তর-ফাল্গুনী	β Leonis	β Leonis	β Leonis
১৩। হস্তা	γ or δ Corvi	γ and δ Corvi	7,8 Corvi
১৪। চিত্রা	α Virginis	Spica	Spica
১৫। স্বাতী	α Bootes	Arcturus	Arcturus
১৬। বিশাখা	α or χ Librae	ε or χ Librae	24 Librae
১৭। অনুরাধা	δ Scorpionis	δ Scorpionis	β Scorpionis
১৮। জ্যেষ্ঠা	α Scorpionis	Antares	Antares
১৯। মূলা	λ Scorpionis	λ Scorpionis	34,35 Scorpionis
২০। পূর্বাষাঢ়া	δ Sagittarii	δ Sagittarii	δ Sagittarii
২১। উত্তরাষাঢ়া	τ Sagittarii	τ Sagittarii	φ Sagittarii
২২। শ্রবণা	α Aquilae	α Aquilae	α Aquilae
২৩। ধনিষ্ঠা	α Delphini	α Delphini	β Delphini
২৪। শতভিষা	λ Aquarii	λ Aquarii	λ Aquarii
২৫। পূর্বভাদ্রপদ	α Pegasi	α Pegasi	α Pegasi
২৬। উত্তরভাদ্রপদ	α Andromedae	γ Pegasi অথবা α-Andromedae	γ Pegasi
২৭। রেবতী	ζ Piscium	ζ Piscium	ζ Piscium

কোন্ নক্ষত্রে কতটি তারা আছে, এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের একজন দেবতা আছে। এই সমস্ত দেবতা এত প্রসিদ্ধ যে, নক্ষত্রের নাম না ক'রে কেবলমাত্র দেবতাদের নাম করলেই নক্ষত্র বুঝা যায়।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
অশ্বি যম দহন কমলজ শশি শূল ভূদদিতি জীব ফণি পিতরঃ

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
যোন্যযমদিন কৃৎ ত্বষ্টৃ পবন শক্রাগ্নি মিত্রাশ্চ ॥

১৮ ১৯ ২০ ২১ ০ ২২ ২৩ ২৪
শক্রোনিঋ'তি স্তোয়ং বিশ্বে ব্রহ্মা হরির্বসুর্বরুণ।

২৫ ২৬ ২৭
অজপাদোহহির্বুধ্ন্যঃ পূষা চেতীশ্বরা ভানাম্ ॥

অর্থাৎ অশ্বিনীর দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভরণীর যম, কৃত্তিকার অগ্নি, রোহিণীর ব্রহ্মা, মৃগশিরার চন্দ্র, আর্দ্রা'র রুদ্র বা মহাদেব, পুনর্বসুর অদিতি, পুষ্যার বৃহস্পতি, অশ্লেষার সর্প, মঘার পিতৃগণ, পূর্বফাল্গুনীর ভগ, উত্তরফাল্গুনীর অর্যমা, হস্তার রবি, চিত্রার বিশ্বকর্মা, স্বাতীর পবন, পূর্বাষাঢ়ার জল, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্বদেব, শ্রবণার বিষ্ণু, ধনিষ্টার বসুগণ, শতভিষার বরুণ, পূর্বভাদ্রপদার অজপাৎ, উত্তরভাদ্রপদার অহির্বুধ্ন, এবং রেবতীর পূষা।

নিম্নে বিভিন্ন মতে নক্ষত্রসমূহে তারার সংখ্যা, নক্ষত্রের আকার, এবং সূর্যসিদ্ধান্ত মতে যোগতারার অবস্থান, তার ধ্রুবক ও বিক্ষেপ দেওয়া গেল। ধ্রুবকের প্রথম অঙ্ক রাশিসংখ্যা; দ্বিতীয় অঙ্ক ডিগ্রী, এবং তৃতীয় অঙ্ক মিনিট। প্রথমে রাশি ও নক্ষত্রের ভিতরে সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক রাশি ৩০ ডিগ্রী এবং প্রত্যেক নক্ষত্র ১৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট। অতএব প্রতি রাশিতে দুইটি পূর্ণ নক্ষত্র এবং একটি নক্ষত্রের কিয়দংশ থাকে। রাশি গণনায় মেষরাশির সংখ্যা দেওয়া হয় ০ (শূন্য), বৃষ ১, ইত্যাদি রূপে মীন রাশির সংখ্যা ১১। প্রত্যেক রাশিতে ২¼ (সোয়া দুই) নক্ষত্র অবস্থিত।

রাশি	নক্ষত্রসমূহ		
০ মেষ	১ অশ্বিনী ১৩/২০	২ ভরণী ১৩/২০	৩ কৃত্তিকা ৩/২০
১ বৃষ	৩ কৃত্তিকা ১০/০	৪ রোহিনী ১৩/২০	৫ মৃগশিরা৬/৪০
২ মিথুন	৫ মৃগশিরা ৬/৪০	৬ আর্দ্রা ১৩/২০	৭ পুনর্বসু১০/০
৩ কর্কট	৭ পুনর্বসু ৩/২০	৮ পুষ্যা ১৩/২০	৯ অশ্লেষা১৩/২০
৪ সিংহ	১০ মঘা ১৩/২০	১১ পূঃফাল্গুনী ১৩/২০	১২ উঃফাল্গুনী ৩/২০
৫ কন্যা	১২ উঃফাল্গুনী ১০/০	১৩ হস্তা ১৩/২০	১৪ চিত্রা ৬/৪০
৬ তুলা	১৪ চিত্রা ৬/৪০	১৫ স্বাতী ১৩/২০	১৬ বিশাখা ১০/০
৭ বৃশ্চিক	১৬ বিশাখা ৩/২০	১৭ অনুরাধা ১৩/২০	১৮জ্যেষ্ঠা ১৩/২০
৮ ধনু	১৯ মূলা ১৩/২০	২০ পূর্বাষাঢ়া ১৩/২০	২১ উঃ আষাঢ়া ৩/২০
৯ মকর	২১ উঃ আষাঢ়া ১০/০	২২ শ্রবণা ১৩/২০	২৩ ধনিষ্ঠা ৬/৪০
১০ কুম্ভ	২৩ ধনিষ্ঠা ৬/৪০	২৪ শতভিষা ১৩/২০	২৫ পূঃভাঃপদ ১০/০
১১ মীন	২৫ পূঃভাঃপদ ৩/২০	২৬ উঃভাঃপদ ১৩/২০	২৭ রেবতী ১৩/২০

বিভিন্ন মতে নক্ষত্র বর্ণনা

নক্ষত্র নাম	সূর্যসিদ্ধান্ত মতে		রত্নমালা মতে		জ্যোতিষসার মতে		বাত্রিলগ্ন নিরূপণ মতে		দেবতা
	যোগতারার অবস্থান	ধ্রুবক বিক্ষেপ	তারা-সংখ্যা	নক্ষত্রা-কার	তারা-সংখ্যা	নক্ষত্রা-কার	তারা-সংখ্যা	নক্ষত্রা-কার	
১। অশ্বিনী	উত্তরস্থ	০।৮ / ১০° উঃ	৩	অশ্বমুখ	৩	অশ্বমুখ	৩	ঘোটকমুখ	অশ্বিনীকুমার
২। ভরণী	দক্ষিণস্থ	০।২০ / ১২° উঃ	৩	ত্রিভুজ	৩	যোনী	৩	যোনী	যম
৩। কৃত্তিকা	„	১।৭।৩০ / ৫° উঃ	৬	ক্ষুর	৬	ক্ষুর	৬	অগ্নিশিখা	অগ্নি
৪। রোহিণী	পূর্বস্থ	১।১৯।৩০ / ৫° দঃ	৫	শকট	৫	শকট	৫	শকুল	কমলজ
৫। মৃগশিরা	উত্তরস্থ	২।৩ / ১০° দঃ	৩	মৃগমুখ	৩	মৃগমুখ	৩	বিড়ালপদ	ইন্দ্র
৬। আর্দ্রা	স্থূল	২।৭।৩০ / ৭° দঃ	১	মণি	১	মণি	১	পদ্ম	গিরীশ
৭। পুনর্বসু	পূর্বস্থ	৩।৩ / ৭° উঃ	৪	গৃহ	৪	গৃহ	৫	ধনু	অদিতি
৮। পুষ্যা	মধ্যস্থ	৩।১৬ / ০°	৩	শর	৩	শর	...	...	বৃহস্পতি

৯। অশ্লেষা	পূর্বস্থ	৩।১৯ / ৭° দঃ	৫	চক্র	৫	চক্র	৭	সপ্তস্থক	সর্প
১০। মঘা	দক্ষিণস্থ	৪।১৯ / ০°	৫	গৃহ	৫	শালা	৫	লাঙ্গল	পিতৃগণ
১১। পূর্বফাল্গুনী	উত্তরস্থ	৪।২৪ / ১২° উঃ	২	খট্ট	২	শয়ন	২	উত্তর দক্ষিণ	ভগ
১২। উত্তরফাল্গুনী	„	৫।৫ / ১৩° উঃ	২	„	২	পর্যঙ্ক	২	„ „	অর্যমা
১৩। হস্তা	পশ্চিমোত্তর	৫।২০ / ১১° দঃ	৫	হস্ত	৩	হস্ত	৫	কর	দিনকৃৎ
১৪। চিত্রা	স্থূল	৬।০ / ২° দঃ	১	মুক্তা	•	মুক্তা	১	মুক্তা	ত্বষ্টৃ
১৫। স্বাতী	„	৬।১৯ / ৩৭° উঃ	১	প্রবাল	...	প্রবাল	১	কুঙ্কুম	পবন
১৬। বিশাখা	উত্তরস্থ	৭।৩ / ১।৩০ দঃ	৪	মালা	...	তোরণ	৫	তোরণ	শক্রাগ্নি
১৭। অনুরাধা	মধ্যস্থ	৭।১৪ / ৩° দঃ	৪	বলি	...	বলি	৭	সর্প	মিত্র
১৮। জ্যেষ্ঠা	„	৭।১৯ / ৪° দঃ	৩	কুণ্ডল	...	কুণ্ডল	৩	শূকরদন্ত	শক্র
১৯। মূলা	পূর্বস্থ	৮।১ / ৯° দঃ	১১	ক্রুদ্ধসিংহপুচ্ছ	১১	ক্রুদ্ধসিংহপুচ্ছ	৯	শঙ্খ	নির্ঋতি

২০। পূর্বাষাঢ়া	উত্তরস্থ	$\frac{৮।১৪}{৫।৩০° দঃ}$	২	পর্যঙ্ক	...	শয্যা	...	...	তোয়
২১। উত্তরাষাঢ়া	„	$\frac{৮।২০}{৫° দঃ}$	২	মত্তহস্তিদন্ত	৪	দন্ত	৪	সূর্য	বিশ্ববিরিঞ্চি
২২। শ্রবণা	মধ্যস্থ	$\frac{৯।১০}{৩০° উঃ}$	৩	ত্রিবিক্রম	৩	ত্রিবিক্রম	৩	শর	হরি
২৩। ধনিষ্ঠা	পশ্চিমস্থ	$\frac{৯।২০}{৩৬° উঃ}$	৪	মৃদঙ্গ	৪	মৃদঙ্গ	৫	...	বসু
২৪। শতভিষা	স্থূল	$\frac{১০।২০}{০।৩০° দঃ}$	১০০	মণ্ডল	১০০	বৃত্ত	১০০	মণ্ডল	বরুণ
২৫। পূঃভাদ্রপদ	উত্তরস্থ	$\frac{১০।২৬}{২৪° উঃ}$	২	যমল	২	যমল	২	উত্তর দক্ষিণ	অজপাদ
২৬। উঃভাদ্রপদ	„	$\frac{১১।৩}{২৬° উঃ}$	২	পর্যঙ্ক	২	„	২	অহির্বুধ্ন	পূষা
২৭। রেবতী	দক্ষিণস্থ	$\frac{১১।১৯।৫০}{৪°}$	১২	মৃদঙ্গ	৩২	মৃদঙ্গ	৩২	মৎস্য	

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় গণনা পদ্ধতি

গ্রহের মধ্যম স্থান ও প্রকৃত স্থান নির্ণয়

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ জানতেন যে, গ্রহসমূহ পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে তার চারদিকে সমান গতিতে পরিভ্রমণ করে না। অবশ্য বহুদিন পর্যবেক্ষণের ফলে প্রত্যেক গ্রহের গড়গতি নির্ণয় করা সম্ভব, এবং তার সাহায্যে তাদের মধ্যম অবস্থানও নির্ণয় করা যেতে পারে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ আরো জানতেন যে, গ্রহসমূহ অত্যন্ত অনিয়মিত-ভাবে পরিভ্রমণ করে; তাদের গতির বেগ এবং দিক উভয়েই অনবরত পরিবর্তিত হয়। কোন সময়ে দেখা যায় যে, কোন গ্রহ হয়তো পুবদিকে চলছে, কিন্তু কিছুদিন পরে হয়তো দেখা গেল যে, গ্রহটি আর পুব-দিকে অগ্রসর না হয়ে এক জায়গায় বেশ কিছুদিন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে; এবং আবার কিছুদিন পরে হয়তো দেখা গেল বিপরীতমুখী হয়ে পশ্চিম দিকে যেতে আরম্ভ করেছে। এইভাবে কিছুদিন পশ্চিম দিকে যেয়ে, আবার কিছুদিন স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আবার পুব-দিকে অগ্রসর হয়। এইভাবে প্রত্যেক গ্রহের অনিয়মিত গতির পুনরা-বৃত্তি ঘটে।

গ্রহসমূহের এই অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল গতি ব্যাখ্যা করবার জন্যই মন্দবৃত্তের (Epicycle) কল্পনা করা হয়। এই কল্পনাটিকে কোনক্রমেই ভারতীয় বলে স্বীকার করা যায় না। গ্রীক গণিতবিদ এপোলোনিয়াস সর্বপ্রথম এই চিত্রটির কল্পনা করেন। ইনি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। আরিস্টটল তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু। তাঁর কথা সকলের কাছে বেদবাক্য। তিনি বলতেন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা স্বর্গীয়

বস্তু ; অতএব কোথাও কোন খুঁত নাই। এদের গতিপথও নিখুঁত। আর সমস্ত প্রকার চিত্রের মধ্যে বৃত্তই নিখুঁত। অতএব খ-বস্তুসমূহের গতিপথ বৃত্তাকার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, এই ছিল সেকালের ধারণা। কিন্তু গ্রহের গতিপথ যখন অনিয়মিত দেখা গেল, তখন বৃত্তের সাহায্যে সেই পথকে আঁকবার চেষ্টা করা হতে লাগলো। এপোলোনিয়াসের মতে, প্রত্যেক গ্রহ তার গতিপথে একটি বৃত্তের পরিধি উৎপন্ন করে। এই বৃত্তটিকে এপিসাইকেল বলা হয়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ এর নাম দেন মন্দবৃত্ত। এই এপিসাইকেল বা মন্দবৃত্তের কেন্দ্র সমগতিতে আর একটি বৃত্তের পরিধি উৎপন্ন করে। এই বৃত্তটিকে Deferent বলা হয় ; ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এর নাম দেওয়া হয় শীঘ্রবৃত্ত। পৃথিবী এই Deferent বা শীঘ্রবৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত। এর পরিধিতে সমগতিতে মন্দবৃত্তের কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে, আর এই মন্দবৃত্তের পরিধিতে সমগতিতে গ্রহ পরিভ্রমণ করে। প্রত্যেক গ্রহের জন্য পৃথক পৃথক মন্দ ও শীঘ্রবৃত্ত আছে। এই হলো ভারতীয় তথা গ্রীক গ্রহগতি তত্ত্ব।

উপরের মন্দ ও শীঘ্রবৃত্তের কল্পনা ছাড়া আরো মনে করা হতো যে, মন্দবৃত্তের কেন্দ্র রাশিচক্রের সাথে পূবদিকে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু ঐ বৃত্তের সমতল বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে পরিভ্রমণ করে। এইরূপ কল্পনার সাহায্য নিয়ে গ্রহসমূহের গতির সমস্ত প্রকার অনিয়মতা ব্যাখ্যা প্রদান করা হতো। এ কল্পনাও ভারতের নিজস্ব নয় ; পাশ্চাত্যের এই কল্পনার উপর নির্ভর করেই গ্রহের গতি ও অবস্থান নির্ণয় করা হ'তো। অবশ্য পাশ্চাত্য জগতে আরো অনেক এপিসাইকেলের কল্পনা করা হয়। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রহের প্রকৃত স্থান বা স্ফুট-স্থান নির্ণয়ের জন্য ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। প্রথমে সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রহের মধ্যম স্থান নির্ণয় করা হতো ; তারপরে এই দুই পদ্ধতির যে কোন একটির সাহায্যে প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা হতো।

এর একটি পদ্ধতি প্রায় এপোলোনিয়াসের পদ্ধতির মত। তবে গ্রীক ও ভারতীয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, গ্রীক এপিসাইকেল বা মন্দবৃত্তের ব্যাস সর্বদা সমান। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ যদিও স্বীকার করেন যে, গ্রহগণ পৃথক পৃথক মন্দবৃত্তে পরিভ্রমণ করে এবং এই সমস্ত মন্দবৃত্তের কেন্দ্র আবার পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে শীঘ্রবৃত্তের পরিধিতে সমগতিতে পরিভ্রমণ করে, তথাপি ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ মনে করতেন যে, মন্দবৃত্তের ব্যাস সর্বদা সমান থাকে না। কোন গ্রহ যখন মন্দোচ্চে (পৃথিবী থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে) বা শীঘ্রোচ্চে (পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে) থাকে, তখন মন্দবৃত্তের ব্যাস সর্বাপেক্ষা বেশী হয়; আর গ্রহের অবস্থান যখন পৃথিবী থেকে ৯০ ডিগ্রী দূরে হয়, তখন মন্দবৃত্তের ব্যাস সবচেয়ে কম হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মনে করা হয় যে, গ্রহের মধ্যম স্থান পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে একটি বৃত্তে সমগতিতে পূবদিকে পরিভ্রমণ করে এবং গ্রহ নিজেও অন্য একটি বৃত্তের পরিধিতে সমগতিতে পূবদিকে পরিভ্রমণ করে। গ্রহের গতিপথের এই বৃত্তটির কেন্দ্র, পৃথিবীর কেন্দ্র ও গ্রহের শীঘ্রোচ্চ এই দুই বিন্দুর সংযোজক সরলরেখার উপরে অবস্থিত।

এই দুই পদ্ধতির যে কোন একটি অনুসারেই গ্রহের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা যাক না কেন, উভয় পদ্ধতিতে একই ফল পাওয়া যায়। অবশ্য একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রথম পদ্ধতিতে গ্রহের গতি রাশিচক্রের ক্রমের দিকে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ঠিক তার বিপরীত গতি বলে মনে করা হয়। এই অসমতা লক্ষ্য ক'রে, ভাস্করাচার্য তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'তে বলেছেন, "যেভাবেই বিচার করা যাক না কেন, গ্রহের প্রকৃত গতি কেহই পরিবর্তন করতে পারে না; উহা সর্বদা একই থাকিবে। কিন্তু এই আপাত বিপরীত দুইটি গতির কল্পনাতে একই ফল পাওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, গাণিতিক জ্যোতির্বিদগণ এইরূপ সুদক্ষভাবে সমীকরণ গঠন ও তাহার সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

গ্রহগণের মধ্যম স্থান থেকে প্রকৃত স্থান নির্ণয় করার জন্য এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্যও ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ সাইন (sine) এবং ভার্সড্ সাইনের (versed sine) একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। এই বিষয়গুলি পাশ্চাত্য অনুরূপ বিষয় থেকে এত বেশী পৃথক যে, এ সমস্ত বিষয় যে ভারতের নিজস্ব, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ থাকে না। বর্তমানে আমরা কোণের সাইন বা একক ব্যাস-যুক্ত চাপের সাইন ইত্যাদিতে এত বেশী অভ্যস্ত যে, এর চেয়ে অন্য কিছু কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সূর্য-সিদ্ধান্ত প্রণয়নেরও পূর্বে, ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ একটি ভিন্ন এবং অধিকতর সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের সাইনে একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে, এতে কৌণিক একক নামে একটি বিশেষ এককের কল্পনা করা হয়েছে। নিম্নলিখিতভাবে এই কৌণিক এককের বর্ণনা দেয়া যেতে পারে।

যে কোন বৃত্তের পরিধি থেকে ব্যাসার্ধের সমান একটা চাপ কেটে নেওয়া হয়। এই চাপ বৃত্তটির কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে, সেইটাই কৌণিক একক। আধুনিক গণিতে একে এক রেডিয়ান বলা হয়। এই এক রেডিয়ান বা কৌণিক একক=৫৭°১৭′৪৪.৪৮″=৩৪৩৭.৭৪৬ মিনিট নিকটবর্তী পূর্ণসংখ্যা ৩৪৩৮। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ ৩৪৩৮-কে বৃত্তের ব্যাসার্ধরূপে কল্পনা করেছেন এবং এর সাহায্যেই সাইনের তালিকা নির্ণয় করেছেন। খ-গোল জ্যামিতির কোন প্রশ্ন সমাধানে যখনই তাঁরা ব্যাসার্ধ কথাটি ব্যবহার করেছেন, তখনই তাঁরা ৩৪৩৮ এই সংখ্যাটির কথা বলেছেন।

তাঁদের এই তালিকা বিশদভাবে প্রণয়ন করা হয় নাই। মাত্র ৩০ ডিগ্রী কোণের এক-অষ্টমাংশের গুণিতকসমূহের সাইনের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্য কোন কোণের সাইনের প্রয়োজন হলে, নিকটবর্তী পূর্ণসংখ্যক মিনিটের আনুপাতিক অন্তরের সাহায্যে নির্ণয় করা হতো। সে সময়ে দশমিকের ব্যবহার-পদ্ধতি জানা ছিল না। কিন্তু এভাবে

যে ফল পাওয়া যেত, তাতে আমাদের আধুনিক সময়ের চার-দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধমান পাওয়া যেত।

সাইন-তালিকা প্রণয়নের জন্য সূর্যসিদ্ধান্তে দুইটি নিয়ম দেওয়া আছে। নিয়ম দুইটি এইরূপ :

(১) এক রাশির (৩০ ডিগ্রীর) এক-অষ্টমাংশকে মিনিটে প্রকাশ ক'রে তার সাইনকে প্রথম সাইন মনে কর। প্রথম সাইনকে ঐটি দ্বারাই ভাগ কর; ভাগফলকে সেই সাইন থেকে বিয়োগ কর। বিয়োগফলকে সেই সাইনের সাথে যোগ কর। এই যোগফলই দ্বিতীয় সাইন।

(২) অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি সাইন নির্ণয় কর। নির্ণীত সাইনসমূহকে প্রথম সাইন দ্বারা ভাগ কর এবং লব্ধ ভাগফলগুলিকে যোগ কর। যোগফলকে প্রথম সাইন থেকে বিয়োগ কর। বিয়োগ-ফলকে সর্বশেষ প্রাপ্ত সাইনের সাথে যোগ কর। যোগফল পরবর্তী সাইন হবে। এইভাবে ২৪টি সাইন পাওয়া যায়। (বৃত্তের এক পাদে ৩০ ডিগ্রীর ২৪টি অষ্টমাংশ আছে।

এই নিয়মগুলি গাণিতিক ফরমুলার সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়। মনে করা যাক,

$$A = \frac{৩০}{৮} \text{ ডিগ্রী} = ২২৫ \text{ মিনিট}$$

$$\therefore \text{ প্রথম সাইন} = \sin A = \sin ২২৫' = ২২৫$$

[বর্তমানে আমরা ব্যাসার্ধকে ১ ধরি; কিন্তু ভারতীয় ত্রিকোণোমিতিতে ব্যাসার্ধ ৩৪৩৮ মিনিট। অতএব সেই হিসাবে $\sin = ২২৫' = \frac{২২৫}{৩৪৩৮}$; কিন্তু ৩৪৩৮ প্রত্যেক সাইনের হর বলে, এর আর উল্লেখ করা হয় না।]

উপরের নিয়ম অনুসারে :

$$\sin 2A = \text{দ্বিতীয় সাইন} = \sin A + \sin A - \frac{\sin A}{\sin A}$$

$$= ২২৫ + ২২৫ - ১$$

$$= ৪৪৯$$

$$\sin 3A = \text{তৃতীয় সাইন} = \sin 2A + \sin A - \frac{\sin A + \sin 2A}{\sin A}$$

$$= ৪৪৯ + ২২৫ - \frac{২২৫ + ৪৪৯}{২২৫}$$

$$= ৬৭১$$

$$\sin 4A = \text{চতুর্থ সাইন} = \sin 3A + \sin A - \frac{\sin A + \sin 2A + \sin 3A}{\sin A}$$

$$= ৬৭১ + ২২৫ - \frac{২২৫ + ৪৪৯ + ৬৭১}{২২৫}$$

$$= ৮৯০$$

$$\sin 5A = \text{পঞ্চম সাইন} = \sin 4A + \sin A - \frac{\sin A + \sin 2A + \sin 3A + \sin 4A}{\sin A}$$

$$= ৮৯০ + ২২৫ - \frac{২২৫ + ৪৪৯ + ৬৭১ + ৮৯০}{২২৫}$$

$$= ১১০৫$$

এইভাবে যে কোন সংখ্যক সাইন নির্ণয় করা যেতে পারে।

$$\sin (n+1)A = (n+1) \text{ সংখ্যক সাইন} = \sin nA + \sin A - \frac{\sin A + \sin 2A + \cdots\cdots + \sin nA}{\sin A}$$

এই ব্যবহারিক নিয়মটি কিভাবে প্রচলিত হয়েছিল জানা যায় না। তবে অনেকে মনে করেন, ত্রিকোণোমিতির সাধারণ সূত্র,

$$\sin (A+B) + \sin(A-B) = 2 \sin A \cos B$$

$$\text{এবং} \quad \sin(A+B) - \sin(A-B) = 2 \cos A \sin B$$

এই দুইটির সাহায্যে উপরের নিয়ম ব্যবহার করা হতো। উপরের এই সাধারণ সূত্র দুইটি ভাস্করাচার্যের পূর্বেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের জানা ছিল। এই সূত্র দুইটিকে ভাস্করাচার্য জ্যা-ভবন সূত্র বলে উল্লেখ করেছেন। এই দুই সূত্রের সাহায্যে অন্যান্য কোণেরও সাইন নির্ণয় করা যায়।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক ব্যবহৃত নিয়মটি নীচের সূত্র থেকেও পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন।

$$\sin(n+1)A+\sin(n-1)A=2\sin nA\cos A=\sin nA\times\frac{\sin 2A}{\sin A}$$

সূর্যসিদ্ধান্তে প্রদত্ত সাইন-তালিকা নীচে দেওয়া গেল। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, এই তালিকাতে ৩৪৩৮ মিনিট ব্যাসার্ধ নেওয়া হয়েছে। তুলনা করবার জন্য এই ব্যাসার্ধ নিয়ে আধুনিক তালিকা থেকে সাইনসমূহের মান তৃতীয় কলামে দেওয়া গেল।

সূর্যসিদ্ধান্ত মতে সাইন-তালিকা

ব্যাসার্ধ=৩৪৩৮ মিনিট

চাপ	সূর্যসিদ্ধান্ত মতে সাইন	আধুনিক গণনায় সাইন
৩°৪৫′	২২৫	২২৪·৮৫
৭°৩০′	৪৪৯	৪৪৮·৯৫
১১°১৫	৬৭১	৬৭০·৭২
১৫°০	৮৯০	৮৮৯·৮২
১৮°৪৫	১১০৫	১১০৫·০১
২২°৩০	১৩১৫	১৩১৫·০৫
২৬°১৫	১৫২০	১৫২০·৫৮
৩০°০	১৭১৯	১৭১৯·০০
৩৩°৪৫	১৯১০	১৯১০·০৫
৩৭°৩০	২০৯৩	২০৯২·০৯
৪১°১৫	২২৬৭	২২৬৬·৮৮
৪৫°০	২৪৩১	২৪৩১·০১
৪৮°৪৫	২৫৮৫	২৫৮৪·০৮
৫২°৩০	২৭২৮	২৭২৭·৫৫

৫৬°১৫	২৮৫৯	২৮৫৮'৫৫
৬০°	২৯৭৮	২৯৭৭'০৪
৬৩°৪৫	৩০৮৪	৩০৮৩'৪৫
৬৭°৩০	৩১৭৭	৩১৭৬'০৬
৭১°১৫	৩২৫৬	৩২৫৫'৭৫
৭৫°০	৩৩২১	৩৩২০'৮৫
৭৮°৪৫	৩৩৭২	৩৩৭১'৯৫
৮২°৩০	৩৪০৯	৩৪০৮'৭৫
৮৬°১৫	৩৮৩১	৩৪৩০'৮৫
৯০°০	৩৪৩৮	৩৪৩৮

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ তাঁদের সমস্ত গণনা সাইন, কোসাইন এবং ভার্সড্ সাইনের সাহায্যে করতেন। তাঁদের গণনাতে কোথাও টানজেন্টের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সাইন এবং কোসাইনের যথেষ্ট ব্যবহার করা হলেও, এদের বিশেষ কোন নাম দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ-গণ ত্রিকোণোমিতির অনেক সূত্রই জ্ঞাত ছিলেন বলে মনে হয়। যেমন, তাঁরা নীচের সূত্রগুলির অনুরূপ সূত্র যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছেন দেখা যায়। R ব্যাসার্ধ মনে করে,

$$\cos A=\sqrt{R^2-\sin^2 A},\quad \text{Versed } \sin A=R-\sin A$$

$$\sin 30^\circ=\frac{R}{2},\quad \sin 45^\circ=\frac{R}{\sqrt{2}}$$

$$\sin 18^\circ=\frac{\sqrt{5R^2}-R}{4},\quad \sin 36^\circ=\sqrt{\frac{5R^2-\sqrt{5R^8}}{8}}$$

ভারতীয় গণিতবিদগণ বর্তমানের মত কোন ফরমুলা ব্যবহার করতেন না। তাঁরা সমস্ত সূত্রটি শ্লোকের আকারে প্রকাশ করতেন। অনুরূপ সাইন, কোসাইন, ভার্সড্ সাইন এবং অর্ধ কোণের ভিতরে পরস্পর সম্বন্ধও তাঁরা শ্লোকের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান ফরমুলা অনুসারে লেখা হলে, সেগুলি এইরূপ হয়ঃ

$$\sin\frac{A}{2}=\frac{1}{2}\sqrt{\sin^2 A+\text{Versed}^2\sin A}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}R\ \text{versed Sin}A}$$

সেজন্ত ভাস্করাচার্য লিখেছেন, "কোন কোণের সাইন জানা থাকলে, সেই কোণের অর্ধ কোণের সাইন নির্ণয় করা যেতে পারে। আবার তারও অর্ধেক কোণের সাইন নির্ণয় করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যে কোন সহকোণের অর্ধেকের সাইন নির্ণয় করা যায়। এইভাবে পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদগণ অন্যান্ত সাইন নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু আমি এখানে অন্য একটি ভিন্ন পদ্ধতি দেখাব।" এরপরে তিনি শ্লোকের সাহায্যে যা বলেছেন, বর্তমান চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করলে সেগুলি এরূপ হয়ঃ

$$\sin\left(45^\circ+\frac{A}{2}\right)=\sqrt{\frac{R^2+R\sin A}{2}}$$

$$\sin\left(45^\circ-\frac{A}{2}\right)=\sqrt{\frac{R^2-R\sin A}{2}}$$

A যে কোন একটি চাপ হতে পারে।

আবার A এবং B যদি যে কোন দুইটি চাপ হয়, তাহলে

$$\sin\frac{A-B}{2}=\frac{1}{2}\{(\sin A-\sin B)^2+(\cos A-\cos B)^2\}^{\frac{1}{2}}$$

এরপরে তিনি বর্গমূলের সাহায্য ব্যতিরেকে সাইন নির্ণয় করার পদ্ধতি শ্লোকের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক চিহ্ন দ্বারা সেগুলি এইভাবে লেখা যায়

$$\sin(2A-90)=\frac{R^2-2\sin^2 A}{R}$$

এভাবে অনেক সাইন নির্ণয় করা যেতে পারে। একে 'প্রতিভাগ-জ্যাকরণ' বিধি বলে। কিন্তু এই পদ্ধতির ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। এর পরে তিনি ১ ডিগ্রী থেকে ৯০ ডিগ্রী পর্যন্ত সমস্ত কোণের (ডিগ্রীতে) সাইন নির্ণয় করার পদ্ধতি দিয়েছেন।

ভাস্করের মতে, ১৮° ও ৩৬ ডিগ্রী কোণের সাইন নির্ণয় করার শ্লোক এইরূপ :

"ব্যাসার্ধের বর্গের পঞ্চগুণ হইতে ব্যাসার্ধের চতুর্বর্গের পঞ্চগুণের বর্গমূল বিয়োগ কর ; বিয়োগফলকে ৮ দ্বারা ভাগ কর। ভাগফলের বর্গমূল ৩৬ ডিগ্রী কোণের সাইন।" অর্থাৎ,

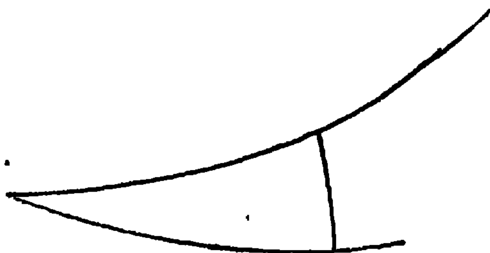
$$\sin 36° = \sqrt{\frac{5R^2 - \sqrt{5R^4}}{8}}$$

এবং "ব্যাসার্ধেব বর্গের পঞ্চগুণের বর্গমূল হইতে ব্যাসার্ধ বিয়োগ কর ; বিয়োগফলকে চার দ্বারা ভাগ কর। ভাগফল ১৮ ডিগ্রী কোণের সাইন।" অর্থাৎ,

$$\sin 18° = \frac{\sqrt{5R^2} - R}{4}$$

সিদ্ধান্তে সাইনের প্রথম ব্যবহার একটি প্রশ্নের আকারে দেওয়া হয়। প্রশ্নটি এইরূপ : একটি গ্রহের ধ্রুবক দেওয়া আছে, তার বিক্ষেপ কত ?

গ্রহেব গড় বিক্ষেপ সূর্যের গড় বিক্ষেপের সমান এবং গ্রহের গড় চরম বিক্ষেপ সূর্যের চরম বিক্ষেপের সমান।



রেখাচিত্র ৯৪ : সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্যের গতিপথ নির্ণয়

প্রশ্নটি সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম দেওয়া হয়েছে। "ধ্রুবকের সাইনকে সূর্যের চরম বিক্ষেপের সাইন ১৩৯৭ দ্বারা গুণ কর ; গুণফলকে

ব্যাসার্ধ ৩৪৩৮ দ্বারা ভাগ কর। ভাগফল কোন্ চাপের সাইনের সমান, নির্ণয় কর। নির্ণীত চাপই গ্রহের বিক্ষেপ।"

সূর্যের ধ্রুবক দেওয়া আছে, তার বিক্ষেপ বের করবার নিয়ম এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

মনে করা যাক, S সূর্যের অবস্থান, γ বিষুবন বিন্দু, SN সূর্যের বিক্ষেপ, γS সূর্যের ধ্রুবক। SNγ একটি সমকোণ। অতএব গোলকীয় ত্রিকোণোমিতির সাইন বিধি অনুসারে

$$\frac{\sin \gamma S}{\sin SN\gamma}=\frac{\sin SN}{\sin S\gamma N}$$

$\therefore$ $R \sin SN=\sin \gamma S \sin S\gamma N$, $R=$৩৪৩৮

কিন্তু $\sin S\gamma N=$সূর্যের চরম বিক্ষেপের সাইন

=১৩৯৭

$\therefore$ ৩৪৩৮ $\times$ সূর্যের বিক্ষেপের সাইন=১৩৯৭ সূর্যের ধ্রুবকের সাইন।

১৩৯৭ সংখ্যাটি সূর্যের চরম বিক্ষেপের সাইনরূপে সূর্যসিদ্ধান্তের আরো বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। একে সাধারণতঃ ২৪ ডিগ্রীর সাইন বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৩৯৭ সংখ্যাটি ২৩°৫৮′৩১″ পরিমিত চাপের সাইন।

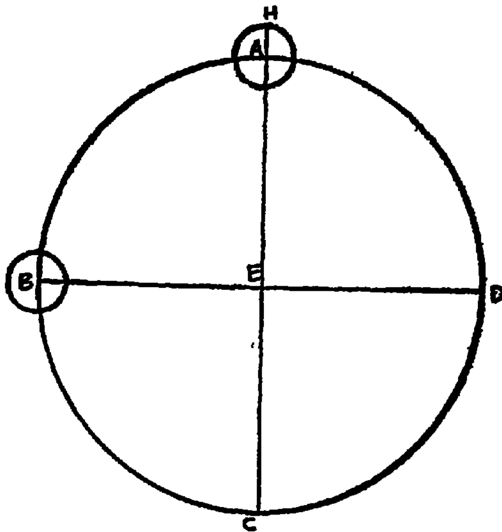
গ্রহের প্রকৃত স্থান নির্ণয় পদ্ধতি

কোন গ্রহের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করতে প্রথমে ঐ গ্রহের নিজের এবং তার শীঘ্রোচ্চের মধ্যম স্থান নির্ণয় করা দরকার। এদের ভিতরের পার্থক্যকে 'কেন্দ্র' বলে। সাইনের তালিকা থেকে এই কেন্দ্রের সাইন বের করতে হয়। বিভিন্ন মন্দবৃত্ত গঠনে এর প্রয়োজন হয়।

মনে কর, E পৃথিবীর কেন্দ্র; AEC গ্রহটির অপদূরক রেখা। ABCD গ্রহটির শীঘ্রবৃত্ত; গ্রহটির গতিপথের সমতলে অবস্থিত।

A বিন্দুতে অঙ্কিত ক্ষুদ্র বৃত্তটি গ্রহটির মন্দবৃত্ত। এর পরিধি অপদূরক রেখাকে H বিন্দুতে ছেদ করেছে। H বিন্দুটি E থেকে বৃহত্তম দূরত্বে,

অবস্থিত ; অতএব H গ্রহটির অপভু বা শীঘ্রোচ্চ। মনে কর, মন্দবৃত্তের কেন্দ্র, A বিন্দু হ'তে আরম্ভ করে রাশিচক্রের রাশির গতির দিকে



রেখাচিত্র ৬৮ঃ সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রহের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়

ABCD শীঘ্রবৃত্তের পরিধিতে পরিভ্রমণ করে। এক্ষণে, কল্পনা করা হয় যে, যত সময়ে A শীঘ্রবৃত্তের পরিধিকে সম্পূর্ণ একবার পরিভ্রমণ করে, ঠিক ঐ সময়ে গ্রহটিও H বিন্দু থেকে আরম্ভ করে বিপরীত দিকে মন্দ-বৃত্তের পরিধিকে সম্পূর্ণ একবার পরিভ্রমণ করে। তাহলে E থেকে গ্রহটিকে যেদিকে দেখা যাবে, তাই তার প্রকৃত অবস্থানের দিক। তবে এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে মন্দবৃত্তটি একটি সাধারণ মন্দবৃত্ত, অর্থাৎ এর ব্যাসার্ধ সব সময় একই থেকে যাবে। কিন্তু ভারতীয় মন্দবৃত্তের ব্যাসার্ধ স্থির নয়। A এবং C-তে অবস্থানকালে এর মন্দ-বৃত্তের ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশী হয় এবং C ও D-তে অবস্থানকালে সর্বাপেক্ষা কম হয়।

সূর্য ও চন্দ্রের প্রথম মন্দবৃত্ত গঠনের নিম্নলিখিত পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে : "বৃত্তের যুগ্মপাদে (even quadrant) মন্দবৃত্ত অঙ্কিত করিলে সূর্যের মন্দবৃত্তের পরিধি ১৪ ডিগ্রী এবং চন্দ্রের মন্দবৃত্তের পরিধি ৩২ ডিগ্রী পরিমিত স্থান অধিকার করে। বৃত্তের অযুগ্মপাদে মন্দবৃত্ত অঙ্কিত করিলে, প্রতি ক্ষেত্রে ২০ মিনিট পরিমিত স্থান হ্রাস পায়।" অর্থাৎ শীঘ্রবৃত্তের A অথবা C বিন্দুতে অঙ্কিত মন্দবৃত্তের পরিধিকে যদি শীঘ্র-বৃত্তের উপর স্থাপন করা হয়, তাহলে সূর্যের মন্দবৃত্ত ১৪ ডিগ্রী অর্থাৎ ৮৪০ মিনিট স্থান অধিকার করে ; এবং চন্দ্রের মন্দবৃত্ত ৩২ ডিগ্রী অর্থাৎ ১৯২০ মিনিট পরিমিত স্থান অধিকার করে। কিন্তু B এবং D বিন্দুতে ঐ মন্দবৃত্ত দুইটি যথাক্রমে ৮২০ এবং ১৯০০ মিনিট পরিমিত স্থান অধিকার করে। মধ্যবর্তী যে কোন M স্থানে সূর্যের মন্দবৃত্ত নিম্নলিখিত-ভাবে পাওয়া যায়।

মনে করা যাক, M স্থানের কেন্দ্র = K

$$\text{তা হ'লে M স্থানে সূর্যের মন্দবৃত্তের পরিধি} = ৮৪০ - ২০ \times \frac{\sin K}{৩৪৩৮}$$

$$\text{এবং ঐ স্থানে চন্দ্রের মন্দবৃত্তের পরিধি} = ১৯২০ - ২০ \times \frac{\sin K}{৩৪৩৮}$$

সাধারণভাবে কোন গ্রহের শীঘ্রবৃত্তের যে কোন দুই স্থান A এবং B তে যদি মন্দবৃত্তের পরিধি যথাক্রমে C_A এবং C_B হয় এবং তাদের মধ্যবর্তী যে কোন M স্থানের কেন্দ্র যদি K হয়, তাহলে,

$$\text{M স্থানে ঐ গ্রহের মন্দবৃত্তের পরিধি} = C_A - (C_A - C_B)\frac{\sin K}{৩৪৩৮}$$

এইরূপ পরিধিকে স্ফুট-পরিধি বলে।

যে কোন গ্রহের মন্দবৃত্তের স্ফুট-পরিধি নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনার পরে যদি কেন্দ্রের পরিমাণ দেওয়া থাকে, তা থেকে গ্রহের প্রথম সমীকরণ নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করা হয়।

"ভুজ এবং কোটির (প্রথম ও দ্বিতীয় কেন্দ্র) সাইনকে স্ফুট-পরিধি (গ্রহের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দবৃত্তের) দ্বারা গুণ কর। গুণফলকে

বৃত্তের ডিগ্রী অর্থাৎ ৩৬০ দ্বারা ভাগ কর। ভাগফলকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ভুজফল ও কোটিফল বলে। যে চাপের সাইন ভুজফলের সমান, তাহা নির্ণয় কর। এই চাপের মিনিট-সংখ্যাকে মন্দফল বা গ্রহের প্রথম সমীকরণ বলে।" নিয়মটি সম্যক বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নীচের চিত্রটি দেওয়া গেল।

রেখাচিত্র ৬৯ ঃ গ্রহের প্রথম সমীকরণ বা মন্দফল নির্ণয়

মনে কর, E পৃথিবীর কেন্দ্র, ABCD বৃত্তটি P গ্রহের শীঘ্রবৃত্ত। H বিন্দুটি মন্দবৃত্ত ও অপদূরক-রেখার ছেদবিন্দু, অর্থাৎ গ্রহের শীঘ্রোচ্চ। গ্রহটি H বিন্দু থেকে মন্দবৃত্তে, এবং একই সময়ে মন্দবৃত্তের কেন্দ্র A শীঘ্রবৃত্তে পরিভ্রমণ আরম্ভ করে। উভয়ে সমগতিতে যেয়ে যে সময়ে H মন্দবৃত্তকে সম্পূর্ণ একবার পরিভ্রমণ করে, সেই সময়ে A শীঘ্রবৃত্তের পরিধিতে সম্পূর্ণ একবার পরিভ্রমণ করে।

মন্দবৃত্তের কেন্দ্র A, যে সময়ে রাশিচক্রের দিকে শীঘ্রবৃত্তের AM দূরত্ব অতিক্রম করে, P গ্রহটি ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দিকে মন্দ-বৃত্তের উপরে H'P দূরত্ব অতিক্রম করে। অতএব AM এবং H'P চাপ দুইটি সদৃশ অর্থাৎ এরা উভয়েই কেন্দ্রে সমপরিমাণ কোণ উৎপন্ন

করে। অতএব $\angle MEA = \angle H'MP$। সুতরাং PM এবং HE সর্বদা সমান্তরাল।

PE রেখা যদি শীঘ্রবৃত্তকে V বিন্দুতে ছেদ করে, তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্র E থেকে গ্রহটিকে EV-এর দিকে দেখা যাবে এবং মন্দবৃত্তে অর্থাৎ পৃথিবীর সমকেন্দ্রিক বৃত্তে গ্রহটিকে V স্থানে দেখা যাবে। অতএব V গ্রহের প্রকৃত অবস্থান। MV গ্রহটির গড় এবং প্রকৃত অবস্থানের ভিতরের দূরত্ব।

P থেকে EM-এর উপরে Pn লম্ব আঁকা হলে, Pn প্রথম সমীকরণ; অর্থাৎ মন্দফলের সাইনের প্রথম আসন্ন মান। কেন্দ্র ৯০ ডিগ্রী থেকে ছোট হলে, Pn, MV-এর সাইন অপেক্ষা বড় হবে, আর কেন্দ্র যদি ৯০ ডিগ্রী এবং ২৭০ ডিগ্রীর মধ্যবর্তী হয়, তাহলে Pn, MV-এর সাইন অপেক্ষা ছোট হবে।

PnM এবং MNE ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ।

অতএব, $\frac{Pn}{MN} = \frac{PM}{ME}$. $\therefore$ $Pn = \frac{PM}{ME} . MN$

কিন্তু পরিধি এবং ব্যাসার্ধ সমানুপাতিক।

$$\therefore \quad \frac{PM}{ME} = \frac{\text{M-তে অবস্থিত মন্দবৃত্তের পরিধি}}{\text{শীঘ্রবৃত্তের পরিধি}}$$

এবং $MN = \sin$ (চাপ AM) $= \sin K$, $K = AM =$ কেন্দ্র

$$\therefore \; Pn = \frac{C_M}{২১৬০০} \times \sin K$$

আবার উপরোক্ত সদৃশ ত্রিভুজ দুইটি থেকে আমরা পাই,

$$\frac{Mn}{MP} = \frac{NE}{ME}$$

$$\therefore \; Mn = \frac{MP}{ME} \times NE$$

কিন্তু, NE=cos (চাপ AM)

$$\therefore\ Mn = \frac{C_M}{২১৬০০} \times \cos K$$

এক্ষণে, MN=ভুজ, NE=কোটি

Pn=ভুজফল, Mn=কোটিফল

এবং ২১৬০০ মিনিট=৩৬০ ডিগ্রী ; C_M=M স্থানে মন্দবৃত্তের স্ফুট-পরিধি।

$$\therefore\ \text{ভুজফল} = \frac{\text{M স্থানে মন্দবৃত্তের স্ফুট পরিধি}}{৩৬০} \times \text{ভুজ}$$

$$\text{কোটিফল} = \frac{\text{M স্থানে মন্দবৃত্তের স্ফুট পরিধি}}{৩৬০} \times \text{কোটি}$$

যে চাপের সাইন ভুজফলের সমান, তাকে মন্দফল বা কেন্দ্রের প্রথম সমীকরণ বলে।

PE ব্যাসার্ধ হলে, কোটিফলই ঠিক উত্তর হতো। কিন্তু যেহেতু PN ব্যাসার্ধ, সেজন্য আরো সংশোধন প্রয়োজন।

সূর্য ও চন্দ্রের বৃহত্তম সমীকরণ

আমরা আগে দেখেছি যে,

$$\text{ভুজফল}\ \ Pn = \frac{C_M}{২১৬০০} \times \sin K$$

এই সমীকরণে C_M-এর পরিবর্তে যদি সূর্য ও চন্দ্রের স্ফুট-পরিধি লেখা যায়, তাহলে,

$$\text{সূর্যের প্রথম সমীকরণের সাইন} = \frac{৮৪০ - ২০ \times \dfrac{\sin K}{৩৪৩৮}}{২১৬০০} \times \sin K$$

K=৯০ ডিগ্রী হলে, sin K=৩৪৩৮, এই সমীকরণের মান বৃহত্তম হবে।

$$\therefore\ \text{সূর্যের বৃহত্তম প্রথম সমীকরণের সাইন} = \frac{৮২০}{২১৬০০} \times ৩৪৩৮$$

$$= \sin ২^\circ ১০' ০২''$$

৬৯ নং চিত্রে উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা বোঝা যেতে পারে। পূর্বে বর্ণিত (৫৩০ পৃঃ) চিত্রকে এখানে পুনরায় ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে দেখানো হয়েছে যে, ভুজফল $Pn = \frac{C_M}{২১৬০০} \times \sin K$

K প্রথম অথবা দ্বিতীয় কেন্দ্র হতে পাবে এবং sin K-এর বিভিন্ন মানের জন্য Mn-এর চিহ্নের পরিবর্তন হতে পারে।

$$\therefore\ En = EM \pm Mn$$

কিন্তু PNE সমকোণী ত্রিভুজে $PE^2 = Pn^2 + En^2$

$$\therefore\ \text{শীঘ্রকর্ণ} = PE = \sqrt{Pn^2 + (EM \pm Mn)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{C_M \sin K}{২১৬০০}\right)^2 + \left(৩৪৩৮ \pm \frac{C_M \cos K}{২১৬০০}\right)^2}$$

আবার, PNE এবং VOE এই দুইটি সদৃশ সমকোণী ত্রিভুজে

$$\frac{VO}{Pn} = \frac{VE}{PE}$$

$$\therefore\ VO = \frac{VE\ .\ Pn}{PE}$$

$$\therefore\ \sin VO = \frac{৩৪৩৮ \times \frac{C_M \sin K}{২১৬০০}}{\sqrt{\left(\frac{C_M \sin K}{২১৬০০}\right)^2 + \left(৩৪৩৮ \pm \frac{C_M \cos K}{২১৬০০}\right)^2}}\ ।$$

ভারতীয় নামে এই সূত্রটিকে এইভাবে লেখা হয়,

$$\text{শীঘ্রকর্ণ} = \frac{\text{ব্যাসার্ধ} \times \text{ভুজফল}}{\text{কর্ণ}}$$

$$\text{এবং কর্ণ} = \sqrt{(\text{ব্যাসার্ধ} \pm \text{কোটিফল})^2 + (\text{ভুজফল})^2}$$

সাইন-তালিকাতে যে চব্বিশটি সাইনের মান দেওয়া আছে, কেন্দ্র তার যে কোন একটি বা একটি পাদের যে কোন ডিগ্রী হ'লে, উপরোক্ত নিয়মসমূহ থেকে সহজেই বিভিন্ন তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পাবে। সূর্য

এবং চন্দ্রের মাত্র একটি ক'রে মন্দবৃত্ত আছে; অতএব এদের প্রকৃত অবস্থান অবগত হ'তে মাত্র একটি করে তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে দু'টি করে মন্দবৃত্তের প্রয়োজন হয়। এই মন্দবৃত্তগুলি নিম্নলিখিত নিয়মে গঠন করা হয়।

"মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির পরিধি, সমকেন্দ্রিক বা শীঘ্র-বৃত্তের যুগ্মপাদসমূহে যথাক্রমে ৭৫, ৩০, ৩৩, ১২ ও ৪৯ ডিগ্রী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত।

মঙ্গল ইত্যাদির শীঘ্র বা দ্বিতীয় মন্দবৃত্তের পরিধি সমকেন্দ্রিকের যুগ্ম-পাদে যথাক্রমে ২৩৫, ১৩৩, ৭০, ২৬২ ও ৩৯ ডিগ্রী এবং অযুগ্ম-পাদে যথাক্রমে ২৩২, ১৩২, ৭২, ২৬০ এবং ৪০ ডিগ্রী স্থান অধিকার করে।"

সূর্যের স্ফুট-পরিধি যেভাবে নির্ণয় করা হয়, গ্রহসমূহের স্ফুট-পরিধিও ঠিক সেইভাবেই নির্ণয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ মঙ্গল-গ্রহ বিবেচনা করা যেতে পারে। M যদি সমকেন্দ্রিকে ঐ গ্রহের যে কোন অবস্থান হয়, এবং K তার কেন্দ্র হয়, তা হলে M-স্থানে তার স্ফুট-পরিধি C_M

$$C_M = C_1 - (C_1 - C_2)\frac{\sin K}{৩৪৩৮}$$

মিনিটে প্রকাশ করা গেলে,

$$C_M = ৪৫০০ - ১৮০ \times \frac{\sin K}{৩৪৩৮}$$

দ্বিতীয় মন্দবৃত্ত বা শীঘ্রের সম্বন্ধেও, K যদি কেন্দ্র হয়, তা হলে,

$$C_M = ১৪১০০ - ১৮০ \times \frac{\sin K}{৩৪৩৮}$$

পূর্বোক্ত নিয়মসমূহে এই মান লেখা হলে মঙ্গলের স্ফুট-পরিধির জন্য দু'টি তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি পাওয়া যায়। প্রথম তালিকাতে কেন্দ্রের প্রথম সমীকরণ বা মন্দফল পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় তালিকাতে শীঘ্র-ফল পাওয়া যায়। শীঘ্রফলই গ্রহটির বার্ষিক লম্বন।

এই সমস্ত তালিকা প্রণয়নের পরেও গ্রহের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য আরো একটি নিয়মের প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকে নিয়মটি দেওয়া গেল :

"গ্রহের মধ্যম স্থান হইতে সমীকরণ নির্ণয় কর। ইহার অর্ধেক মধ্যম অবস্থানে প্রয়োগ কর। প্রয়োগফল প্রথম সমীকরণে ব্যবহার কর। ইহা হইতে প্রথম সমীকরণ নির্ণয় কর এবং ইহার সমগ্র গ্রহের মধ্যম স্থানে প্রয়োগ কর।

স্ফুট-মধ্যম অবস্থানে সমগ্র দ্বিতীয় সমীকরণ প্রয়োগ কর। ইহার ফলে গ্রহের প্রকৃত অবস্থান পাইবে।"

ক্রমিক প্রয়োগ দ্বারা এইভাবে গ্রহের প্রকৃত অবস্থানের সন্নিকট হওয়ার প্রক্রিয়া বর্তমানে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন ক্ষুদ্র বক্ররেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে মনে করা হয় যে, রেখাটি তার জ্যা ও স্পর্শকের মধ্যবর্তী এবং ক্রমিক পদ্ধতিতে সেই রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়।

গ্রহের মধ্যম স্থান যদি প্রকৃত স্থানের অগ্রবর্তী হয়, তা হলে সমীকরণ বিয়োগ করতে হয় আর পশ্চাদ্বর্তী হলে যোগ করতে হয়। উচ্চ ও মন্দ অপদূরকে মধ্যম ও প্রকৃত অবস্থান সমান।

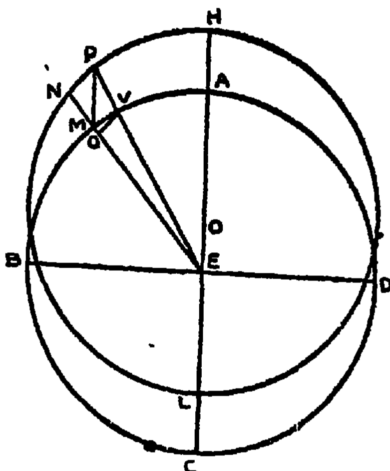
সূর্যসিদ্ধান্তের প্রথম নিয়মে কর্ণকে পরিত্যাগ করা হয়েছে কেন, এ ব্যাপারে জ্যোতির্বিদগণ অনেক আলোচনা করেছেন।

ভাস্কর বলেন, "অনেকে বলেন, কর্ণ ব্যবহার করিলে পার্থক্য অত্যন্ত নগণ্য হয় বলিয়াই উহা ব্যবহার করা হয় নাই। আবার অন্য অনেকে বলেন, যেহেতু এই পদ্ধতিতে প্রথম বৃত্তের পরিধিকে কর্ণ দ্বারা পূরণ করিয়া ব্যাসার্ধ দ্বারা ভাগ করিলে প্রকৃত পরিধি পাওয়া যায়, এবং ইহার পরে যদি আবার কর্ণ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে পূর্বফলই পুনরায় পাওয়া যাইবে, সেজন্যই কর্ণের প্রয়োগ করা হয় নাই। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ভিন্ন প্রমাণ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং সেখানে যে এইরূপ কেন হইবে না, সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি তোলা হয় নাই।"

ভাস্কর মন্দবৃত্ত পদ্ধতির অতি সামান্য উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, বৃত্তের আয়তন অপরিবর্তনীয়। এতে মনে হয়, তিনি বিকেন্দ্রিক পদ্ধতিকেই অধিকতর সঙ্গত বলে মনে করতেন।

বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি

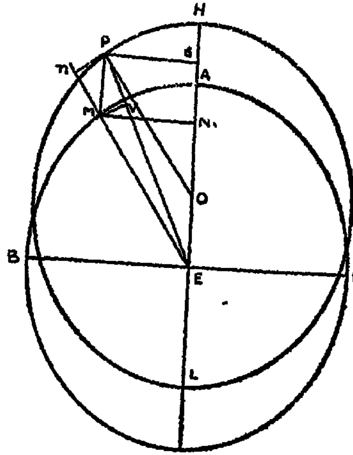
মনে কর, ABCD এবং HPL দুইটি সমান ব্যাসার্ধের বৃত্ত; প্রত্যেকটির ব্যাসার্ধ ৩৪৩৮ মিনিট; সাইন-তালিকাতে এই ব্যাসার্ধ ব্যবহার করা হয়। E এবং O যথাক্রমে এদের কেন্দ্র। গ্রহটির কক্ষের কেন্দ্রের বৃহত্তম সমীকরণ, E এবং O এর ভিতরের দূরত্বের সমান।



রেখাচিত্র ৭০ : বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি (ভাস্করাচার্য মতে) ১ম চিত্র

E পৃথিবীর কেন্দ্র হলে ABCD বৃত্তটিকে সমকেন্দ্রিক এবং HPL-কে বিকেন্দ্রিক বলে। EO সরলরেখা অপদূরক রেখা। যদি এই রেখাটি বিকেন্দ্রিককে H ও L বিন্দুতে ছেদ করে, তাহলে এই বিন্দু দুইটিকে যথাক্রমে মন্দোচ্চ ও শীঘ্রোচ্চ বলে।

এখন মনে করা যাক, P গ্রহটি বিকেন্দ্রিকে পরিভ্রমণ করে এবং অন্য একটি কাল্পনিক গ্রহ, P-এর গড় গতিতে সমকেন্দ্রিকে পরিভ্রমণ করে। P যে সময়ে HP চাপ অতিক্রম করে, সেই সময়ে সমকেন্দ্রিকের উপরে কাল্পনিক গ্রহটি AM চাপ অতিক্রম করে। সুতরাং AM চাপ ও HP চাপ সমান এবং এই সময়ে সমকেন্দ্রিকের ব্যাসার্ধ ME, বিকেন্দ্রিকের ব্যাসার্ধ PO-এর সমান্তরাল হবে। MP ও EO রেখা দ্বারা সমান ও সমান্তরাল দুইটি রেখার প্রান্তবিন্দু যোগ করায়, এই দুইটি রেখাও সমান্তরাল। অতএব প্রকৃত গ্রহ ও কাল্পনিক গ্রহের সংযোজক সরলরেখা PM অপদূরক সরলরেখা EO-র সমান্তরাল। বিকেন্দ্রিকতা EO-র সমান।



রেখাচিত্র ৭১ঃ বিকেন্দ্রিক পদ্ধতি (ভাস্করাচার্য মতে) ২য় চিত্র

পৃথিবীর কেন্দ্র E ও গ্রহ P-এর সংযোজক রেখা EP-এর দিকে গ্রহটিকে দেখা যাবে। এই রেখা যদি সমকেন্দ্রিককে V বিন্দুতে ছেদ

করে, তাহলে V গ্রহের প্রকৃত অবস্থান। মধ্যম ও প্রকৃত অবস্থানের ভিতরের পার্থক্য MV-কে কেন্দ্রের সমীকরণ বলে।

AM চাপ = গড় কোণ বা কেন্দ্র = K (মনে কর)

MN = M থেকে HE-এর উপরে অঙ্কিত লম্ব

$= \sin MA$

$= \sin K$

$NE = \cos MA$

$= \cos K$

MPn এবং PEG দুইটি সদৃশ ত্রিভুজ।

$$\therefore \frac{Mn}{MP} = \frac{PG}{PE}$$

$$\therefore Mn = \frac{MP.PG}{PE}$$

$$= \frac{e \sin K}{PE}, \quad e = EO = \text{বিকেন্দ্রিকতা}$$

আবার $PE = \sqrt{PG^2 + GE^2}$

$$= \sqrt{\sin^2 K + (\cos K \pm e)^2}$$

Mn = কেন্দ্রের সমীকরণের সাইন

$$= \frac{e \sin K}{\sqrt{\sin^2 K + (\cos K \pm e)^2}}$$

উপরোক্ত নিয়মসমূহে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহারে সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষা করা হয় নাই। বিভিন্ন শব্দ দ্বারা অনেক সময় একই বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। আবার অনেক সময় একই শব্দ দ্বারা বিভিন্ন বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। কেন্দ্র শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত অসঙ্গতিপূর্ণ। বৃত্তের কেন্দ্র এই একটি শব্দ দ্বারা centre এবং anomaly দুইটি বিষয়ই বুঝানো হয়েছে। sin K দ্বারা MN সরলরেখা অথবা তার সমান PG সরল-রেখাকে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন সময়ে একে কেন্দ্রের ভুজের সাইন বলা হয়েছে, আবার কোন সময় একে কেবলমাত্র ভুজ বলা

হয়েছে। অনুরূপভাবে $\cos K$ দ্বারা NE অথবা তার সমান সরল-রেখা GO-কে বুঝানো হয়েছে। একে কোন সময় কোটি, কোন সময় কোটির সাইন, আবার কোন সময় ভুজের অনুপূরকের সাইন বলা হয়েছে। $(\cos K \pm e)$ দ্বারা EG অথবা EN+NG বুঝানো হয়েছে। একে স্ফুট-কোটি বলে; PE-কে কর্ণ বা অতিভুজ বলে। $(\text{কর্ণ})^2 = (\text{ভুজ})^2 + (\text{স্ফুট-কোটি})^2$

সাইন-ভুজ শব্দটি এখানে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। সম-কেন্দ্রিক বা শীঘ্রবৃত্তের অংশের জন্যই এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং $\sin(৯০+A)$, $\sin(১৮০\pm A)$ প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সাইনের তালিকা থেকে প্রাপ্ত চাপই ভুজের সমান।

সাইন এবং কোসাইন দ্বারা ৩৪৩৮ মিনিট ব্যাসার্ধযুক্ত বৃত্তের চাপ বুঝানো হয়েছে। মন্দবৃত্তের ব্যাসার্ধ e এবং এই e পরিবর্তনীয় বা অপরি-বর্তনীয় হতে পারে। এই মন্দবৃত্তের সাইন এবং কোসাইনকে যথাক্রমে ভুজফল ও কোটিফল বলে।

মন্দবৃত্তের সাহায্যে অথবা বিকেন্দ্রিকের সাহায্যে যেভাবেই গ্রহের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা যাক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই যে একই ফল পাওয়া যায় ভাস্কর সে কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

"মন্দবৃত্ত ও বিকেন্দ্রিক একই চিত্রে অঙ্কন করিলে এবং পূর্বব্যাখ্যা-মত তাহাতে গ্রহের প্রকৃত অবস্থান নির্দেশ করিলে, দেখা যাইবে যে, বিকেন্দ্রিক ও মন্দবৃত্তের ছেদবিন্দুতে গ্রহটি অবস্থিত।

"প্রথমে সমকেন্দ্রিক ও বিকেন্দ্রিক অঙ্কিত কর এবং পূর্বনির্দেশমত অক্ষর দ্বারা এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। গ্রহ P মন্দবৃত্তের মন্দোচ্চ H বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিচক্রের রাশির ক্রমের দিকে যেয়ে HP চাপ সৃষ্টি করে। PM সরলরেখাকে HE-এর সমান্তরাল অঙ্কিত কর। ইহা সমকেন্দ্রিককে M বিন্দুতে ছেদ করিবে। M কাল্পনিক মধ্যম গ্রহ এবং ইহা সমকেন্দ্রিকে পরিভ্রমণ করে বলিয়া কল্পনা করা হয়। PM এবং EO উভয়েই বিকেন্দ্রিকতার সমান।

"এখন M-কে কেন্দ্র করিয়া, বিকেন্দ্রিকতার সমান ব্যাসার্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত কর। ইহাই হইবে মন্দবৃত্ত। এই বৃত্তের কেন্দ্র যখন সমকেন্দ্রিকে AM চাপের সৃষ্টি করে, গ্রহটি তখন মন্দবৃত্তে মন্দোচ্চ হইতে HP চাপ সৃষ্টি করে। মন্দবৃত্তের ব্যাসার্ধ বিকেন্দ্রিকতার সমান এবং ইহা HP-রও সমান। অর্থাৎ মন্দবৃত্ত ও বিকেন্দ্রিক সমকেন্দ্রিককে একই বিন্দুতে ছেদ করে। এইভাবে এক পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের রেখা ও কোণ, অন্য পদ্ধতিতে অঙ্কিত রেখা ও কোণের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়।

"ইহাও স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিকেন্দ্রিকে গ্রহটি রাশিচক্রের গতির দিকে HP চাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু মন্দবৃত্তে গ্রহটি রাশিচক্রের গতির বিপরীত দিকে HP চাপ সৃষ্টি করে।"

পরের একটি শ্লোকে প্রথম ও দ্বিতীয় সমীকরণের প্রয়োগ-বিধি বর্ণনা করা হয়েছে, এতে কোথায় যোগ করতে হবে আর কোথায় বিয়োগ করতে হবে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার পরের শ্লোকে স্থানের সংশুদ্ধি আলোচনা করা হয়েছে। একে ভুজান্তর বলা হয়। এরপরে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহের প্রকৃত আহ্নিক গতি নির্ণয়ের পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। কোন্ কোন্ কারণে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির বক্রগতি হয়, তা বিবেচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যখন তাদের কেন্দ্র (অথবা বৈষম্য) যথাক্রমে ১৬৪°, ১৪৪°, ১৩০°, ১৬৩° এবং ১১৫ ডিগ্রী, তখন বক্রগতি আরম্ভ হয় এবং কেন্দ্রের পরিমাণ যখন যথাক্রমে ১৯৬°, ২১৬°, ২৩০°, ১৯৭° এবং ২৪৫ ডিগ্রী হয়, তখন বক্রগতি শেষ হয়।

যদি গ্রহের স্ফুট-অবস্থান ও তার পাতবিন্দুর অন্তর এবং গ্রহের সর্ববৃহৎ বিক্ষেপ জানা থাকে, তাহলে অনুপাতের সাহায্যে যে কোন সময়ে গ্রহের বিক্ষেপ নির্ণয় পদ্ধতি পরবর্তী শ্লোকে আলোচিত হয়েছে।

সূর্য এবং গ্রহসমূহের নতি গণনার পার্থক্য সম্বন্ধে পরবর্তী শ্লোক লিখিত হয়েছে। সূর্যের নতিকে, খ-বিষুবে তা'র প্রকৃত স্থানের প্রকৃত

নতি বলেই মনে করা হয়েছে। গ্রহসমূহের নতিকে তাদের মধ্যম নতি বলা হয়েছে। খ-বিষুবে গ্রহের অবস্থানের সাথে তার খ-অক্ষাংশ, উত্তরদিকে হ'লে যোগ করে এবং দক্ষিণ দিকে হলে বিয়োগ করে নির্ণয় করবার পদ্ধতি দেওয়া আছে। গ্রহের আহ্নিক গতির সাহায্যে অনুপাত দ্বারা, খ-বিষুবাংশের চাপকে সময়ে পরিবর্তন ক'রে গ্রহের দিবা ও রাত্রির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে,

গ্রহের আহ্নিক গতিবৃত্তের ব্যাসার্ধ=৩৪৩৮′– নতির ভার্সড সাইন। গ্রহের আহ্নিক গতিবৃত্তের ব্যাসার্ধ, নতি ও বিষুবন ছায়ার সাহায্যে গ্রহের খ-বিষুবাংশের অন্তর নির্ণয় পদ্ধতি পরের শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে খ-বিষুবাংশের অন্তরের সাহায্যে স্থূলভাবে পুনরায় দিবা ও রাত্রির দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

একটি গ্রহ কোন্ বিশেষ সময়ে কোন্ রাশিতে কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করে এবং কতদিন পূর্বে সেই নক্ষত্রে প্রবেশ করেছে এবং সেই নক্ষত্রের কত অংশ অতিক্রম করেছে, পরবর্তী শ্লোকে তার নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

কোন বিশেষ সময়ে চান্দ্রদিন-সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি আলোচনা ক'রে গ্রহের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়-অধ্যায় শেষ করা হয়েছে।

চন্দ্রগ্রহণ গণনা পদ্ধতি

কোন্ দিন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হবে তা নির্ণয় করতে সূর্যের সঙ্গে প্রতি-যোগ অবস্থায় চন্দ্রের ও চন্দ্রের পাতবিন্দুর অবস্থানের তুলনা করতে হয়। প্রতিযোগকালে যদি চন্দ্র ও চন্দ্রের পাতবিন্দুর দ্রাঘিমাংশের অন্তর ৭½ ডিগ্রী অথবা তার কম হয়, তাহলে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়।

সূর্য সিদ্ধান্তের চতুর্থ অধ্যায়ে মনে করা হয়েছে যে,

সূর্যের গড় ব্যাস=৬৫০০ যোজন

চন্দ্রের গড় ব্যাস=৪৮০ যোজন

সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব সব সময় একই থাকে না; যখন তা'রা নিকটে থাকে, তখন তাদের ব্যাস বড় বলে মনে হয়; আবার যখন দূরে থাকে, তখন তাদের ব্যাস ছোট বলে মনে হয়। তাদের আহ্নিক গতি দূরত্বের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়, এবং তাদের আপাতঃ আয়তন আহ্নিক গতির উপর নির্ভর করে, এইরূপ মনে ক'রে তাঁদের ব্যাসের সংশুদ্ধি নির্ণয় করা হয়।

চন্দ্র ও সূর্য এক মহাযুগে সম্পূর্ণ যতবার আবর্তন করে, তাকে মহাযুগের দিন-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হলে, তাদের গড় আহ্নিক গতি পাওয়া যায়।

$$\text{সূর্যের গড় আহ্নিক গতি} = \frac{৪৩২০০০০}{১৫৭৭৯১৭৮২৮}$$

$$= ৫৯\text{'}১৩৬১৬ \text{ মিনিট}$$

$$\text{চন্দ্রের গড় আহ্নিক গতি} = \frac{৫৭৭৫৩৩৩৬}{১৫৭৭৯১৭৮২৮}$$

$$= ৭৯০\text{'}৫৬ \text{ মিনিট}$$

গ্রহণ-দিনে সূর্য ও চন্দ্রের আহ্নিক গতিকে তাদের প্রকৃত আহ্নিক গতি বলা হয়।

দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র ও সূর্যের ব্যাসকে তাদের প্রকৃত আহ্নিক গতি দ্বারা গুণ ক'রে গুণফলকে গড় আহ্নিক গতি দ্বারা ভাগ করা হলে স্ফুট-ব্যাস পাওয়া যায়। গ্রহণ-দিনে সূর্য ও চন্দ্রের প্রকৃত আহ্নিক গতি যদি যথাক্রমে σ এবং μ মিনিট হয়, তা হলে,

$$\text{সূর্যের স্ফুট-ব্যাস} = \frac{৬৫০০ \times \sigma}{৫৯\text{'}১৩৬১৬}$$

$$\text{এবং চন্দ্রের স্ফুট-ব্যাস} = \frac{৪৮০ \times \mu}{৭৯০\text{'}৫৬}$$

তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সূর্যের স্ফুট-ব্যাসকে এক মহাযুগে তার আবর্তন-সংখ্যা দ্বারা গুণ ক'রে গুণফলকে এক মহাযুগে চন্দ্রের আবর্তন-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হলে, চন্দ্রকক্ষে সূর্যের ব্যাস পাওয়া

যায়। অথবা সূর্যের স্ফুট-ব্যাসকে চন্দ্রকক্ষের পরিধি দ্বারা গুণ ক'রে সূর্যকক্ষের পরিধি দিয়ে ভাগ করলেও চন্দ্রকক্ষে সূর্যের ব্যাস পাওয়া যায়।

এই গণনাতে যে সমস্ত বিরাট বিরাট সংখ্যা দেওয়া আছে, সরল করবার পরে সেগুলি এরূপ দাঁড়ায়,

$$\text{চন্দ্রকক্ষে সূর্যের ব্যাস} = \frac{৬৫০০ \times \sigma}{৭৯০\text{'}৫৬} \text{ যোজন}$$

$$= ৮\text{'}২২২ \times \sigma \text{ যোজন।}$$

মনে করা হয় যে, চন্দ্রকক্ষের পরিধি ৩২৪০০০ যোজন; এবং ঐ পরিধিতে মোট ২১৬০০ মিনিট আছে। অতএব ১ মিনিট পরিমাণ চাপে ১৫ যোজন বুঝায় এবং সূর্যের স্ফুট-ব্যাসকে ১৫ দিয়ে ভাগ করলে,

$$\text{সূর্যের আপাতঃদৃষ্ট ব্যাস} = \text{'}৫৪৮১৩ \times \sigma \text{ মিনিট}$$

$$= \text{'}৫৪৮ \times ৩ \times ৫৯\text{'}১৩৬১৬ \text{ মিনিট}$$

$$= ৩২\text{'}৩৯৪৩ \text{ মিনিট}$$

চন্দ্রের স্ফুট-ব্যাসকে ১৫ দিয়ে ভাগ করলে,

$$\text{চন্দ্রের আপাতঃদৃষ্ট ব্যাস} = \frac{৪৮০ \times \mu}{৭৯০\text{'}৫৬ \times ১৫}$$

$$= ০৪০৪৮ \times \mu$$

$$\text{এবং চন্দ্রের গড় ব্যাস} = ৩২ \text{ মিনিট।}$$

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে চন্দ্রস্থানে পৃথিবীর ছায়া-ছেদনের ব্যাস নির্ণয়-প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে।

"চন্দ্রের প্রকৃত আহ্নিক গতিকে পৃথিবীর পরিধি দ্বারা গুণ কর এবং গুণফলকে তাহার (চন্দ্রের) গড় আহ্নিক গতি দ্বারা ভাগ কর। ভাগফলকে শূচি বলে।" পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন মনে করলে,

$$\text{শূচি} = \frac{১৬০০ \times \mu}{৭৯০\text{'}৫৬} \text{ যোজন}$$

$$= ২\text{'}০২৪ \times \mu \text{ যোজন।}$$

গ্রহণ-সময় ও পূর্ব-মধ্য রাত্রির ভিতরে এই সমস্ত দ্রাঘিমাংশের পরিবর্তন অনুপাত অনুসারে নির্ণয় করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।"

নবম শ্লোকে বলা হয়েছে, "চন্দ্র নিয়ন্তর মণ্ডলে মেঘের ন্যায় থাকে বলিয়া সূর্যগ্রহণের সময় পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে ভূচ্ছায়ায় প্রবেশ করে এবং সেই ছায়া চন্দ্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।"

গ্রহণের পরিমাণ নির্ণয় করতে যদি আচ্ছাদকের ব্যাস D, গ্রহণ-গ্রস্ত পদার্থের ব্যাস d এবং গ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের দ্রাঘিমাংশ λ হয়, তাহলে, দশম ও একাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "গ্রহণগ্রস্ত অংশের পরিমাণ $\frac{1}{2}(D+d)-\lambda$. এই পরিমাণ যদি গ্রহণগ্রস্ত পদার্থের ব্যাস হইতে বড় হয়, তাহা হইলে পূর্ণগ্রহণ হইবে; তাহা না হইলে আংশিক গ্রহণ হইবে। $\frac{D+d}{2}$ অপেক্ষা যদি λ বড় হয়, তাহা হইলে কোন গ্রহণ হইবে না।"

দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে; "আচ্ছাদিত এবং আচ্ছাদকের ব্যাস-দ্বয়ের সমষ্টি ও অন্তর পৃথকভাবে নির্ণয় কর। এই অর্ধ-সমষ্টি ও অর্ধ-অন্তরের বর্গ হইতে চন্দ্রের দ্রাঘিমার বর্গ বিয়োগ কর। বিয়োগফল-সমূহের বর্গমূল নির্ণয় কর।"

ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "এই বর্গমূল দুইটিকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে সূর্য হইতে চন্দ্রের আহ্নিক গতি দ্বারা ভাগ কর। ভাগফলদ্বয়কে স্থিতি-অর্ধ (গ্রহণের স্থায়িত্বের অর্ধেক কাল) ও মধ্য-অর্ধ (পূর্ণগ্রহণের স্থায়িত্বের অর্ধেক কাল) বলে। ইহা ঘটিকাতে প্রকাশ করা হয়।"

যদি স্থিতি-অর্ধ ও মধ্য-অর্ধকে যথাক্রমে S ও M দ্বারা নির্দেশ করা হয় এবং সূর্য থেকে চন্দ্রের দৈনিক অপসরণ-গতি l হয়,

$$S=\frac{৬০}{l}\times\sqrt{\left(\frac{D+d}{2}\right)^2-\lambda^2}$$

$$M=\frac{৬০}{l}\times\sqrt{\left(\frac{D-d}{2}\right)^2-\lambda^2}$$

$$\frac{S}{60} = \frac{HH_1}{l}$$

$$\therefore \quad S = \frac{60}{l} \times \sqrt{\left(\frac{D+d}{2}\right)^2 - \lambda^2}$$

সূর্য, চন্দ্র ও পাতবিন্দুর দৈনিক গতি থেকে S সময়ে তাদের দ্রাঘিমার পরিবর্তন সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে। এইভাবে প্রাপ্ত-সংখ্যা প্রতিযোগ-সময়ে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান থেকে বিয়োগ করতে হয় এবং পাতবিন্দুর অবস্থানের সাথে যোগ করতে হয়।

তারপরে চন্দ্র ও তার পাতবিন্দুর সংশোধিত অবস্থানের সাহায্যে চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয় ক'রে উপরোক্ত সূত্র প্রয়োগ করতে হয়। এতে S-এর আরো আসন্ন মান পাওয়া যায়। এইভাবে যতক্ষণ না S-এর মান বারবার একই পাওয়া যায়, ততক্ষণ উপরোক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়। এইরূপে প্রাপ্ত S-এর মানকে প্রথম প্রকৃত স্থিতি-অর্ধ বলে।

দ্বিতীয় স্থিতি-অর্ধ অর্থাৎ গ্রহণের স্থায়িত্বের শেষার্ধ নির্ণয় করতে সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিযোগ-স্থানের দ্রাঘিমার সাথে তাদের দ্রাঘিমার আনুপাতিক অংশ যোগ করতে হয় এবং চন্দ্রের পাতবিন্দুর পরিবর্তন ও তার প্রতিযোগ-স্থানের সাথে যোগ করতে হয়।

এইভাবে সংশোধিত অবস্থান থেকে চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয় করার পর উপরোক্ত সূত্রে λ-র মান বসিয়ে S-এর অধিকতর সন্নিহিত মান পাওয়া যায়। পুনঃপুনঃ এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ ক'রে প্রকৃত দ্বিতীয় স্থিতি-অর্ধ নির্ণয় করা হয়।

অনুরূপভাবে পুনঃপুনঃ গণনা দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় মধ্য-অর্ধও নির্ণয় করা হয়।

ষষ্ঠদশ শ্লোকে পূর্ণিমার সময়কে চন্দ্রগ্রহণের মধ্যকাল বলা হয়েছে। এই সময়কে T বলা হলে,

T—প্রথম-স্থিতি-অর্ধ=ভূচ্ছায়ার প্রথম স্পর্শকাল।

T+দ্বিতীয়-স্থিতি-অর্ধ=গ্রহণান্ত কাল।

সপ্তদশ শ্লোকে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যে,

T − প্রথম মধ্য-অর্ধ = পূর্ণগ্রহণ আরম্ভকাল

T + দ্বিতীয় মধ্য-অর্ধ = পূর্ণগ্রহণ অন্তকাল।

গ্রহণ-কালের যে কোন সময়ে আচ্ছাদিত অংশ নির্ণয় করতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

"গ্রহণাচ্ছন্ন অংশের পরিমাণ ক্রমশঃ গ্রহণের মধ্য-অংশের দিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই পরিমাণ প্রথম স্পর্শ হইতে অতিবাহিত সময়ের উপর নির্ভর করে। এইরূপ অতিবাহিত সময়কে m দ্বারা নির্দেশ করিলে, S যদি প্রথম স্থিতি-অর্ধ হয়, তাহা হইলে S−m সময়ের জন্য দ্রাঘিমার আনুপাতিক পরিবর্তন গণনা করা হইয়া থাকে।

দ্রাঘিমার আপেক্ষিক গতি l হইলে, সেই সময় হইতে গ্রহণের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ে দ্রাঘিমার অন্তর হইবে, $\frac{l}{60}(S-m)$।

এই অন্তরকে কোটি বলে। চন্দ্রের অক্ষাংশকে ভুজ করিয়া চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে চন্দ্র ও ভূচ্ছায়ার কেন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ-সময়ে চন্দ্র ও সূর্যের কেন্দ্রের দূরত্বকে অতিভুজ করিয়া যে সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করা যায়, সেটি তাহার লম্ব-বাহু।

অতএব গ্রহণাচ্ছন্ন অংশ (চাপ মানে) $= \frac{D+d}{2} - \sqrt{(\text{কোটি})^2 + \lambda^2}$।

একবিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "একইভাবে গ্রহণ-অন্তর ও গ্রহণ-মধ্যের মধ্যবর্তী যে কোন সময়ে গ্রহণাচ্ছন্ন অংশ নির্ণয় করা যাইতে পারে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে কোটি অথবা সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব-বাহু নির্ণয় করিতে দ্বিতীয় স্থিতি-অর্ধ ব্যবহার করিতে হইবে।"

দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

"গ্রহণাচ্ছন্ন অংশ দেওয়া থাকিলে, সেই সময় নির্ণয় করিবার জন্য ত্রয়োদশ শ্লোকের অনুরূপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করিতে হয়। অধিকতর আসন্ন

মান নির্ণয় করিতে হইলে এই প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিতে হয়।"
n যদি গ্রহণাচ্ছন্ন অংশ হয়, তাহলে,

$$\text{কোটি} = \sqrt{\left(\frac{D+d}{2} - n\right)^2 - \lambda^2}$$

এবং সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে,

$$\text{কোটি} = \frac{\text{আপাতস্থিতি}}{\text{গড়স্থিতি}} \times \sqrt{\left(\frac{D+d}{2} - n\right)^2 - \lambda^2}$$

কোটি থেকে স্থিতি-অর্ধ নির্ণয় প্রণালীর সাহায্যে সময়-নির্ণয় করা যায়।

বলন

সূর্যসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, প্রক্ষেপ ব্যতীত গ্রহণের ক্রম সম্যক-ভাবে বুঝতে পারা যায় না। পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রক্ষেপ-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্বিংশ এবং পঞ্চবিংশ শ্লোকে বলন নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। দুইটি বিশেষ কোণের সমষ্টি ও অন্তরকে স্ফুট-বলন বা সূর্যপথের পরিবর্তন বলে।

সম্পূর্ণ পরিবর্তন অর্থে সূর্যপথের উপর অবস্থিত বস্তুর অক্ষবৃত্ত এবং ঐ বস্তুরই অবস্থানবৃত্তের ছেদিত কোণ বুঝানো হয়। সূর্যপথে অবস্থিত বস্তু বা গ্রহ এবং দিগন্তের উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দু দ্বারা অঙ্কিত বৃহৎ বৃত্তকে অবস্থানবৃত্ত বলে।

নীচে চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ শ্লোক দেওয়া গেল।

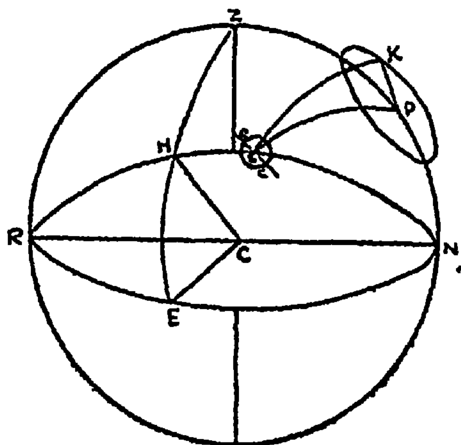
"সূর্যপথে অবস্থিত বস্তুটির অবস্থানবৃত্তে সূর্যবিষুব দূরত্ব নির্ণয় কর। ইহার সাইনকে পর্যবেক্ষণ-স্থানের অক্ষাংশের সাইন দ্বারা গুণ কর। গুণফলকে ব্যাসার্ধ দ্বারা ভাগ কর। এই ভাগফল যে চাপের সাইনের সমান, সেই চাপ নির্ণয় কর। এই চাপে যত ডিগ্রী আছে, তাহাকে

অক্ষের ডিগ্রী বা অক্ষাংশ-বলন বলে। বস্তুটি পূর্ব-গোলার্ধে হইলে অক্ষাংশ-বলন উত্তর এবং পশ্চিম গোলার্ধে হইলে দক্ষিণ হইবে।

"বস্তুর অবস্থান তিন রাশি বর্ধিত করিয়া পরিবর্তন নির্ণয় কর। ইহাকে আয়ন-বলন বলে। এই বলন এবং অক্ষাংশ-বলন উভয়ে একই দিকে হইলে তাহাদের সমষ্টি এবং বিপরীত দিকে হইলে অন্তর নির্ণয় কর। এই ফলকে স্ফুট-বলন বা প্রকৃত বলন বলে।

"প্রকৃত বলনের সাইনকে ৭০ দ্বারা ভাগ করিলে বলনসংখ্যা পাওয়া যায়।"

উপরোক্ত সূত্র দুইটি ব্যাখ্যার জন্য নীচের চিত্রটি বিবেচনা করা যাবে। মনে কর যে, RZPN = যে কোন স্থানের মধ্যরেখা, Z = খবিন্দু, P = খ-বিষুব মেরু, N = দিগন্তের উত্তর বিন্দু এবং NHE = প্রধান উন্মণ্ডল রেখা।



রেখাচিত্র ৭০ : সূর্যসিদ্ধান্ত মতে বলন নির্ণয়

মনে কর, S বস্তুর গ্রহণ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হচ্ছে। S থেকে এর অবস্থান-বৃত্ত NSR অঙ্কন কর। N এবং R দিগন্তের উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দু।

সূর্যপথের ক্ষুদ্র একটি চাপ eSc-এর অবস্থান নির্ণয় করাই বলনের প্রধান কাজ। পর্যবেক্ষণ-স্থান থেকে সূর্য অথবা চন্দ্রের উপরে এই চাপটি দৃশ্য হয়।

এক্ষণে গ্রহণ-সময়ে, K সূর্যপথের মেরু এবং P খ-বিষুবের মেরু হ'লে, ক্ষুদ্র চাপ eSc; S থেকে অঙ্কিত অক্ষবৃত্ত SK-এর উপরে লম্ব হবে এবং KSN কোণটি—অক্ষাংশ-বৃত্ত SK এবং অবস্থান-বৃত্ত RSN-এর ভিতরের স্ফুট-বলন।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে দুইটি কোণে এই স্ফুট-বলন গঠিত, পৃথকভাবে সেই কোণ দুইটি নির্ণয় করাই সুবিধাজনক। এই কোণ দুইটি যথাক্রমে PSN কোণ বা অক্ষ-বলন এবং KSP কোণ বা অয়ন-বলন। প্রয়োজন-বোধে এদের সমষ্টি বা অন্তর নিলেই স্ফুট-বলন পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, PSN গোলকীয় ত্রিভুজে,

$$\sin PSN = \frac{\sin PNS \sin PN}{\sin SP}$$

কিন্তু PNS কোণটি ZH চাপ দ্বারা পরিমাপ করা যায় এবং যদি ZH = n হয়, তাহলে পর্যবেক্ষণ-স্থানের অক্ষাংশ PN = l

এবং নতির পরিপূরক SP = 90 − δ

$$\therefore \text{ অক্ষ-বলনের সাইন} = \frac{\sin n \sin l}{\cos \delta}$$

কিন্তু সূর্যসিদ্ধান্তে আছে যে,

$$\text{অক্ষের সাইন} = \frac{\sin n \sin l}{R}$$

এখানে R অর্থে গ্রহণ-দিনে সূর্যের আহ্নিক কক্ষের ব্যাসার্ধ বুঝানো হয়েছে এবং সূর্যের নতি যদি δ হয়, তাহলে এর কোসাইন ঐ দিনের ব্যাসার্ধ হবে।

দ্বিতীয়তঃ, অয়ন-বলনের জন্য শ্লোকে গ্রহণ বস্তুর অবস্থানকে তিন রাশি বা ৯০ ডিগ্রী বাড়িয়ে দিতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ দ্রাঘিমা 90 + L নিতে হবে।

PSK গোলকীয় ত্রিভুজে PK চাপটি ক্রান্তি-কোণের পরিমাপক এবং এর মান ২৩ ডিগ্রী বলে মনে করা হয় ; PS চাপ নতির অনুপূরক এবং SKP = 90 + L।

KSP কোণের সাইন = অয়নের সাইন

= অয়ন-বলন

$$= \frac{\sin(90+L)\sin 24^\circ}{\cos \delta}$$

পূর্বের ন্যায় cos δ কে R দিয়ে নির্দেশ করা যেতে পারে।

সূর্যগ্রহণ গণনা পদ্ধতি

রাশিচক্রের উদয়বিন্দু বা উদয়লগ্ন থেকে রাশিচক্রের উপরে অবস্থিত সুমেরুর নিকটতম বিন্দুকে নবতিতম বিন্দু (nonagesimal point) বলে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের প্রদত্ত পদ্ধতিতে এই বিন্দুর অবস্থানও সহজেই নির্ণয় করা যায়। সূর্যগ্রহণ গণনাতে যে লম্বন নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়, সেখানে এই বিন্দুর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

সূর্যসিদ্ধান্তের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যখন নবতিতম বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান হয়, তখন তার কোন লম্বন থাকে না। আরো বলা হয়েছে যে, পর্যবেক্ষণ-স্থানের উত্তর অক্ষাংশ যদি নবতিতম বিন্দুর নতির সমান হয় তা হ'লে (নবতিতম বিন্দু সুবিন্দু হলে) খ-অক্ষাংশেও কোন লম্বন হবে না।

কোন গ্রহের অবস্থান যদি অনুরূপ হয়, অর্থাৎ যদি নবতিতম বিন্দুর পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থান হয়, তাহলে তার লম্বন নির্ণয় পদ্ধতি প্রদানের পূর্বে কতকগুলি নিয়ম দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় শ্লোকে কোটিবিন্দু বা উদয়লগ্নের ধাবনসীমা নির্ণয় করা হয়েছে।

সংযোগের সময় উদয়কালের সাহায্যে সূর্যোদয় থেকে উদয়লগ্নের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। উদয়লগ্নের খ-দ্রাঘিমাংশের সাইনকে ২৪ ডিগ্রীর সাইন দ্বারা গুণ করা হয় এবং গুণফলকে পর্যবেক্ষণ-স্থানের অক্ষাংশের কোসাইন দ্বারা ভাগ করা হয়। (সূর্যের সর্বাধিক নতিকে ২৪ ডিগ্রী বলে মনে করা

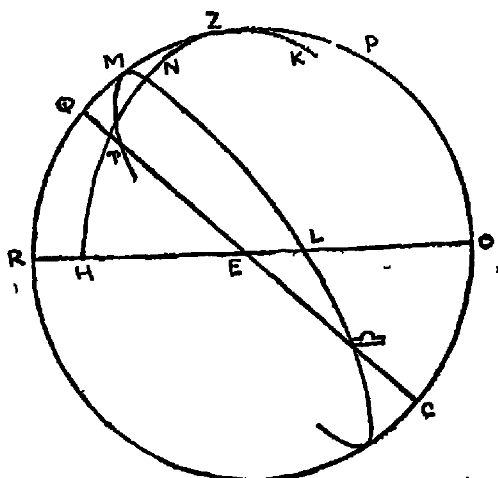
হয়।) এই ভাগফলকে উদয়লগ্নের বা কোষ্ঠী-স্থানের ধাবনসীমার সাইন বলা হয় ; অনেক সময় একে কেবলমাত্র 'উদয়'ও বলা হয়।

$$\text{অর্থাৎ উদয়} = \frac{\sin L \sin 24^\circ}{\cos l}$$

এখানে, L = উদয়লগ্ন বা কোষ্ঠী-স্থানের খ-দ্রাঘিমাংশ

l = পর্যবেক্ষণ স্থানের খ-অক্ষাংশ

চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "রাশিসমূহের উদয়কালের সাহায্যে রাশিচক্রের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা হয়।"



রেখাচিত্র ৭৪ : সূর্যসিদ্ধান্ত মতে সূর্যগ্রহণ নির্ণয়

যদি, d = মধ্যবিন্দুর নতি

l = পর্যবেক্ষণ-স্থানের অক্ষাংশ হয়,

তা হ'লে $l + d$ = মধ্যবিন্দু ও সুবিন্দুর দূরত্ব।

পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে, $\sin(l + d)$ = মধ্য-বিন্দুর সাইন

= মধ্য-জ্যা।

চিত্রের সাহায্যে (চিত্র ৭৪) উপরের শ্লোকে বর্ণিত বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া গেল।

মনে কর, RMZPO = মধ্যরেখা

REO = দিগন্ত-বৃত্তের প্রক্ষেপ

E = পূর্ব দিগবিন্দু

Z = সুবিন্দু

P = খ-বিষুব মেরু

γML♌ = রাশিচক্র

M = রাশিচক্রের মধ্যবিন্দু

L = রাশিচক্রের উদয়বিন্দু বা উদয়লগ্ন

N = নবতিতম বিন্দু

K = রাশিচক্রের মেরু

MNZK = N বিন্দু অতিক্রমকারী উর্ধ্ববৃত্ত

γ = বসন্তবিষুবন

γN = নবতিতম বিন্দুর খ-দ্রাঘিমাংশ

γL = উদয়বিন্দুর খ-দ্রাঘিমাংশ

পূর্বপৃষ্ঠার চিত্র (চিত্র ৭৪) থেকে সহজেই দেখা যায় যে,

যেহেতু, LZ = একটি পাদ এবং LN = একটি পাদ

$\therefore$ LH = একটি পাদ

কিন্তু, ER = LH

= একপাদ

ER এবং LH এই দুই সমান অংশ থেকে HE সাধারণ অংশ বাদ দিলে অবশিষ্ট RH = EL

কিন্তু, EL = উদয়বিন্দুর ধাবনসীমা

তৃতীয় শ্লোকে এই উদয়বিন্দুর ধাবনসীমার সাইন বা উদয় নির্ণয় করা হয়েছে।

আবার, চাপ RH = $\angle$RZH

= $\angle$MZN

এক্ষণে, MZN এই সমকোণী গোলকীয় ত্রিভুজে,

$$\sin MN = \frac{\sin MZ}{R} \cdot MZN$$

তৃতীয় ও পঞ্চম শ্লোক থেকে এদের প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হলে, আমরা পাই,

$$\sin MN = \frac{\text{মধ্য-জ্যা} \angle \text{উদয়}}{R}$$

$$= \frac{\sin (l+d). \sin 24 . \sin L}{R. \cos l}$$

ষষ্ঠ শ্লোকে নবতিতম বিন্দুর সুবিন্দু দূরত্ব NZ ও তার উন্নতি NH নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

N বা নবতিতম বিন্দুর সুবিন্দু-দূরত্বের সাইনকে দৃক্ক্ষেপ বলে এবং N বা নবতিতম বিন্দুর উন্নতির সাইনকে দৃগ-গতি বলে।

দৃক্ক্ষেপ নির্ণয় পদ্ধতি

"মধ্য জ্যা-কে উদয় দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ব্যাসার্ধ দ্বারা ভাগ কর। ভাগফলের বর্গ নির্ণয় কর এবং মধ্য-জ্যা'র বর্গ হইতে এই ভাগফলের বর্গ বিয়োগ কর। বিয়োগফলের বর্গমূল দৃক্ক্ষেপের আসন্নমানের সমান।"

দৃগ-গতি নির্ণয় পদ্ধতি

"দৃক্ক্ষেপের বর্গ এবং ব্যাসের বর্গের অন্তরের বর্গমূল নবতিতম বিন্দুর উন্নতির সাইন বা দৃগ-গতির সমান।"

নবতিতম বিন্দুর সুবিন্দু-দূরত্বে সাইন এবং কোসাইনকে স্থূলভাবে যথাক্রমে দৃক্ক্ষেপ ও দৃগ-গতি বলে মনে করা যেতে পারে।

উপরে প্রদত্ত MZN গোলকীয় ত্রিভুজ থেকে নবতিতম বিন্দুর সুবিন্দু-দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এই ত্রিভুজের বাহুগুলির সাইনকে একটি

সমতলীয় সমকোণী ত্রিভুজের বাহু মনে করলে, নিম্নলিখিত সূত্রটি পাওয়া যায়।

$$\sin ZN = \sqrt{\sin^2 ZM - \sin^2 MN}$$

পূর্বে ZM এবং MN-এর যে মান নির্ণয় করা হয়েছে, তা থেকে sin ZN-এর মান নির্ণয় করা যেতে পারে।

লম্বন

সূর্যগ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের দ্রাঘিমাংশের লম্বন নির্ণয় অত্যন্ত জটিল। সেজন্য এই গণনা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়।

সূর্য ও চন্দ্রের সংযোগের প্রকৃত সময়, তার দৃশ্য-সময় থেকে পৃথক। চন্দ্র ও সূর্যের লম্বনের উপরে এই পার্থক্য নির্ভর করে।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ চন্দ্রের পরম লম্বন (Horizontal parallax; সূর্যসিদ্ধান্ত এবং বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় একে 'হরিজ'-লম্বন বলা হয়েছে। 'হরিজ' এবং 'horizon'-এর মধ্যে ধ্বনিগত সামঞ্জস্য এত বেশী যে, 'হরিজ' কথাটি যে horizon থেকে গৃহীত, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।) কক্ষপথে চন্দ্রের গড় দৈনিক গতির ১/১৫ অংশ বলে মনে করতেন। চন্দ্রের দৈনিক গড়গতি ১৩ ডিগ্রী ১০ মিনিট ৪৬·৭ সেকেণ্ড; একে ১৫ দিয়ে ভাগ করলে, তার পরম লম্বনের পরিমাণ পাওয়া যায় ৫২ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড।

এইরূপ কল্পনার ফলে তাঁরা সূর্যের লম্বন পেয়েছিলেন ৩ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড। অতএব তাঁদের মতে, উভয়ের আপেক্ষিক পরম লম্বনের পরিমাণ হয় ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড। সময়ে পরিবর্তন ক'রে এই লম্বনকে ৪ ঘটিকা, অর্থাৎ দিবারাত্রির পনেরো ভাগের একভাগ মনে করা হতো।

সপ্তম শ্লোকে প্রথম স্তরে ছেদ নামে একটি ভাগফল নির্ণয় করা হয়।

$$\text{ছেদ} = \frac{(\sin 30)^2}{\text{দৃগ্‌-গতি}} = \frac{R^2}{4 \times \text{নবতিতম বিন্দুর উন্নতির সাইন}}$$

অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যদি সূর্য ও নবতিতম বিন্দুর দ্রাঘিমাংশের অন্তর D হয়, তা হলে,

$$\text{সূর্য থেকে চন্দ্রের দ্রাঘিমাংশের লম্বন} = \frac{D}{\text{ছেদ}} \text{ ঘটিকা}$$

সময়ের এককে আপেক্ষিক লম্বনের এই প্রথম আসন্ন মান।

নবম শ্লোকে বলা হয়েছে, "সূর্যের স্থান নবতিতম বিন্দুর বাহিরে হইলে, সংযোগের প্রকৃত সময়ের অন্তর হইতে উপরে নির্ণীত লম্বন (সময়ের এককে) বিয়োগ কর। আর যদি নবতিতম বিন্দু ভিতরে থাকে তবে উভয় সময় যোগ কর। এইভাবে নির্ণীত সংযোগের সময় হইতে পুনরায় লম্বন নির্ণয় কর এবং ইহার সহিত ও সংযোগের প্রকৃত সময়ের সহিত উপরোক্তভাবে এই লম্বনের ব্যবহার কর। এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে থাক। যখন পরবর্তী প্রত্যেক স্তরে একই লম্বন ও একই সময় পাওয়া যাইবে, তখন বুঝিবে উহাই প্রকৃত লম্বন এবং ঐ গ্রহণের মধ্য-সংযোগের প্রকৃত সময়।"

দশম শ্লোকে সূর্য থেকে চন্দ্রের অক্ষাংশের লম্বন নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। "দৃক্ষেপকে সূর্য ও চন্দ্রের দৈনিক আপেক্ষিক গতি দ্বারা গুণ কর। গুণফলকে ব্যাসার্ধের ১৫ গুণ দ্বারা ভাগ কর। ভাগফলই চন্দ্রের অক্ষাংশের আপেক্ষিক লম্বন।" এইভাবে,

চন্দ্রের অক্ষাংশের আপেক্ষিক লম্বন

$$= \frac{8৮\frac{2}{5}}{৩৪৩৮} \times \text{নবতিতম বিন্দুর খবিন্দু-দূরত্বের সাইন}$$

একাদশ শ্লোকে এর অন্য একটি সূত্র দেওয়া হয়েছে। এখানে যা বলা হয়েছে, তার অর্থ এইরূপ,

$$\text{অক্ষাংশের লম্বন} = \frac{\text{দৃক্ষেপ}}{৭০}$$

$$= \frac{\text{নবতিতম বিন্দুর খবিন্দু-দূরত্বের সাইন}}{৭০}$$

দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "নবতিতম বিন্দু সুবিন্দুর উত্তরে হইলে, নির্ণীত লম্বনের পরিমাণও উত্তরে হইবে এবং ঐ বিন্দু সুবিন্দুর দক্ষিণে হইলে, লম্বনও দক্ষিণে হইবে। লম্বনের পরিমাণ এবং চন্দ্রের অক্ষাংশ একই দিকে হইলে, উভয়কে যোগ করিতে হইবে এবং বিপরীত দিকে হইলে বিয়োগ করিতে হইবে। নির্ণীত ফল চন্দ্রের দৃশ্য খ-অক্ষাংশ"

নবম শ্লোক অনুযায়ী নির্ণীত সংযোগের প্রকৃত সময়ের সাথে খ-দ্রাঘিমাংশের লম্বন (সময়ের এককে প্রকাশিত) প্রয়োগের সাহায্যে সংযোগের দৃশ্য-সময় নির্ণয় করা হয়। এই দৃশ্য-সময় নির্ণয় করতে চন্দ্রের যে দৃশ্য অক্ষাংশের প্রয়োজন হয়, দশম শ্লোক অনুযায়ী প্রকৃত অক্ষাংশের সাথে লম্বন প্রয়োগ ক'রে, সেটা নির্ণয় করা হয়।

এরপরে যেভাবে চন্দ্রগ্রহণ গণনা করা হয়, সেই একইরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে সূর্যগ্রহণ গণনা করা হয়।

ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "চন্দ্রগ্রহণ গণনায় যেভাবে স্থিতি-অর্ধ, মধ্য-অর্ধ ইত্যাদি গণনা করা হয়, সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রেও সেই সমস্ত এবং চন্দ্রের দৃশ্য অক্ষাংশ নির্ণয় করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও বলন, প্রদত্ত সময়ে গ্রহণগ্রস্ত অংশ ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হইবে।"

নীচে চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শ্লোকে বর্ণিত বিষয় দেওয়া গেল।

"প্রথমে গ্রহণের আদি ও অন্ত-সময়ের স্থূল পরিমাণ নির্ণয় করিয়া প্রয়োজন-মত লম্বন প্রয়োগ করিতে হইবে।

গ্রহণের আরম্ভে, সংযোগের সময় হইতে প্রথম স্থিতি-অর্ধ বিয়োগ করিয়া এবং গ্রহণের শেষে সংযোগ-সময়ের সহিত দ্বিতীয় স্থিতি-অর্ধ যোগ করিয়া ক্রমিক গণনা পদ্ধতি দ্বারা দ্রাঘিমাংশের লম্বন নির্ণয় কর।

সূর্য নবতিতম বিন্দুর পূর্বে থাকিলে এবং গ্রহণের আরম্ভে লম্বনের পরিমাণ গ্রহণের মধ্যকালের লম্বনের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইলে এবং গ্রহণের শেষে উহা কম হইলে, অথবা,

সূর্য নবতিতম বিন্দুর পশ্চিমে থাকিলে এবং গ্রহণের আরম্ভে লম্বনের পরিমাণ গ্রহণের মধ্যকালের লম্বনের পরিমাণ অপেক্ষা কম হইলে এবং গ্রহণের শেষে উহা বেশী হইলে,

গ্রহণের আরম্ভের এবং মধ্যকালের লম্বনের অন্তরকে প্রথম স্থিতি-অর্ধের সহিত এবং গ্রহণের শেষের ও মধ্যকালের লম্বনের অন্তরকে দ্বিতীয় স্থিতি-অর্ধের সহিত যোগ কর।

উহার বিপরীত হইলে বিয়োগ কর।

গ্রহণের আরম্ভ এবং মধ্য অথবা মধ্য এবং শেষ উভয় সময়েই সূর্য যদি নবতিতম বিন্দুর পূর্বে অথবা পশ্চিমে থাকে, তবে উপরোক্ত প্রকার হইবে। অন্যরূপ হইলে আরম্ভ ও মধ্যকালের অথবা মধ্যকালের ও অন্তের লম্বনের যোগফল প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থিতি-অর্ধের সহিত যোগ কর।"

এইভাবে দৃশ্য স্থিতিদ্বয় নির্ণয় করা যায় এবং এ থেকে সূর্যগ্রহণের আরম্ভ এবং শেষ নির্ণয় কর করা যায়।

অনুরূপভাবে মধ্য-অর্ধ নির্ণয় ক'রে পূর্ণসূর্যগ্রহণের আরম্ভ ও শেষ নির্ণয় করা যায়।

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রক্ষেপ

যে খ-পদার্থ গ্রহণগ্রস্ত হয়, তার কোন্ স্থানে গ্রহণ আরম্ভ হয় এবং কোন্ স্থানে গ্রহণ শেষ হয়, চিত্রের সাহায্যে সেটা দেখানোই প্রক্ষেপের উদ্দেশ্য।

সূর্যসিদ্ধান্তের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হয়েছে যে, প্রক্ষেপ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান যদি না থাকে, তা হলে গ্রহণের কলা বা স্তর বোঝা কঠিন।

চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের পূর্বপ্রান্ত প্রথমে পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে প্রবেশ ক'রে গ্রহণগ্রস্ত হয় এবং পশ্চিম প্রান্তে ছায়ামুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে।

সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের পশ্চিম প্রান্ত প্রথমে অন্ধকার হয়ে গ্রহণগ্রস্ত হয় এবং পূর্বপ্রান্ত হ'তে ছায়া অপসারিত হলে গ্রহণমুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে।

ভূ-কক্ষ অথবা সূর্যের আপাত গতির পথ প্রক্ষেপণের ফলে জ্যোতিষ্ক পদার্থের বিম্ব কোন্ সবলরেখা দ্বারা নির্দিষ্ট হবে তা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে প্রকৃত স্ফুট-বলন নির্ণয়ের যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ-স্থান থেকে এই সবল-রেখার দিক নির্দিষ্ট করা যায়।

যে বৃত্তে বলন চিহ্নিত করা হয়, নিম্নলিখিত শ্লোকে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

"চূন দ্বারা আচ্ছাদিত মেজেকে পানির সাহায্যে সমতল করিয়া তাহার উপর যে কোন একটি বিন্দু লও। সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ৪৯ অঙ্গুলি ব্যাসার্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত কর।

এইভাবে বারো অঙ্গুলি শঙ্কুর সাহায্যে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের ছায়া যেভাবে পরিমাপ করা হয়, প্রক্ষেপণেও ঠিক একইভাবে পরিমাপ করা হয়।

প্রথম বৃত্তের ব্যাসার্ধ শঙ্কুর চারগুণের সামান্য বেশী। এই ব্যাসার্ধের সাথে ভারতীয় কাল্পনিক ব্যাসার্ধ ৩৪৩৮ মিনিটের সম্বন্ধ আছে। এই দুইটি ব্যাসার্ধ সমান বলে মনে করা হয়। অতএব ঐ একই বৃত্তের জন্য যে অঙ্গুলি পরিমাণ গ্রহণ করা হয়, সেটি ৭০$\frac{২}{৬}$ মিনিট চাপের প্রায় সমান। একে ৭০ এই অখণ্ড সংখ্যার সমান বলে মনে করা হয়েছে।

গ্রহণের উপাদানসমূহ, যেমন চাঁদের অক্ষাংশ, ব্যাস, বলন, গ্রহণ-গ্রস্ত অংশ প্রভৃতি প্রথমে মিনিট চাপে লেখা হয়েছিল। এক্ষণে ৭০ দ্বারা ভাগ করে এগুলিকে অঙ্গুলিতে প্রকাশ করা যায়।

কিন্তু অঙ্গুলির কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ দেওয়া নাই। বিভিন্ন গ্রন্থে এর পরিমাপ বিভিন্ন।

এক অঙ্গুলিকে যদি ½ ইঞ্চি মনে করা যায়, তা হলে প্রথম বৃত্তের ব্যাসার্ধ হয় ৩৭ ইঞ্চি।

তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "একই বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ছাদ্য ও ছাদকের ব্যাসকলার সমষ্টির অর্ধেক ব্যাসার্ধ লইয়া একটি দ্বিতীয় বৃত্ত অঙ্কন কর।"

চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ছায়া ছাদক। চন্দ্রের গড় দূরত্বে এই ছায়ার ব্যাসকলার পরিমাণ প্রায় ৮২ মিনিট। চন্দ্র নিজে এক্ষেত্রে ছাদ্য। গড় দূরত্বে চন্দ্রের ব্যাসকলার পরিমাণ প্রায় ৩২ মিনিট।

অতএব যদি, D = পৃথিবীর ছায়ার ব্যাসকলা

এবং d = চন্দ্রের ব্যাসকলা হয়,

তা হলে দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \frac{D+d}{2} = \frac{82+32}{2} = 57$ মিনিট

তৃতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \frac{d}{2} = \frac{32}{2} = 16$ মিনিট

সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি প্রথম বৃত্তের ব্যাসার্ধের স্কেলে লওয়া হয়, তা হলে দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ হয় মাত্র ·৬ ইঞ্চি এবং তৃতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ হয় মাত্র ·১৭ ইঞ্চি।

অতএব দেখা যায় যে, তিনটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই স্কেলে লওয়া সম্ভব নয়। এতে মনে হয় যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ ভিন্ন স্কেলে নেওয়া হতো। কেবলমাত্র বলন-কোণ চিহ্নিত করার জন্যই প্রথম চিত্রটি ব্যবহার করা হতো, অর্থাৎ ভূ-কক্ষের দিক পূর্ব বা পশ্চিম রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে, মাত্র সেইটা নির্ণয় করবার জন্যই প্রথম বৃত্ত ব্যবহার করা হতো।

সূর্যসিদ্ধান্তে যেভাবে প্রক্ষেপণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ বলেই মনে হয়। কেবলমাত্র প্রক্ষেপণ দ্বারা গণনার কাজ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রহণ-দিন নির্ণয়ের জন্য সংখ্যাতত্ত্ব ও গণনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গ্রহণ গণনায় সূর্য, চন্দ্র ও চন্দ্রপাতের দ্রাঘিমাংশ, তাদের প্রকৃত দৈনিক গতি, গ্রহণের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে চন্দ্রের অক্ষাংশ ইত্যাদি সমস্তই সময়ের উপর নির্ভর করে। গ্রহণকালে চন্দ্র যে গতিতে ভূ-কক্ষ অতিক্রম করে, এই সংখ্যাগুলি তার উপরে নির্ভর করে এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে এদেরও পরিবর্তন হয়।

পরপৃষ্ঠার চিত্রে (চিত্র ৭৫) গভীর কালো দাগের তিনটি বৃত্ত, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোক অনুযায়ী গঠিত তিনটি বৃত্তের প্রক্ষেপ। এদের সাধারণ কেন্দ্র M, এক্ষেত্রে চন্দ্রের কেন্দ্র। তৃতীয় বৃত্ত চন্দ্রের বিম্ব।

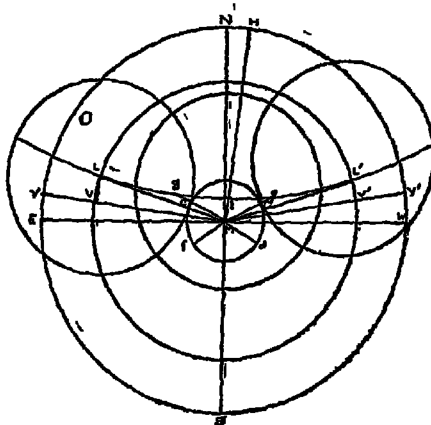
NS এবং EW, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম দিক নির্দেশক দুইটি সরলরেখা। MV এবং MV′ সরলরেখা দুইটি এমনভাবে টানা হয়েছে, যেন EMV এবং WMV′ কোণ দুইটি স্ফুট-বলনের সমান হয়। এই সরলরেখা দুইটি গ্রহণ-আরম্ভে ও শেষে ভূ-কক্ষের অবস্থান নির্দেশ করে এবং দ্বিতীয় বৃত্তকে V এবং V′ বিন্দুতে ছেদ করে।

গ্রহণ-আরম্ভে অর্থাৎ চন্দ্রবিম্ব যখন পৃথিবীর ছায়াকে স্পর্শ করে, তখন চন্দ্রের অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয় এবং এই অক্ষাংশ-কলার সমান ক'রে V থেকে VL লম্ব টানা হয়।

এখন L-কে কেন্দ্র ক'রে এবং পৃথিবীর ছায়ার ব্যাসকলার অর্ধেক ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকা হলে, সেই বৃত্ত তৃতীয় বৃত্তকে C বিন্দুতে স্পর্শ করে। এই বিন্দুটি গ্রহণের সময় চন্দ্রবিম্ব স্পর্শের প্রথম বিন্দু। অনুরূপভাবে চন্দ্রবিম্বে গ্রহণের শেষ বিন্দুও নির্ণয় করা যায়। গ্রহণ-শেষে চন্দ্রের অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয়। এবং ঐ অক্ষাংশ কলার সমান L′V′ একটি লম্ব টানা হয়। L′-কে কেন্দ্র ক'রে এবং পৃথিবীর ছায়ার ব্যাস-

কলার অর্ধেক ব্যাসার্ধ নিয়ে অঙ্কিত বৃত্ত তৃতীয় বৃত্তকে C′ বিন্দুতে স্পর্শ করে। এই বিন্দুই চন্দ্রবিম্বে গ্রহণের শেষ স্পর্শবিন্দু।

প্রতিযোগের সময় গ্রহণ-মধ্য নির্ণয় করার জন্য উত্তর-দক্ষিণ সরল-রেখার যে কোন প্রান্ত হ'তে বলনচিহ্নিত করতে হয়। NS সরল-রেখার সাথে বলনের সমান কোণ আঁকবার বিষয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা আছে। চিত্রে একে MN দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এই সরলরেখাটি পূর্ণিমার সময়ে ভূ-কক্ষের উপর লম্ব। চন্দ্রের অক্ষাংশ নির্ণয় ক'রে এই সরলরেখার উপর স্থাপন করা হয় (চিত্রে IM বলা হয়েছে)। তা হলে ভূ-কক্ষের উপরে I বিন্দুটিই পৃথিবীর ছায়ার অবস্থান। ঐ বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে এবং পৃথিবীর ছায়ার ব্যাসকলার অর্ধেক ব্যাসার্ধ নিয়ে অঙ্কিত বৃত্ত চন্দ্রবিম্বকে যতটা আবৃত করে, তা-ই চন্দ্রের গ্রহণগ্রস্ত অংশের সমান।



রেখাচিত্র ৭৫ঃ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের প্রক্ষেপ

প্রক্ষেপণে যদি চন্দ্রবিম্বকে স্থির মনে করা যায়, তা হ'লে L, I, L′ এই তিনটি বিন্দু দ্বারা অঙ্কিত বৃত্ত পৃথিবীর ছায়ার আপেক্ষিক কক্ষ। এই বৃত্তের উপরে যে কোন একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এবং ছায়ার

ব্যাসকলার অর্ধেকের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে অঙ্কিত বৃত্ত, চন্দ্রবিম্বের যে অংশ ছেদ করবে, সেইটাই ঐ সময়ের গ্রহণগ্রস্ত অংশ।

পূর্ণচন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে চন্দ্রবিম্বের যে স্থানে পূর্ণ অন্ধকার আরম্ভ হয়, তা' নির্ণয় করবার জন্য চন্দ্রের ও পৃথিবীর ছায়ার ব্যাসকলার অর্ধেকের সমান একটি সরলরেখা, সাধারণ কেন্দ্র M থেকে আঁকতে হয়; এই সরলরেখার একটি প্রান্ত ছায়ার কেন্দ্রপথ LIL'-এর উপরে যে কোন এক G বিন্দুতে পড়ে। এই সরলরেখাটিকে বিপরীত দিকে বাড়িয়ে দিলে চন্দ্রবিম্বকে যে একটি d বিন্দুতে ছেদ করবে, এই বিন্দু থেকেই পূর্ণ অন্ধকার আরম্ভ হয়।

অনুরূপভাবে, M থেকে $\frac{D-d}{2}$ এর সমান আর একটি সরলরেখা যদি ছায়ার কেন্দ্রপথ LIL'-কে অন্য একটি বিন্দু E-তে ছেদ করে এবং ঐ সরলরেখাটিকে বিপরীত দিকে বাড়িয়ে দিলে যদি চন্দ্রবিম্বকে f বিন্দুতে ছেদ করে, তা হ'লে ঐ f বিন্দুতে পূর্ণ অন্ধকার শেষ হয়।

চন্দ্রগ্রহণ প্রক্ষেপণ পদ্ধতি সামান্য পরিবর্তন করবার পর সূর্যগ্রহণ প্রক্ষেপণও ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষেত্রে উপরের চিত্রের LIL' বৃত্তটি চন্দ্র-কেন্দ্রের আপাত গতিপথ; এখানে সূর্যবিম্বকে স্থির মনে করতে হয়। সূর্যবিম্বই তৃতীয় বৃত্ত এবং এর ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসকলার অর্ধেকের সমান। দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধেরও পরিবর্তন হয়। এখানে চন্দ্রবিম্ব ছাদক এবং সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাসকলার সমষ্টির অর্ধেক দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান।

গ্রহণযোগ বা গ্রহণযুতি

সূর্যসিদ্ধান্তের সপ্তম অধ্যায়ে গ্রহসমূহের একত্র সমাবেশ বা গ্রহ-সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এইরূপ সমাবেশকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় গ্রহযুতি বলে। এই সমাবেশের ফলে বিকীর্ণ আলোর

পরিমাণ অনুযায়ী কোন সময় একে গ্রহসংগ্রাম, আবার কোন সময় গ্রহমিলনও বলে।

কোন এক গ্রহের গতি যদি অন্য কোন গ্রহের গতি অপেক্ষা বেশী হয়, তা হ'লে অতীতে কোন্ সময় তাদের সংযোগ হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেই বা কোন্ সময়ে তাদের সংযোগ হবে, তা নির্ণয় করবার পদ্ধতি দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া উভয় গতিই যদি সরল বা পূর্বমুখী হয়, অথবা একটির গতি সরল এবং অপরটির গতি বক্র হয়, অথবা উভয় গতিই যদি বক্র হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সংযোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিও এই একই শ্লোকে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্লোকে সংযোগের নিকটবর্তী এমন একটি সময়ের কল্পনা করা হয়েছে, যখন উভয় গ্রহই সমগতিতে গতিশীল থাকে।

মনে কর, কোন এক সময়ে A এবং B দুইটি গ্রহের অক্ষাংশ প্রায় সমান এবং তাদের দ্রাঘিমাংশ যথাক্রমে l_1 ও l_2, এবং ঐ সময়ে তাদের দৈনিক গতি যথাক্রমে m_1 এবং m_2 ; আরো মনে কর যে, m_2 থেকে m_1 বড়। যদি উভয় গ্রহের গতিই সরল বা পূর্বমুখী হয় এবং d দিন পরে যদি তাদের সাধারণ দ্রাঘিমাংশ l হয়, তা হলে, পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ সংযোগের জন্য গ্রহ দুইটির দ্রাঘিমাংশের সাথে যথাক্রমে, $\frac{m_1(l_2-l_1)}{m_1-m_2}$ ও $\frac{m_2(l_2-l_1)}{m_1-m_2}$ যোগ করতে হয়। এই সংখ্যা দুইটিকে গ্রহ পরিবর্তন বলে।

$$\text{অতএব } l = l_1 + \frac{m_1(l_2-l_1)}{m_1-m_2}$$

$$= l_2 + \frac{m_2(l_2-l_1)}{m_1-m_2}$$

$$= \frac{m_1 l_2 - m_2 l_1}{m_1-m_2}$$

সুতরাং প্রদত্ত দিন থেকে $d=\frac{l_2-l_1}{m_1-m_2}$ দিন পরে গ্রহ দুইটির সংযোগ হবে। শ্লোকের সাহায্যে ষষ্ঠ শ্লোকে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

গ্রহ দুইটির অক্ষাংশ যদি সমান না হয়, অর্থাৎ তাদের অক্ষাংশের পার্থক্য যদি উপেক্ষণীয় না হয়, তাহলে কিভাবে সংযোগ নির্ণয় করতে হয়, সপ্তম শ্লোকে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

রাশিচক্রের যে বিন্দু গ্রহের সাথে পূর্বদিকে উদিত হয় (গ্রহলগ্ন) তা নির্ণয়ের জন্য দৃকক্রম নামে এক প্রকার বিশুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন। এই বিশুদ্ধি দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশের নাম অয়ন-দৃকক্রম এবং অন্য অংশের নাম অক্ষ-দৃকক্রম।

বিভিন্ন গ্রন্থে এই দৃকক্রম নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। অক্ষ-দৃকক্রম নির্ণয় সম্বন্ধে সূর্যসিদ্ধান্তে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

"গ্রহের অক্ষাংশকে বিষুবন-ছায়া দিয়া গুণ কর এবং গুণফলকে ১২ দিয়া ভাগ কর। মধ্যাহ্ন হইতে গ্রহ-স্থানের সময়কে ঘটিকা-এককে পরিণত করিয়া পূর্বোক্ত ভাগফলকে গুণ কর। এই গুণফলকে গ্রহ-স্থানের দিবার দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দ্বারা ভাগ করিলে অক্ষ-দৃকক্রম বিশুদ্ধি পাওয়া যায়।

গ্রহের অক্ষাংশ উত্তর হইলে এবং গ্রহ-স্থান মধ্যরেখা হইতে পূর্বে হইলে, এই বিশুদ্ধি গ্রহ-স্থান হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। গ্রহের অক্ষাংশ দক্ষিণ হইলে এই বিশুদ্ধি যোগ করিতে হইবে।"

অয়ন-দৃকক্রম বিশুদ্ধি নির্ণয় পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে,

"গ্রহ-স্থানের সহিত তিনরাশি যোগ কর এবং যোগফল হইতে নতি নির্ণয় কর। গ্রহ-অক্ষাংশে যত মিনিট আছে, তাহাকে নতিতে যত ডিগ্রী আছে তাহা দ্বারা গুণ করিলে দ্বিতীয় বিশুদ্ধি পাওয়া যায়। এই বিশুদ্ধিকে অয়ন-দৃকক্রম বলে।

গ্রহের অক্ষাংশ এবং নতি একই চিহ্নের হইলে, গ্রহ-স্থানের সহিত অয়ন-বিশুদ্ধি যোগ করিতে হইবে এবং বিপরীত চিহ্নের হইলে বিয়োগ করিতে হইবে।"

যে দুইটি শ্লোকে এই দুই বিশুদ্ধি-নির্ণয়পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথম পরিবর্তনের পর থেকে তাদের অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। ভাস্করাচার্য তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'তে গ্রহে রাশিচক্রে গ্রহের স্থানের (অর্থাৎ গ্রহের দ্রাঘিমাংশের) উদয়-সময়ের পার্থক্য নির্ণয়ের পদ্ধতি দিয়েছেন। এই পার্থক্যও অক্ষ ও অয়ন-দৃকক্রম বিশুদ্ধি থেকে নির্ণয় করা হয়।

মনে কর, θ = অয়ন দৃকক্রম

φ = অক্ষ দৃকক্রম

λ = গ্রহের অক্ষাংশ

λ' = গ্রহের স্পষ্ট সার (বিশোধিত অক্ষাংশ)

l = পর্যবেক্ষণ স্থানের অক্ষাংশ

d = গ্রহের নতি

তা হলে, ভাস্করের মতে, নিম্নলিখিত সূত্রে দৃকক্রম নির্ণীত হয়।

$$\sin\theta = \frac{\sin\lambda}{\cos d} \times \text{অয়ন বলনের সাইন।}$$

$$\sin\varphi = \frac{R\sin\lambda'}{\cos d\cos l} \times \text{অক্ষ বলনের সাইন।}$$

পরপৃষ্ঠার চিত্রের (চিত্র ৭৬) সাহায্যে উপরোক্ত সূত্র প্রমাণ করা যায়। মনে কর পূর্বের গোলার্ধের বৃত্তসমূহের মধ্যরেখার উপর প্রক্ষেপে,

Z = স্থু-বিন্দু

HEN = দিগন্ত

P = উত্তরবিন্দু

PEF = খ-বিষুব

E = পূর্ববিন্দু

S = একটি তারা বা গ্রহ

MSσM' = S-এর দৈনিক ভ্রমণ-বৃত্ত

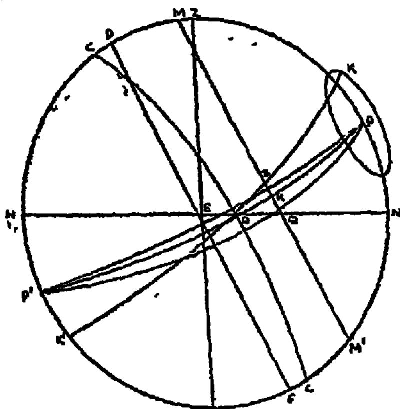
KSOK' = S এর অক্ষবৃত্ত

O = S-এর অক্ষবৃত্ত ও রাশিচক্রে ছেদবিন্দু

COC′ = ভূ-কক্ষ বা রাশিচক্র

K = রাশিচক্রের মেরু

তা হলে দেখা যায় যে, O বিন্দু রাশিচক্রের উপরে S এর দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করে এবং OS তার অক্ষাংশ λ নির্দেশ করে। যদি গ্রহটি দিগন্তের উপরে OS পর্যন্ত ওঠে, তা হলে দিগন্তের উপর অবস্থিত হয়।



রেখাচিত্র ৭৬ : গ্রহযুতি নির্ণয়

এই সময়ে বিষুবমেরু P থেকে যদি O, S এবং Q দিয়ে একটি বৃহৎ বৃত্ত আঁকা যায়, তা হলে,

∠PON = অক্ষ-বলন

এবং ∠KOP = অয়ন-বলন।

গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী এই দুই অয়নের যোগ বা বিয়োগফলই প্রকৃত বলন।

এক্ষণে Q থেকে S পর্যন্ত যেতে, যদি PS কোণটিকে সময়ে পরিবর্তিত করা হয়, তাতে যে সময় পাওয়া যায়, তত সময় দরকার হয়। এই কোণ দুই অংশে বিভক্ত—SPO′ এবং OPQ; এই দুইটি কোণকেই যথাক্রমে θ ও φ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

SPO গোলকীয় ত্রিভুজে,

$$\frac{\sin SPO}{\sin SOP}=\frac{\sin SO}{\sin SP}$$

কিন্তু, $OS=\lambda$ গ্রহের অক্ষাংশ,

$SP=$ সহ-নতি $=90-d$

এবং $\angle SOP=$ অয়ন-বলন

$$\therefore \sin\theta=\frac{\sin\lambda}{\cos d}\times \text{অয়ন-বলনের সাইন } \varphi \quad \cdots \quad (১)$$

আবার SOQ গোলকীয় ত্রিভুজে,

$$\frac{\sin RQ}{\sin OR}=\frac{\sin ROQ}{\sin OQR}$$

কিন্তু, $OR=$ বিশোধিত অক্ষাংশ λ'

$\angle OQR=\angle HED$ (প্রায়) $=90-l$

$\angle ROQ=$ অক্ষ-বলন

$$\therefore \sin QR=\frac{\sin\lambda'}{\cos l}\times \text{অক্ষ-বলনেব সাইন} \quad \cdots \quad (২)$$

OR চাপের অনুরূপ খ-বিষুবের চাপ $\angle OPQ=\varphi$ দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

$$\text{এবং } \sin\varphi=\frac{\sin QR}{\cos d} \quad \cdots \quad \cdots \quad (৩)$$

এই সূত্র থেকে φ নির্ণয় করা যায়।

(২) থেকে প্রাপ্ত sin QR এর মান (৩)-এ বসালে,

$$\sin\varphi=\frac{R\sin\lambda'}{\cos l\cos d}\times \text{অক্ষ-বলনেব সাইন} \quad \cdots \quad \cdots \quad (৪)$$

(১) এবং (৪) থেকে θ এবং φ-এর মান নির্ণয় করা যেতে পারে।

গ্রহ এবং তারার সংযোগেও দৃকক্রম-বিশুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অক্ষাংশের পার্থক্য এত বেশী যে, তা' উপেক্ষা করা যায় না। চন্দ্রকলা নির্ণয়েও এই দৃকক্রম-বিশুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়।

দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, গ্রহসংযোগ-সময়ে এই বিশুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়। দুইটি সংযুক্ত গ্রহের সাধারণ দ্রাঘিমাংশ এবং তাদের সংযোগ-সময় ষষ্ঠ শ্লোক অনুসারে নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ত্রয়োদশ শ্লোকে মঙ্গল, শনি, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের আপাত ব্যাস দেওয়া হয়েছে। এইগুলি যথাক্রমে ৩০, ৩৭½, ৪৫, ৫২½ এবং ৬০ যোজন।

চতুর্দশ শ্লোকে গ্রহসমূহের ব্যাস মিনিটে দেওয়া হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে ২, ২½, ৩, ৩½, এবং ৪ মিনিট।

পঞ্চদশ শ্লোকে দর্পণের প্রতিফলনের সাহায্যে কোন উজ্জ্বল তারা বা গ্রহ পর্যবেক্ষণের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। "একটি সমতল মেজের উপর একটি শঙ্কু স্থাপন করিয়া মেজেতে ইহার দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। ছায়া-চিহ্নের শেষ প্রান্তে একখানি দর্পণ স্থাপন করিয়া ছায়ার প্রান্ত এবং শঙ্কুর প্রতিফলিত প্রান্ত দ্বারা গঠিত সরলরেখার দিকেই তারাটির প্রতি-ফলন দেখা যাইবে"।

ষোড়দশ ও সপ্তদশ শ্লোকে সংযোগের সময়ে দুইটি গ্রহের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

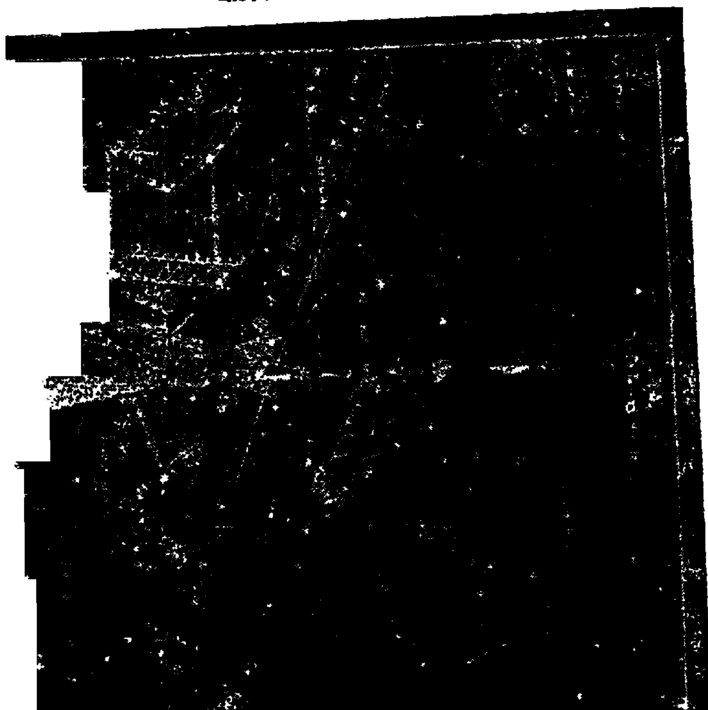
ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় তারা ও তারামণ্ডলসমূহ

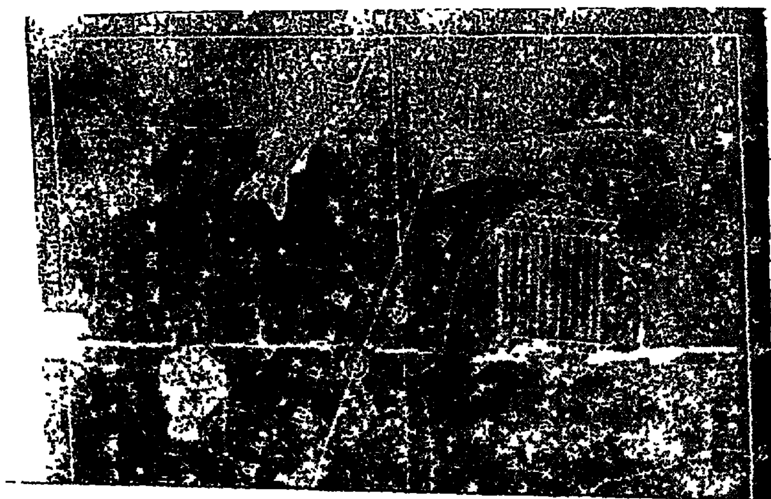
প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ আকাশের সমস্ত তারার নামকরণ করেন নাই। কিন্তু রাশিচক্র ও নক্ষত্রসমূহ ছাড়া অন্যান্য কয়েক জায়গার তারার নাম বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে ধ্রুব (Polaris), ব্রহ্মহৃদয় (Capella), অগ্নি (Alnath), অগস্ত্য (Canopus), লুব্ধক (Sirius) ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

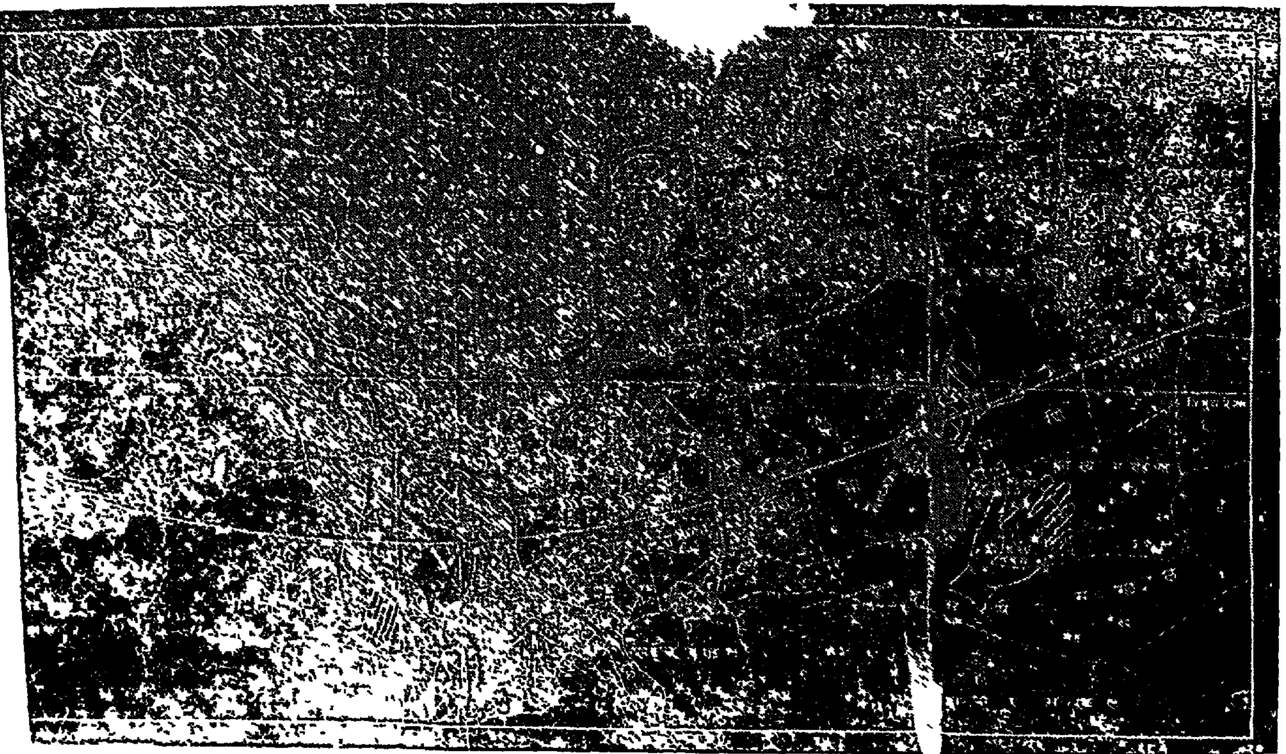
পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য মণ্ডলগুলিকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় গ্রহণ করা হয়। মণ্ডলগুলির নাম অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় নামে পরিবর্তন করা হয়েছে; তবে সেগুলির সীমা, তারাসংখ্যা ইত্যাদি থেকে বিশেষভাবে বোঝা যায় যে, সেগুলি পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা থেকে গৃহীত। নীচে কতকগুলি মণ্ডলের ভারতীয় নাম, তাদের ভারতীয় ছবি এবং তারাসমূহের ভারতীয় নাম দেওয়া গেল। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ—বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির যে সমস্ত শ্লোক এই তারাদের বর্ণনা দিয়েছে, তার দুই-একটি উদ্ধৃতিও দেয়া গেল। (চিত্র ৭৭ দ্রঃ)

পরশুমণ্ডল (Perseus)

ধ্বনিগত সামঞ্জস্য থেকেই বোঝা যায় যে, পরশু নামটি পাশ্চাত্য পারসিউস থেকে নেওয়া। পাশ্চাত্য ছবিকেও এখানে ভারতীয় পুরাণের মতে পরিবর্তন করা হয়েছে। পারসিউসের হাতের তরবারি







রেখাচিত্র ৭৮ : ভারতীয় তারাচিত্র (২)। [পৃষ্ঠা ৫৮৩]

পরশুরামের হাতের কুঠারে পরিণত করা হয়েছে এবং তার অন্য হাতে মেডুসার মাথা কোনো ক্ষত্রিয়ের মাথাতে পরিণত করা হয়েছে।

আধুনিক তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Mirfak	কুঠারপৃষ্ঠ
β	Algol	মায়াবতী
ρ	Caput Meduci	রেণুকা

মেষরাশি (Aries)

নামটি যদিও পাশ্চাত্য নামের অনুবাদ, কিন্তু এখানে ভারতীয় চিত্রে কোন মেষের ছবি দেখা যায় না। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে যে তিনটি তারার সাহায্যে ভেড়ার মাথার কল্পনা করা হয়, ভারতীয় তারাচিত্রে সেখানে অশ্বিনী নক্ষত্রের ঘোড়ার মুখ দেখা যায়। এই তিনটি তারা সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থে বলা হয়েছে, "ঘোটক মুখাকৃতি তারাত্রয়াত্মক"। 'রাশিনিরূপণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "অশ্বী ঘোটক মুখাকৃতি ত্রিভে"। মেষের লেজের তিনটি তারায় ভরণী নক্ষত্র। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এখানে যোনীর কল্পনা করা হয়। এই তিনটি তারা সম্বন্ধে কালিদাস বলেছেন, "তারকাত্রয়মিতে ত্রিকোণকে"।

আধুনিক তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Hamnal	অমল	ধ্বনিগত সামঞ্জস্য লক্ষণীয়
β	Sheratan	শিবত্রাণ	"
γ	Mesarthim	মুখরশ্মি	"

তিমিমণ্ডল (Cetus)

এই মণ্ডলের ভারতীয় নাম যদিও তিমি, কিন্তু ছবিতে তিমির কোন চিহ্ন দেখা যায় না। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে সমুদ্রদৈত্য সিটাসের ছবির কল্পনা করা হয়। এই জল-দৈত্যের মুখ পূর্বদিকে; মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হতে দেখা যায়। ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে

মানুষের মাথাযুক্ত একটি মাছের ছবি দেখা যায়। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, "পতিতং তত্রচ এক একঃ মৎস্যঃ জগ্রাহ বালকম্।"

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Menkar	মীনকেতন	তারাটি মানুষের মাথায় চোখের তারা। আরবী শব্দের অর্থ ঠোঁট। ধ্বনি-গত সামঞ্জস্য কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।
β	Deneb Kaitos	মীন পুচ্ছ	আরবী শব্দের অর্থ সিটাসের লেজ; ভারতীয় অর্থও মাছের লেজ।
O	Mira	ম্যান	

ব্রহ্মমণ্ডল (Auriga)

এই মণ্ডলের নামে বা ছবিতে কোথাও পাশ্চাত্য ছবি বা নামের মিল নাই। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে ছাগশিশু কাঁধে একজন সারথীর ছবি দেখা যায়। ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে চতুর্মুখ ব্রহ্মার কল্পনা করা হয়ে থাকে। ε, η এবং ζ তারা তিনটি দিয়ে পাশ্চাত্য চিত্রে ছাগশিশু দেখানো হয়; ভারতীয় তারাচিত্রে এই তিনটি তারা দিয়ে সার্থকভাবেই একটি তীরের কল্পনা করা হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় 'রামবাণ'। বাল্মীকির রামায়ণে এই মণ্ডল সম্বন্ধে লেখা আছে, "ব্রহ্মরাশিবিশুদ্ধশ্চ"।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Capella	ব্রহ্মহৃদয়	ব্রহ্মার বাম বুকের তারা
β	Menkalinan	উরঃ	ব্রহ্মার ডান বুকের তারা
δ	—	প্রজাপতি	সামনের মাথার কপালের তারা

বৃষরাশি (Taures)

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় বৃষের কোন কল্পনা দেখা যায় না। কৃত্তিকা নক্ষত্রের ছয়টি তারা দিয়ে যেখানে পাশ্চাত্য তারাচিত্রে বৃষের কুঁজের কল্পনা করা হয়, প্রাচীন ভারতীয় তারাচিত্রে সেই ছয়টি তারা দিয়ে আগুনের শিখা ("অগ্নিশিখাকৃতি ষটতারকাময়ং"—কালিদাস) বা ক্ষুরের ("ক্ষুরনিভ ষটতারকাময়ং"—কোচিন) কল্পনা করা হয়েছে। আবার রোহিণী নক্ষত্রের তারাসমূহ দিয়ে পাশ্চাত্য তারাচিত্রে যেখানে ষাঁড়ের মুখ ও চোখের কল্পনা করা হয়, প্রাচীন ভারতীয় তারাচিত্রে সেখানে একটি গাড়ীর ("শকুলাকৃতি পঞ্চ-তারকাত্মক"—কালিদাস, "শকট-সম"—জ্যোতিষ-সারম) কল্পনা করা হয়েছে।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Aldebaran	হলদীবরণ	ধ্বনিগত সামঞ্জস্য লক্ষ্যণীয়
β	Alnath	অগ্নি	
ζ	—	স্বাহা	
η	Alcyone	দেবসেনা	
γ	—	শকটমুখ	
20	Maya	সন্তৃতি	
19	Taygete	অনুসূয়া	
16	Caeleno	সন্নতি	
17	Electre	লজ্জা	
23	Merope	প্রীতি	
27	Atlas	উমা	
28	Plecione	বিনতা	
MI	Crab nebula	পূতনা	

সুবর্ণাশ্রমমণ্ডল (Dorado)

ডোরাডো অর্থ তরবারি মাছ। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এখানে একটি আশ্রমের ভিতরে একটি মেয়ের কল্পনা করা হয়।

"ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবৎজগাম্।
দিশং স যামী সহসান্তরীক্ষং॥
তত্রাশ্রমং রম্যতরং হি কৃত্বা।
সংশুদ্ধ জাম্বুনদ তীবণাস্তং॥
তত্রাথ নিক্ষিপ্য বিদর্ভপুত্রী।
খমাশ্রমং সৌম্যমুপাজগাম।"—ব্রাহ্মণ পুরাণম্

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	—	লোপামুদ্রা

মিথুন রাশি (Gemini)

এই রাশিটির ভারতীয় নাম মিথুন হলেও প্রাচীন ভারতীয় তারাচিত্রে কোন যুগলমূর্তি এখানে দেখা যায় না। পুনর্বসু নক্ষত্রে একটি ধনুর্চাপের ছবি দেখা যায়।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Castor	বিষ্ণুতারা
β	Pollux	সোমতারা
γ	Alhena	হলবলা
χ	—	অনল
δ	Wasat	অনিল

কালপুরুষমণ্ডল (Orion)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে গদা হাতে একজন মানুষের ছবি দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে একটি হরিণের

ছবি দেখা যায়। "প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মেয়ের প্রতি আসক্ত হন এবং তাকে রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন দেবতারা নিজেদের ঘোরতম অংশ একত্রিত ক'রে ভূতবাণের সৃষ্টি করেন। সেই ভূতবাণ প্রজাপতির অকৃতকে শরবিদ্ধ ক'রে আকাশে গমন করেন। লোকে প্রজাপতিকে মৃগ ও ভূতবাণকে মৃগব্যাধ বলে। প্রজাপতি দুহিতা রোহিতা নামক মৃগে রূপান্তরিত হন, আকাশে যেয়ে তিনি রোহিণী নক্ষত্র হন।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। আবার, "যখন প্রজাপতি কামুক হইয়া স্বীয় দুহিতার প্রতি কামনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন দুহিতা লজ্জা-বশতঃ মৃগীরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।"—মহিম্নস্তোত্র। সেই মৃগরূপী ব্রহ্মা রুদ্র কর্তৃক শরবিদ্ধ হয়ে আকাশে মৃগরূপে বিরাজ করছে। আর্দ্রা তারাই সেই শর।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Betelgeux	আর্দ্রা (বিশাখা নক্ষত্রের যোগতারা)
β	Rigel	বাণরাজা
γ	Bellatrix	কার্তিকেয়
δ	Mintaka	চিত্রলেখা
ϵ	Alnilam	অনিরুদ্ধ
ζ	Alnitak	উষা
λ	Heka	এনক

মৃগব্যাধ মণ্ডল (Canis Major)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে একটি কুকুরের ছবি দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় তারাচিত্রে একজন শিকারীকে (ভূতবাণ, রুদ্র) মৃগরূপী কালপুরুষ বা ব্রহ্মার প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে দেখা যায়।

"য উ এব মৃগব্যাধঃ স উ এব সঃ"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্‌,
"ধনুষ্পানের্ঘাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
এসন্তং তেহদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ"—শিবপুরাণম্‌,

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Sirius	লুব্ধক	এ তারাটিকে 'শ্বা'-ও বলা হয়ে থাকে। শ্বা অর্থ শিকারী কুকুর।

অর্ণবযান মণ্ডল (Argonavis)

অর্ণবযান নামটি পাশ্চাত্য আর্গোনভিসেরই প্রতিশব্দ। এ নামটি যে পাশ্চাত্য জ্যোতিবিদ্যা থেকে লওয়া সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভারতীয় তারাচিত্রেও এখানে একখানা নৌযানেরই কল্পনা করা হয়ে থাকে।

"হিরণ্যয়ী নৌ অচরাৎ হিরণ্যবন্ধনা দিবি
তত্র অমৃতস্য পুষ্পং দেবাঃ কুষ্ঠং অবন্বত।"—অথর্ববেদ

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Canopus	অগস্ত্য
η	—	মারীচ

কর্কটরাশি (Cancer)

পাশ্চাত্য নাম অনুসারে এই রাশিটির ভারতীয় নাম যদিও কর্কট, কিন্তু নামের সঙ্গে ছবির কোন মিল দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে একটি বাণের ছবি দেখা যায়।

"বাণাকারৈক তারাত্মকং"—জ্যোতিষং

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Al-Hammarin	তোমর
β	South Aselus	গর্দভ
γ	North Aselus	খর
δ	—	সুমিত্রা
ζ	—	পুষ্যা
M44	Praesepe	মধুচক্র

শুনীমণ্ডল (Canis Minor)

ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে কোন ছবি দেখা যায় না। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে একটি ছোট কুকুরের ছবি দেখা যায়।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Procyon	প্রভাস	এই তারাটিকে প্রশ্বাও বলা হয়। লুব্ধক শ্বা—অর্থাৎ বড় কুকুর এবং এই তারাটি প্রশ্বা অর্থাৎ ছোট কুকুর। এই দুইটি তারা যমের দক্ষিণ দুয়ারে পাহারা দেয়।
β	Gomeisa	প্রত্যুষ	

সিংহরাশি (Leo)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে যেখানে সিংহের মাথা ও সামনের অংশ দেখা যায়, ভারতীয় তারাচিত্রে সেখানে লাঙ্গলের কল্পনা করা হয়। 'লাঙ্গলাকৃতিনি পঞ্চতারকে'—কালিদাস। আর পাশ্চাত্য চিত্রে যেখানে সিংহের পিছনের অংশ দেখা যায়, ভারতীয় তারাচিত্রে সেখানে দেখা যায় একটি ফুলগাছ। 'খট্বাকৃতি তারকাদ্বয়াত্মকং'—মুহূর্ত চিন্তামণি।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Regulus	মঘা
β	Denebola	উত্তরফাল্গুনী
γ	Algiba	সিংহ ককুদ
δ	Zosma	পূর্বফাল্গুনী
θ	Subra	অর্জুন
ζ	—	কেশর
μ	Rasalas	মণি

হ্রদসর্প মণ্ডল (Hydra)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রের মত ভারতীয় তারাচিত্রেও এখানে একটি সাপের কল্পনা করা হয়।

"নাত্র স্থেয়ং সর্প কদাচিৎ যমুনাজলে
স ভৃত্য পরিবারস্থং সমুদ্রসলিলং ব্রজ"—বিষ্ণুপুরাণম্‌.

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Alphard	কালিয়
β	—	শেষ
ζ	—	বাসুকী

সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে একটা বড় ভালুকের ছবি দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে একটি 'চিত্রশিখণ্ডী'র (ময়ূরের) কল্পনা করা হয়ে থাকে।

'সপ্তর্ষয়ো মরীচ্যত্রিমুখাঃ চিত্রশিখণ্ডিন'—অমর কোষ
'স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচিরঙ্গিরা অত্রিঃ পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু
সারুন্ধতী বশিষ্ঠশ্চ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ'—শ্রীভাগবতম্‌.

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Dhube	ক্রতু
β	Mirak	পুলহ
γ	Phecda	পুলস্ত্য
δ	Megrez	অত্রি
ε	Alioth	অঙ্গিরা
η	Benetnasch	মরীচি
ζ	Mizar	বশিষ্ঠ
20	Alcor	অরুন্ধতী

সারমেয় যুগল (Canes Venatici)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে দুইটি শিকারী কুকুরের ছবি দেখা যায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাতেও একই অর্থে এই মণ্ডলের নামকরণ করা হয়েছে।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Cor Corroli	জ্যেষ্ঠ কালকঞ্জ
β	—	কনিষ্ঠ কালকঞ্জ

কন্যারাশি (Virgo)

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় তারাচিত্রেই এখানে একটি মেয়ের ছবির কল্পনা করা হয়। তবে পাশ্চাত্য তারাচিত্রে মেয়েটির মাথা পশ্চিমে সিংহরাশির দিকে এবং পা পূর্বদিকে তুলারাশির দণ্ডের উপরে। আর ভারতীয় তারাচিত্রে মেয়েটির মাথা পূর্বদিকে তুলারাশির দিকে এবং পা পশ্চিমে সিংহরাশির দিকে একখানা নৌকার উপরে। উভয় তারাচিত্রেই কন্যার হাতে ধানের শীষ দেখা যায়।

"জলে নৌকাস্থ শস্যাগ্রধারিণী স্ত্রী"—দীপিকা

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Spica	চিত্রা	
β	Zavijava	জপজপা	ধ্বনিগত সামঞ্জস্য
γ	Porrima	নাভিতারা	
ϵ	Vendimiatrix	দ্রাক্ষাহরণী	
η	Zewia	জানু	
ι	Syrma	শ্রীমাতা	ধ্বনিগত সামঞ্জস্য লক্ষণীয়
θ	—	অপাংবৎস	
ν	—	দ্রুপদ	

করতল মণ্ডল (Corvus)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে একটি কাকের ছবি দেখা যায়। ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে একখানি করতলের ছবি দেখা যায়।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Alchiba	কনিষ্ঠা
β	—	মণিবন্ধ
γ	—	তর্জনী
δ	Algorab	অঙ্গুষ্ঠ
ϵ	—	অনামিকা

ত্রিশঙ্কু মণ্ডল (Crux)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে একটি ক্রশের ছবি দেখা যায়। ভারতীয় তারাচিত্রে একটি ত্রিশূলের কল্পনা করা হয়ে থাকে।

"ত্রিশঙ্কুবিমলো ভাতি রাজর্ষি সন্তবোহিত :"—রামায়ণম্,

"অবাকশিরা ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠত্বমরসন্নিভ :"—রামায়ণম্,

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	—	বিশ্বামিত্র

শিশুমার মণ্ডল (Ursa Minor)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে একটি ছোট ভালুকের ছবি দেখা যায়। এই ভালুকটির লেজের শেষে ধ্রুবতারা অবস্থিত। ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে একটি শিশুকের ছবির কল্পনা করা হয়ে থাকে। এই শিশুকের পিছনের পায়ের একটি তারাই ধ্রুবতারা।

"তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ
দিবিরূপং হরের্যত্তু তস্যপুচ্ছেস্থিতোধ্রুবঃ।" —বিষ্ণুপুরাণম্

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Polaris	ধ্রুব
β	Kochab	প্লবঙ্গ

ভূতেশ মণ্ডল (Bootes)

ভূতেশ নামটি যে পাশ্চাত্য বুটিস থেকে নেওয়া এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে ভূতনাথ শিবকে তাণ্ডব-নৃত্য করতে দেখা যায়। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে একজন গো পালকের ছবি দেখা যায়। (চিত্র ৭৮ দ্রঃ)

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Arcturus	স্বাতী

তুলারাশি (Libra)

উভয় তারাচিত্রেই এখানে তুলাদণ্ডের কল্পনা করা হয়ে থাকে। তবে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় তুলাদণ্ডের ভিতরে কিছুটা পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে সূর্যপথ দক্ষিণের পাল্লার উপর দিয়ে গিয়েছে, আর ভারতীয়

তারাচিত্রে সূর্যপথ দুইটি পাল্লার মাঝখান দিয়ে গিয়ে তুলাদণ্ডকে দুই সমান ভাগে ভাগ করেছে। 'রাত্রিলগ্ন নিরূপণম্' গ্রন্থে এখানে একটি তোরণের কল্পনা করা হয়েছে।

"তোরণাকৃতি পঞ্চতারকে"—রাত্রিলগ্ন নিরূপণম্

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Zubenel Genubi	যাম্যকীলক বা বিশাখা
β	Zubenel Chameli	সৌম্যকীলক
20	Hakrabi	তড়িত

মহিষাসুর মণ্ডল (Centaurus)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে সেণ্টর (অশ্বদেহে নরমস্তকধারী)-এর ছবি দেওয়া হয়। একে ভারতীয় রূপ দিয়ে মহিষাসুরের (মহিষের দেহে নরমুণ্ড) ছবি দেওয়া হয়েছে। সেণ্টরের হাতে তীর ধনুক, আর মহিষাসুরের হাতে ঢাল, তরবারি। দুঃখের বিষয় এই অসুরের মস্তক অনেকটা মোগল সৈন্যের মত।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	—	জয়
β	—	বিজয়

উত্তর কিরীট মণ্ডল (Corona Borealis)

পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় উভয় তারাচিত্রেই এখানে একটি রত্নখচিত মুকুটের কল্পনা করা হয়।

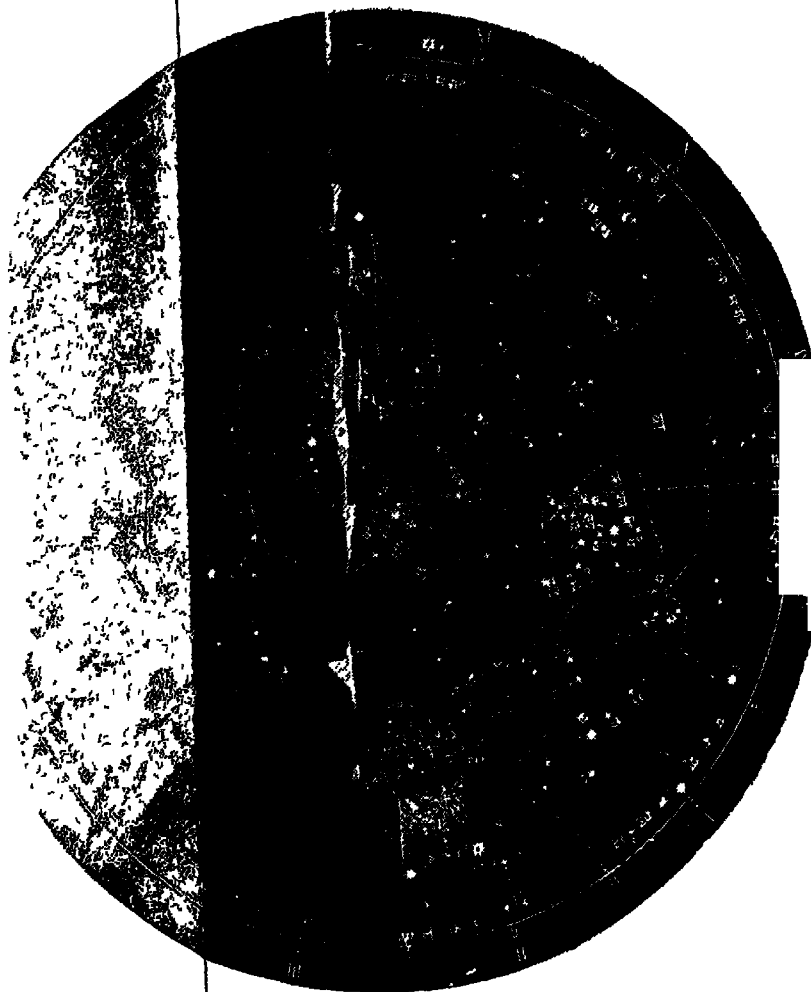
তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Alpheca	কোহিনূর
γ	—	চিন্তামণি

কিন্তু
না।
রতীয
াকৃতি
কা)।
তি—
শ্চকেব
াস)।
)

কল্পনা

রেখাচিত্র ৭:

রেখাচিত্র ৮



রেখাচিত্র ৭৯ : ভারতীয় তারাচিত্র (৩)। [পৃষ্ঠা ৫৮৫]

বৃশ্চিক রাশি (Scorpius)

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় যদিও রাশিটির নাম বৃশ্চিক রাশি, কিন্তু তারাচিত্রে এর কোন অংশেই বৃশ্চিকের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে যেখানে বৃশ্চিকের মাথা দেখানো হয়, ভারতীয় তারাচিত্রে সেখানে একটি সাপের কল্পনা করা হয়ে থাকে। (সর্পাকৃতি সপ্ত-তারাময়ং—কালিদাস; বলিনিভ তারা চতুষ্টাত্মক—দীপিকা)। বৃশ্চিকের বুকের অংশে একটি চাকার কল্পনা করা হয়। (বলয়াকৃতি—দীপিকা; শুকর দণ্ডাকৃতি তারকাচিত্ররাত্মক—কালিদাস)। বৃশ্চিকের লেজের অংশে একটি শঙ্খের কল্পনা করা হয়। (শঙ্খ-মূর্তিনী—কালিদাস)।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Antares	পারিজাত (জ্যেষ্ঠা)
β	Akrab	বালি
δ	Dschubba	দিব্যচঞ্চলা (অনুরাধা)
λ	Shaulah	শুক
ν	Lesath	সারণ
τ	—	সুগ্রীব
σ	—	দ্রোণ
π	—	রয়ী
ι	—	পঞ্চজন (মূলা)
ρ	—	বিদ্যুৎ

তক্ষক মণ্ডল (Draco)

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় তারাচিত্রেই এখানে একটি সাপের কল্পনা করা হয়। (চিত্র ৭৯ দ্রঃ)

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Thuban	কংস	

β	Alwaid	নহুষ	
γ	Etamin	সর্পমণি	
ι	El-Asich	আশীবিষ	ধ্বনিগত সামঞ্জস্য

বীণা মণ্ডল (Lyra)

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় তারাচিত্রেই এখানে একটি তারের বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে একটি Harp-এর কল্পনা করা হয়, আর ভারতীয় তারাচিত্রে নারদমুনির বীণার কল্পনা করা হয়ে থাকে। পাশের হারকিউলিস মণ্ডলকে হরকুলেশ না বলে সহজেই নারদমণ্ডল বলা যেত।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Vega	নীলমণি (অভিজিৎ)	
β	Shelak	শেলক	ধ্বনিগত সামঞ্জস্য
γ	Shulaphat	শূলফলক	"

ধনুরাশি (Sagittarius)

ভারতীয় তারাচিত্রে এখানে কোন ধনুকের ছবি দেখা যায় না, যদিও নাম ধনুরাশি। একখানা খাট দ্বারা এই রাশিটি দেখানো হয়। অবশ্য নানাগ্রন্থে নানাভাবে এর কল্পনা করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে পাশ্চাত্য ধনুর্ধর সেণ্টর চিরণের মত অর্ধনর ও অর্ধপশুর কল্পনাও আছে।

'পূর্বার্দ্ধ মনুষ্যাকার শেষার্দ্ধ অশ্বাকার ধনুর্ধারী পুরুষ' —জাতক চন্দ্রিকা

ধনুস্তরঙ্গজঘনো দীপ্যমানো ধনুর্দ্ধরঃ।

... ...

মৃগাস্যে মকরো ব্রহ্মণঃ বৃষস্কন্ধ ফণাস্পদঃ। —বামন পুরাণম্.

"সূর্পাকৃতি তারা চতুষ্টয়াত্মক" —কালিদাস

"গজদন্তবৎ অষ্ট তারাময়ং" —দীপিকা

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
γ	—	বিভীষণ
δ	—	তুলসী(পূর্বাষাঢা)
σ	—	উত্তরাষাঢ়া

দক্ষিণ কিরীট মণ্ডল (Corona Australis)

এখানেও উভয় তারাচিত্রেই একটি মুকুটের ছবি দেখা যায়।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	—	মেঘনাদ

বক মণ্ডল (Cygnus)

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় তারাচিত্রেই এখানে একটি বক বা রাজহাঁসের কল্পনা করা হয়।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম	মন্তব্য
α	Deneb	পুচ্ছ	আরবী দেনেব শব্দের অর্থও পুচ্ছ
β	Alberio	বকমুখ	

গরুড় মণ্ডল (Aquilla)

উভয় তারাচিত্রেই এখানে একটি পাখীর কল্পনা করা হয়ে থাকে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় একে গরুড় এবং পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যায় ঈগল পাখী বলা হয়।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Altair	শ্রবণা
γ	Tarazed	কর্ণ

শ্রবিষ্ঠা মণ্ডল (Delphinus)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে একটি ডলফিন বা শিশুক মাছের কল্পনা করা হয়। ভারতীয় তারাচিত্রে মৃদঙ্গ জাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখা যায়।

'মস্তকোপরি সমাগতে ধনে মর্দলাকৃতি তি পঞ্চতারকে'— কালিদাস

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	—	বসুদেব
β	—	রত্নপুরী

মকর রাশি (Capricornus)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে শিংওয়ালা একটি ছাগলের ছবি দেখা যায়। আর ভারতীয় তারাচিত্রে দেখা যায় একটি মাছের ছবি।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
γ	Denebalgedi	মকরপুচ্ছ

কুম্ভ রাশি (Aquarius)

উভয় তারাচিত্রেই এখানে একটি লোকের হাতে একটি পানির কলসী দেখা যায়। কলসী থেকে পানি গড়িয়ে নীচে মাছের মুখে পড়ছে।

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Sadalmelik	ধৃতরাষ্ট্র
β	Sadalsud	গান্ধারী
γ	Sadalchiba	বিদুর
λ	—	দুর্যোধন (শতভিষা)

কাশ্যপেয় মণ্ডল (Cassiopeia)

নাম দুইটির ধ্বনিগত সামঞ্জস্য এত বেশী যে, ভারতীয় নামটি যে পাশ্চাত্য নাম থেকে নেওয়া এ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা থাকা সম্ভব

নয়। পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে ইথিওপিয়ার রানী ক্যাসিওপিয়াকে একটি চেয়ারে উপবিষ্টা দেখা যায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এখানেও সাতজন ঋষির কল্পনা করা যায়।

"সপ্তমে বৈবস্বত মন্বন্তরে
কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্টশ্চ বিশ্বামিত্র গোতমঃ
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ এতে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাযঃ।"—শ্রীভাগবতম

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Schedar	গোতম
β	Caph	জমদগ্নি
γ	—	বশিষ্ট
δ	—	অত্রি
ϵ	—	কশ্যপ
η	—	বিশ্বামিত্র
κ	—	ভরদ্বাজ

ধ্রুবমাতা মণ্ডল (Andromeda)

পাশ্চাত্য তারাচিত্রে এখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি মেয়ের ছবি দেখা যায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এখানে একটি মাছের ছবি দিয়ে তার নাম দেওয়া হয়েছে ধ্রুবমাতা। (চিত্র ৮০ দ্রঃ)

"সুনীতিরপি তে মাতা তদাসন্নাতি নির্ম্মলা
বিমানে তারকাভূত্বা তাবত্‌ কালম্‌ নিবত্‌সতি"—বিষ্ণুপুরাণম্‌

তারাচিহ্ন	পাশ্চাত্য নাম	ভারতীয় নাম
α	Alpheratz	উত্তর ভাদ্রপদ
β	Mirach	মচ্ছ
γ	Almach	সুনীতি
δ	—	মুখ

চতুর্থ ভাগ

চীন দেশের জ্যোতির্বিদ্যা

চীনা জ্যোতির্বিদ্যার পটভূমি

প্রাচীন চীনদেশের যে সমস্ত বিবরণী পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশের মত তার সমস্তই প্রায় বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণী। এই বিরাট দেশে বিভিন্ন রাজবংশ বিভিন্ন যুগে রাজত্ব করেছে। চীন সম্বন্ধে যে কোন বিষয় জানতে হলে এ সমস্ত রাজবংশের বিবরণী থেকেই জানতে হয়। সেজন্য প্রথমে চীনের এই সমস্ত প্রাচীন রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া গেল।

প্রাচীন সভ্য দেশসমূহের মধ্যে চীন অন্যতম। চীন ইতিহাসে বিভিন্ন রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন্ বংশ যে সর্বপ্রথম চীনদেশে রাজত্ব করেন তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে অর্ধ-উপাখ্যানের মত শিয়া বংশের নাম জানা যায়। এর পূর্বের আর কোন রাজা বা রাজবংশের নাম জানা যায় না। এরপরে রাজত্ব করেন শ্যাং রাজবংশ। এঁদের রাজত্বকাল খ্রীস্টপূর্ব ১৫২৩ হতে ১০২৭ অব্দ পর্যন্ত ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। এর পরে রাজত্ব করেন চু রাজবংশ। এঁদের রাজত্বকাল খ্রীস্টপূর্ব ১০২৭ থেকে ২৫৬ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল বলে জানা যায়। এই সময়ে চীনে নানাপ্রকার বিপর্যয় ঘটে; আবার এই সময়েই খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন দার্শনিকের, কুং ফুৎ সে [কনফুসিয়াস (খ্রীস্টপূর্ব ৫৫১ হতে ৪৭৯ (?) পর্যন্ত] এবং লাও-ৎসে (খ্রীস্টপূর্ব ৬০৪) আবির্ভাব হয়। চীনবাসীদের জীবনে এই দুই দার্শনিকের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এই যুগেই চীনদেশে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। চু বংশের প্রথম রাজার নাম পাওয়া যায়, উ-ওয়াং। ইনি যাযাবর চীন জাতিকে সংঘবদ্ধ ক'রে গ্রামে ঘরবাড়ী তৈরী ক'রে তাতে বাস করতে বাধ্য করেন। এই সময় থেকেই চীনের রাজা 'স্বর্গের পুত্র' বলে অভিহিত হতে থাকেন। চু বংশের পরে চীনবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশের নাম থেকেই এ দেশের নাম হয় চীন। এ বংশের

প্রথম রাজা ছিলেন চুয়াং সিয়াং ওয়াং। শি হুয়াং তি ছিলেন এ বংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী রাজা। ইনি নিজেকে চীনের প্রথম সম্রাট বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, তাঁর আগে যে সমস্ত রাজা চীনে রাজত্ব করে গেছে, তাদেব কারোরই রাজা হওয়ার যোগ্যতা ছিল না; অতএব চীনেব বই বা বিবরণীতে সে সমস্ত রাজাব উল্লেখ থাকা অন্যায়। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলতেন, তাঁব পূর্বে চীনে যে সমস্ত কাজ হযেছে, সেগুলি কোন সভ্য জাতিব পক্ষে কলঙ্কজনক। অতএব সে সম্বন্ধে কোন কথা, কোন উল্লেখ থাকাও চীনের পক্ষে অপমানকব। সেজন্য তিনি হুকুম দিলেন যে, তাঁব শাসনকালের পূর্বে যে সমস্ত বই, পুস্তক, বিবরণী ইত্যাদি লেখা হযেছিল, সে সমস্ত পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাজার আদেশ অক্ষরে অক্ষবে পালিত হয়; প্রাচীন সমস্ত বই-পুস্তক পুড়িয়ে ফেলা হয়। খ্রীস্টপূর্ব ২০৭ অব্দ পর্যন্ত এ বংশের বাজত্ব চলে। এরপরে আসে হ্যান-বংশ। এই যুগে প্রাচীন চীনেব সভ্যতা ও কৃষ্টি উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। শি হুয়াং তির আদেশে যদিও পূর্বেকার সমস্ত বই পুড়িযে ফেলতে বলা হয়েছিল, এবং প্রবল পরাক্রান্ত রাজাব আদেশ বাজকর্মচারিগণ পালনও করেছিলেন, কিন্তু চীনেব নানা জায়গায় অনেক লোক ছিল, যারা রাজার এ আদেশ অন্যায় বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ না করলেও, অনেক বই, পুস্তক, বিবরণী ইত্যাদি পাহাড়েব গুহায়, বাক্সের ভিতরে ইত্যাদিতে লুকিয়ে বেখেছিলেন। হ্যান রাজবংশেব সমযে এই সমস্ত বই যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার করা হয়। এই সময়েই চীনদেশে প্রথম কাগজ ও ছাপাখানা তৈবী হয। বাজকার্যে লোক নিয়োগের জন্য এই সময় থেকে চীনদেশে প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষা নেওয়াব ব্যবস্থা করা হয়। খ্রীস্টপূর্ব ২০২ অব্দ থেকে খ্রীস্টীয ২২০ অব্দ পর্যন্ত এই বাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। এই রাজবংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজার নাম ছিল উ তি।

হ্যানবংশের পরে ৎসীন বংশ তৃতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, তারপবে ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিয়াং এবং সপ্তম শতাব্দীতে সুই রাজবংশ

চীনে রাজত্ব করে। এর পরের রাজবংশের নাম তাং রাজবংশ। এই সময়ে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত চীনের অধীনে আসে। নানাদেশের রাজদূত এই সময়ে চীনের রাজসভায় প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হতেন। চীনের রাজদূতও বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত থাকতেন। রোমের সম্রাটের রাজসভাতেও চীনের প্রতিনিধি ছিল। দশম শতাব্দী পর্যন্ত তাং রাজবংশ চীনে রাজত্ব করেন। এর পরে আসেন সুং রাজবংশ। এঁদের রাজত্বকাল দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগের শেষভাগে উত্তর অঞ্চলের খিতান জাতের তাতারদের অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই তাতারদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিজ খানের সাহায্য চাওয়া হয়। চেঙ্গিজ খান তাতারদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই চীনের রাজা হয়ে বসেন এবং ইউয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইউয়ান বংশ ১২৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। চেঙ্গিজ খানের পৌত্র কুবলাই খান এই বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর সময়ে চীনরাজ্য উত্তরে মেরু সাগর থেকে দক্ষিণে মালাক্কা প্রণালী এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে নীপার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রোমের পোপ দশম গ্রেগরীর চিঠি নিয়ে ভেনিসের মার্কো পোলো কুবলাই খানের দরবারে আসেন। মার্কো পোলো লিখে গিয়েছেন যে, কুবলাই খানের রাজপ্রাসাদ আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া ছিল। সম্রাট যে খাটে শুতেন, সে খাট ছিল খাঁটি সোনার তৈরী; তার উপরে সোনার আঙুরলতা আর তাতে মূল্যবান পাথরের আঙুর ঝুলতো। কুবলাই খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গলদের পতন হয়। দারুণ শক্তিশালী মোঙ্গলদের পতনের পর চীনের বিভিন্ন দল শাসনক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। এদের মধ্যে মিং বংশীয়রা সফল হয়। মিং বংশ ১৩৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৪৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চীনে রাজত্ব করে। এই সময়েই ইউরোপীয়গণ ব্যবসায় উপলক্ষে চীনে আগমন করে। ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে মাকাওতে পর্তুগীজগণ প্রথম বসতি স্থাপন করে। ইতিমধ্যে চীনের উত্তরের মাঞ্চু তাতারগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং চীনের একদল

লোক মিংদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাঞ্চুদের ডেকে আনে। মাঞ্চুরা এসে মিং বংশীয় রাজাদের পরাজিত ক'রে নিজেরাই চীনের রাজা হয়ে বসে এবং চিং রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এদের শাসনক্ষমতা বজায় ছিল। বিজিত চীনাদের চিহ্নিত করবার জন্য এঁরা তাদের মাথায় বেণী রাখবার নির্দেশ দেয়। চীনে কম্যুনিস্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর এই বেণী রাখা প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। চিয়াং-কাইশেক এবং ওয়াং চিং-ওয়াই-এর সহায়তায় সানইয়াৎসেন এই চিং-বংশের পতন ঘটিয়ে ১৯১২ সনে চীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

চীনবাসীদের জীবনযাত্রায় জ্যোতিবিদ্যার স্থান ছিল অতি উচ্চে। কেননা, যে মহৎ চিন্তার জন্য সুং যুগের দার্শনিকগণ দেশবরেণ্য ছিলেন, সেই বিশ্বধর্ম বিশ্বের আধ্যাত্মিক একত্ববোধের সঙ্গে জ্যোতিবিদ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। একটি কৃষিজীবী জাতির সম্রাট যে পঞ্জিকা অনুসরণ করবার নির্দেশ দিতেন, আপামর জনসাধারণ সকলেই সে আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করত। চীনের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় এর নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীসের জ্যোতিবিদ ও জ্যোতিবিদ্যার সঙ্গে রাজার কোন সম্বন্ধ ছিল না। যে সমস্ত দার্শনিক জ্যোতিবিদ্যায় ও অন্যান্য বিজ্ঞানের আলোচনা করতেন, রাজদরবারে তাদের কোন প্রতিষ্ঠা ছিল কিনা, এ প্রশ্ন কেউ কোনদিন করে নাই এবং তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল রাজাদেশেও পরিণত হয় নাই। কিন্তু চীনদেশে জ্যোতিবিদ্যা ছিল রাজদরবারের ব্যাপার। চীনের রাজা ছিলেন 'স্বর্গের পুত্র', অতএব স্বর্গের ব্যাপার তাঁকে জানতে হতো; সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ইত্যাদির গতিগতির বিষয় জানবার জন্য জনসাধারণ রাজার দিকেই চেয়ে থাকতো। এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁকেই নির্দেশ দিতে হতো। এই কারণে চীনদেশে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যোতিবিদ্যা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে।

রাজার নির্দেশ অনুযায়ী পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যোতিবিদ্যার চর্চা হ'তো বলেই যে জ্যোতিবিদগণের ব্যক্তিগত কোন আগ্রহ তা'তে ছিল না, এমন

কথা বলা চলে না। মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের আবির্ভাবের পূর্বে চীনা জ্যোতির্বিদগণের পর্যবেক্ষণই ছিল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম। ধূমকেতু, উল্কা, নবতারা, অতি-নবতারা ইত্যাদির প্রাচীন তালিকা একমাত্র চীনদেশেই পাওয়া যায়। চীনদেশের এই সমস্ত তালিকা থেকেই অনেক ধূমকেতুর গতিপথ ও গতিকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে; অনেক নীহারিকার জন্ম-বৃত্তান্ত গঠন করা হয়েছে। হিপারকাসের সময় থেকে টাইকো ব্রাহের সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে কেউ কোনদিন কল্পনাও করে নাই যে, আকাশে নূতন তারা দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চীনে অনেক পর্যবেক্ষণ-তালিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই তালিকাসমূহে নবতারা, সূর্যকলঙ্ক ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বিশ্ব-তত্ত্বজ্ঞান অনুসন্ধানে এই সমস্ত তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় চীনা জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক বই আছে। কিন্তু এদের কোনটি থেকেই স্পষ্টভাবে ও ধারাবাহিকভাবে কিছু বলা মুস্কিল। খ্রীস্টান পাদ্রীগণ চীনদেশের জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ দিয়েছেন, তার অধিকাংশই ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। চীনদেশের জ্যোতির্বিদ্যাকে ছোট করে দেখানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। নানাপ্রকার ফন্দিফিকির করে এরা রাজদরবারে প্রবেশ করে এবং সেখানে প্রভাবও বিস্তার করে। এই পাদ্রীগণ কোনদিনই চীনা জ্যোতির্বিদ্যা-পদ্ধতিকে বুঝতেও চেষ্টা করে নাই। চীনা ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির ভিতরে পার্থক্য না বুঝেই এঁরা চীনা জ্যোতির্বিদ্যাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার সূর্যপথ বা রাশিচক্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত; পাশ্চাত্যের গোটা জ্যোতির্বিদ্যাই এই সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্যপথের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই জ্যোতির্বিদ্যাতে আকাশকে কয়েকটা ভাগে ভাগ ক'রে সেই ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণকার্য চালানো হতো।

এভাবেও যে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা ও তার উন্নয়ন করা সম্ভব, খ্রীস্টীয় পাদ্রীগণ সে কথা বিশ্বাস করতেন না এবং সে চেষ্টাও করতেন না।

একটি প্রশ্ন সকলের মনেই জাগে—চীনা জ্যোতির্বিদ্যা কত প্রাচীন? গ্রীক, ভারতীয় এবং চীনা জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে প্রাচীনতায় কোন্ জ্যোতির্বিদ্যা অধিক বনেদী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা আছে বলে মনে হয় না। এর কারণ, কতকগুলি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে গোলমাল আছে। অনেকের ধারণা, বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যা খ্রীস্টীয় যুগের দুই হাজার বৎসর পূর্বের এবং চীনা জ্যোতির্বিদ্যা খ্রীস্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর বেশী প্রাচীন নয়। তবে এ কথা সত্য যে, চীনা জ্যোতির্বিদ্যা বাইরের অন্য দেশের প্রভাবমুক্ত। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি হয় জ্যামিতির সাহায্যে; কিন্তু চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় জ্যামিতির কোন স্থান ছিল না। পাশ্চাত্য জগতের ধারণা জ্যামিতি ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যার প্রগতি সম্ভব নয়। আর সেজন্যই চীনে জ্যামিতিহীন যে জ্যোতির্বিদ্যা গড়ে উঠে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তা বুঝতে পারেন নাই এবং সে কারণেই চীনের জ্যোতির্বিদ্যাকে হেয় বলে ধারণা করেছেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যে, শি হুয়াং তি এর সময়ের জ্যোতির্বিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য অনেকে একে পুরাণ কাহিনীর মত উপাখ্যান বলে মনে করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

চীনা জ্যোতির্বিদ্যার উৎস

(১) চীনা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক সরকারী বিবরণীসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে, চীনা জ্যোতির্বিদ্যা ছিল সবকাবী বিষয়, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই এব পবিপুষ্টি সাধন হয। চীনের ইতিহাসের আদি হতেই এ ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায। 'শু চিং' (প্রাচীন ইতিহাস)-এর প্রথম অধ্যাযেই আছে, অর্ধ পৌবাণিক সম্রাট ইযাও তাঁর দুই জ্যোতির্বিদ হুসি এবং হো-কে সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশ দেন। তাঁব নির্দেশনামাটিতে "মহান স্বর্গেব সম্মানেব জন্য সম্রাট (ইযাও) হুসি এবং হো (দুই ভাই)-কে সূর্য, চন্দ্র, তারা এবং আকাশেব অন্যান্য 'ছেন'-গুলিব (ছেন অর্থ কালপুরুষের বেল্টেব তিন তাবা, সপ্তর্ষিমণ্ডলেব সাত তাবা, ধ্রুবতাবা এবং জ্যেষ্ঠা) গণনা ক'রে তাদের চিহ্নিত কবতে এবং জনসাধাবণকে ঋতুব সংবাদ দিতে আদেশ কবেন, যেন তা'বা শ্রদ্ধার সঙ্গে ঋতু পালন কবতে পাবে।

তিনি, বিশেষ কবে, বড় ভাই হুসিকে ইয়াংতু নামে প্রাসাদে ইউ বর্বরদেব মধ্যে বাস করতে আদেশ দেন এবং উদীয়মান সূর্যকে অভ্যার্থনা কবতে এবং পূর্বদিকে তাব যাত্রাপথ নিযন্ত্রিত করতে বলেন। এ ছাড়াও তিনি বড় ভাই হুসিকে নানচিয়াওতে বাস ক'রে দক্ষিণেব কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং গ্রীষ্মাযনের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ দিতেও আদেশ করেন।

তিনি ছোট ভাই হো-কে পশ্চিমে মাইকু নামক প্রাসাদে বাস ক'বে পশ্চিমেব কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ কবতে এবং অস্তগামী সূর্যকে বিদায় জানাতে আদেশ করেন। তিনি ছোট ভাইকে উত্তবাঞ্চলে ইউ-তু নামক প্রাসাদে বেযে বাস কবতে এবং উত্তরের কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে বলেন।"

প্রায় তিন হাজার বৎসর এই উপাখ্যানকে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রাজকীয় আদেশ বলেই মনে করা হতো। সম্প্রতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন যে, হ্যান-বংশের পূর্বের সমস্ত সাহিত্যে হ্সি এবং হো কোন দুইজন বা ছয়জনের নাম নয়, বরং একটিমাত্র পৌরাণিক নাম। কোন সময়ে একে সূর্যের মাতা, আবার কোন সময়ে সূর্যের সারথীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে কোনভাবে এই নামটি চারটি যাদুকরের নামে বিভক্ত হয়। পৌরাণিক যুগের সেই সম্রাট এই চার যাদুকরকে বিশ্বের চারদিকে পাঠিয়ে দেন। তাদের প্রতি আদেশ ছিল, প্রত্যেক অয়নে সূর্যকে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে না দিয়ে পূর্বপথে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং প্রত্যেক বিষুবনে সূর্যকে থামতে না দিয়ে তার যাত্রাপথে চলতে বাধ্য করতে হবে। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এই সমস্ত উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রীষ্মায়নে দেখা যায় যে, সূর্য উত্তরদিকে যেতে যেতে একটি বিশেষ জায়গায় যেয়ে আর বেশী উত্তরে যেতে পারে না। মনে হয় কেউ যেন তাকে জোর করে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে যেতে বাধ্য করে। ঠিক একই-ভাবে শীতায়নে দক্ষিণ অয়ন পর্যন্ত যেয়ে সূর্য আবার উত্তর দিকে ফিরতে বাধ্য হয়। বসন্ত এবং হেমন্ত বিষুবনে সূর্যকে যথাক্রমে তার উত্তর দিকের গতি ও দক্ষিণ দিকের গতি অব্যাহত রাখতে বাধ্য করা হয়।

মিশরেও যে ঠিক একইরূপ কল্পনা করা হতো, তার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। সভ্যতার যুগে, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ২৪২৬ অব্দের কাছাকাছি সময় হতে খ্রীস্টপূর্ব ২৬৬ অব্দ পর্যন্ত সময়ে বসন্ত-বিষুবন বৃষরাশিতে সংঘটিত হতো এবং উত্তরায়ন ছিল কন্যা ও সিংহরাশির মাঝখানে। সেজন্য এই যুগে বৃষ, সিংহ ও স্ফিংক্সের (সিংহের নীচের অংশে কুমারীকন্যার উপরের অংশ সংযোজিত মূর্তি) প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। এই সময়ে মিশরীয় জ্যোতির্বিদগণ এবং সেইসঙ্গে মিশরীয় জনসাধারণ বিশ্বাস করতেন যে, এই সমস্ত দেবতা এত বেশী শক্তিশালী যে, সূর্যকে বেশী উত্তরে যেতে বা স্থির হয়ে থাকতে বাধা দেয়।

শু চিং-এর পরবর্তী এক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, উপবের উপাখ্যানে সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে চারজন যাদুকরকে চারদিকে পাঠানো হয়েছিল ; তারা কোন একটি বিশেষ গ্রহণ ঘটতে বাধা দিতে পারে নাই বলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

চীনের রাজা-পুরোহিতগণ জ্যোতিবিদ্যাকে একটি গুপ্ত বিদ্যা বলে বিবেচনা করতেন। মানমন্দির (লিংথাই) রাজার ধর্মীয় প্রাসাদের (মিং থ্যাং) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। একটি কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রে পঞ্জিকা নিয়ন্ত্রণের জন্য জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এইরূপ একটি জাতি তাকেই রাজা বা পুরোহিত বলে মেনে নিত, যে তাদের বলতে পারত, কোন্ সময়ে কোন্ শস্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বা কোন্ সময়ে কোন্ ঋতুর আরম্ভ হবে। এই কারণেই চীনের জ্যোতিবিদ্যা সরকারী আওতায় প্রতিপালিত হয়।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হ্যান রাজবংশের যে চু লি (চু এর রীতিনীতি) সঙ্কলিত হয়, তা'তে এই রাজা-জ্যোতিবিদদের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বই-এর সূচনাতেই বলা হয়েছে, "সূর্য ও ধ্রুবতারা পর্যবেক্ষণ ক'রে সম্রাট চারটি দিগবিন্দু ঠিক করবেন।" রাজ-জ্যোতিষী (ফেং হূসিয়াং শিহ্)) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, "সে বারো বৎসর (বৃহস্পতির নাক্ষত্রিক আবর্তনকাল), বারো মাস, বারো (দ্বিগুণ) ঘণ্টা, দশদিন এবং আঠাশ তারা (হূসিউসমূহ নির্দেশক তারা) নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে তাদিগকে পৃথক-ভাবে রাখে এবং আকাশের কার্যাবলী পরিচালনা করে। ঋতুর ক্রম নির্ণয়ের জন্য শীতায়ন ও গ্রীষ্মায়নে সূর্য পর্যবেক্ষণ করে এবং বসন্ত ও হেমন্ত বিষুবনে চন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে।"

চীনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন চীনের সকল যুগেই জ্যোতিবিদগণ রাজকর্মচারী ছিলেন। এঁদের কাজ ছিল আকাশ পর্যবেক্ষণ ক'রে নানা বিষয়ের গণনা করা এবং জ্যোতিবিদ্যা

বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করা। বিভিন্ন যুগে এঁদের পদের বিভিন্ন নাম ছিল। খ্রীস্টীয় পাদ্রীদের সময় পর্যন্ত এই সমস্ত জ্যোতির্বিদের সরকারী-ভাবে অত্যন্ত সম্মান ছিল। এঁরা নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। এমনকি মাত্র গত শতাব্দীতেও একই অপরাধের জন্য অন্যান্য লোক এমনকি রাজকর্মচারী অপেক্ষা একজন জ্যোতির্বিদকে অনেক লঘু শাস্তি দেওয়া হতো। সম্রাটের অধীনে জ্যোতির্বিদ্যার জন্য একটি বিভাগ ছিল। এই বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন পরিচালক বা ডিরেক্টর। এই ডিরেক্টরকে চীনা ভাষায় সর্বপ্রথম থাই শিহ্ লিং বলা হতো। রাজকীয় মানমন্দিরের সমস্ত ভার এই ডিরেক্টরের উপরেই ন্যস্ত থাকতো। কোন কোন যুগে একই সঙ্গে দুইটি মানমন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সুং যুগে এইরূপ দুইটি মানমন্দির ছিল বলে জানা যায়। এদের একটি ছিল হ্যানলিন একাডেমীর জ্যোতি-র্বিদ্যা বিভাগ (থিয়েন ওয়েন ইউয়ান); এটি রাজপ্রাসাদের ভিতরে অবস্থিত ছিল। অন্যটির নাম ছিল, জ্যোতির্বিদ্যা ও পঞ্জিকা ডিরেক্টরেট (সু থিয়েন চিয়েন)। রাজধানীর বাইরে এটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। থাই শিহ্ লুং নিজে এর দেখাশুনা করতেন।

দুই মানমন্দিরেই স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ ও গণনা করা হ'তো এবং এই দুই মানমন্দিরের গণনাফল ভালভাবে একত্রে বিবেচনা ক'রে যখন দেখা যেত যে, কোন ভুলের সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র তখনই সাধারণ্যে প্রকাশ করা হতো। কিন্তু ফেং চেং-এর লিখিত বিবরণী হতে জানা যায় যে, ঐ একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই পর্যবেক্ষণের মান অত্যন্ত নেমে যায়। সত্যকারভাবে কোন পর্যবেক্ষণ না ক'রে কেবল-মাত্র পূর্বের পর্যবেক্ষণ-তালিকা নকল ক'রে কোনভাবে [গোঁজামিল দিয়েই পঞ্জিকা প্রণয়নের কাজ শেষ করা হতো। ফেং চেং নিজে রাজ-জ্যোতির্বিদ ছিলেন। এঁর পরবর্তী রাজ-জ্যোতির্বিদ শেন কুয়া এই অবস্থার তীব্র সমালোচনা ক'রে বলেন, "হুয়াং হো-এর রাজত্বকালে (১০৪৯ হ'তে ১০৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগে লোক

নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হতো, তা'তে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক তত্ত্ব ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হতো। কিন্তু পরীক্ষার্থীগণ সেই সময় প্রশ্নের যে সমস্ত উত্তর দিত সেগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের। এই সমস্ত উত্তর হ'তে বোঝা যেত, জ্যোতির্বিদ্যার কোন শাখা সম্বন্ধেই তাদের কোন জ্ঞান নাই; একটা অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণা থেকেই তারা উত্তর দিত। এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাদের ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'লো যে, পরীক্ষকগণের জ্ঞানও তার চেয়ে বেশী ছিল না; তা'রা নিজেরাও বিশেষ কিছু জানত না। সেজন্য সমস্ত পরীক্ষার্থীকেই খুব বেশী বেশী নম্বর দিয়ে ভালভাবে পাশ করিয়ে দিত। এইভাবেই জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগে প্রায় অজ্ঞলোকের নিয়োগ করা হতো।" অবশ্য শেন্ কুয়া নিজে অত্যন্ত দক্ষ জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁর সময়ে জ্যোতির্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদ্বয় সু সুং এবং হ্যান কুং লিয়েন তাঁর মানমন্দিরেই কাজ করতেন।

এইভাবে দেখা যায় যে, চীনের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ কোন বই পাওয়া যায় না বটে, তবে রাজবংশীয় ইতিহাসের ভিতরে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়; সেইগুলিই এই সমস্ত যুগের জ্যোতির্বিদ্যা তথ্যের প্রধান উৎস।

(২) প্রাচীন পঞ্জিকাসমূহ

চীনের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কতকগুলি তথ্য ও উপাত্ত চীনের দুইখানা প্রাচীন পঞ্জিকা হতে পাওয়া যায়। এই পঞ্জিকা দুইখানার নাম হ্সিয়া হ্সিয়াও চেং (হ্সিয়া রাজবংশের ক্ষুদ্র বর্ষপঞ্জী) এবং উয়ে লিং (মাসিক নির্দেশাবলী)।

হ্সিয়া হ্সিয়াও চেং-এ হ্সিয়া রাজবংশের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। এটি আসলে কৃষকদের একটি সহায়ক গ্রন্থ। ঋতু ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ছাড়াও এতে চাঁদের বারোমাস অনুযায়ী আবহাওয়া, তারা এবং জীবজন্তু সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে।

ছিং রাজবংশের যুগে এই পঞ্জিকা সংস্কার করা হয়; কিন্তু বর্তমানে এই পঞ্জিকাটিকে যেভাবে পাওয়া যায়, সেটি হলো ছং চেন-হু সুয়ানের হ্সিয়া হ্সিয়াও চেং স্থ আই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই পঞ্জিকার প্রণয়নকাল খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই বইখানাকে তা তাই লি চি (বড় তাই-এর ক্রিয়াকলাপের বিবরণী) এব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বইয়েব জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যায়ে বর্তমান যুগের খবরের কাগজে প্রকাশিত মাসিক তারাচিত্রের বেশী কিছু নাই।

দ্বিতীয় পঞ্জিকা উয়ে লিং কে হ্সিয়াও তাই লি চি (ছোট তাই-এর কার্যকলাপের বিবরণী) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবা হয়। এই বইখানা অপেক্ষাকৃত বড়। লু শিহ ছুন ছিউ (প্রভু লু-এর বসন্ত ও হেমন্ত ইতিহাস)-এর প্রথম বারো অধ্যায়ের সাথে এই বইয়ের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তবে উয়ে লিং-এব প্রত্যেক অধ্যায়ের বিবরণীর পরে তার ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে লু শিহ ছুন ছিউ-এ আরো চারটি ক'বে অধ্যায় যোগ করা হযেছে। উয়ে লিং-এর প্রত্যেকটি অধ্যায় একই পদ্ধতিতে লেখা। মাসের জ্যোতিষিক গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেক অধ্যায় আরম্ভ কবা হয়েছে; তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত গানের সুর, সংখ্যা, খাদ্য-তালিকা, উৎসর্গেব যোগ্য বস্তুর তালিকা ইত্যাদি তার পরে সংযোগ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছে সেই মাসে রাজার করণীয় কার্যকলাপের বিবরণী দিয়ে। এরপরে ঐ মাসে কি কি করা যাবে না তার তালিকা এবং পরিশেষে ঐ সমস্ত বিধি-নিষেধ অমান্য করলে কি কি দৈবদুর্বিপাক ঘটবে তার তালিকা দেওয়া হযেছে। এই মাসিক নির্দেশ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পরে সঙ্কলিত হয নাই বলেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা। কেননা, তাঁরা বলেন, 'লু শিহ্ ছুন ছিউ'-এব সঙ্কলন-কাল খ্রীস্টপূর্ব ২৪০-২৩৯ অব্দ।

'লু শিহ ছুন ছিউ' একখানি অতিপ্রামাণ্য গ্রন্থ। শিহ চি তে লু পু ওয়াই-এর জীবনী আলোচনাকালে এই বইয়েব সঙ্কলন সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ দেওয়া আছে।

"সেই সময় (খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে) ওয়াই প্রদেশে হ্‌সিন লিং-এর প্রভু ছিলেন, ছু প্রদেশে ছিলেন ছুন-শোন-এর প্রভু, চাও প্রদেশে ছিলেন ফিং ইওয়ানের প্রভু এবং ছি প্রদেশে ছিলেন মিং ছ্যাং-এর প্রভু। এঁদের সকলেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নানাবিষয়ে দক্ষ পণ্ডিতগণ তাঁদের রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি করত। এই সমস্ত প্রদেশ-সমূহের পণ্ডিতগণের ভিতরে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। লু পাই যখন দেখল যে, তাঁর প্রদেশ ছিন, পাণ্ডিত্যে বা পণ্ডিতগণের সংখ্যায় অন্যান্য প্রদেশের চাইতে ছোট হয়ে আছে, তখন তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর রাজসভায় নিয়ে আসেন এবং নানাবিধ উপাদেয় ভোজে তাঁদের আপ্যায়িত করেন। তারপরে এই সমস্ত পণ্ডিতদের তিনি নিজ নিজ বিষয়ের উপরে লিখতে অনুরোধ করেন। এইভাবে আটটি পর্যবেক্ষণ (ল্যান), ছয়টি আলোচনা (লুন) এবং বারোটি বিবরণী (চি) লিপিবদ্ধ করান। এতে মোট দুইলক্ষ অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁর পণ্ডিতগণের মতে আকাশ, পৃথিবী ও বিশ্বের অন্যান্য হাজার হাজার বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য এই বইতে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। তিনি এ বইয়ের নাম দেন, 'লু শিহ্‌ ছুন ছিউ' অর্থাৎ প্রভু লু-এর বসন্ত ও হেমন্ত-ইতিহাস। তিনি হ্‌সিয়েন ইয়াং-এর বাজারের এক প্রকাশ্য স্থানে এই বইখানা প্রদর্শনী হিসাবে রেখে দেন এবং তার পাশে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাও রেখে দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, 'যদি কেউ ঐ বই থেকে একটি অক্ষর বাদ দিতে পারে বা ঐ বইতে একটি অক্ষর যোগ করতে পারে, তা হ'লে তাকে ঐ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।' 'লু শিহ্‌ ছুন ছিউ'-এর পরিশিষ্টে এর সঙ্কলনের সমাপ্তির যে সময় নির্দেশ করা হয়েছে, বর্তমানে হিসাব করে দেখা যায় ঐ সময় খ্রীস্টপূর্ব ২৩৯ অব্দ।

(৩) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক লিখিত বিবরণীসমূহ

(ক) চু রাজবংশ হতে লিয়াং রাজবংশ পর্যন্ত (খ্রীস্টপূর্ব ১০২৭ অব্দ হতে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত)

চু রাজবংশের রাজত্বকালে মেং ৎসে (মেনসিয়াস) নামে একজন দার্শনিক ছিলেন। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৩৭১ অব্দ হতে খ্রীস্টপূর্ব ২৮৮ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর একটি লেখাতে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণী দেওয়া আছে। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ উক্তি করতেন বলে তিনি লিখেছেন, "যারা বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন উক্তি করে, তাদের একমাত্র যুক্তি থাকে কার্যকারণ (কু); এ ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না। কিন্তু ঘটনার মান তার স্বাভাবিকতার ভিতরেই নিহিত থাকে। তোমাদের পণ্ডিতগণ যেভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তা আমি ঘৃণা করি। মহান ইউ যেভাবে যুক্তি দিতেন, এই সমস্ত পণ্ডিতের যুক্তি সেরূপ হলে তাদের পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে বলবার কিছু থাকে না। ইউ অতি সহজভাবে তাঁর বক্তব্য বলতেন; যেমন পানি স্বভাবতঃই নীচের দিকে গড়িয়ে যায়, কোন যুক্তিতর্ক দিয়েই তিনি বিপরীত দিকে বহাতে চেষ্টা করতেন না। তোমাদের পণ্ডিতগণ যদি এইরূপ করতো, তা হলে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত বিরাট হতো। সব সময়ে আকাশকে অতিশয় উঁচু এবং তারাসমূহকে অত্যন্ত দূরবর্তী মনে করবে। এদের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলে, একই জায়গায় বসে হাজার হাজার বছর আগের অয়নেরও সন্ধান পাওয়া যায়।"

মনে হয়, মেং ৎসু বা মেং খো তাঁর সমসাময়িক জ্যোতির্বিদদের কথাই বলেছিলেন। কেননা সেই সময়ে চীনের ইতিহাসের দুইজন অতি বিখ্যাত প্রাচীন জ্যোতির্বিদ জীবিত ছিলেন। এঁদের একজনের নাম শি শেন্; ইনি ছি প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। অন্যজনের নাম কান্ তে; ইনি ওয়াই প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। এঁরা উও সিয়েন নামে আর একজন জ্যোতির্বিদের সহায়তায় পৃথিবীর সর্বপ্রথম তারা-তালিকা

প্রণয়ন করেন। হিপারকাসের তারা-তালিকা প্রণয়নের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে এই তারা-তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

শি শেনের বইয়ের নাম ছিল 'থিয়েন ওয়েন' (জ্যোতির্বিদ্যা); কান্ তে'র বইয়ের নাম ছিল 'থিয়েন ওয়েন হ্সিং চ্যাং' (জ্যোতির্বিদ্যায় তারা-পরিচিতি)। তারা-তালিকাতে এঁদের দুইজনের সঙ্গে উও হ্সিয়েনের নাম জড়িত ছিল। এই তালিকা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিয়াং বংশ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। এরপরে আর এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্যুই রাজবংশের সময়ে (ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে) উও মি-এর 'কু চিন থাং চ্যাং' (জ্যোতিষ সংগ্রহ) গ্রন্থে উপরোক্ত বইগুলির কিছু কিছু অংশ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের কোন কোন অংশ বর্তমানে চারভাবে পাওয়া যায়। (১) 'হ্সিং চিং' (তারা-পরিচিতি) নামে একখানা বই। (২) 'চিন শূ' (চীনবংশের ইতিহাস) গ্রন্থের জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যায়; খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গণিতবিদ লি শূন ফেং এই গ্রন্থ সংকলন করেন। (৩) 'থাই ইউয়ান চ্যান চীং' (থাই ইউয়ান যুগের জ্যোতিষ গ্রন্থ)। এবং (৪) ৬২১ খ্রীস্টাব্দের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় একখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি; এর অসম্পূর্ণ কিছুটা অংশ বর্তমানে হ্সিং চিং-এ পাওয়া যায়। এতে কেন্দ্রীয় প্রাসাদের (ধ্রুব পরিক্রমণ অঞ্চলের) পূর্বপ্রাসাদ ও উত্তর প্রাসাদের তারা ও মণ্ডলসমূহ দেওয়া আছে। বর্তমানে প্রচলিত হ্সিং চিং গ্রন্থখানা স্যুই রাজবংশের সময়ে সঙ্কলিত হয় বলেই মনে হয় এবং অনেকের ধারণা এই সংকলন খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতব্দীর।

চু যুগের এইরূপ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ-কার্যের পর হ্যান যুগের প্রচলিত বিশ্বতত্ত্ব যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। দক্ষিণ চীনের চু ইউয়ানের অর্ধ-আধ্যাত্মিক কবিতার বই 'থিয়েন ওয়েনে'-এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উল্লেখ আছে। এর কোন কোন কবিতাতে বিশ্বের নয়টি স্তরের উল্লেখ আছে। এখানে গ্রীক মতবাদের কিছুটা প্রতিধ্বনি দেখা যায়।

হ্যান যুগের বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক জায়গায় উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় ৭৬ অব্দে সুং চুন দুইখানা বই সঙ্কলন করেন। এই

বই দুইখানার নাম 'শ্যাং শু ওযাই খাও লিং ইয়াও' (রহস্যময উজ্জলতার অনুসন্ধান) এবং 'আাই ওযাই থুং কুয়া ইয়েন' (পবিবর্তন সম্বন্ধীয় বইতে কুযার শক্তির অনুসন্ধান)। এই সকলনের অংশবিশেষ মাত্র, মিং যুগে কুযাই শু সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এর প্রথমটিতে চু পাই-এর বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ভূ-তত্ত্ববিদ চ্যাং হেং (৭৮ খ্রীস্টাব্দ)-এব বই 'লিং হুসিয়েনে'র বর্ণিত মতবাদ লিপিবদ্ধ কবা হযেছে।

এরপবে খ্রীস্টপূর্ব ৯০ অব্দে সুমা ছিযেনেব বই 'শিহ্ চি' (ঐতিহাসিক বিবরণী)-এব উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই বইয়েব থিয়েন কুযান (স্বর্গীয় শাসনকর্তাসমূহ) অধ্যায়ে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা কবা হয়েছে। গ্রন্থকার সুমা ছিয়েন নিজে রাজকীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই অধ্যাযে তিনি প্রথমে তাবা ও পাঁচটি প্রাসাদের (কেন্দ্রীয়, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তব) মণ্ডলসমূহের ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। এবপবে তিনি গ্রহসমূহের গতি সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা দিযেছেন; এব মধ্যে গ্রহেব বক্রগতিরও উল্লেখ আছে। এরপবে তিনি হুসিউসমূহেব সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জ্যোতিষ সম্বন্ধ, সূর্য ও চন্দ্রেব অস্বাভাবিক দৃশ্য, ধূমকেতু, উল্কা, মেঘ, বাষ্প, ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, প্রাচীন চীনে এমন কোন যুগ ছিল না বা কোন যুগে এমন কোন রাজা ছিলেন না, যে সময়ে অতি দক্ষতার সাথে আকাশ পর্যবেক্ষণ কবা হয় নাই। পূর্ববর্তী যুগসমূহে যে সমস্ত গ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল এবং অস্বাভাবিক উল্কাপাত হয়েছিল, পৃথিবীতে সে সমস্ত ঘটনাব ফল এবং এ সম্বন্ধে চীনা জ্যোতির্বিদগণের ভবিষ্যদ্বাণীর কতটা মিল ছিল, সে সমস্ত বিশদভাবে আলোচনা কবেছেন। তিনি তাবা-কেরাণীর একটি বিরাট তালিকাও সংযোজন কবেছেন। প্রাচীন চীনা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হ্যান যুগের সবকারী বংশ-ইতিহাসেব নাম 'ছিয়েন হ্যান শু'। এই বইখানা খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীর

প্রথম ভাগে মা হুস্ কর্তৃক রচিত হয়। এই বইখানার কোন অনুবাদ পাওয়া যায় না। তবে এই বইতে চন্দ্রের যুতিকাল গণনা এবং গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত চীনের জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্যপথের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ৮৫ খ্রীস্টাব্দে চিযা খুয়াই-এর পঞ্জিকা সংস্কারের সময়ে সূর্যপথ নির্ণয়ের যন্ত্র তৈরী করা হয়। লিউ হুং এবং শাই ইয়ুং ১৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'লু লি চিহ্' (পঞ্জিকা সংক্রান্ত পুস্তক) নামে যে বই রচনা করেন, তাতে সূর্যপথ এবং তার তীর্যকতা ডিগ্রীতে দেওয়া ছিল। গ্রীসে এরাস্টোথেনেস খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই তীর্যকতা নির্ণয় করেন। প্রায় ২৬০ খ্রীস্টাব্দে উ প্রদেশের ওয়াং ফ্যা'নের গ্রন্থ 'হুন থিয়েন হুসিয়াং শুও' নামে একখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এবারহার্ড এবং মুইলার এই বইখানার অনুবাদ করেন। ইরাও হুসিন নামে আর একজন জ্যোতির্বিদের গ্রন্থ 'হুসিন থিয়েন লুনে'র অংশবিশেষের সন্ধান পাওয়া যায়।

পরবর্তী শতাব্দীতে, ৩০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৩৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইউ হুসি বিষুবনের অগ্রগমন আবিষ্কার করেন; তাঁর বই 'আন থিয়েন লুনে'র অংশবিশেষের এখনও সন্ধান পাওয়া যায়। এর একশত বৎসর পরে ছিয়েন লো-চিহ্ তাঁর তারা-তালিকা প্রকাশ করেন; এ বইয়ের কোন সন্ধান, এমনকি এর নামেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এরপরে ৎসুকেং-চীযের বই 'থিয়েন ওয়েন লু' (জ্যোতির্বিদ্যা সঙ্কলন) বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ বইয়ের অংশবিশেষ খাই ওয়ান চ্যাং চিং (তৃতীয় উৎস)-এ সংরক্ষিত হয়েছে।

(খ) লিয়াং রাজবংশ হ'তে সুং রাজবংশের প্রারম্ভ (খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হ'তে দশম শতাব্দী পর্যন্ত)

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে সুই রাজবংশের রাজত্বকালে 'উ মি'-এর সঙ্কলনকার্য শেষ হয়। এই সময়ে ওয়াং হুসি-মিং নামে একজন কবি

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কবিতা লিখতেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল ইউয়ান ৎস্থ এবং তাঁর কবিতার বইয়ের নাম ছিল 'পু থিয়েন কো' (আকাশ গতির সঙ্গীত)। তাঁকে গ্রীক কবি এরাটাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই সমস্ত কবিতা অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করে। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে থু শু চি ছেং বিশ্বকোষ সঙ্কলনের সময় খ-গোল সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সূচনাতে 'পু থিয়েন কো'-এর বিষয়োপযোগী এক একটি কবিতা দিয়ে আরম্ভ করেছেন। এই বিশ্বকোষে স্থানাঙ্ক সমেত তারা-তালিকা দেওয়া আছে। ওয়াং হ্সি মিং-এর সমসাময়িক আর একজন জ্যোতির্বিদের সন্ধান পাওয়া যায়; তাঁর নাম লি পো। ইনি সুই রাজবংশের শেষের দিকে আকাশের বড় বড় তারামণ্ডলসমূহের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর এই বইয়ের নাম 'থিয়েন ওয়েন তা হ্সিয়াং ফু'।

তাং বংশের রাজত্বকালে, প্রায় ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে চিন শু (চিনবংশের ইতিহাস) এবং সুই শু (সুই বংশের ইতিহাস) লেখা হয়। এই দুই ইতিহাসের বিশেষ করে চিন শু-এর জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যায়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মনে হয়, লি পো-এর পিতা বিখ্যাত গণিতবিদ লি শুন ফ্যাং এবং তাঁর সহকর্মী ছাং সু উ-চি এই অধ্যায় লিখতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এরপরে অষ্টম শতাব্দীতে 'খাই ওয়ান চ্যান চিং' প্রকাশিত হয়। এই বই সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে এত অধিক মূল্যবান তথ্য আর কোথাও নাই; সেজন্য পরবর্তী যুগের জ্যোতির্বিদগণ, এমনকি সাধারণ লোকও এই বইখানার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এই সময়েই আই হ্সিং জীবিত ছিলেন। ইনি একজন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং চীনের ইতিহাসে ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ বলে পরিচিত। ইনি ভারতীয় ও গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন, এবং সেই প্রভাবে তিনি বিভিন্ন খ-বস্তুর খ-অক্ষাংশ ও খ-দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করেন। আই হ্সিং-এর নিজস্ব কোন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে তাঁর 'হ্সিউ ইয়াও আই কুয়াই' (সিউ এবং গ্রহের কক্ষ) এবং 'পাই তু ছি হ্সিং লিয়েন স্থং

আই কুবাই' (সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাত তারাব সঙ্গীত ও তাদের কক্ষ) ত্রিপিটকে স্থান পেবেছে। গ্রহণ গণনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ৭২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'তা ইয়েন' পঞ্জিকা প্রণযন কবেন।

সুই এবং তাং বংশের রাজত্বকালে অনেক ভাবতীয জ্যোতির্বিদও চীনেব পঞ্জিকা সংস্কারে অংশগ্রহণ কবেন। শি শু ইতিহাসে ব্রাহ্মণীয জ্যোতির্বিদ্যাব বই 'পো-লো-মেন' (ব্রাহ্মণ) থিযেন ওযেনচিং-এব উল্লেখ আছে। অবশ্য এ বইখানার এখন আর কোন সন্ধান পাওবা যায় না। এ বইখানা সম্ভবতঃ ৬০০ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয। এব পরের দুই শতাব্দীতে অনেক ভারতীয জ্যোতির্বিদ চীনেব রাজধানীতে বাস করতেন বলে জানা যায। ৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে 'হ্‌সিউ ইযাহ্ চিং' (সিউ ও গ্রহসূত্র) নামে একখানা বৌদ্ধ-জ্যোতিষ-গ্রন্থেব অনুবাদ কবেন পু খুং (অমোঘ বজ্র)। এর পাঁচ বৎসর পরে তাঁর চীনা শিষ্য এবং তরুণ জ্যোতির্বিদ ইয়াং চিং ফ্যাং বলেন, "যারা পাঁচটি গ্রহের অবস্থান জানতে চায তারা যেন ভাবতীয় পদ্ধতি অবলম্বন কবে। এই পদ্ধতিব সাহায্যে কোন্ গ্রহ কোন্ সিউতে আছে, তা জানা যায়। আমাদের দেশে তিন গোষ্ঠীর ভাবতীয় জ্যোতির্বিদ আছেন; চিযাযেহ (কাশ্যপ), চুথান (গৌতম) এবং চুমোলো (কুমাব)। এঁরা প্রত্যেকেই জ্যোতির্বিদ্যাসঙ্ঘের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু বর্তমানে প্রভু চুথানেব পঞ্জিকা-পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয এবং চীন সবকারে তাঁর মতেরই প্রাধান্য দেওবা হয।"

৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে লি শুন ফ্যাং, যে 'লিন তে' পঞ্জিকা প্রণযন কবেন, সেখানে ভারতীয জ্যোতির্বিদ চিযাযেহ্ হ্‌সিয়াও-ওয়াই তাঁকে সাহায্য করেন। এবপরে প্রায ৭০৮ খ্রীস্টাব্দে চিযাযেহ্ চিহ্ চুং এবং এব ৮০ বৎসর পরে চিযাযেহ চি সামরিক কার্যে জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োগ করেন। গৌতম বংশেব প্রথম জ্যোতির্বিদ ছিলেন চুথান লো। ইনি ৬৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দে দুইখানা পঞ্জিকা প্রণযন কবেন। কিন্তু এঁদেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন চুথান হ্‌সি-তা (গৌতম সিদ্ধার্থ?)। তিনি 'খাই-ইউযান চ্যান চিং' সঙ্কলন করেন। গৌতম গোষ্ঠী পঞ্জিকা সংক্রান্ত বিষযে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

আই-হ্সিং-এর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। ৭২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর রাজকীয় নির্দেশে তাঁর বই 'তা ইয়েন লি শু'-এর সঙ্কলন করা হয়। এই সঙ্কলন করেন চ্যাং ইউয়েহ এবং সেন হ্সুয়ান চিং। কিন্তু ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ছুথান চুয়ান ঘোষণা করেন যে, আই-হ্সিং-এর 'তা ইয়েন' পঞ্জিকা 'চিউ-চিহ' (নবগ্রহ) পদ্ধতির অনুকরণ মাত্র। কিন্তু কোনো-ভাবেই তাঁরা আই হ্সিং-এর প্রভাবকে চীন থেকে দূর করতে পারেন নাই। চুমোলো গোষ্ঠী আই-হ্সিং-এর মতাবলম্বী ছিল। তাঁদের একজন 'তা ইয়েন' পঞ্জিকা অনুসারে সূর্যগ্রহণ গণনা পদ্ধতি নির্ণয় করেন।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ চীনা জ্যোতির্বিদ্যার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। খ-বিষুবকে পূর্বের মত ৩৬৫¼ ডিগ্রীতে ভাগ করা হতে থাকে। গ্রীক রাশিমালা কেবলমাত্র অনুবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই যুগে পারস্যদেশীয় জ্যোতির্বিদগণও চীনদেশে আসেন। ৭১৯ খ্রীস্টাব্দে জাগনিয়ান (?) থেকে তা-মু-শে নামে একজন পারস্যদেশীয় জ্যোতির্বিদ চীনে আসেন, সে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শতাব্দীর চীনা-বৌদ্ধ-বিবরণীতে পারস্যদেশীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক শব্দ-সমূহের প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। হ্সিউ-ইয়াও চিং-এ পারস্যভাষায় গ্রহসমূহের নাম পাওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন দেশীয় জ্যোতির্বিদ্যার সংমিশ্রণে এ বিষয়ে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চীনে সমৃদ্ধশালী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত জ্যোতির্বিদ্যা সাহিত্যের কোন কোন অংশ ত্রিপিটকে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ছি ইয়াও হ্সিং ছেন পিয়েহ হ্সিংফা (সাতটি বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক ও মণ্ডলের বিভিন্ন প্রভাব) অংশে হ্সিউসমূহের তালিকা এবং এদের প্রত্যেক হ্সিউয়ের তারাসংখ্যা দেওয়া আছে। ছি ইয়াওলি নামে এক প্রকার পঞ্জিকা ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে সরকারী-ভাবে গ্রহণ করা হয়। এই পঞ্জিকার প্রণেতা ছিলেন উও পো-শান। বর্তমানে এরূপ মনে করা হয় যে, যে সমস্ত গ্রন্থে সাতটি গ্রহের বা জ্যোতিষ্কের উল্লেখ আছে এবং গ্রহের নামানুসারে সপ্তাহের সাতদিনের

নামকরণ করা হয়েছে, সে সমস্ত গ্রন্থে পারস্যদেশীয় জ্যোতিবিদ্যার প্রভাব আছে। 'শি শু'-তে এইরূপ বাইশখানা গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া এইরূপ আরো প্রায় কুড়িখানা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

(গ) সুং, ইউয়ান, মিং ও চিং যুগে জ্যোতির্বিদ্যা (দশম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত)

সুং বংশের রাজত্বকালে চীন সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধশালী ও উন্নত দেশে পরিণত হয়। এই যুগে জ্যোতিবিদ্যার প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় সুং সম্রাটের (৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৯৯৭ খ্রীস্টাব্দ) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একটি গ্রন্থাগার (থিয়েন ওয়েন কো) ছিল। এই গ্রন্থাগারে মোট ২৫৬১ খানা বই ছিল। এই সমস্ত বইয়ের কিছু কিছু নাম এখনও পাওয়া যায়। এই নামের তালিকা থেকে বোঝা যায়, সে সময় জ্যোতিবিদ্যা কতদূর প্রসার লাভ করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চেং ছিয়াও সম্রাটের বইয়ের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। এর নাম 'থুং চিহ্ লুয়েহ' (ঐতিহাসিক সঙ্কলন)। এতে জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ে ৩৬৯ খানা বইয়ের নাম পাওয়া যায়। এতে সাধারণ জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে ৭৩ খানা বইয়ের নাম আছে। এর মধ্যে 'লিং হ্‌সিয়েন থু চি' (বিশ্বগঠনে ধর্মীয় চিত্র), 'হুন থিয়েন থু চি' (খ-গোলকের চিত্র), 'হ্‌সিন থিয়েন লুন (আহ্নিক গতি সম্বন্ধে আলোচনা), 'হ্‌সিং শু' (তারার বিবরণ) ইত্যাদি নাম বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতীয় জ্যোতিবিদ্যা সম্বন্ধেও ছয়খানা বইয়ের নাম পাওয়া যায়। এই বইগুলির নাম 'পো-লো-মেন' (ব্রাহ্মণ) দিয়ে আরম্ভ। এ ছাড়া জ্যোতিষ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধেও বইয়ের নাম পাওয়া যায়।

সুং যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ একখানি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এ বইখানার নাম 'হ্‌সিন আই হ্‌সিয়াং ফা ইয়াও'। সু সুং ১০৮৮ খ্রীস্টাব্দে এই বইখানা প্রণয়ন করা আরম্ভ করেন এবং ১০৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই প্রণয়ন-কার্য শেষ হয়। এ বইখানাতে জ্যোতিবিদ্যা সংক্রান্ত এক প্রকার ঘড়ির

বিবরণ দেওয়া আছে। এর প্রথম অধ্যায়ে যন্ত্রটির প্রতিটি অংশের বিবরণ ও চিত্র দেওয়া আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে খ-গোলকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় প্রাসাদ ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের তারাচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যন্ত্রটির চালনা-কৌশল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বইখানা ছাড়া সুং যুগের আরো অনেক বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইউয়ান বা মোঙ্গল যুগে স্বভাবতই অন্যান্য মুসলিম দেশের, বিশেষ করে আরব ও পারস্যদেশের, জ্যোতির্বিদগণের সহযোগিতায় অনেক কাজ করা হয়। অন্যান্য মুসলিম দেশের ব্যবহৃত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রপাতি এই সময়ে চীনদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মারাঘার নাসির-উদ্দিন আল-তুসীর আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির অনুসরণে চীনে কুও শো-চিং নামে জ্যোতির্বিদ নানা প্রকার যন্ত্রপাতি তৈরী করেন। ১২৬৭ খ্রীস্টাব্দে পারস্য থেকে চীনে যে সাতটি যন্ত্র আমদানী করা হয়, সে সম্বন্ধে নানা-প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। ইউয়ান শি-এ পশ্চিম দেশ থেকে আনীত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রপাতির মডেল (হুসি ইউ আই হুসিয়াং) সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই যন্ত্রগুলি হালাকু খান কিম্বা তাঁর পরবর্তী সম্রাট কুবলাই খানকে পাঠানো হয়। মারাঘার মানমন্দিরের অন্যতম জ্যোতির্বিদ চা-মা-লু-তিং (জামালুদ্দিন) এই যন্ত্রগুলি চীনদেশে নিয়ে আসেন। এই জামালুদ্দিনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে অনেকে মনে করেন ইনি জামালুদ্দিন নাজ্জারী। মারাঘা থেকে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি চীনে আনীত হয়, সেগুলির চীনা অনুলিপি, আরবী-ফারসী নাম এবং চীনা নাম নীচে দেওয়া গেল।

চীনা অনুলিপি	আরবী-ফারসী নাম	চীনা অনুবাদ
১। ৎসা-থু-হা-লা-চি	যাতুল হালাকী (বলয়াধার)	হুন থিয়েন
২। ৎসা-থু শুও-পা-থাই	যাতুল শুবাতানি (দ্বিপদ যন্ত্র)	ৎশে-ইয়েন চু থিয়েন হুসিং ইয়াও চিহ ছি

৩। লু-হ্যা-মা-ই মিয়াও-ওয়া-চিহ্	কথামাহে মুবাজ্জা (অয়ন-ফলক)	তুং-হুসিযা চিহ্ কুযাই
৪। লু-হ্যা-মা-ই মুসগু-থা-ইউ	কুথামাহে মুসতাবিযা (বিষুবন ফলক)	ছুন ছিউ ফেন কুযাই
৫। খু-লাই-ই সা-ঘা	'কুরাই সামা' (খ-গোলক)	হুসিযে ওয়ান হুন বিযেন থু
৬। খু-লাই-ই এরংসু	কুবাই আর্দ (ভূ-গোলক)	তি লি চিহ্
৭। উ শু তু-এব-লা	আস্তারলাব	—

এরপরে জ্যোতির্বিদ্যা-সাহিত্য ক্রমেই বিরল হতে থাকে। খ্রীস্টান পাদ্রীদেব চীনে আগমনেব পবে পুনরায এ বিষযে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হ'তে থাকে। কিন্তু এব প্রায সবই জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষেব সংমিশ্রণ মাত্র। এ সমস্ত বইযেব ভিতবে হুয়াং তিং-এর লেখা 'থিযেন ওযেন তা ছেং কুযান থুয়াই চি ইয়াও' (দেখবার নলের অর্থাৎ দূরবীক্ষণেব ভিতব দিযে খ-বস্তুসমূহের পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পূর্বে একাদশ শতাব্দীতে লিযাও-এর ইযেহলু-শুন কর্তৃক বচিত 'হুসিং মিং ৎস্থং কুযা' (তারাসমূহের সাধারণ বিবরণ) বইখানারও উল্লেখ করা যেতে পারে। এরপরে ইউয়ান যুগের চাও-ইউ-ছিন লিখিত 'কো হুসিয়াং হুসিন শু' (খ পদার্থসমূহেব নূতন ব্যাখ্যা) বইখানা প্রকাশিত হয এবং মিং যুগে ওযাং ওযাই এই বইখানাব সংশোধিত সংস্কবণ প্রকাশ করা হয। অত্যন্ত দুঃখেব বিষয যে, ইউযান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিবিদ কুও-শুও-চিং-এব লেখা কোন বইযেব সন্ধান পাওযা যায না। তবে একটা বিষয উল্লেখ কবা যেতে পারে যে, ১৩১৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুব পরে, মা তুযান-লিন এর 'ওযেন হুসিযেন থুও খাও' (সাধাবণ ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান) প্রকাশিত হয। এই বইতে অন্যান্য বিষযেব সাথে ধূমকেতু, নবতাবা, উল্কা প্রভৃতিব আবির্ভাবের বিস্তারিত তালিকা দেওযা আছে। এই তালিকার উপরে ভিত্তি করেই পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক তালিকা প্রণীত হয।

মিং যুগে চীনের সাধারণ অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা সাহিত্যেরও অবনতি ঘটে। উপরে যে ওয়াং ওয়াই-এর কথা বলা হয়েছে, এ বইখানা প্রকাশের কিছুদিন পরে ওয়াং কো-তা এর 'হুসিয়াং ওয়াই হুসিন ফিয়েন' (তারাজ্ঞানের নূতন বিবরণ) প্রকাশিত হয়। এর পরে খ্রীস্টান পাদ্রীদের আগমন ঘটে, এবং তাঁরা মিং ও চিং যুগে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বই প্রকাশ করতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বতত্ত্ব

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন চীনে তিনটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ শাই ইউং ১৮০ খ্রীস্টাব্দে এই তিন দলের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

"যাঁরা আকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁদের তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম সম্প্রদায়ের নাম চু পাই, দ্বিতীয় সম্প্রদায় হুস্রয়ান ইয়েহ এবং তৃতীয় সম্প্রদায় হুন থিয়েন। চু পাই-তত্ত্বে বর্ণিত প্রণালী ও গণনা-পদ্ধতি যদিও এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু এই গণনা নির্ভুল বা প্রমাণসহ নয়। সেজন্য সরকারী জ্যোতির্বিদ্যা-গণনাতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হত না। একমাত্র হুন সম্প্রদায়ের তত্ত্বই অনেকটা প্রমাণসহ এবং প্রকৃত ঘটনার অনেকটা নিকটবর্তী বলে মনে হয়।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ৎস্যু কেং চি তাঁর বিখ্যাত 'থিয়েন ওয়েন লু' গ্রন্থে প্রায় একই কথা বলেছেন; তবে তিনি প্রথম সম্প্রদায় ও তাদের তত্ত্বের নাম চু পাই ব্যবহার করেন নাই, তার বিকল্পে, কাই থিয়েন নাম ব্যবহার করেছেন। এই তত্ত্বটি এখন কাই থিয়েন তত্ত্ব নামেই পরিচিত।

(১) কাই থিয়েন বিশ্বতত্ত্ব মতবাদ

এই তত্ত্বে পৃথিবীকে একটা উল্টানো গামলার মত মনে করা হতো আর আকাশকে মনে করা হতো সেই গামলার সমকেন্দ্রিক গোলাকার একটি আচ্ছাদন। এই দুইটি সমকেন্দ্রিক গোলকের পরিধির ভিতরে দূরত্ব

৮০,০০০ লি। আকাশের মধ্যস্থলে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে মানুষের অ ইকুমেন অবস্থিত। বৃষ্টির পানি পৃথিবীর উপরে প'ড়ে চারদিকে গড়িয়ে যায়, তাতে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়। আকাশ গোল, পৃথিবী (ভিত্তি) বর্গাকৃতির। পৃথিবীর একধার থেকে আকাশের দূরত্ব ২০,০০০ লি। অতএব পৃথিবীর মাঝখান থেকে আকাশের দূরত্ব সবচেয়ে বেশী। আকাশ ডানদিক থেকে বাম দিকে আবর্তিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে সূর্য, চন্দ্রও আবর্তিত হয়। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্রের বামদিক থেকে ডানদিকে আর একটি আবর্তন-গতি আছে। এই গতি আকাশের আবর্তন-গতি অপেক্ষা অনেক মৃদু। সূর্য ও চন্দ্রের উদয় বা অস্ত বলে কিছু নাই; চোখের ধাঁধা মাত্র। এরা কোন সময়েই পৃথিবীর নীচে যায় না।

বিষুবন চলনের আবিষ্কর্তা ইউ হুসির পিতামহ ইউ সুং ২৬৫ খ্রীস্টাব্দে লিখিত 'ছিয়ুং থিয়েন লুন' গ্রন্থে বলেন,

"আকাশসমূহের আকার অত্যন্ত বিশাল এবং মুরগীর ডিমের মত অবতল। এদের প্রান্তসমূহ পৃথিবীর চার প্রান্তের চার সমুদ্রে মিলিত হয়। এরা আদিম বাষ্প ইউয়ান ছি তে ভাসমান। উল্টিয়ে রাখা পেয়ালার ভিতরে বাতাস আছে বলে যেমন তার ভিতরে পানি ঢুকতে পারে না, আকাশসমূহও ঠিক একই কারণে সমুদ্রের পানির উপরে ভাসমান থাকে। মেরুর চারদিকে আবর্তন করতে করতে সূর্য পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পুনরায় পূর্বদিকে দেখা দেয়। কিন্তু সূর্য কখনও পৃথিবীর নীচে যায় না বা পৃথিবীর নীচে থেকেও উত্থিত হয় না। আকাশেরও মেরু আছে। উত্তর আকাশ পৃথিবী অপেক্ষা ৩০ ডিগ্রী নীচু (অর্থাৎ উত্তর আকাশের মেরু পৃথিবীর মেরু অপেক্ষা ৩০ ডিগ্রী বেশী অবনত)। মেরু উত্তরদিকে অবনত এবং পূর্ব-পশ্চিম রেখার সাথে ৩০ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে। মেরুর পূর্ব-পশ্চিম রেখার ১০০০ লি দক্ষিণে মানুষের বাস। অতএব পৃথিবীর কেন্দ্র (আইকুমেন) মেরুর ঠিক নীচেও অবস্থিত নয়। এই কেন্দ্র আকাশ ও পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু। নিজ কক্ষে ভ্রমণকালে সূর্য মেরু প্রদক্ষিণ

করে। শীতায়ন আদিবিন্দুতে মেরুর অবস্থান সূর্যপথের ১১৫ ডিগ্রী উত্তরে।"

চু পাই এর মতে, সূর্য মাত্র ১৬৭,০০০ লি ব্যাস পরিমিত জায়গা আলোকিত করতে পারে। এই জায়গার বাইরে যে সমস্ত জায়গা, সেখানে রাত্রি এবং এর ভিতরের জায়গাতে দিবা। এইভাবে সূর্যকে ধ্রুব-পরিক্রমণকারী বলে মনে করা হতো। সূর্য সার্চ-লাইটের রশ্মির মত এক এক সময় পৃথিবীর এক এক অংশ আলোকিত করে। বিভিন্ন ঋতুতে সূর্য মেরু হতে দূরত্বে অবস্থান করে এবং সাতটি সমান্তরাল নতিবৃত্তের (হেং চু) মধ্যে সাতটি বিভিন্ন পথে (চিয়েন) পরিভ্রমণ করে। এই সাতটি পথের সবচেয়ে বাইরের পথ গ্রীষ্মায়ন আদিবিন্দুর নতিবৃত্ত এবং সবচেয়ে ভিতরের পথ শীতায়ন আদি বিন্দুর নতিবৃত্ত।

কাই থিয়েন বিশ্বতত্ত্ব অত্যন্ত প্রাচীন। এ সম্বন্ধে চিন শু-তে নিম্ন-লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

পাও হ্সি আকাশের পরিধিকে বিভক্ত করবার জন্য এবং পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম ডিগ্রীর প্রবর্তন করেন। এ থেকেই কাই থিয়েন বিশ্বতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী যুগে চু এর ডিউক এই তত্ত্ব শ্যান এবং ইইন জাতির নিকট থেকে শিক্ষা করেন এবং তাঁর আদেশে এই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা করা হয়। এ জন্যই এই তত্ত্ব চুপাই তত্ত্ব আখ্যা পেয়ে এসেছে। পাই অর্থ লম্ব বাহু অথবা নমনদণ্ড অর্থাৎ ছায়ার দৈর্ঘ্য নিরূপণের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের উপর দণ্ডায়মান দণ্ড।

'কাই থিয়েন তত্ত্বে' বলা হয় যে, পৃথিবী উল্টানো একটা গামলার মত; আর আকাশ তার উপরে বাঁশের তৈরী টুপির মত একটা আচ্ছাদন। আকাশ এবং পৃথিবী উভয়ের কেন্দ্রই সমুন্নত এবং উভরেই অপেক্ষাকৃত নিম্ন। আকাশ এবং পৃথিবী উভয়ের কেন্দ্রই উত্তর মেরুর নীচে অবস্থিত। সেখানে পৃথিবী সবচেয়ে উঁচু এবং সেখান থেকেই চারদিক ঢালু হয়ে গেছে। তিনটি জ্যোতিষ্ক (সূর্য, চন্দ্র ও তারাসমূহ) কোন সময়ে উজ্জ্বল দেখা যায় আবার কোন সময় অদৃশ্য থাকে এবং এইভাবেই

দিন-রাত্রির সৃষ্টি হয়। শীতায়নের আদিবিন্দুতে সূর্য যে স্থানে থাকে, সেই সর্ব-বহিস্থ বাধা (নতিবৃত্ত—হং) অপেক্ষা আকাশের কেন্দ্র ৬০,০০০ লি বেশী উঁচু। বহিস্থ বাধার ভিতরে পৃথিবীর যে অবস্থান, তা থেকে উত্তর মেরুর অবস্থান ৬০,০০০ লি বেশী উঁচু। পৃথিবী হতে সূর্য সর্বদা ৮০,০০০ লি দূরে থাকে। সূর্য আকাশের সঙ্গে যুক্ত; শীত ও গ্রীষ্মের অন্তবর্তী সময়ে সমান বেগে সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তন হয়। এই গতিপথে সূর্য সাতটি বাধা (নতিবৃত্ত) এবং ছয়টি রাস্তা অতিক্রম করে। নমনের ছায়ার দৈর্ঘ্য পর্যবেক্ষণ ক'রে এবং সদৃশ সমকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে প্রত্যেক বাধার পরিধি ও ব্যাস লি তে নির্ণয় করা যেতে পারে। মেরুর দূরত্ব এবং দূরের ও নিকটের সমস্ত গতি নমন ও সমকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। সে জন্য এই প্রণালীকে চু পাই প্রণালী বলে।

চু পাই সম্প্রদায়ের মতে, আকাশ খোলা ছাতার মত গোলাকার এবং পৃথিবী দাবার বোর্ডের মত বর্গাকার। আকাশ ডানদিক থেকে বামদিকে ঘোরে। সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই ডান দিকে ঘোরে এবং সেই-সঙ্গে আকাশের সাথে সাথে বামদিকেও ঘোরে। এজন্য যদিও এরা প্রকৃতপক্ষে পূর্বদিকে ঘোরে, তবু আকাশের ঘোরার জন্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।

চীনা জ্যোতির্বিদগণের একটি অতি প্রাচীন আবিষ্কার হলো, পৃথিবীর মেরুর নতি। চীনের অতি প্রাচীন উপাখ্যানেও এর উল্লেখ আছে যে, পুরাকালে কুং কুং এবং চুয়ান হ্‌সু-এর মধ্যে রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ হয়। অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে কুং কুং অনাবর্তনশীল পাহাড় (পৃথিবীর মেরু)-কে প্রচণ্ড আঘাত করে। আকাশের স্তম্ভ ভেঙে যায় এবং পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের বন্ধন ছিঁড়ে যায়। আকাশ উত্তর-পশ্চিমে নত (থিয়েন ছিং হ্‌সিপাই) হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক খালি হয়ে যায়।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হ্‌সু কেং-চিহ্-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর অক্ষ সম্বন্ধে কাই থিয়েন সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার মতবাদ

ছিল। এর একটি মতবাদে বলা হতো যে, আকাশ একটি গাড়ীর আচ্ছাদনের (চেহ্ কাই) মত, এবং আটটি সীমার (চি) মধ্যে পরিভ্রমণ করে। আর একটি মতবাদে বলা হয় যে, আকাশ শঙ্কু জাতীয় একটি বাঁশের টুপির মত ; এর কেন্দ্র অতি উঁচুতে অবস্থিত এবং পাশগুলি নীচের দিকে নামানো। তৃতীয় একটি মতবাদে বলা হয় যে, আকাশ একটা ঢালু গাড়ীর (আই ছে কাই) আচ্ছাদনের মত, দক্ষিণে উঁচু এবং উত্তরে নীচু।

(২) হুন থিয়েন বিশ্বতত্ত্ব মতবাদ (খ-গোলক মতবাদ)

ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের অনুরূপ একটি মতবাদও চীনদেশে প্রচলিত ছিল। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে শিহ্‌ শেন যখন চীনদেশে সর্বপ্রথম তারা-তালিকা প্রণয়ন করেন, এই মতবাদ তখন থেকেই প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। ইয়াং হ্‌সিয়াং তাঁর গ্রন্থ 'ফা ইযেনে' মত প্রকাশ করেন যে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোহ্‌সিয়া হুং এই মতবাদ প্রথম আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ চ্যাং হেং-এর 'লিং হ্‌সিয়েন' গ্রন্থে। এখানে তিনি বলেন, আকাশের পথসমূহ (থিয়েন লু) অঙ্কন করতে খ-বস্তুসমূহের স্বর্গীয় পথ (লিন কুয়াই) নির্দিষ্ট করতে এবং সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির মূল নির্ণয় করতে সাধু-সম্রাটগণ সর্বপ্রথম একটি খ-গোলক (হুন থি) স্থাপন করেন, এইভাবে তাঁদের যন্ত্রপাতি সংশোধন ক'রে ডিগ্রীর (চেং ই লিতু) প্রবর্তন করেন এবং রাজকীয় মেরু স্থির করেন। বিশ্বের সমস্তই বিশ্বস্তভাবে আকাশ মেরুর চারদিকে ঘোরে। এই সমস্ত স্থাপন করবার পরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, আকাশের একটি নিয়মিত গতি (ছ্যাং) আছে। এই সমস্ত সাধুগণের পূর্ব পরিকল্পিত কোন তত্ত্ব ছিল না। তাঁরা ঘটনাসমূহকে যেভাবে দেখতেন, সেইভাবেই চিন্তা করতেন। এই সমস্ত ব্যাখ্যা করবার জন্যই আমি 'লিং হ্‌সিয়েন' গ্রন্থ রচনা করি।

পৃথিবীতে যেমন গঠিত আকার আছে, আকাশে তেমনি ঘটনা আছে। পৃথিবীতে যেমন নয়টি মহাদেশ (ইউ) আছে, আকাশেও তেমনি নয়টি অবস্থান (ওয়াই) আছে। আকাশে তিনটি ছেন (সম্ভবতঃ সূর্য, চন্দ্র ও তারাসমূহ) আছে, পৃথিবীতে তিনটি হ্‌সিং (আকার ; সম্ভবতঃ মাটি, পানি ও বাতাস) আছে। ঘটনা এবং আকার উভয়কেই পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা যায়। বিশ্বে ও পৃথিবীতে হাজার হাজার জিনিস আছে, যারা একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও একে অন্যকে আক্রমণ করে। এই সমস্ত জিনিস একটি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং পরস্পরকে প্রভাবান্বিত (হুজু-জান হ্‌সিয়ান সেং) করে। মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে সাধু তিনি চিকাং (প্রকৃতির সমন্বয় ধর্ম) নির্ণয় করেন। এইভাবে তাঁরা খ-অক্ষাংশ (চিং ওয়াই) এবং আট সীমা (চি) নির্ণয় করেন। গোলকসমূহ আবদ্ধ রাখবার বন্ধনীর (ওয়াই) ব্যাস ২০,৩২,৩০০ লি ; উত্তর-দক্ষিণ দিকে এই ব্যাস ১০০০ লি কম এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১০০০ লি বেশী। আকাশ ও পৃথিবীর ভিতরের দূরত্ব আটটি সীমার ভিতরের দূরত্বের অর্ধেক এবং পৃথিবীর নীচের গভীরতাও এই দূরত্বের সমান। দাগ কাটা হুন যন্ত্র (থুং এরহ্‌, তু চিহ্‌ হসে শিহ্‌ হুন আই) দ্বারা এই পরিমাপ করা হয়। এই গণনার জন্য দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নমন-দণ্ডের ছায়া দ্বারা খ-গোলক ও ভূ-গোলকের (হুন তি চিহ্‌) ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। উত্তর বা দক্ষিণে নমনের অবস্থানের এক হাজার মাইল দূরত্বকে ছায়ার দৈর্ঘ্যের এক ইঞ্চি দ্বারা নির্দেশ করা হয়। এইভাবে উপরের সমস্ত গণনা করা যায়। কিন্তু এরপরে কি আছে, সে কথা কেউ জানে না। একেই মহাবিশ্ব (ইউ চু) বলা হয়। এর কোন শেষ (উ চি) নাই, কোন সীমা (উ ছিয়াং) নাই। আকাশে দুইটি চিহ্‌ (আই : সূর্য ও চন্দ্র) উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারার (শু হসিং) চারদিকে নৃত্য করে। দক্ষিণ মেরু দেখা যায় না ; সেজন্য সাধুগণ এর কোন নাম দেন নাই।

এইরূপে নিয়মিতভাবে আকাশ ঘুরতে থাকে এবং কখনও কেন্দ্র পরিত্যাগ করে না। শীত ও গ্রীষ্মে সমস্ত জীবের পুষ্টিসাধন করতে করতে চার ঋতুর আবির্ভাব হয়।

চ্যান হেং তাঁর 'হুন আই চু' গ্রন্থে বলেছেন,

"আকাশ মুরগীর ডিমের মত; পৃথিবী সেই ডিমের হলুদ অংশের মত, আকাশের কেন্দ্রে অবস্থিত। আকাশ বৃহৎ এবং পৃথিবী ক্ষুদ্র। আকাশের নীচের দিকে পানি আছে। আকাশ বাষ্পের (ছি) উপরে স্থাপিত এবং পৃথিবী পানির উপরে ভাসমান।

"আকাশের পরিধি ৩৬৫¼ ডিগ্রীতে বিভক্ত; এর অর্ধেক, অর্থাৎ ১৮২⅝ ডিগ্রী পৃথিবীর উপরে এবং আর অর্ধেক পৃথিবীর নীচে অবস্থিত। এইজন্য আঠাশটি হ্সিউ-এর মাত্র অর্ধেকটি একসঙ্গে দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু আকাশের দুই প্রান্ত; উত্তরমেরু আকাশের মাঝখানে পৃথিবীর ঠিক ৩৬ ডিগ্রী উপরে অবস্থিত। অতএব আকাশে যে সমস্ত তারা দেখা যায়, তাদের সবগুলিই ৭২ ডিগ্রী ব্যাসের একটি বৃত্তের ভিতরে নিবদ্ধ। দক্ষিণ মেরুর চারদিকে একটি বৃত্তের ভিতরের তারাসমূহ আমরা কোনদিনই দেখতে পাই না। দুই মেরুর দূরত্ব ১৮২ ডিগ্রী এবং আধ ডিগ্রীর একটু বেশী। রথের চাকার ঘূর্ণনের মতই এই আবর্তন।"

(৩) হ্সুয়ান ইয়েহ (অনন্ত মহাশূন্য) বিশ্বতত্ত্ব মতবাদ

হ্সুয়ান ইয়েহ বিশ্বতত্ত্বের সাথে বর্তমানে যে নামটি জড়িত হয়ে থাকে, সেটি খুব বেশী প্রাচীন যুগের নয়। এঁর নাম ছি মেং; ইনি হুন রাজবংশের সময়ের লোক। অনেকে মনে করেন, ইনি চাং হেং-এর একজন তরুণ সহকর্মী ছিলেন। অর্থাৎ ইনি খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। এঁর জীবনী সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না।

প্রায় এক শতাব্দী পরে কো হুং বলেন,

"হ্সুয়ান ইয়েন সম্প্রদায়ের সমস্ত বই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ছি মেং নামে একজন গ্রন্থাগারিক এই সম্প্রদায়ের বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ

ছিলেন। এই মতবাদ অনুসারে আকাশ শূন্য এবং সম্পূর্ণরূপে বস্তুহীন (উ চিহ্)। আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আকাশ অত্যন্ত উঁচু এবং অনেক দূরে অবস্থিত; এর কোন সীমা (উ চি) নাই। মানুষ রং-কাণা (মু উ); এ ছাড়াও মানুষ বেশী দূরে দেখতে পায় না; সেজন্য আকাশ নীল দেখায়। অনেক দূর থেকে কোন হলুদ পাহাড়কে একপাশ থেকে দেখলে যেমন নীল দেখায়, অথবা দুই হাজার গজ গভীর খাদ যেমন গম্ভীর ও কালো দেখায়, এও অনেকটা সেইরূপ। কিন্তু পাহাড়ের নীল রং কিম্বা খাদের কালো রং তাদের প্রকৃত রং নয়।

"সূর্য, চন্দ্র ও তারার দল শূন্যস্থানে (ফু খুং চুং) ভেসে বেড়ায়; কোন সময় চলতে থাকে আবার কোন সময় স্থির হয়ে থাকে। এরা সমস্তই ঘনীভূত বাষ্প (চিয়েহ্ চি ছি)। এইভাবে সাতটি জ্যোতিষ্ককে কোন সময়ে দেখা যায় আবার কোন সময় অদৃশ্য থাকে; কোন সময় সামনে যায় আবার কোন সময় পিছনে যায়। মনে হয় প্রত্যকটি জ্যোতিষ্ক নিজের খামখেয়ালে চলে। এদের প্রত্যেকের অগ্র ও পশ্চাৎ গতি এক প্রকার নয়। এর কারণ এরা কোথাও কিছুর সঙ্গে যুক্ত নয় বা একে অন্যের সঙ্গেও যুক্ত নয়। খ-বস্তুসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ধ্রুবতারাই সব সময় একই জায়গায় থাকে। অন্যান্য তারা যেমন পশ্চিমে অস্ত যায়, কেবলমাত্র সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটি তারা সেরূপ অস্ত যায় না। সাতটি জ্যোতিষ্ক পূর্বদিকে পিছিয়ে পড়ে; সূর্য প্রতিদিন ১ ডিগ্রী এবং চন্দ্র প্রতিদিন ১৩ ডিগ্রী পিছনে যায়। এদের নিজস্ব প্রকৃতির উপর এদের গতি নির্ভর করে। এতে বোঝা যায় যে, এরা কোন কিছুর সঙ্গে যুক্ত নয়। আকাশের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এরূপ ঘটতে পারত না।"

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন চীনের এই বিশ্বতত্ত্ব গ্রীসের বিশ্বতত্ত্ব অপেক্ষা অনেক উন্নত। আরিস্টটল ও টলেমীর বিশ্বের সমকেন্দ্রিক স্ফটিক গোলকের যে ধারণা পাশ্চাত্য জগতকে এক হাজার বৎসরের অধিক সময় মোহমুগ্ধ করে রেখেছিল, মহাশূন্যে খ-বস্তুসমূহের

বিরল অবস্থানের কল্পনা তার চাইতে অনেক বেশী উন্নত। অনেক চীন-বিশারদ বলে থাকেন যে, প্রাচীন চীনের এই বিশ্বতত্ত্ব চীনের জীবন-যাত্রাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করতে পারে নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়। হুন থিয়েন মতবাদের আলোচনাতে চ্যাং হেং-এ যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন যে, খ-গোলকের বৃহৎ বৃত্তের বাইরে আরো অনেক শূন্যস্থান আছে। এতে হ্‌সুয়ান ইয়েহ মতবাদের কিছুটা প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। চীনের জ্যোতির্বিদ্যাকে অনেকে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বলে অবজ্ঞা করতে চান। তাঁদের মতে এই জ্যোতির্বিদ্যা জ্যামিতি-ভিত্তিক নয়, সেজন্য কোন বিশ্বতত্ত্ব এখানে দানা বেঁধে উঠতে পারে নাই। অন্যপক্ষে গ্রীকদের সম্বন্ধে এ কথা বলা যেতে পারে যে, তাদের জ্যোতির্বিদ্যা অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে জ্যামিতি-ভিত্তিক ছিল এবং তার ফলে যে সমস্ত দার্শনিক-তত্ত্বকথার সৃষ্টি হয়, সে সবের মোহজাল কাটিয়ে উঠতে অত্যন্ত বেশী সময়ের দরকার হয়। বৃত্তের সর্বাঙ্গীণ-সুন্দরতার (perfectness) জন্য এপিসাইকেলের উপর এপিসাইকেল, কক্ষের উপর কক্ষ, প্রভৃতি নানাপ্রকার উদ্ভট কল্পনার বা তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। আর এই সমস্ত তত্ত্বকথা মানুষের জীবনে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, তার জন্য অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে, টাইকো, কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিওর মত লোকদিগকে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বিষুবনের অগ্রগতির আবিষ্কারক ইউ হ্‌সি এই হ্‌সুয়ান ইয়েহ মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর 'আন থিয়েন লুন' গ্রন্থে ৩৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি বলেছেন,

"আমি মনে করি আকাশের উচ্চতা অনন্ত, এবং পৃথিবীর নীচের গভীরতাও অনন্ত। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে, আকাশের নিজের কোন গতি নাই এবং পৃথিবীর নীচেও গতিশূন্য। একটি অপরটিকে আচ্ছাদিত করে রাখে; একটি বর্গাকার হলে অন্যটিও বর্গাকার; একটি গোলাকার হলে অন্যটিও গোলাকার। আকারে এদের কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। জ্যোতিষ্কসমূহ চারদিকে ছড়ানো আছে; সেগুলি নিজ নিজ

কক্ষে পরিভ্রমণ করে। কোন সময়ে দেখা যায়, আবার কোন সময়ে দেখা যায় না।"

হ্‌সুয়ান ইয়েহ তত্ত্বে তাও-ধর্মের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। লাও ৎসের 'মহাশূন্য' (হ্‌সু উও) এবং লিয়েহ ৎসুর 'স্তূপীকৃত ছি' (চি ছি)-এর সাদৃশ্য আছে বলে অনেকে মনে করেন। এ সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায়, তার অধিকাংশই কো হুং এবং লি শুন ফিং-এর লেখা থেকে। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তেং মু-এর 'পা ইয়া ছিন' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

"আকাশ ও পৃথিবী অত্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু সমস্ত মহাশূন্যের (হ্‌সু খু) তুলনায় এরা অতি ক্ষুদ্র শস্যকণার মত। সমস্ত মহাশূন্য যেন একটি বিরাট মহীরুহ, পৃথিবী ও আকাশ এর একটি ফল মাত্র। সমস্ত মহাশূন্য যেন একটি বিরাট সাম্রাজ্য, এবং পৃথিবী ও অকাশ এই বিরাট সাম্রাজ্যের এক একজন লোক মাত্র। একটি মহীরুহে অনেক ফল আছে, একটি সাম্রাজ্যে অনেক লোক আছে। আমরা যে আকাশ ও পৃথিবী দেখি, এ ছাড়া আর কোন আকাশ বা পৃথিবী নাই, এরূপ মনে করবার মত অযৌক্তিক আর কিছু হতে পারে না।"

যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বা যে সমস্ত জাতি এইরূপ বিশ্বাস করত, তারা যদি জানত যে, আমাদের ছায়াপথ ছাড়া আরো অনেক ছায়াপথ আছে, তা হলে তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়ীভূত হতো। সর্বশেষে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চু হ্‌সি বলেছেন, "আকাশ অশরীরী এবং শূন্য মাত্র (থিয়েন উও থি)।"

কাই থিয়েন মতবাদ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ৫২৫ খ্রীস্টাব্দে লিয়াং বংশের সম্রাট উ তি তাঁর ছ্যাং ছুন হলের দরবারে এই মতবাদকে সরকারী মতবাদ বলে স্বীকার করে নেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাই থিয়েন ও হুন থিয়েন সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়। এই ব্যাপারে ৎসুই লিং-এন এবং হ্‌সিন তু ফ্যাং এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেন যে, এই দুইটি মতবাদের প্রত্যেকটি নিজে

নিজে অর্ধসত্য, দুইটি মতবাদ মিলে পূর্ণ সত্য। অতএব পূর্ণ সত্যকে জানতে ও স্বীকার করতে হলে দু'টি মতবাদকেই জানতে ও স্বীকার করতে হবে। এরপরে দেখা যায় যে, হুন থিয়েন মতবাদকেই একমাত্র সরকারী মতবাদ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

অন্য মতবাদ

এই তিনটি মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শতাব্দীতে আরো একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। এই মতবাদ অনুসারে মহাশূন্যে 'শক্ত বায়ু' (কাং ছি বা কাং ফেং) দ্বারা গ্রহ, তারা ইত্যাদি স্থির থাকে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে শাও ইউং এবং চু হ্সি সর্বদা এই শক্ত বায়ুর উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন, এই বায়ু জ্যোতিষ্কসমূহকে আকাশে আবদ্ধ রাখে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এই শক্ত বায়ুর সাথে ভারতীয় পুরাণের সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। অবশ্য এরূপ মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় গ্রন্থ 'লোকস্থিতি অভিধর্ম শাস্ত্র' (লি শিহ আ-পি-থান লুন) চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই গ্রন্থখানা চীনা জ্যোতির্বিদ্যার উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় জ্যোতিষ্ক

অতি প্রাচীনকাল থেকে চীনা বিজ্ঞানে কল্পনা করা হ'তো যে, সূর্য অগ্নিময় ইয়াং (পুরুষ) এবং চন্দ্র জলময় ইয়িন (স্ত্রী)। পৃথিবীও ইয়িন। প্রাচীনকাল হতেই সূর্যকে থাই ইয়াং (জ্যেষ্ঠ পুরুষ) এবং স্থির তারাসমূহকে হ্সিয়াও ইয়াং (কনিষ্ঠ পুরুষ) বলা হতো। আর চন্দ্রকে থাই ইয়িন (জ্যেষ্ঠা স্ত্রী) এবং গ্রহসমূহকে হ্সিয়াও ইয়িন (কনিষ্ঠা স্ত্রী) বলা হতো। এতে মনে হয় যে, পুরাকাল হতেই চীনে, স্বীয় আলোকে উজ্জ্বল ও প্রতিফলিত আলোকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে পার্থক্য করা হতো।

এ সম্বন্ধে 'চু পাই' গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সূর্য চন্দ্রকে আকার দান করে; সেজন্য চন্দ্র আলো

দেয় (জিহ্ চাও ইউযেহ, ইউয়েহ কুয়াং নাই ছু, কু ছেং মিং ইউয়েহ্)। এই গ্রন্থ হ্যান রাজবংশের পূর্বের খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা বলে অনেকে মনে করেন। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে চিং ফেং লিখেছেন, "চন্দ্র এবং গ্রহসমূহ ইয়িন। তাদের আকার আছে, কিন্তু আলো নাই। সূর্যের আলোতেই এরা আলোকিত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে সূর্য গোল এবং চন্দ্র দর্পণের মত। অনেকে চন্দ্রকেও বলের মত বলে মনে করতেন। চন্দ্রের যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে, সে অংশ উজ্জ্বল দেখায় এবং যে অংশে আলো পড়ে না, সে অংশ অন্ধকার দেখায়।"

ভারতবর্ষ হতে রাহু (লো-হু) এবং কেতুর (চি-তু) ধারণাও চীনে অনুপ্রবেশ করে। চীনেও এই দুইটি পাতবিন্দুকে দুইটি অন্ধকার গ্রহ বলে মনে করা হতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চীনা জ্যোতির্বিদ্যার বৈশিষ্ট্য

হ্‌সিউ পদ্ধতি

মিশরীয়, গ্রীক, ভারতীয় এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশীয় জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি ও চীনা জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রীস প্রভৃতি দেশীয় জ্যোতির্বিদ্যাতে সূর্যপথকে মূল বৃত্তরূপে বিবেচনা ক'রে তাকে বারোটি রাশিতে বিভক্ত করা হয় এবং এই সমস্ত দেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা এই রাশিচক্রের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চীনা জ্যোতির্বিদ্যাতে সূর্যপথের বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। বিষুববৃত্তই চীনা জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি। আধুনিক কালের জ্যোতির্বিদ্যাতে প্রাচীন চীনের জ্যোতির্বিদ্যার মতই বিষুববৃত্ত ও উত্তর খ-বিষুব মেরুকেই জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশে এইরূপ বিভিন্ন ভিত্তি গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ একটি ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। সূর্য ঋতু নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সূর্যের উজ্জ্বল আলোর জন্য আকাশের অন্য কোন তারা দেখা যায় না। সেজন্য অন্যান্য তারাসমূহের ভিতরে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। তারাসমূহের ভিতরে চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ঋতুর পূর্বাভাস জানতে হ'লে তারাসমূহের ভিতরে সূর্যের অবস্থান জানা প্রয়োজন। এই অবস্থান প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় বটে, তবে অপ্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে যে সমস্ত তারার উদয় হয়, সেগুলি লক্ষ্য ক'রে সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা যেতে পারে। আবার সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে যে সমস্ত তারাকে পূর্ব আকাশে উঠতে দেখা যায়,

তাদের সাহায্যেও সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা যেতে পারে। কোন ঋতুর আগমনে যে সমস্ত তারা সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে বা সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে পূব আকাশ দেখা দেয়, সেগুলি চিনতে পারলেই, এবং ঐ তারাগুলি পুনরায় ঐরূপ উদয় হলে বোঝা যাবে যে, সেই ঋতুর আবার আগমন হচ্ছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে যে সমস্ত তারার উদয় হতো, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করেই গ্রীস এবং মিশরে ঋতুর আগমন ঘোষণা করা হতো। লুব্ধকের যখন এইরূপ উদয় লক্ষ্য করা যেত, মিশরীয় জ্যোতির্বিদগণ তখনই বুঝতে পারতেন যে, বর্ষাকাল আগত প্রায়; কিছুদিনের মধ্যেই নীলনদের দুই কূল বন্যার পানিতে ভেসে যাবে। তারাসমূহের ভিতরে সূর্যের আপাত বার্ষিক গতির ফলেই বিভিন্ন ঋতুর আগমনে বিভিন্ন তারার সঙ্গে সূর্যোদয় হয়। অন্যপক্ষে যে সমস্ত তারাকে সূর্যাস্তের পরে পূব আকাশে উদিত হতে দেখা যায়, সেগুলো দিনদিন পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং অবশেষে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়। আবার এই তারাগুলিকেই সূর্যোদয়ের সঙ্গে পূব আকাশে উদিত হতে দেখা যায়। এইভাবে চক্র পূর্ণ হয়। এই পর্যবেক্ষণের জন্য মেরু, খ-বিষুব বা মধ্যরেখা কোন কিছু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এইরূপ পর্যবেক্ষণের ফলেই পরোক্ষভাবে রাশিচক্রের কল্পনার সৃষ্টি হয়।

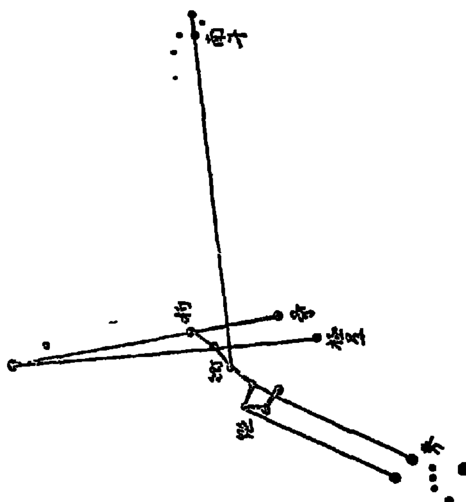
প্রাচীন চীনে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সঙ্গে তারার উদয় বা অস্ত দেখে ঋতুর আগমনবার্তা নির্ণয় করা হতো না। ধ্রুবতারা ও ধ্রুবপরিক্রমণকারী তারাসমূহ পর্যবেক্ষণ করেই এ বিষয় নির্ণয় করা হ'তো। যে তারা কোন সময়েই অস্ত যায় না, যে তারাকে সর্বদা ধ্রুবের চারদিকে পরিভ্রমণ করতে দেখা যায়, সেই তারাকে ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারা বলে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ তারার ঊর্ধ্ব সংক্রমণ (ধ্রুবতারার উপরে মধ্যরেখা অতিক্রম) বা অধঃসংক্রমণ (ধ্রুবতারার নীচে মধ্যরেখা অতিক্রম) সময় পর্যবেক্ষণ করেই চীনদেশে ঋতুর আগমন-সংবাদ জানা হতো। অতএব দেখা যায়, মধ্যরেখার কল্পনাই ছিল চীনা জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান ভিত্তি। চীনা জ্যোতির্বিদগণ দিনের বেলায় নমন-দণ্ডের সাহায্যে ছায়ার

দৈর্ঘ্য মাপতেন এবং রাত্রিতে বিভিন্ন তারার উধ্বর্' ও অধঃসংক্রমণ-কাল পর্যবেক্ষণ করতেন। 'চু লি' (চু রাজবংশের কার্যাবলীর বিবরণী) গ্রন্থের খাও কুংচি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, "দিনের বেলায় তাঁরা সূর্যের ছায়ার দৈর্ঘ্য পর্যবেক্ষণ করতেন ; এবং রাত্রিতে তাঁরা তারার মধ্যগমন পর্যবেক্ষণ করতেন ; এইভাবে তাঁরা প্রভাত ও সন্ধ্যা ঠিক করতেন। (চুও ৎশাম চু জিহ্ চুং চিহ্ চিং ; ইয়েহ্ খাও চিহ্ চি হুসিং ; আই চেং চাও হুসি।)"

যে কোন দিনের একই সময়ে (প্রাচীন চীনে সন্ধ্যা হুবটায), একই জায়গায় বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তারার মধ্যগমন হয়। 'শু চিং' গ্রন্থের ইয়াও তিয়েন অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটি তালিকা পাওয়া যায়। এইটিই পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সংক্রমণ-তালিকা।

স্বর্গের পুত্রের প্রভাব (সূর্যের আলো) যেমন পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মেরু থেকে কাল-বৃত্ত তেমনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতেই চীনে খ-বিষুবকে সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত করা হয়। কাল-বৃত্তসমূহ খ-বিষুবকে যে সমস্ত অংশে বিভক্ত করে, সেই অংশগুলিকে হুসিউ বলা হতো। এগুলি কমলালেবুর কোষের মত কাল-বৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ খ-গোলকের খণ্ডসমূহ। এই কাল-বৃত্তের উপরে যে সমস্ত তারা অবস্থিত, সেই সমস্ত তারামণ্ডল থেকে ঐ সমস্ত হুসিউ-এর নামকরণ করা হয়। এই গোলকখণ্ড থেকেই বিভিন্ন হুসিউ-এর ডিগ্রী পরিমাপ করা হতো। রাশিচক্র বা সূর্যপথের কল্পনা না করেই চীনদেশে যে সম্পূর্ণভাবে একটি খ-বিষুব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এ কথা পাশ্চাত্যের অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। হুসিউ সীমা নির্দিষ্ট করবার জন্য হুসিউ-এর সীমানির্দেশক তারার নতি বিবেচনা করবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। এই সমস্ত তারা খ-বিষুবের নিকটেই হোক বা দূরেই হোক, যে কোন অবস্থাতেই তাদের ব্যবহার করা সম্ভব হ'তো। কেননা ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারার সঙ্গে একই কাল-বৃত্তে অবস্থিত সমস্ত তারার অবস্থান সর্বদা জানা সম্ভব। কোন তারা যদি দিগন্তের নীচেও থাকে, তা হলে তার সঙ্গে একই নতিবৃত্তে অবস্থিত ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারার

মধ্য-গমন পর্যবেক্ষণ ক'রে সেই তারার মধ্য-গমনকাল নির্ণয় করা যায়। এইভাবেই চীনদেশে সৌর-নাক্ষত্রিক সমস্যার সমাধান করা হ'তো। আকাশের দৈনিক আবর্তনের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে, ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারার ঊর্ধ্ব ও অধঃ সংক্রমণ হতে খ-বিষুবের উপরের যে কোন বিন্দুর অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। এইভাবে তারাসমূহের ভিতরে আকাশে সূর্যের অবস্থান এবং সৌর ও নাক্ষত্রিক স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।



রেখাচিত্র ৮১ : ধ্রুব পরিক্রমণকারী অন্যান্য তারা সম্বন্ধে চীনা চিত্র

ধ্রুব-পরিক্রমণকারী তারাসমূহ ও খ-বিষুবের বিন্দুসমূহ

ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারার সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ করেই যে অদৃশ্য হ্সিউ-এর অবস্থান নির্ণয় করা যায়, এ সম্বন্ধে 'শিহ্ চি' গ্রন্থের 'থিয়েন কুয়ান' অধ্যায়ে একটি বিবরণ দেওয়া আছে। "ড্রাগনের শিং (চিও, ১ নং হ্সিউ), পিয়াও-এর সঙ্গে যুক্ত (হ্সি)। হেং দক্ষিণ পেয়ালাকে

(নান্ তু, ৮ নং হ্সিউ) মাঝখানে আঘাত করে। খুযাই কালপুরুষের (শেন্, ২১ নং হ্সিউ) মাথার বালিশ (চেন)।

পিযাও-এব তাবাসমূহ সন্ধ্যা নির্দেশক (হুন চিযেন চে ; সন্ধ্যার সময় যে সমস্ত তাবাব সংক্রমণ হয)। হেং মধ্যরাত্রি নির্দেশক (মধ্যরাত্রিতে যে তারার সংক্রমণ হয)। এবং খুযাই-এর তাবাসমূহ উষা নির্দেশক (উষাকালে যে সমস্ত তাবার সংক্রমণ হয়)।"

সপ্তর্ষি মণ্ডলের তাবাসমূহেব নাম জানতে পাবলেই উপরেব কথাগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এই তারাগুলিব নাম নীচে দেওয়া গেল :

(ক) পেযালা বা বাক্স ; খুযাই (প্রধান ব্যক্তিগণ)

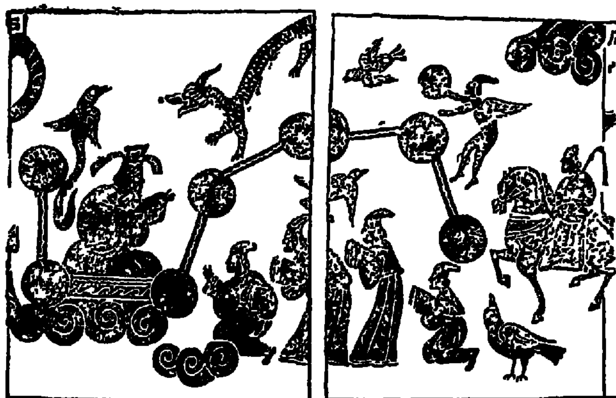
α	Dhube	ক্রতু	থিযেন শু	(খ-মেরু)
β	Merak	পুলহ	থিযেন হ্সুয়ান	(খ-ছাঁচ)
γ	Phecda	পুলস্ত্য	থিযেন চি	(খ-অস্ত্রাগার)
δ	Megrez	অত্রি	থিযেন চুযান	(খ- তুলাদণ্ড)

(খ) হাতল, পিযাও (চামচ)

ε	Alioth	অঙ্গিরা	ইউ হেং	(দেখবাব নল)
ζ	Mizar	বশিষ্ঠ	খাই ইয়াং	(তাপ প্রবর্তনকাবী)
η	Benetnasch	মরীচি	ইযাও কুযাং	(মিটমিটি আলো)

উপরেব বক্তব্য থেকে এই জানা যায় যে, হাতলেব শেষ দুইটি তারাব অবস্থান থেকেই চিও-এর অবস্থান জানা যেতে পাবে। আলফা উরসী মাইনরিস (থিয়েন হুযাং তি বা থিয়েন চি ; বর্তমান ধ্রুবতাবা) ও খাই ইয়াং সংযোগকারী সবলরেখা এবং বিটা উরসী মাইনরিস (থিয়েন তি হ্সিং) ও ইযাও কুযাং সংযোগকাবী সরলবেখা চিযাও (চিত্রা)-তে মিলিত হয। অনুরূপভাবে যদি ইউ হেং থেকে থিয়েন চি-ও থিযেন হুয়ান সংযোগকাবী সবল বেখাব সমান্তরাল একটি সবল রেখা টানা যায, তা হ'লে সেই রেখাটি নান্ তু (φ-স্যাজিটারী)-এর অবস্থান নির্দেশ করবে। পেয়ালার বা বাক্সের উপরেব এবং নীচের সরল-

রেখা দুইটিকে (থিয়েন ছুয়ান+থিয়েন শু এবং থিয়েন চি+থিয়েন হ্সুয়ান) বাড়িয়ে দিলে শিয়েনে মিলিত হবে।



রেখাচিত্র ৮২ঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলের চীনা চিত্র

চীনা জ্যোতির্বিদ্যা হ্সিউ-ভিত্তিক। অতএব অন্য কিছু আলোচনার পূর্বে হ্সিউ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

হ্সিউ-তালিকা

পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় চীনা হ্সিউসমূহের বিবরণ দেওয়া গেল। এই তালিকার,
১ম স্তম্ভে প্রাসাদ
২য় স্তম্ভে হ্সিউ-এর ক্রমিক সংখ্যা
৩য় স্তম্ভে হ্সিউর নাম
৪র্থ স্তম্ভে হ্সিউ-এর নামের অর্থ
৫ম স্তম্ভে (১) চীনা ডিগ্রীতে (৩৬৫¼ ডিগ্রী) হ্সিউ-এর মাপ
(২) আধুনিক ডিগ্রীতে (৩৬০ ডিগ্রী) „ „
৬ষ্ঠ স্তম্ভে (১) হ্সিউ নির্দেশক তারা বা যোগতারা
(২) যোগতারার উজ্জ্বলতা
(৩) যোগতারার বিষুবাংশ (১৯০০ খ্রীস্টাব্দ)
(৪) যোগতারার বিষুবলম্ব „ „
৭ম স্তম্ভে হ্সিউ-এর সঙ্গে যুক্ত ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারা

হ্সিউ তালিকা

প্রাসাদ	ক্রমিক সংখ্যা	হ্সিউয়ের নাম	হ্সিউ নামের প্রাচীন অর্থ	হ্সিউয়ের বিস্তৃতি		যোগতারা	হ্সিউ নির্দেশক তারা বা যোগতারা							নির্দেশক তারার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারা
				চীনা চিত্রে	আধুনিক		ঔজ্জ্বল্য	বিষুবাংশ ঘ	মি	সে	বিষুবলম্ব ডি	মি	সে	
পূর্ব	১	চিও	শিং	১২°	১১'৮৩°	চিত্রা α-Virginis	১'২	১৩	১৯	৫৫	—১০	৩৮	২২	α-উরসী মাইনরিসের (থিয়েন ছয়াং তা তি) অধঃ সংক্রমণ
	২	খাং	গলা	৯°	৮'৮৭°	κ-Virginis	৪'৩	১৪	০৭	৩৪	—০৯	৪৮	৩০	α-এবং β সেণ্টরীর সংক্রমণ
	৩	তি	শিকড়	১৫°	১৪'৭৮°	α²-Librae	২'৯	১৪	৪৫	২১	—১৫	৩৭	৩৫	×
	৪	ফ্যাং	কক্ষ	৫°	৪'৯৩°	π-Scorpii	৩'০	১৫	৫২	৪৮	—২৫	৪৯	৩৫	α-ড্রাকোনিসের মধ্যগমন
	৫	হ্সিন	হৃদয়	৫°	৪'৯৩°	σ-Scorpii	৩'১	১৬	১৫	০৭	—১৫	২১	১০	×
	৬	ওয়াই	লেজ	১৮°	১৭'৭৪°	μ¹-Scorpii	৩'১	১৬	৪৫	০৬	—৩৭	৫২	৩৩	×
	৭	চি	কুলা	১১¼	১১°	γ-Sagittarii	৩'১	১৭	৫৯	২৩	—৩০	২৫	৩১	κ-ড্রাকোনিসের অধঃ-সংক্রমণ

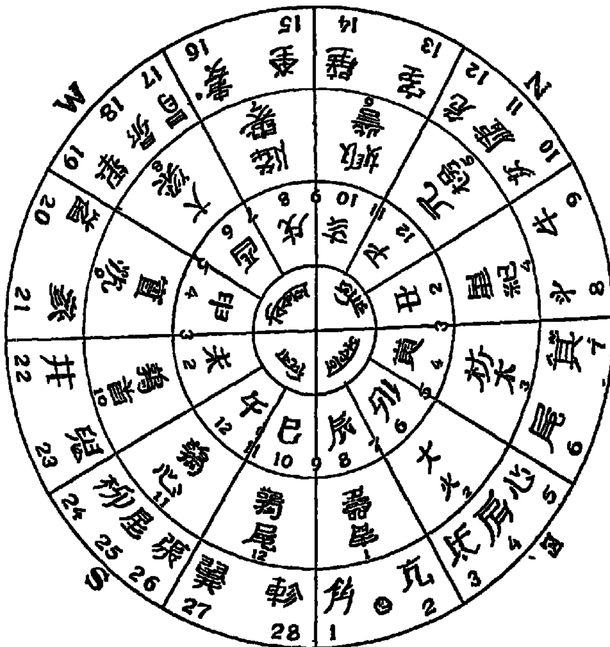
উত্তর	৮	নান্ তু	দক্ষিণ চামচ	২৬°	২৫·৮°	φ-Sagittarii	৩·৩	১৮	৩৯	২৫	−২৭	০৫	৩৭	ι-ড্রাকোনিসের মধ্য-গমন
	৯	নিউ বা ছিযেন নিউ	বলদ রাখাল	৮°	৭·৮৯°	β-Capricorni	৩·৩	২০	১৫	২৪	−১৫	০৫	৫০	α-লাইরী (অভিজিৎ; চিহ্নু)-এর মধ্যগমন β-লাইরী (চিয়েন থাই)-এর মধ্যগমন α-উরসী মেজরিস (ক্রতুঃথিবেনশু)-এর অধঃসংক্রমণ β-উরসী মেজরিস (পুলহঃ থিয়েন হ্সুয়ান)-এর অধঃসংক্রমণ
	১০	নু বা হ্সু নু	মেযে ঝি	১২°	১১·৮৩°	ε-Aquarii	৩·৬	২০	৪২	১৬	−০৯	৫১	৪৩	×
	১১	হ্সু	শূন্যতা	১০°	৯·৮৬°	β-Aquarii	৩·১	২১	২৬	১৮	−০৬	০০	৪০	γ-উরসী মেজরিস (পুলস্ত্য; থিয়েন চি)-এর অধঃসংক্রমণ δ-উরসী মেজরিস (অত্রি; থিয়েন ছুয়ান)-এর অধঃসংক্রমণ

	১২	ওয়াই	ছাদ	১৭°	১৬·৭৬°	α-Aqnarii	৩·২ ২২ ০০ ৩৯ —০০ ৪৮ ২১	ε-উবসী মেজরিস (অঙ্গিরা ; ইউ হেং)-এব অধঃসংক্রমণ 184-ড্রাকোনিস (থাই আই)-এর অধঃসক্রমণ
	১৩	শিহ্ বা ইয়িং শিহ্	বাড়ী তাঁবু	১৬°	১৫·৭৪°	α-Pegasi	২·৬ ২২ ৫৯ ৪৭ ১৪ ৪০ ০২	” ”
	১৪	পি বা তুং পি	দেয়াল পূর্ব-দেয়াল	৯°	৮·৮৭°	γ-Pegasi	২·৯ ০০ ০৮ ০৫ ১৪ ৩৭ ৩৯	β উবসী মাইনবিসের (থিয়েন তি হ্সিং)-এব মধ্যগমন
পঃ	১৫	খুয়াই	পা	১৬°	১৫·৭৭°	η-Andromd	৪·২ ০০ ৪২ ০২ ২৩ ৪৩ ২৩	3233-উরসী মাইনবিস (শু ৎজু)-এর মধ্যগমন
	১৬	লু	বাঁধন	১২°	১১·৮৩°	β-Arietis	২·৭ ০১ ৪৯ ০৭ ২০ ১৯ ০৯	η-উরসী মেজবিস (ইযাও কুযাং)-এর অধঃসংক্রমণ
	১৭	ওযাই	পেট	১৪°	১৩·৮°	41-Arities	৩.৭ ০২ ৪৪ ০৬ ২৬ ৫০ ৫৪	×

	১৮ মাও	কৃত্তিকা	১১°	১০'৮৪°	η-Tauri	৩'০ ০৩ ৪১ ৩২	২৩ ৪৭ ৪৫	α-ড্রাকোনিস (ইউ শু)-এর অধঃসংক্রমণ
	১৯ পি	জাল	১৬°	১৫'৭৭°	ε-Tauri	৩'৬ ০৩ ২২ ৪৭	১৮ ৫৭ ৩১	×
	২০ ৎস্থই বা ৎস্থই চুই	কচ্ছপ	২°	১'৯৭°	λ^1-Orionis	৩'৪ ০৫ ২৯ ৩৮	০৯ ৫২ ০২	κ-ড্রাকোনিসের মধ্য-গমন
	২১ শেন	তিনটি তারা	৯°	৮'৮৭°	ζ-Orionis	১'৯ ০৫ ৩৫ ৪৩	—০১ ৫৯ ৪৪	সপ্তর্ষি মণ্ডলের লেজ নীচের দিকে লম্ব
দঃ	২২ চিং বা তুং চিং	কুপ বা পুবের কুপ	৩৩°	৩২'৫৩°	μ-Gemini	৩'২ ০৬ ১৬ ৫৫	২২ ৩৩ ৫৪	α-উবসী মেজরিস (থিয়েন শু)-এর মধ্যগমন
	২৩ কুযাই বা ইউ কুয়াই	ভুত বা ভুতের গাড়ী	৪°	৩'৯৪°	θ-Cancri	৫'৮ ০৮ ২৫ ৫৪	১৮ ২৫ ৫৭,	,, ,,
	২৪ লিউ	উইলো	১৫°	১৪'৭৮°	δ-Hydrae	৪'২ ০৮ ৩২ ২২	০৬ ০৩ ০৯	α-পাপিস (লাও জেন অগস্ত্য)-এর মধ্যগমন

২৫ হ্সিং বা ছি হ্সিং	তাবা বা সাত-তাবা	৭°	৬·৯°	α-Hydrae	২·১	০৯	২২	৪০	—০৮	১৩	৩০	γ-উরসী মেজরিস (থিয়েন চি)-এর মধ্যগমন
২৬ চ্যাং	ছড়ানো জাল	১৮°	১৭·৭৪°	μ-Hydrae	৩·৯	১০	২১	১৫	—১৬	১৯	৩৫	×
২৭ আই	পাখা	১৮°	১৭·৭৪°	α-Crateris	৪·২	১০	৫৪	৫৪	—১৭	৪৫	৫৯	γ-উরসী মাইনরিস (থাই ৎজু)-এর অধঃসংক্রমণ
২৮ চেন	গাড়ীর পা-দানি	১৭°	১৬·৭৬°	γ-Corvi	২·৪	১২	১০	৪০	—১৬	৫৯	১২	β-উরসী মাইনরিসের (থিয়েন তি হ্সিং)-এর অধঃসংক্রমণ

উপরের তালিকার ষষ্ঠ স্তম্ভ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, হ্সিউ নির্দেশক তারা নির্ণয়ে তারার উজ্জ্বলতার উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। আকাশের যে অংশেই অবস্থিত হোক না কেন এবং যত অনুজ্জ্বলই হোক না কেন, কাল-বৃত্তের সীমায় অবস্থিত তারাকেই হ্সিউ নির্দেশক তারা বলে নির্বাচন করা হয়েছে। এই তারাটির সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রাসাদ বা ধ্রুব-পরিক্রমণকারী তারার সম্বন্ধ থেকেই ঋতু নির্ণয় করা হতো।



রেখাচিত্র ৮৩ঃ খ-বিষুবের প্রাচীন চীনা বিভক্তি

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, হ্সিউ-এর সংখ্যা ২৮ হ'লো কেন? চন্দ্রের যুতিকাল ও নক্ষত্রকাল (২৯·৫৩ দিন এবং ২৭·৩৩ দিন) এই উভয়ের গড় দিনের সংখ্যা থেকেই এই সংখ্যা নেওয়া হয়েছে।

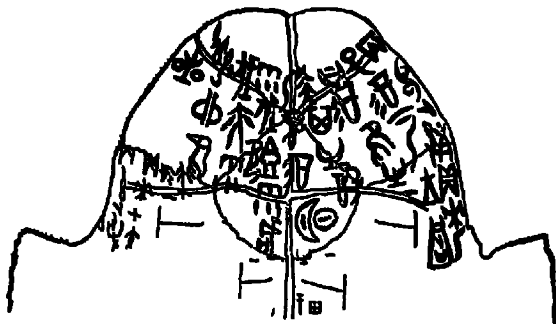
হ্সিউ পদ্ধতির ক্রমবিকাশ

হ্সিউ পদ্ধতির প্রাচীনতা সম্বন্ধে দুই শতাব্দী ধরে নানাপ্রকার গবেষণা করা হয়েছে। আনিয়াং এ শ্যাং রাজবংশের (খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ) হাড়-লিপি আবিষ্কারের পরে এ সমস্ত গবেষণার অবসান হয়েছে। এই হাড়-লিপির সাহায্যে কুও মো-জো এবং লিউ চাও-ইয়াং চীনের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তুং হসো-পিন তাঁর 'ইয়িন লি ফু' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

উ তিং-এর রাজত্বকালের (খ্রীস্টপূর্ব ১৩৩৯ থেকে ১২৮১ অব্দ) যে সমস্ত হাড়-লিপি পাওয়া গেছে, তাতে এবং তার আগে ও পরে প্রাপ্ত হাড়-লিপিতেও অনেক তারার উল্লেখ আছে, দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত হাড়-লিপিতে যে সমস্ত তারার নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে নিম্নলিখিত তারাগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) নিয়াও হ্সিং, পাখী-তারা বা তারামণ্ডল। বর্তমানে এটিকে চু ছিয়াও (লাল পাখী) বা পঞ্চবিংশ সংখ্যক হ্সিউ-এর হ্সিং (α-Hydrae) বলে মনে করা হয়। এই হ্সিউটি দক্ষিণ প্রাসাদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত। (২) হুও হ্সিং, অগ্নিময় তারা বা তারামণ্ডল। এটি জ্যেষ্ঠাতারা বলে মনে হয়। এই তারাটিকে বা তারামণ্ডলটিকে অনেকে পূর্ব প্রাসাদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চতুর্থ ও পঞ্চম হ্সিউ ফ্যাং এবং হ্সিন বলেও মনে করেন। এ থেকে চু খো-চেন অনুমান করেন যে, এই সময় থেকেই আকাশের বিষুববৃত্তকে, পূর্বে নীল ড্রাগন (ৎশাং লুং), দক্ষিণে রক্তবর্ণ পাখী (চু নিয়াও), পশ্চিমে সাদা বাঘ (পাই হু), এবং উত্তরে কাল-কচ্ছপ (হ্সুয়ান উও), এই চারটি প্রধান প্রাসাদে বিভক্ত করা হয়। হাড়লিপিতে প্রাপ্ত উপরে যে দুইটি তারার নাম উল্লেখ করা হয়েছে এ ছাড়া আরো দুইটি তারার নামের সন্ধান পাওয়া যায়। এর একটি তারার নাম শ্যাং। এটি কোন্ তারা, এ সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। অন্য তারাটির নাম তা হ্সিং (বড় তারা)। খুব সম্ভব

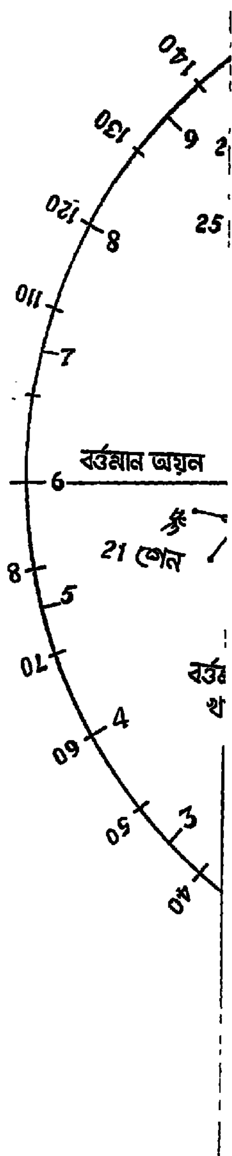
এই চারটি তারা চারটি দিগবিন্দু নির্দেশ করত। নীচে একটি হাড়-লিপির চিত্র দেওয়া গেল।



রেখাচিত্র ৮৪ : একটি হাড়লিপির চিত্র

'শিহ্‌ চীন' নামে একখানা গ্রন্থে চীনের প্রাচীন পল্লীগান, কবিতা ইত্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, এই সমস্ত গান ও কবিতা খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম, নবম শতাব্দীর বা তারও পূর্বের। এইরূপ একটি গানে বলা হয়েছে যে, সপ্তম মাসে হুও-এর মধ্যগমন হয় (ছি ইউয়েহ লিউ হুও)। আর একটি গানে তিং-এর মধ্যগমনের উল্লেখ আছে (তিং চিহ্ ফ্যাং চুং)। পেগাসাসকে প্রাচীনকালে চীনদেশে তিং বলা হতো। এটি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ হ্সিউ। আর একটি গানে মাও-এর (অষ্টাদশ হ্সিউ, কৃত্তিকা) উল্লেখ আছে। অবশ্য সেখানে প্রাচীন নাম লিউ ব্যবহার করা হয়েছে। এবং শেন্ (একবিংশ হ্সিউ, কালপুরুষ) তারা প্রাচীন স্থান হ্সিং নামে উল্লেখিত হয়েছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন গানে পি (উনবিংশ হ্সিউ, বৃষরাশির রোহিণী), চি (সপ্তম হ্সিউ, ধনু), রাখাল-বালক ছিয়েন নিউ (আলতেয়ার; প্রাচীন-কালে এই তারাটিকে নবম হ্সিউ-এর নির্দেশক তারা বলে মনে করা হ'তো.) এবং চিহ্ নু (তাঁতী মেয়ে) ইত্যাদি তারারও উল্লেখ পাওয়া



বর্ত্তমান অয়ন
140
130
120
110
70
60
50
40
9
8
7
6
5
4
3
25

যায়। শেষোক্ত তারা চিহ্ নু কোন হ্সিউ-এর তারা নয়; এটি একটি ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারা।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'শু চিং' খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হতে পঞ্চম শতাব্দীর ভিতরে সঙ্কলিত বলে অনেকে মনে করেন। এই গ্রন্থের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, "মধ্যম দৈর্ঘ্যের দিবস এবং নিয়াও তারার মধ্যগমন, মধ্যবসন্ত নির্ণয়ে সাহায্য করে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিবস ও হুও তারার মধ্যগমন, মধ্য গ্রীষ্ম নির্ণয়ে সাহায্য করে। মধ্যম দৈর্ঘ্যের রাত্রি এবং হ্সু তারার মধ্যগমন মধ্য শরৎ নির্ণয়ে সাহায্য করে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘরাত্রি এবং মাও তারার মধ্য গমন মধ্য শীত নির্ণয়ে সাহায্য করে। বৎসরে মোট ৩৬৬ দিন আছে।" এগুলিতে পঞ্চবিংশ, পঞ্চম, একাদশ ও অষ্টাদশ হ্সিউ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে মনে করা হয়, এগুলি ভুল ঋতুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী চিত্র হতে দেখা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীতে হ্সিং (নিয়াও) এবং হ্সু, অয়ন হ্সিউ ছিল; আর ফ্যাং হ্সিন ও মাও, বিষুবন হ্সিউ ছিল। কিন্তু এগুলি সূর্যের সঙ্গের সংযোগের সময়ের অবস্থা। এই সময়ে এই সমস্ত তারা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীনকালে চীনদেশে শীতকালের সন্ধ্যা ছয়টার সময় যে হ্সিউ (এক্ষেত্রে মাও)-এর মধ্যগমন হতো পরবর্তী বসন্তকালের দুপুরে সেই হ্সিউতে সূর্য অবস্থান করতো। অন্যান্য ঋতুতেও ঠিক একইরূপ ব্যাপার ঘটতো। প্রাচীন চীনে এইভাবে সৌর ও নাক্ষত্রিক সময়ের সমন্বয় করা হতো এবং দৃশ্যবস্তুর সাহায্যে অদৃশ্য বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করা হ'তো (চিত্র ৮৫ দ্রঃ)।

শু চিং হতে উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা থেকেই ঐ সময় নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষুবনের অগ্রগতির সাহায্যে হিসাব করে দেখা গেছে যে, যদি মধ্যগমন সর্বদা সন্ধ্যা ছয়টার সময় পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে, তা হ'লে উপরে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তা খ্রীস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দের। কিন্তু মধ্যগমন যদি সাতটায় পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে, তা হলে এই সময় পাওয়া যায় খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী। আধুনিক কালের গবেষণাতে জানা যায় যে, নিয়াও (পাখীমণ্ডল)

শব্দটিতে মোট সাতটি হ্সিউ (পূর্ব-প্রাসাদের সমস্ত হ্সিউ) এবং হুও (অগ্নিমণ্ডল) শব্দটিতে মোট তিনটি হ্সিউ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত যে কোন সময় নির্দেশ করা যেতে পারে। অতএব দেখা যায় যে, যে কোন ভাবেই ঐ সময়ের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

'হ্সিয়া হ্সিয়াও চেং' গ্রন্থে ছয়টি হ্সিউ-এর (৪, ৫, ৬, ১৮, ২১, ২৪ সংখ্যক) উল্লেখ আছে। এর মধ্যে লিউ এবং ওয়াইয়ের উল্লেখ এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যে সমস্ত তথ্য দেওয়া আছে, তাতে একে শিহ্ শেন এবং কান তে-র সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের বলে মনে হয়। 'উয়েহ্ লিং' গ্রন্থে পাঁচটি ছাড়া অন্য সমস্ত হ্সিউ-এর উল্লেখ আছে। এ বইখানিও প্রায় একই সময়ের। 'উয়েহ্ লিং'-এ বলা হয়েছে যে, "শরতের তৃতীয় মাসে (অর্থাৎ তৃতীয় মাসের আদিতে) সূর্য ফ্যাং-এ অবস্থান করে। সন্ধ্যাকালে হ্সু-এর মধ্যগমন হয়। প্রাতঃকালে লিউ-এর মধ্যগমন হয়। (ফিহ্ ৎসাই ফ্যাং; হুন হ্সু চুং; তান লিউ চুং।)"

'লি চি' (অনুষ্ঠান বিবরণী) এবং 'লু শিহ্ ছুন ছিউ' (প্রভু লু-এর বসন্ত ও হেমন্ত বিবরণী) গ্রন্থ দুইখানাতে উপরোল্লিখিত বই দুইখানার বিষয়বস্তু সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বই দুইখানা ছিন ও হ্যান রাজবংশের সময়ের, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতাব্দীর ভিতরে এদের রচনাকাল। এখানেই আমরা হ্সিউ পদ্ধতির পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ পাই। হ্যান বংশের অন্যান্য বইতেও, যেমন 'হুয়াই নান্ ৎস্যু' এবং 'এবহ্ ইয়া' বই দুইখানাতেও হ্সিউ-সমূহের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। এই বই দুইখানাও শিহ্ শেন এবং কান তে-র সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর বলে মনে হয়।

অতএব দেখা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দীর ভিতরে হ্সিউ পদ্ধতি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

হ্সিউ নির্দেশক তারাসমূহের নতির বিভিন্নতা লক্ষ্য করলে প্রথমে বিস্মিত হতে হয়। অনেকে মনে করেন, খ-বিষুবরেখার বর্তমান অবস্থান ও প্রাচীন যুগের অবস্থানের পার্থক্যই এর কারণ। বর্তমানে এই তারাগুলি যে রেখায় অবস্থান করে, সেটি মাও (১৮শ হ্সিউ) এবং শেন (২১শ হ্সিউ)-এর মাঝখান দিয়ে সূর্যপথকে ছেদ করেছে এবং ২০ ডিগ্রী দক্ষিণ নতিতে চ্যাং (২৬শ হ্সিউ) এবং আই (২৭শ হ্সিউ)-তে নেমে এসেছে; পরে আবার তি (৩য় হ্সিউ) এবং হ্সিন (৫ম হ্সিউ)-এর মাঝখান দিয়ে সূর্যপথকে অতিক্রম করে, পি (১৩শ হ্সিউ) এবং খুয়াই (১৫শ হ্সিউ)-এর উত্তরে ২০ ডিগ্রী নতি পর্যন্ত গিয়ে আর একটি রেখার সৃষ্টি করেছে। বিষুবনের অগ্রগমনের হার প্রতি ৭১৬ বৎসরে ১০ ডিগ্রী স্বীকার করে খ্রীস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দের খ-বিষুবরেখা আঁকা হলে, আরো অধিক সংখ্যক হ্সিউকে এই বৃত্তের নিকটে অবস্থান করতে দেখা যায়। এই সময় শ্যাং যুগের অব্যবহিত পূর্বে। মাও এবং ফ্যাং-এর অবস্থান হয় বিষুবন বিন্দুর নিকটে এবং হ্সিং ও হ্সু-এর অবস্থান হয় অয়ন-বিন্দু দুইটির নিকটে। প্রাচীন চীনের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক সমস্ত বিবরণীতে, যেমন হাড়লিপিতে, হ্সিং এবং ফ্যাং-এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

'চু খো-চেন' গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের খ-বিষুব বৃত্ত অঙ্কন ও আলোচনা করে দেখানো হয়েছে, কোন্ যুগে কত অধিক সংখ্যক হ্সিউ খ-বিষুবের সর্বাপেক্ষা নিকটে ছিল। নীচে এই আলোচনার ফল দেখানো হলো।

সন	উত্তর ও দক্ষিণে ১০ ডিগ্রী নতির ভিতরে অবস্থিত হ্সিউ-এর সংখ্যা
খ্রীস্টাব্দ ১৯০০	১১
" ০	১৪
খ্রীস্টপূর্ব ২৩০০-৪৩০০ অব্দ	১৮-২০
" ৬৬০০ অব্দ	১৫
" ৮৮০০ অব্দ	৬

এতে দেখা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের খ-বিষুবই এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য।

হ্সিউ পদ্ধতির উপরে বিষুবনের অগ্রগমনের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক। খ-বিষুবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব-পরিক্রমণকারী তারারও পরিবর্তন হয়। আগে যে সমস্ত তারা ধ্রুবপরিক্রমণ করে, পরে আর সেগুলি সেরূপ করে না। বড় ভালুকের (সপ্তর্ষিমণ্ডলের) লেজের অবস্থান (উপরে, নীচে, পূর্বে বা পশ্চিমে) দ্বারা ঋতু নির্ণয় করা যায়। 'হ্সিং চিং' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীন কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, বড় ভালুকের বর্তমানে যেখানে সাতটি তারা দেখা যায়, আগে সেখানে মোট নয়টি তারা ছিল। দুইটি তারা পরে অদৃশ্য হয়ে যায়। এর ব্যাখ্যাতে বলা হয় যে, বড় ভালুকের লেজ বা পেয়ালার হাতলকে বাড়িয়ে দিলে বুটিস মণ্ডলের এমন অনেক তারা পাওয়া যায়, যেগুলিকে বড় ভালুকের অংশ বলে মনে করা যেতে পারে। 'হুয়াই নান্ ৎস্থ' নামক গ্রন্থে (খ্রীস্টপূর্ব ১২০ অব্দের) বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চাও ইয়াও তারাটি যখন ইয়িনের দিকে (পূর্ব-উত্তর ৬০ ডিগ্রী কোণে) থাকে, তখন বসন্তকালের প্রথম মাস আরম্ভ হয়; যখন মাওয়ের দিকে (পূর্বদিকে) থাকে, তখন বসন্তকালের দ্বিতীয় মাস আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন, চাও ইয়াও তারাটি বর্তমানের γ-বুটিস এবং খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের পূর্বে এই তারাটি ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারা ছিল। অতএব দেখা যায় যে, চীনা জ্যোতির্বিদ্যা অন্ততঃপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব ২ সহস্রাব্দের।

সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বিষুবনের অগ্রগমনের ফলে ধ্রুব পরিক্রমণকারী তারার পরিবর্তন ঘটে। এজন্য 'শিহ্ চিন' গ্রন্থের রচনাকাল ও হ্যান রাজত্বকালের মাঝখানে কোন এক সময়ে ছিয়েন নিউ (রাখাল বালক, আলতেয়ার)-এর পরিবর্তে অনুজ্জ্বল ন্যু (ε-একোয়ারী) তারাটিকে, চিহ্ নু (তাঁতী মেয়ে, অভিজিৎ) তারার পরিবর্তে অনুজ্জ্বল নিউ (β-ক্যাপ্রিকর্নি) তারাকে এবং তাও চিও (স্বাতী) তারার পরিবর্তে চিও (চিত্রা)-তারাকে বিভিন্ন হ্সিউ নির্দেশক তারা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় জ্যোতিষ্ক

সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহ

পূর্বে বলা হয়েছে, চীনা জ্যোতিবিদ্যায় জ্যামিতিব কোন স্থান ছিল না। চন্দ্রের গতি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওযা যায 'আই চু শূ' (চু-এর হারিয়ে যাওয়া বই) নামক গ্রন্থের - চু ইউযেহ্ (চন্দ্রের গতি) অধ্যায়ে। এ গ্রন্থখানি খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের বচিত বলে মনে করা হয। 'হুয়াই ন্যান ৎসু' গ্রন্থে বলা হযেছে যে, চন্দ্র প্রতিদিন ১৩ ডিগ্রী পূর্বে সরে যায়। পববর্তী যুগেও চন্দ্রের এই দৈনিক গতি স্বীকাব করে নেওযা হযেছে। শিহ্ শেন জানতেন যে, চন্দ্রের গতি সর্বদা এক থাকে না, বিভিন্ন সময়ে এই গতির পরিমাণ বিভিন্ন হয। সূর্যপথ হতে চন্দ্র কোন সময়ে উত্তরে থাকে আবাব কোন সময়ে দক্ষিণে থাকে। দ্রুততব গতিব সময় চন্দ্রকে থিবাও এবং মন্দতর গতিব সময় ৎশে নি বলা হতো। খ্রীস্টপূর্ব দশম অব্দে লিউ হ্সিযান প্রণীত 'হুযান ফ্যান উও হ্সিং চুযান' গ্রন্থে সর্বপ্রথম চন্দ্রের নযটি পথেব উল্লেখ করা হযেছে। এই নয়টি পথ বিভিন্ন বং-এ নির্দিষ্ট করা হতো। বিষুবয়ত্ত ও সূর্যপথকে যেমন লাল ও হলুদ বং এ দেখানো হতো, চন্দ্রের পথগুলিও তেমনি সবুজ, সাদা, লাল ও কালো রং-এ দেখানো হতো।

গ্রহসমূহেব নাম ও তাদেব গতি সম্বন্ধে বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ পাওযা যায। 'খাই ইউযান চ্যান চিং' গ্রন্থে এই সমস্ত উল্লেখ আছে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকেই এই শব্দগুলি প্রচলিত ছিল। পাঁচটি গ্রহের সঙ্গে

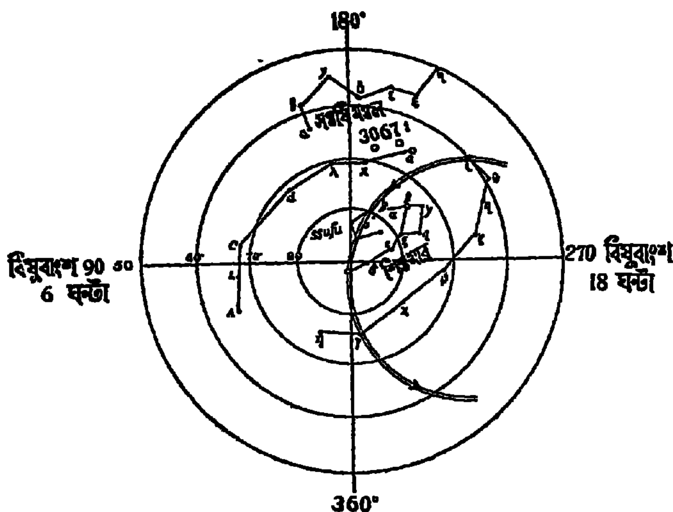
পাঁচটি দিকের সম্বন্ধ ছিল বলে চীনের জ্যোতির্বিদগণ মনে করতেন। নীচে এই সম্বন্ধ দেখানো গেল।

গ্রহ	চীনা নাম ও তার অর্থ	সম্বন্ধযুক্ত দিক
বৃহস্পতি	স্বুই হ্সিং (বর্ষতারা)	পূর্ব
মঙ্গল	ইয়িং হুও (অস্থির জ্যোতিক)	দক্ষিণ
শনি	চেন হ্সিং (অশুভ আত্মা দূরকারী তারা)	মধ্য
শুক্র	থাই পাই (মহান শ্বেত ব্যক্তি)	পশ্চিম
বুধ	ছেন হ্সিং (কাল তারা)	উত্তর

গ্রহের অগ্রগতিকে বলা হ'তো 'শুন' আর বক্রগতিকে বলা হ'তো 'নি'। এইভাবে গ্রহের উদয় (সূর্যের সঙ্গে বা অস্ত সময়) (ছু) হয়, এগিয়ে যায় (চিন), গতির দিক পরিবর্তন করে (ফ্যান) এবং অবশেষে অস্ত যায় (জু)। স্বল্পকালের বক্রগতিকে 'পিছিয়ে পড়া' (সো) বলা হতো আর অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত অগ্রগতিকে 'লাভ' (হ্সিং) অথবা 'জরুরী অবস্থা' (চি অথবা চু হ্সিং) বলা হতো। কোন এক জায়গায় স্থির থাকলে বলা হতো গ্রহটি সেখানে 'বাস করছে' (ছু অথবা লিউ)। এইভাবে যদি অনেক বেশীদিন, কুড়িদিনের বেশী কোন গ্রহকে একই জায়গায় থাকতে দেখা যেত, তা হলে ছু অথবা শু শব্দটি ব্যবহার করা হতো। কোন গ্রহ কোন তারামণ্ডলের নিকটে থাকলে বলা হ'তো, গ্রহটি ঐ তারা-মণ্ডলকে পাহারা দিচ্ছে, আর তারামণ্ডলের ভিতরে প্রবেশ করলে বলা হ'তো 'জোরপূর্বক প্রবেশ করেছে' (ফ্যান)। অস্বাভাবিক মন্দগতিকে 'দেরী করা' (ছি হ্সিং) বলা হতো। পাঁচটি গ্রহকে একত্রে পাঁচ পুঁতি বা মুক্তার দানা (উও ওয়াই) বা পাঁচ ভ্রমণকারী (উও পু) বলা হতো। এই শব্দগুলি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদগণের লিখিত বিবরণী থেকে পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে, পরবর্তী যুগেও এই শব্দগুলি রক্ষিত হয়েছে। 'শিহ্ চি' গ্রন্থে স্সুমা ছিয়েন গ্রহের বক্রগতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

খ-বিষুব মেরু ও ধ্রুবতারাসমূহ

চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় খ-বিষুব মেরুর গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বিষুবনের অগ্রগমনের ফলে খ-বিষুব মেরু সূর্যপথ-মেরুকে কেন্দ্র ক'রে অঙ্কিত একটি বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে। বর্তমানে ৫-উরসী মাইনরিসের নিকটে খ-বিষুব মেরু অবস্থিত। চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় খ-বিষুব মেরুকে থিয়েন হুয়ান তা তি বলে।



রেখাচিত্র ৮৬ঃ খ মেরু প্রক্ষেপ

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, চীনা তারাচিত্র অনুযায়ী, বর্তমান খ-বিষুব মেরুর চারিদিকে ১৫ ডিগ্রী ব্যাসার্ধের একটি অঞ্চল, দুইটি তারা-মণ্ডল, 'লাল নিষিদ্ধ আবেষ্টনী' (ৎজু ওয়াই ইউয়ান)-কে ঘিরে রেখেছে; যেন প্রহরীর দল রাজদরবারকে বেষ্টন করে আছে। এই আবেষ্টনীর পূর্বদিকের প্রহরায় (তুযাং ফ্যান) আছে, $\iota, \varphi, \eta, \zeta, \theta$ ড্রাকোনিস, χ ও γ সেফি এবং 21-ক্যাসিওপি; আর পশ্চিম দিকের প্রহরায়

(হুসি ফ্যান) আছে X ও λ ড্রাকোনিস, d-21006 উরসী মেজরিস এবং 43,931H[1] ক্যামেলোপার্ডি। দুইটি প্রহরা-বেষ্টনীর (হুস্ কুং মেন, লোহিত প্রাসাদের তোরণ বা চুং হো মেন) উত্তর সীমার তারার একটিকে বাম অক্ষ (হুসো স্যু) এবং অন্যটিকে ডান অক্ষ (ইউ স্যু) বলা হয়।

পশ্চিম আবেষ্টনীর ঠিক বাইরে থিয়েন আই (খ-একক) এবং থাই আই (বৃহৎ একক) নামে দুইটি তারার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, এই দুইটি তারা যথাক্রমে 3067 ι-ড্রাকোনিস এবং 42 অথবা 184-ড্রাকোনিস। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় এদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো। এরা উভয়েই পঞ্চম শ্রেণীর অনুজ্জ্বল তারা এবং হিসাব করে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর প্রথম ও শেষভাগে এই তারা দুইটিকে খ-বিষুব মেরু বলে অভিহিত করা হ'তো।

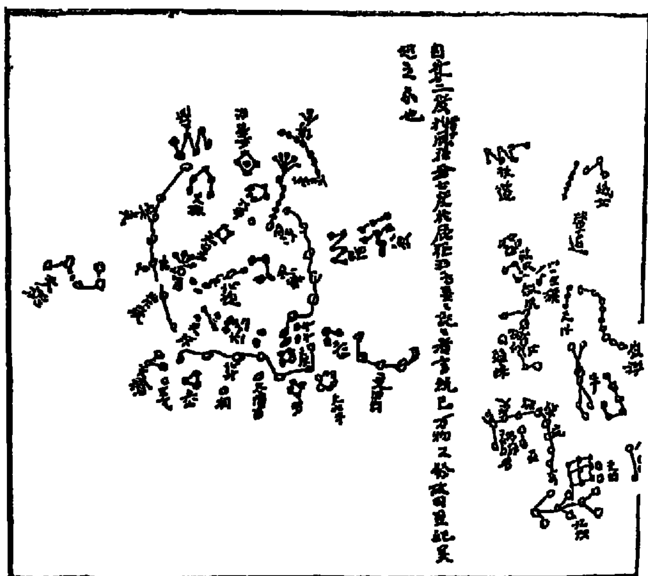
পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যায় লঘু সপ্তর্ষি বা ছোট ভালুকমণ্ডল যেভাবে অঙ্কিত করা হয়, চীনা জ্যোতির্বিদ্যায় এইখানের তারাগুলিকে ঠিক এইভাবে অঙ্কিত করা হ'তো না। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে শিহ্ চিন এইখানের একটি তারার মালাকে পাই চি (উত্তর মেরুমণ্ডল) বলে অভিহিত করেন। এই মালাটির তারাসমূহ প্রথমে γ-উরসী মাইনরিস (থাই হুজু, যুবরাজ; পিতার বা পূর্ববর্তী ধ্রুবতারার নিকটে), তারপরে β-উরসী মাইনরিস (থিয়েন তি হুসিং, খ-সম্রাট, ধ্রুবতারা), তারপরে 33-উরসী মাইনরিস (শু হুস্, সম্রাটের উপপত্নীর ছেলে), একটি অতি অনুজ্জ্বল তারা, 3162 উরসী মাইনরিস (হু কুং, সাম্রাজ্ঞী বা সম্রাটের উপপত্নী) নামে আর একটি অনুজ্জ্বল তারা এবং সর্বশেষে 4339 ক্যামেলো-পার্ডি (থিয়েন শু, খ-মেরু, বা নিউ হুসিং, গিঁটতারা) নামে আর একটি অনুজ্জ্বল তারা। চীনা জ্যোতির্বিদ্যাতে এই সর্বশেষ তারাটির তিনদিকে চারটি ছোট তারার একটি বেষ্টনী দেখা যায়। এই বেষ্টনীকে স্যু ফু (চার স্তম্ভ) বলা হয়। এতে মনে হয় যে, হ্যান রাজবংশের রাজত্ব-কালে এই তারাটি ধ্রুবতারা ছিল। লঘু সপ্তর্ষি বা ছোট ভালুক-

মণ্ডলের অন্যান্য তারা ৭-উরসী মাইনরিস (থিয়েন হুয়ান তা তি, বর্তমান ধ্রুবতারা) তারাটির চারদিকে একটি বেষ্টনী সৃষ্টি করে। এই বেষ্টনীকে কু ছেন (বক্র আবেষ্টনী) বলা হয়।

উপরে যে সমস্ত তারার উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের কোনটিই মেরুপথের উপরে অবস্থিত নয়। মেরুর প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, 'চু পাই স্যুয়ান চিং' নামক গ্রন্থে। এই বইয়ের এক জায়গায় মেরুর চারটি অভিযানের (স্যু ইউ) কথা বলা হয়েছে। উত্তর মেরুমণ্ডলের মহান তারাটিকে হুস্যুয়ান চি যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হতো এবং চারদিকে এর অপসরণের মান নির্ণয় করা হতো বলেও উল্লেখ আছে। সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে হ্যান বংশের সময়ের ধ্রুবতারার অবস্থান মেরু থেকে আরো দূরে সরে যেতে থাকে। পঞ্চম শতাব্দীতে ৎস্যু কেং চিহ্ দেখতে পান যে, তদানীন্তন ধ্রুবতারা প্রকৃত মেরু থেকে প্রায় ১ ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে, প্রকৃত মেরু থেকে ধ্রুবতারার দূরত্ব হয়েছে ৪½ ডিগ্রী। এই সময়ের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ চু হ্সি বিশেষভাবে অবগত ছিলেন যে, প্রকৃত মেরুতে মোটেই কোন তারা নাই।

প্রকৃত মেরু নির্ণয়ে একাদশ শতাব্দীতে শেন কুয়া বলেছেন, "হ্যান রাজবংশের পূর্বে ধ্রুবতারাকে আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে মনে করা হতো, এবং সেজন্য একে চিহ্ হ্সিং (শীর্ষতারা) বলা হতো। দর্শন-নলের সাহায্যে ৎস্যু কেং চি লক্ষ্য করেন যে, আকাশের যে বিন্দুর কোন গতি নাই, শীর্ষতারা থেকে সেই বিন্দু প্রায় এক ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। হ্সি-নিং এর রাজত্বকালে (১০৬৮-১০৭৭ খ্রীস্টাব্দ) সম্রাট আমার উপর পঞ্জিকা ব্যুরোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমি নলের সাহায্যে প্রকৃত মেরু নির্ণয়ের চেষ্টা করি। প্রথম রাত্রিতেই আমি লক্ষ্য করি যে, যে তারা নলের ভিতর দিয়ে দেখা যায়, কিছুক্ষণের ভিতরেই সেটি দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। আমি বুঝতে পারি যে, নলটি অত্যন্ত ছোট, সেজন্যই এরূপ হয়। ক্রমশঃ আমি নলের ব্যাস

বৃদ্ধি করতে থাকি। তিনমাস চেষ্টার পর, আমি এরূপ ব্যাসের নল তৈরী করতে সক্ষম হই যে, তারাটি নলের ভিতরেই ঘুরতে থাকে, কোন সময়েই নলের বাইরে যায় না। এইভাবে আমি বুঝতে পারি যে, প্রকৃত মেরু থেকে ধ্রুবতারা প্রায় ৩ ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। দৃশ্য-ক্ষেত্রের ছবি এঁকে, তা'তে বিভিন্ন সময়ে তারার অবস্থান দেখান হতো। সন্ধ্যার সময়, মধ্যরাত্রিতে এবং শেষরাত্রিতে এই ছবিতে ধ্রুব-তারার অবস্থান বসিয়ে নানাভাবে আলোচনা করা হতো। এইরূপ



রেখাচিত্র ৮৭ : একটি তারাচিত্রের একাংশ। বামে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও লোহিত প্রাসাদ ; ডাইনে ধনু ও মকর রাশির অংশ

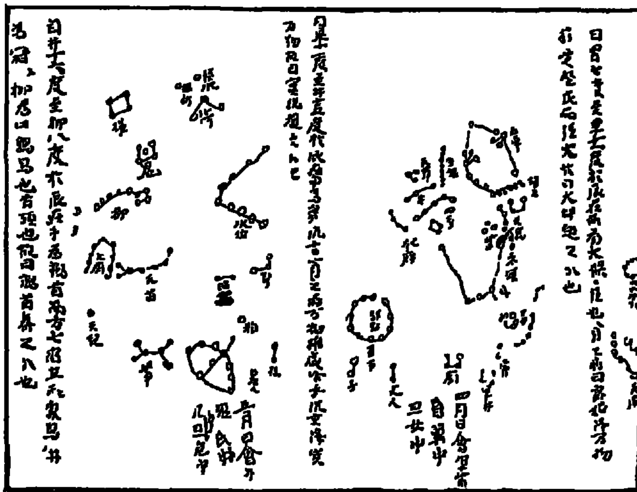
২০০টি ছবি আঁকবার পর আমরা বুঝতে পারি যে, ধ্রুবতারা প্রকৃত-পক্ষে একটি মেরুপরিক্রমণকারী তারা মাত্র। সম্রাটের নিকট এ বিষয়ে আমি বিশদ বিবরণী পেশ করি।"

তারা-তালিকা ও তারার স্থানাঙ্ক

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শিহ্ শেন, কান তে, উও হ্সিয়েন প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিয়াং রাজবংশের সময়েও এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তারপরে আর এঁদের সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে জ্যোতির্বিদ ছেন চো এঁদের বইসমূহ থেকে তারার তালিকা নিয়ে একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। ৪২৪ থেকে ৪৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ছিয়েন লো চি নামে অন্য একজন জ্যোতির্বিদ একটি উন্নত ধরনের খ-গোলক তৈরী করেন। এতে উপরোক্ত তিন জ্যোতির্বিদ কর্তৃক নির্ণীত তারাসমূহকে তিনটি পৃথক পৃথক রং-এ চিহ্নিত করা হয়। শিহ্ শেন নির্ণীত তারাসমূহকে লাল রং-এ, কান তে নির্ণীত তারাসমূহকে কালো রং-এ এবং উও হ্সিয়েন নির্ণীত তারাসমূহকে সাদা রং-এ চিহ্নিত করা হয়। ছুতান হ্সি-তা (৭১৫ খ্রীস্টাব্দ)-এর সময় যখন 'থাই ইউয়ান চান চিং' গ্রন্থখানা সঙ্কলিত হয়, তখনও এই তারাচিত্র ও খ-গোলকের উল্লেখ পাওয়া যেত। এই বইখানা এখনও পাওয়া যায়। এর সাহায্যে এবং বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত হ্সিং চিং (তারা-গ্রন্থ) পাওয়া যায়, সেগুলির সাহায্যে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে পর্যবেক্ষণের বিবরণী পাওয়া যায়। ১২২৪ খ্রীস্টাব্দে হ্সু ৎজু-থাই নামে কোন এক হতভাগ্য পরীক্ষার্থীর গল্প থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন রং-এ চিহ্নিত পূর্বপ্রচলিত তারা-চিত্রাবলী সে সময়েও পাওয়া যেত। ছিয়েন লো চিহ্-এর ৯৪০ খ্রীস্টাব্দের একখানা রঙিন তারাচিত্র এখনও পাওয়া যায়।

'সুই শু' গ্রন্থে এইরূপ বিবরণী পাওয়া যায়। "চাং হেং যে তারাচিত্র তৈরী করেন (চু), হ্যান রাজবংশের শেষে গোলমালের মধ্যে সেটি হারিয়ে যায়। ঐ চিত্রে যে সমস্ত তারা ও তারামণ্ডলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি আর কোথাও রক্ষিত ছিল না। পরে ঐ রাজ্যের রাজ-জ্যোতির্বিদ ছেন চো তারা ও তারামণ্ডলসমূহের একটি মানচিত্র

তৈরী করেন। প্রভু কান, প্রভু শিহ্ এবং প্রভু উও হ্সিয়েন, এই তিন জ্যোতির্বিদের মত অনুযায়ী এই তারা-মানচিত্র তৈরী করা হয়। এতে তিনি জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা এবং নানাবিধ আলোচনাও লিপিবদ্ধ করেন। মানচিত্রটিতে ২৫৪টি মণ্ডল, ১২৮৩টি তারা, ২৮টি হ্সিউ, এবং অতিরিক্ত ১৮২টি তারা, সর্বমোট ২৮৩টি মণ্ডল এবং ১৫৬৫টি তারা দেওয়া ছিল। [এখানে হিসাবে ভুল আছে বলে মনে হয়]। তারপরে সুং বংশের ইওয়ান-চিয়ার রাজত্বকালে রাজ-জ্যোতির্বিদ ছিলেন লো চি একটি দস্তাব



রেখাচিত্র ৮৮ঃ তারাচিত্রের আর একটি অংশ। ডাইনে হ্সিউ পি-এর অংশ। কালপুরুষ, মৃগব্যাধ ও শশকমণ্ডল এর অন্তর্ভুক্ত আছে। বামে হ্সিউ লিউ, শুনী, কর্কট ও হ্রদসর্পের অংশ এর অন্তর্ভুক্ত আছে

খ-গোলক তৈরী করেন। তিনি তিনজন ভিন্ন জ্যোতির্বিদের মতবাদের পার্থক্য দেখানোর উদ্দেশ্যে লাল, কালো এবং সাদা এই তিনটি ভিন্ন রং ব্যবহার করেন। তাঁর খ-গোলকের তারাসমূহ ছেন চো-এন তারা-

তালিকার সাথে অভিন্ন। এরপরে সুই রাজবংশের প্রারম্ভে সম্রাট কাও ৎসু, ছেন রাজবংশকে পরাজিত করেন এবং জ্যোতিবিদ্যা বিশারদ চু ফেনকে বন্দী করে নিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও নিয়ে যান। চু, ছি, লিয়াং ও ছেন রাজবংশের সময় যে সমস্ত তারা-মানচিত্র পাওয়া গিয়েছিল, এবং ৎসু কেং চিহ্, সুন সেং-হুয়া এবং অন্যদের নিকটে যে সমস্ত তারা-মানচিত্র ছিল, সেগুলির আকার ও নির্ভুলতা যাচাই করতে তিনি উও চি ৎশাই ও অন্যান্য জ্যোতিবিদগণকে আদেশ করেন। তিন মতবাদ অনুসারে একটি তারা-গোলার্ধ নির্মাণই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।"

প্রাচীন চীনে পরিচিত তারাসমূহের বর্তমানে যে সন্ধান পাওয়া যায় তাতে ২৮৪টি মণ্ডলে (কুয়ান-সরকারী, অথবা ৎসাও-সরকারী আসন) মোট ১৪৬৪টি তারার নাম পাওয়া যায়। নীচের তালিকাতে বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী এদের বিবরণ দেওয়া গেল।

	আসন	তারাসংখ্যা	আসন	তারাসংখ্যা
শিহ্ শেন (লাল)				
অন্তস্থ (চুং)				
(খ-বিষুবের উত্তরে)	৬০	২৭০		
বহিস্থ (ওয়াই)				
(খ-বিষুবের দক্ষিণে)	৩০	২৫০		
হুসিউ	২৮	২৮২		
মোট লাল তারা			১২২	৮০১
কান্ তে (কালো)				
অন্তস্থ (চুং)	৭৬	২৮১		
বহিস্থ (ওয়াই)	৪২	২৩০		
মোট কালো তারা			১১৮	৫১১
উও হ্সিয়েন (সাদা)				
অন্তস্থ, বহিস্থ, মোট সাদা তারা			৪৪	১৪৪
			২৮৪	১৪৬৪

প্রাচীন বিবরণীসমূহে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পাওয়া যায়। ১৩০ খ্রীস্টাব্দে মা হ্‌সু বলেন, "১১৮টি মণ্ডলে মোট ৭৮৩টি তারা আছে।" সমসাময়িক চ্যাং হেং তাঁর 'লিং হ্‌সিয়েন' গ্রন্থে বলেন, "খ-বিষুবের উত্তর ও দক্ষিণে ১২৪টি দল আছে; এরা সব সময়ে উজ্জ্বল। এদের মধ্যে ৩২০টি তারার নামকরণ করা যায়। সর্বমোট ২৫০০টি তারা আছে। নাবিকগণ যে সমস্ত তারা দেখতে পান, সেগুলিকে এর মধ্যে ধরা হয় নাই (এরহ্‌ হাই জেন চিহ্‌ চ্যান ওয়াই ৎশুন)। মোট ১১,৫২০টি ছোট তারা আছে। এরা সকলেই মানুষের ভাগ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"

চ্যাং হেং-এর তালিকাতে কি ছিল, এ থেকে তার কিছু অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু এই তালিকা কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল, না গোলকে চিহ্নিত ছিল, এ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

প্রাচীন তারা-তালিকাসমূহে যে সমস্ত আলোচনা আছে, সেগুলির মধ্যে উয়ে তার আলোচনাই সর্বাপেক্ষা বিশদ। এগুলিতে (১) তারা-মণ্ডলসমূহের নাম, (২) মণ্ডলসমূহের তারাসংখ্যা, (৩) নিকটবর্তী মণ্ডলের সঙ্গে প্রত্যেক মণ্ডলের অবস্থানের সম্বন্ধ এবং (৪) মণ্ডল-নির্দেশক তারার বা প্রধান তারার অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই ৩৬৫¼ ডিগ্রীর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি অবস্থান ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়েছে। নির্দেশক তারা বা প্রধান তারার অবস্থান নির্ণয় করতে (ক) নির্দেশক তারা যে হ্‌সিউতে অবস্থিত, সেই হ্‌সিউ এর আদিবিন্দু থেকে তারাটির কাল-কোণ এবং (খ) উত্তর খ-মেরু থেকে তারার দূরত্ব, এই দুইটি স্থানাঙ্কের উল্লেখ করা হ'তো। এর প্রথম স্থানাঙ্কটি বিষুবাংশের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তুং হ্‌সিয়েন মণ্ডলের সর্বদক্ষিণ তারাটি হ্‌সিন হ্‌সিউ-এর আদিবিন্দু (রু হ্‌সিন-এরহ্‌ তু) থেকে ২ ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় স্থানাঙ্কটি বিষুবলম্বের পরি-পূরক। এই তারাটির বেলায় বলা যেতে পারে যে, উত্তর খ-বিষুবমেরু থেকে এর দূরত্ব-১০৩ ডিগ্রী (ছু চি, অথবা পাই ছেন, আই পাই স্যান তু)।

উয়ে তা তাঁর তারা-তালিকাতে এক ডিগ্রীর বিভিন্ন অংশের জন্য যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

তু	ডিগ্রী	
জো	'দুর্বল'	১৫/১৬ ডিগ্রী
প্যান	'অর্ধ'	১/২ ডিগ্রী
শাও	'ছোট'	১/৪ ডিগ্রী
ছিয়াং	'সবল'	১/১৬ ডিগ্রী
শ্যাও ছিয়াং	'ছোট সবল'	৫/১৬ ডিগ্রী
প্যান জো	'অর্ধ দুর্বল'	৭/১৬ ডিগ্রী
প্যান ছিয়াং	'অর্ধ সবল'	৯/১৬ ডিগ্রী
থাই	'বড'	৩/৪ ডিগ্রী
শ্যাও জো	'ছোট দুর্বল'	৩/১৬ ডিগ্রী

উয়ে তা বিভিন্ন যুগে তারাসমূহের উত্তর খ-বিষুব মেরুর দূরত্ব থেকে ঐ সমস্ত যুগের আনুমানিক সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। নীচের তালিকাতে তাঁর নির্ণীত সময় দেওয়া গেল। এই তালিকা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যে সমস্ত পরিমাপ এখনও নানা জায়গায় পাওয়া যায়, তাদের অনেকগুলিই শিহ্ শেন এবং কান্ তে'র সময়ের। অন্যগুলি পরবর্তী যুগে সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে।

তারা-তালিকা গঠনের সম্ভাব্য সময়
(উয়ে তা'র মতে)

২৮টি হ্‌সিউ

৬টি (চিও, হ্‌সিন, ফ্যাং, চিং এবং চ্যাং ; সম্ভবতঃ তু ও)	খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ
১৭টি	২০০ খ্রীস্টাব্দ
২টির উত্তর মেরু-দূরত্ব জানা যায় না (খ্যাং, শেন)	
৩টি (তি, লিউ, হ্‌সিং)	অনির্দিষ্ট

উত্তর গোলকার্ধের ৬২টি তারা

২৭টি	খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ
১৩টি	১৮০ খ্রীস্টাব্দ
৬টি, উত্তর মেরু-দূরত্ব জানা যায় না।	
অবশিষ্ট	অনির্দিষ্ট

দক্ষিণ গোলকার্ধের ৩০টি তারা

১০টি	খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ
১৬টি	২০০ খ্রীস্টাব্দ
৪টি	অনির্দিষ্ট

বর্তমানে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-ইতিহাসে বলা হয়ে থাকে যে, টাইকো ব্রাহের সময় পর্যন্ত টলেমীর 'আলমাজেস্ট'ই তারার অবস্থান নির্ণয়ের একমাত্র উৎস ছিল। ঐতিহাসিকগণ এ কথা বলেন না যে, পাশ্চাত্যে 'আলমাজেস্ট'ই ছিল একমাত্র উৎস ; তাঁরা দাবী করেন, সারা পৃথিবীতে ছিল এই একমাত্র উৎস। অবশ্য তাঁরা উলুগবেগের তারা-তালিকার উল্লেখ না ক'রে পারতেন না। কিন্তু এখন দেখা যায় যে তাঁদের এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল ছিল ; আর এই ভুলের একমাত্র কারণ, পূর্ব-এশিয়া সম্বন্ধে তাঁদের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। চীনা তারা-তালিকার সঙ্গে হিপারকাস ও টলেমীর তালিকা তুলনা করলে দেখা যায় যে, চীনা তালিকার অনেক পরে হিপারকাসের তালিকা (খ্রীস্টপূর্ব ১৫০ অব্দ) প্রণয়ন করা হয় এবং হিপারকাসের তালিকার তারাসংখ্যা চীনা তালিকার তারাসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ কম। 'আলমাজেস্টে'র তারাসংখ্যা ১০২৮ আর চীনা তারাসংখ্যা ১৪৬৪।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারাসমূহের যে স্থানাঙ্ক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তা' গ্রীক বা পাশ্চাত্য পদ্ধতি নয় বরং সংশোধিত আকারের চীনা পদ্ধতি। পাশ্চাত্যে প্রথমে সূর্যপথের উপরে ভিত্তি করেই স্থানাঙ্ক নির্দেশ করা হ'তো। কিন্তু পরে, টাইকো ব্রাহের সময় সূর্যপথ-ভিত্তিক পদ্ধতি পরিত্যাগ ক'রে খ-বিষুব

ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। অবশ্য চীনা পদ্ধতিতে যে স্থানাঙ্ক ব্যবহার করা হতো, তাতে বর্তমানের মত বিষুবনকে মূলবিন্দু মনে করা হতো না; প্রত্যেকটি হ্সিউ-এর আদিবিন্দু থেকে এই স্থানাঙ্ক পরিমাপ করা হতো।

তারা ও তারামণ্ডলসমূহ

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, গ্রীক ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় তারা-মণ্ডলসমূহ প্রায় এক; অতি অল্প জায়গাতেই পার্থক্য দেখা যায়। ভারতীয় ও গ্রীক তারামণ্ডলসমূহ প্রায় একই তারাসমূহ দ্বারা গঠিত এবং তাদের আকার ও গঠন-প্রণালীও প্রায় একরূপ। কিন্তু চীনা জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নাই বললেই চলে। ভারতীয় বা গ্রীক তারামণ্ডলের তারাসমূহ নিয়ে চীনা তারামণ্ডল তো গঠিত হয়-ই নাই, এমনকি কোথাও একপ্রকার আকারও দেখা যায় না। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যাতে যেখানে একটি মণ্ডলের কল্পনা করা হয়েছে, চীনা জ্যোতির্বিদ্যাতে সেখানে একাধিক মণ্ডল দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হাইড্রা বা হ্রদসর্প মণ্ডলের উল্লেখ করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যাতে আকাশের একটি বিরাট অংশের তারাসমষ্টিকে নিয়ে এই মণ্ডলটির কল্পনা করা হয়েছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাতেও এখানে একটিমাত্র মণ্ডলের কল্পনা করা হয়েছে; হ্রদসর্প নামটিরও হাইড্রার সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে। কিন্তু চীনা জ্যোতির্বিদ্যাতে হাইড্রার তারা-সমূহ এবং আশেপাশের অন্যান্য তারা নিয়ে চ্যাং, হ্সিং ও লিউ এই তিনটি হ্সিউ এবং আটটি মণ্ডল গঠন করা হয়েছে। এই আটটি মণ্ডলের কোনটির গঠন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে হাইড্রার কোন অংশের গঠন-প্রক্রিয়ার কোন মিল নাই। যে সমস্ত তারা যেভাবে যোগ ক'রে হাইড্রা গঠন করা হয়েছে, চীনে সে সমস্ত তারা বিবেচনা না করে অন্য কতকগুলি তারা অন্যভাবে যোগ করা হয়েছে। অতএব এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে, গ্রীক ও ভারতীয় মণ্ডলসমূহ অভিন্ন। এক দেশ অন্য দেশ থেকে এই নাম ও আকার গ্রহণ করেছে। নক্ষত্র পদ্ধতি ভারতের নিজস্ব, কিন্তু

তারামণ্ডলের নাম ও আকার নিঃসন্দেহে গ্রীস থেকে পাওয়া। স্বাধীন-ভাবে তারামণ্ডলের আকার গঠন করতে গেলে এমন কোন স্বাভাবিক অবস্থা আকাশে দেখা যায় না, যে জন্য বিশেষ কতকগুলি তারাকে নিয়ে বিশেষ কোন আকারের কল্পনা করা যেতে পারে। অন্যান্য তারাসমষ্টির সঙ্গে অন্য যে কোনভাবের আকার কল্পনা করা সম্ভব। এদিক থেকে দেখতে গেলে সহজেই বোঝা যায় যে, চীনের তারামণ্ডলসমূহ স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে ; অন্য কোন দেশের প্রভাব এর উপরে পড়ে নাই।

তবে চীনা ও পাশ্চাত্য তারামণ্ডলসমূহের মধ্যে দুই-একটি মিল হয়তো খুঁজে বের করা যেতে পারে। কিন্তু এই মিল আকস্মিক; এর ভিতরে কোন পূর্বকল্পনা খুঁজে বের করা সঙ্গত নয়। অতি কষ্টকল্পনা ক'রে চীনা তারাসমষ্টির সাথে পাশ্চাত্য তিনটি রাশি এবং সাতটি রাশিচক্র-বহির্ভূত মণ্ডলের কিছু সামঞ্জস্য খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। রাশি-চক্রের এই তিনটি রাশি হলো মকর (নিউ), সিংহ (হুসুয়ান ইউয়ান, ড্রাগনের মেরুদণ্ড) এবং বৃশ্চিক (ফ্যাং, হুসিন এবং ওযাই)। রাশিচক্রের বহির্ভূত মণ্ডলসমূহ হলো অরিগা (উ ছে, পাঁচ রথ), বুটিস (হুসুয়ান কো, কঠোর কুঠার), মৃগব্যাধ (থিয়েন লাং, লুব্ধক), দক্ষিণ কিরীট (পি, কচ্ছপ), উত্তর কিরীট (কুয়ান সো, কুণ্ডলীকৃত চাবুক), কাল-পুরুষ (শেন, মানুষের আকৃতি) ও সপ্তর্ষি মণ্ডল (পাইতু, উত্তর চামচ)। এই মণ্ডলসমূহের তারা-সমষ্টি আকাশে এমনভাবে সাজানো আছে যে, এই সামান্য মিল অতি স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজকাল স্বীকার করে নিয়েছেন যে, চীনা তারামণ্ডলসমূহ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে।

তারা-মানচিত্র

খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে, এমনকি হ্যান রাজবংশের সময় থেকেই যে চীনদেশে তারা-মানচিত্র আঁকা চলছিল, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। হ্যান রাজবংশের সময়ের খোদাই ও রিলিফ করা শিল্প থেকে জানা যায় যে, সেই সময় থেকেই বিন্দু অথবা ছোট ছোট বৃত্ত দিয়ে তারা নির্দেশ করা হ'তো এবং রেখা দিয়ে সেগুলিকে যোগ ক'রে

তারামণ্ডল আঁকা হতো। নীচের ছবিতে হ্যানবংশীয় একটি কবরের উপরে খোদাই করা একটি চিত্র দেখা যায়। এখানে তারাসমষ্টির সাহায্যে একটি



রেখাচিত্র ৮৯ : পাথরে খোদিত হ্যান যুগের একটি তারাচিত্র। বামে তাঁতী মেয়ে (চিহ্ নু) মণ্ডল। তার মাথার উপরে অভিজিৎ দেখা যায়। মাঝখানে সূর্যের চিত্র, ভিতরে কাকের ছবি দেখা যায়

তাঁত এবং পাশে একজন তাঁতী-মেয়েকে (চিহ্ নু; অভিজিৎ) তাঁত বুনতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে জ্যোতিষী ব্যাখ্যার জন্য এইভাবে তারামণ্ডলের



রেখাচিত্র ৯০ : তাওবাদীদের পতাকাতে একটি তারামণ্ডলের চিত্র

চিত্র আঁকা হতো। তাও মন্দিরের পতাকাতেও এইরূপ ছবি দেখা যায়। উপরের চিত্রে চুংকিং-এর একটি তাও মন্দিরের পতাকার ছবি দেওয়া গেল।

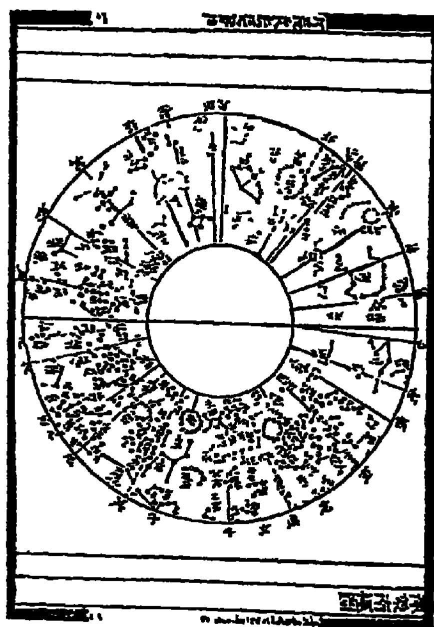
সু সুং প্রণীত 'হ্‌সিন আই হ্‌সিয়াং ফা ইয়াও' গ্রন্থে যে তারা-মানচিত্র দেখা যায়, সেইটিই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রিত তারা-মানচিত্র। এই গ্রন্থখানির সংকলন আরম্ভ হয় ১০৮৮ খ্রীস্টাব্দে, এবং শেষ হয় ১০৯৪ খ্রীস্টাব্দে। এখানে পাঁচটি তারা-মানচিত্র দেওয়া আছে। একটি উত্তর খ-মেরু অঞ্চলের, দুইটি ৫০ ডিগ্রী উত্তর ও ৬০ ডিগ্রী দক্ষিণ নতি অঞ্চলের, আর দুইটির একটি উত্তর খ-গোলকার্ধের এবং অন্যটি দক্ষিণ খ-গোলকার্ধের। এই তারা-মানচিত্র থেকে নীচে দুইটি চিত্র দেওয়া গেল।



রেখাচিত্র ৯১ : 'হসিন আই হসিয়াং ফা ইয়াও'
গ্রন্থের একটি তারাচিত্র

চীনের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত তারা-মানচিত্র তৈরী করা হয় ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে। নিং ৎসুং নামে একজন যুবরাজের শিক্ষার জন্য ১২৪৭ খ্রীস্টাব্দে এই তারা-মানচিত্রটিকে খোদাই করা হয়। এই মানচিত্র চিয়াংশুতে সু চো'র কনফুসিয়ান মন্দিরে রক্ষিত আছে। এর সঙ্গে তারা-মানচিত্রটির বিভিন্ন বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণী ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কনফুসিয়ান দর্শন দিয়ে আরম্ভ

ক'রে এতে খ-গোলকের 'লাল' এবং 'হলুদ' রাস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, "লাল রাস্তা আকাশের হৃদয় বেষ্টন ক'রে আছে এবং এই রাস্তার সাহায্যে ২৮টি হ্‌সিউ-এর ডিগ্রীর পরিমাণ সংশোধন করা হয়।" তারপরে 'সাদা রাস্তা' বা চন্দ্রপথের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, 'সাদা রাস্তা সূর্যপথকে ৬ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে'। তারপরে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে



রেখাচিত্র ৯২ : ঐ গ্রন্থে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের একটি তারাচিত্র

যে, মোট ১৫৬৫টি তারার নামকরণ করা হয়েছে। গ্রহের সঙ্গে জ্যোতিষের সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে এবং আকাশের বিভিন্ন অংশের সাথে চীনের বিভিন্ন জায়গার সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত জায়গাগুলি আকাশের ঘটনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই গ্রন্থের একটি

অধ্যায়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ঋতু-নির্দেশক বলে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্য সমস্ত তারা-মানচিত্রের মত এখানেও হ্‌সিউ-নির্দেশক তারাসমূহের কাল-বৃত্তসমূহকে বিকীর্ণ সরলরেখার মত দেখানো হয়েছে।

কোরিয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ই তাই জো-এর আদেশে ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দে আর একটি তারা-মানচিত্র খোদাই করা হয়। এই মানচিত্রটি যদিও পূর্বোল্লিখিত মানচিত্রের পরের যুগের, তবু এর গঠন ও খোদাইভিত্তি সু সুং-এর তারাচিত্রের গঠনভিত্তি অপেক্ষা প্রাচীন। এখানে ছায়াপথকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারাগুলিকে ছোট-বড় বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।

জাপানে ব্রঞ্জের তৈরী ১৩½ ইঞ্চি ব্যাসের একটি তারা-মানচিত্র পাওয়া গেছে। এখানে উঁচু বিন্দু দিয়ে তারা দেখানো হয়েছে। এই চিত্রটি নৌ-চালনার কাজে ব্যবহার করা হ'তো বলে মনে হয়। এটি খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে তৈরী বলে মনে হয় না।

এ ছাড়া পরবর্তীকালে রেশমের কাপড়ের উপর তারা-মানচিত্র আঁকা হয়েছে, এমন অনেক দেখা গেছে। এই সমস্ত মানচিত্রে দক্ষিণ খ-মেরু অঞ্চলের তারামণ্ডলসমূহের ছবিও আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রহণাদি ঘটনাবলীর বিবরণ

প্রাচীন চীনা ভাষায় গ্রহণকে বলা হ'তো শিহ্, অর্থ 'খেয়ে ফেলা'। আইয়াং হাড-লিপিতে এ শব্দটির উল্লেখ আছে। এই শব্দ এবং তার অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ ঘটলে প্রাচীন চীনে বলা হ'তো যে, কোন স্বর্গীয় ড্রাগন এই দুইটি জ্যোতিককে খেয়ে ফেলত এবং কোন কারণে হজম করতে না পেরে আবার তাদের উগড়ে দিত। পরবর্তী যুগে এই শিহ্ শব্দটির এমনভাবে গঠন করা হয় যে, এতে পোকায় খাওয়া বলে বোঝা যেত।

কত প্রাচীনকাল থেকে চীনদেশে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণ ক'রে আসা হয়েছে এবং তার বিবরণ পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হয়ে গেছে। এই বাদানুবাদ আরম্ভ হয় খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে। গ্রহণচক্রের উপর চীনা জ্যোতির্বিদগণের আস্থা এত প্রবল ছিল যে, এক সময়ে আই হ্সিং নিজে হ্সিয়া ও শ্যাং রাজবংশের সময়ের গ্রহণ-গণনা করেন। প্রচলিত প্রথামত 'শু চিং' গ্রন্থে যে গ্রহণের উল্লেখ আছে, সেটি তৃতীয় সহস্রাব্দীতে সংঘটিত একটি সূর্যগ্রহণ বলে মনে হয়। "শরতের শেষ মাসের প্রথম দিনে সূর্য এবং চন্দ্র ফ্যাং-এ মিলিত হয় নাই (নাই চি ছিউ, ইউযেহ শুও, ছেন ফু চি ইউ ফ্যাং)।" এতে যে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে তার সংঘটনকাল খ্রীস্টপূর্ব ২১৬৫ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ১৯৪৮ অব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু এখন মনে হয় যে, এ একটি রূপকথার কাহিনী মাত্র। সেজন্য এর সংঘটন-কাল নির্ণয়ের চেষ্টা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এরপরে সকলেই একমত হন যে, শিহ্

চিং-এ যে সূর্যগ্রহণের উল্লেখ আছে, লিপিবদ্ধ গ্রহণসমূহের সেইটিই সর্ব-প্রাচীন। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে এই গ্রহণের সংঘটনকাল খ্রীস্টপূর্ব ৭৩৪ অব্দ। কিছুদিন পূর্বেও এই মত ঠিক বলে মেনে নেওয়া হ'তো। কিন্তু হাড়-লিপি আবিষ্কারের পরে দেখা যায় যে, তাতে আরো অনেক প্রাচীনকালের গ্রহণের উল্লেখ আছে। এইরূপে হাড়-লিপি গবেষণা ক'রে তুং ৎসো-পিন ছয়টি চন্দ্রগ্রহণ এবং একটি সূর্যগ্রহণের সন্ধান পেয়েছেন। চন্দ্রগ্রহণগুলি খ্রীস্টপূর্ব ১৩৬১, ১৩৪২, ১৩১১ এবং ১৩০৪ অব্দে এবং সূর্যগ্রহণটি ১২১৭ অব্দে সংঘটিত হয়। এই সঙ্গে তিনি সপ্তম একটি চন্দ্রগ্রহণের উল্লেখও করেছেন। 'আই চু শু' গ্রন্থে এই গ্রহণটির বিবরণী দেওয়া আছে। এটি খ্রীস্টপূর্ব ১১৩৭ অব্দে সংঘটিত হয়। পরে আর একটি প্রবন্ধে তিনি আরো তিনটি গ্রহণের বিবরণী উদ্ধার করেছেন; এই তিনটি গ্রহণের একটি চন্দ্রের, একটি সূর্যের। তৃতীয়টি চন্দ্রের বা সূর্যের যে কোন একটির হতে পারে।

একটি বেশ মজার ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'শিহ্ চিং' গ্রন্থে সূর্যগ্রহণকে ছু (কদাকার, অস্বাভাবিক) বলা হয়েছে, আর চন্দ্রগ্রহণকে ছ্যাং (স্বাভাবিক) বলা হয়েছে। এতে মনে হয়, চন্দ্রগ্রহণ অনেকটা সাধারণ ঘটনা ছিল, আর কচিৎ কখনো সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হতে দেখা যেত।

গ্রহণতত্ত্ব

গ্রহণের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে প্রাচীন চীনের জ্যোতির্বিদগণের বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু গ্রহণ পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণের কাজ চীনদেশে গ্রীকযুগের আগে থেকেই, এমনকি বেবিলনীয় যুগের সময় থেকেই হয়ে এসেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদ শিহ্ শেন বুঝতে পারেন যে, গ্রহণের সঙ্গে চন্দ্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কেননা গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য তিনি সূর্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর

ভিত্তি কববার নির্দেশ দেন। অন্ধকার ব্যাত্রিতে (হুই) চান্দ্রমাসেব প্রথমে বা শেষে সূর্য ও চন্দ্রের সংযোগকালে (চিও) গ্রহণ সংঘটিত হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস কবতেন। চন্দ্রবিম্ব সূর্য ও পৃথিবীব মাঝখানে এসে সূর্যকে অদৃশ্য কবে দেয়—এই তত্ত্ব শিহু শেন জানতেন বলে মনে হয় না। বরং তাঁর মতে, চন্দ্রেব ইয়িন প্রভাব সূর্যেব ইয়াং প্রভাবকে প্রতিহত কবে বলেই সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। এইজন্য বান্‌তে বলতেন, সূর্যেব কেন্দ্র হতে গ্রহণ আবম্ভ হয় এবং পরে বাইবেব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। চু এবং হ্যান রাজবংশের সময়েব জ্যোতির্বিদগণ সূর্যের ঘোমটার (পো) কথা বলতেন।

স্‌মা ছিয়েনেব সময় মনে কবা হতো যে, পাঁচটি গ্রহ ছাড়াও জ্যেষ্ঠা এবং স্বাতী-তারার যে কোন একটিব প্রভাবে চন্দ্রগ্রহণ হতে পাবে। তিনি জানতেন যে, চন্দ্রগ্রহণের নির্দিষ্ট সময় আছে; কিন্তু সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে সেরূপ নির্দিষ্ট সময়েব কথা বলতে তিনি সাহস করেন নাই।

ওয়াং চুং-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও প্রভাব বিস্তাব তত্ত্ব ভালভাবে প্রচলিত ছিল। আবাব তাঁব লেখা থেকে এ কথাও জানা যায় যে, সে সময়েব অনেক আগে থেকেই গ্রহণেব প্রকৃত তত্ত্ব জানা ছিল। কিন্তু তিনি নিজে এই তত্ত্বেব বিরোধী ছিলেন। সূর্য ও চন্দ্র এই দুইটি জ্যোতিষ্কেব 'ছি'-এব সঙ্কোচন হওযাব বা অস্পষ্ট হওযার ফলেই যে গ্রহণ সংঘটিত হয়, একথা তিনি বিশ্বাস কবতেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,

"পণ্ডিতগণেব মতে চন্দ্রেব জন্যই সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। দেখা গেছে যে, অমাবস্যাব সময়ে মাসেব শেষদিনে (হুই) এবং মাসেব প্রথম দিনে (শুও) চন্দ্র ও সূর্য যখন সংযোগস্থলে থাকে, তখন সূর্যগ্রহণ ঘটে, অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যকে ঢেকে ফেলে। বসন্ত ও হেমন্তকালে অনেক গ্রহণ হয়ে থাকে; এবং 'ছুন ছিউ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অমুক অমুক মাসের অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল, কিন্তু এব কোথাও এমন কথা বলা হয় নাই যে, চন্দ্রই এই সমস্ত গ্রহণ ঘটিয়েছিল। প্রাচীনকালেব জ্যোতির্বিদগণ যদি

জানতেন যে, চন্দ্রের জন্যই গ্রহণ সংঘটিত হয়, তা হ'লে সে কথা তাঁরা বলেন নাই কেন ?

এক্ষণে এই অস্বাভাবিক অবস্থায় ইয়াং দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইয়িন সবল হয়ে ওঠে, কিন্তু এমন ঘটতে দেখা যায় না যে, সবল দুর্বলকে পরাভূত করে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, মাসের শেষে চন্দ্রের আলো অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মাসের প্রথমে চন্দ্রের আলো থাকে না বললেই চলে। তা হলে সে কি করে সূর্যকে পরাজিত করতে পারে? কেউ যদি এ কথা বলতে চায় যে, চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করে বলেই সূর্যগ্রহণ হয়, তা হলে চন্দ্রগ্রহণের সময়ে চন্দ্রকে কে গ্রাস করে? কিছুই তাকে গ্রাস করে না ; সে আপনা থেকেই আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে যায়। সূর্যগ্রহণের বেলাতেও একই তত্ত্ব প্রয়োগ ক'রে বলা যেতে পারে যে, সূর্যও আপনা আপনি অদৃশ্য হয়ে যায়।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে প্রতি ৪১ বা ৪২ মাসে একটি ক'রে সূর্যগ্রহণ হয় এবং প্রতি ১৮০ দিনে একটি ক'রে চন্দ্রগ্রহণ হয়। পণ্ডিতেরা যে বলে থাকেন, গ্রহণের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, তার কারণ এই নয় যে, চন্দ্রের আবর্তনকালে কতকগুলি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে ; বরং তার কারণ এই যে, ঐ সময়ে সূর্যের 'ছি'-এর অবস্থার পরিবর্তন হয়। মাসের প্রথমে ও শেষে সূর্যের 'ছি'-এর পরিবর্তনের সময়ের সঙ্গে চন্দ্রের কোন সম্বন্ধ আছে, এমন বলার কি কারণ থাকতে পারে? স্বাভাবিকভাবে সূর্য পূর্ণ অবস্থায় থাকবে ; তার যদি কোন সঙ্কোচন (থুয়াই) হয়, তবে সেটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। আর এই ব্যাপারকে পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে, সূর্যকে কেউ গ্রাস করেছে। কিন্তু ভূমি-ধ্বস ও ভূমিকম্পের সময় কে তাদের গ্রাস করে?

অন্য অনেক পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে, সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্যকে ঢেকে ফেলে (ইউয়েহ্ ইয়েন চিহ্)। সূর্য অনেক দূরে থাকে আর চন্দ্র নিকটে থাকে ; সেজন্য চন্দ্র, সূর্যের আকৃতিক দৃশ্যকে বাধা দেয় (চ্যাং)। কিন্তু চন্দ্র যদি অনেক দূরে হ'তো, আর সূর্য নিকটে হতো, তা হলে চন্দ্র সূর্যকে

ঢেকে ফেলতে পাবতো না। কিন্ত প্রকৃত ঘটনা এর ঠিক বিপবীত। সেজন্যই সূর্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। চন্দ্র, সূর্যেব আলো-কে আচ্ছাদিত করে ফেলে, ফলে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। যেমন মেঘলা দিনে সূর্য বা চন্দ্র কিছুই দেখা যায না। যখন তা'বা পরস্পরকে স্পর্শ করে, তখন একে-অন্যকে গ্রাস কবে; আর যখন তা'রা সমকেন্দ্রিক হয়, তখন একে-অন্যেব মুখোমুখি দাঁড়ায এবং সূর্য প্রায নিভে যায। অমাবস্যাব সময় সূর্য ও চন্দ্র যে সংযোগে অবস্থান কবে, এ একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু সূর্যগ্রণেব সময সূর্যের আলো চন্দ্র দ্বাবা আচ্ছাদিত হয, এ ঠিক নয। কিভাবে এর প্রমাণ করা যেতে পাবে? সূর্য এবং চন্দ্র যখন সংযোগে অবস্থান করে এবং সূর্যেব আলো যখন চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয, তখন তাদেব দুইটি প্রান্তদেশ (ইযাই) প্রথমে স্পর্শ করবে এবং পরে যখন আলো আবাব দেখা যাবে, তখন নিশ্চযই তাদের পরস্পবের স্থান পরিবর্তন হবে। মনে কব, সূর্য পূবদিকে আছে আব চন্দ্র আছে পশ্চিম দিকে। চন্দ্র দ্রুতগতিতে পূবদিকে যেযে সূর্যেব সঙ্গে মিলিত হয এবং তাব একপ্রান্ত আচ্ছাদিত কবে ফেলে। তারপরে আরো পূবদিকে যেতে যেতে চন্দ্র সূর্যকে অতিক্রম করে যায। সূর্যের যে পশ্চিম অংশ প্রথমে আচ্ছাদিত হযেছিল, সেই অংশ তখন আলোকিত হয এবং পূবের যে অংশ আগে আচ্ছাদিত ছিল না, এখন সেই অংশ আচ্ছাদিত হযে পড়ে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সূর্যগ্রহণেব সময় আমবা দেখতে পাই যে, পশ্চিম প্রান্ত প্রথমে অন্ধকার হযে যায; কিন্তু পরে পশ্চিম প্রান্ত যখন আলোকিত হয, পূর্বপ্রান্তও তখন আলোকিত হয। চন্দ্র, সূর্যেব পুব ও পশ্চিম উভয দিকেরই ভিতরের অংশ আচ্ছাদিত কবে। একে 'প্রকৃত বাধা' (হো হুসি) এবং 'পরস্পর অস্পষ্টকরণ' (হুসিব়ান ইয়েন চাং) বলে। এই ঘটনা কিভাবে ব্যাখ্যা কবা যায?

পণ্ডিতেরা আবো বলে থাকেন যে, সূর্য ও চন্দ্রেব আকার গোলকাকাব। কিন্ত এদেব দিকে তাকালে, এদেব গোল ঘুড়ির মত দেখা যায। অনেক

দূরের আলোর 'ছি' যেমন দেখায়, এরা সেরূপ নয় ; কেননা আলোর 'ছি' গোলাকার হতে পারে না। আমার মতে, সূর্য ও চন্দ্র গোলকাকার নয় ; অনেক দূরে অবস্থিত বলেই এরা এরূপ দেখায়। কিভাবে এর প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে? সূর্য আগুনের সারাংশ। পৃথিবীতে আগুন ও পানি কোন সময়ই গোলকাকার ধারণ করে না। তা হলে কেবলমাত্র আকাশেই বা তা'রা গোলকাকার হবে কেন? সূর্য ও চন্দ্র অন্য পাঁচটি গ্রহের মত ; এগুলি আবার তারার মত। কিন্তু অন্যান্য তারা প্রকৃতপক্ষে গোলকাকার নয় ; অনেক দূরে থেকে আলো দেয় বলে' গোলকাকার দেখায়। কিভাবে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি? বসন্ত এবং হেমন্ত-কালে সুং রাজ্যের রাজধানীর উপর তারা পড়েছিল। সেই তারা পরীক্ষা করতে যেয়ে দেখা গেল যে, সেটা পাথর, আর তার আকারও গোলাকার নয়। এই সমস্ত তারা যখন গোলকাকার নয়, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহগণও গোলকাকার নয়।"

উপরের বিবরণী পাঠে বোঝা যায় যে, ওয়াং ছুং-এর সময়ে (খ্রীস্টীয় ৮০ অব্দ) গ্রহণের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তবে তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন যে, সূর্য ও চন্দ্রের নিজস্ব পর্যায়ক্রমিক উজ্জ্বলতা আছে। বলয়গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেই তিনি প্রকৃত তত্ত্বের বিরোধিতা করেন।

প্রকৃত মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, লিউ হ্সিয়াং-এর 'উও চিং থুং আই' গ্রন্থে। এই গ্রন্থখানি খ্রীস্টপূর্ব ২০ অব্দে রচিত। এতে বলা হয়েছে যে, "চন্দ্র নিজের চলার পথে যখন সূর্যকে ঢেকে ফেলে, তখন সূর্যগ্রহণ হয়।" ওয়াং ছুং-এর পরেও এ তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১২০ খ্রীস্টাব্দে চ্যাং হেং তাঁর 'লিং হ্সিয়েন' গ্রন্থে বলেন,

"সূর্য আগুনের মত আর চন্দ্র পানির মত। আগুন আলো দেয়, আর পানিতে সেই আলো প্রতিফলিত হয়। এইভাবে সূর্যের আলো থেকেই চন্দ্রের আলোর সৃষ্টি হয়। আর সূর্যের আলো বাধা পাওয়ার

ফলেই চন্দ্রে অন্ধকারের (ফো) সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের যে অংশ সূর্যের দিকে থাকে, সেই অংশ সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয়; আর যে অংশ সূর্য-থেকে দূরে থাকে, সে অংশ অন্ধকার থাকে। গ্রহ এবং চন্দ্রের স্বভাব পানির মত; এরা আলো প্রতিফলিত করে। সূর্য থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয়, পৃথিবীর বাধার (পি) জন্য সে আলো সব সময় চন্দ্রে পৌঁছিতে পারে না (তাং জিংহু চিহ্ ছুং কুযাং); একেই আন্ হুস্ম্ চন্দ্রগ্রহণ বলে। কোন গ্রহের জন্য এই অবস্থা হলে তাকে আচ্ছাদন (হ্সিং ওয়াই) বলে। চন্দ্র যখন কুও (সূর্যের পথে)-তে পড়ে যায়, তখন শিহ্ (সূর্যগ্রহণ) হয়।"

খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সুং রাজবংশের জ্যোতির্বিদগণের মতামত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ের জ্যোতির্বিদ শেন্ কুয়া (১০৮৬ খ্রীস্টাব্দে) বলেন,

"আমি যখন 'চাও ওয়েন' গ্রন্থখানা সমালোচনা করেছিলাম, তখন সেখানে আমি মানমন্দিরে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। পরিচালক সাহেব আমাকে সূর্য ও চন্দ্রের আকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'সেগুলো কি বলের মত, না পাখার মত? যদি তা'রা বলের মত হয়, তা হলে তা'রা মিলিত হলে পরস্পরকে বাধা দেবে।' আমি তাঁকে বললাম, 'আকাশের এই সমস্ত বস্তু নিশ্চয়ই বলের মত'। 'এটা আমরা কিভাবে জানতে পারি?' 'চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধিতেই (ইযিং খুয়াই) এ ব্যাপার জানা যায়।' চাঁদের নিজের কোন আলো নাই; এ একটি রূপার বলের মত। চাঁদের আলো প্রকৃতপক্ষে সূর্যের প্রতিফলিত আলো। চন্দ্রকে যখন প্রথম উজ্জ্বল দেখা যায়, সূর্যের আলো তখন তার একপাশ দিয়ে পড়ে। সেজন্য সেইপাশ মাত্র আলোকিত হয় এবং আমরা অর্ধচন্দ্র দেখতে পাই। সূর্য যতই দূরে যেতে থাকে, তার আলো চন্দ্রের উপরে ততই সোজা হয়ে পড়তে থাকে এবং অবশেষে আমরা চন্দ্রকে বুলেটের মত গোল দেখতে পাই। কোন গোলকের অর্ধেক সাদা পাউডার দিয়ে ঢেকে দিলে, একপাশ

থেকে দেখলে পাউডারে ঢাকা অংশটিকে অর্ধচন্দ্রের মত দেখায়। আর সামনে থেকে দেখলে পূর্ণিমার চাঁদের মত দেখায়।

সূর্য এবং চন্দ্র 'ছি' দ্বারা গঠিত : তাদের আকার আছে, কিন্তু কোন কঠিন বস্তু নাই। সেজন্য কোনপ্রকার বাধা না পেয়েই তা'রা পরস্পর মিলিত হ'তে পারে।

এরপরে তিনি আবো জিজ্ঞাসা করেন, "চন্দ্র ও সূর্য প্রতিদিন একবার সংযোগ অবস্থায় (হো) ও একবার প্রতিযোগ অবস্থায় (তুই) থাকে। তা হলে কোন কোন সময়ে গ্রহণ হয় আবার কোন সময় গ্রহণ হয় না কেন?" উত্তরে আমি বললাম, 'সূর্যপথ ও চন্দ্রপথ দুইটি বলয়ের মত। একটি আর একটির উপর অবস্থিত (হুসিয়েং তিয়েহ); কিন্তু তাদের ভিতরে পার্থক্য (তীর্যকতা) অত্যন্ত সামান্য। এই তীর্যকতা যদি না থাকতো, তা হ'লে যখনই এই দুইটি খ-বস্তু সংযোগে অবস্থান করে তখনই সূর্যগ্রহণ হতো এবং যখনই প্রতিযোগে অবস্থান করে, তখনই চন্দ্রগ্রহণ হ'তো। কিন্ত এদের অবস্থান সমান ডিগ্রী দূরত্বে হলেও, দুইটি পথ সব সময় নিকটবর্তী হয় না; সেজন্য খ-বস্তু দুইটির একে-অপরকে কোনপ্রকার বাধা দিতে পারে না। সংযোগের সময় যখন তা'রা নিকটবর্তী হয়, অর্থাৎ সূর্যপথ ও চন্দ্রপথ যেখানে ছেদ করে, সংযোগের সময় জ্যোতিক দুইটি সেখানে থাকলে, সূর্য ও চন্দ্র পরস্পরকে আক্রমণ করে এবং একে অন্যকে আবৃত করে। পাতবিন্দুতে (চিয়াও ছু) সংযোগ হলে পূর্ণগ্রহণ হয়। সংযোগ যদি কেন্দ্রীয় ও প্রতিসম না হয় তা হ'লে আংশিক গ্রহণ হয়।

আমি আরো বললাম যে, সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রপথ যদি বাইরের দিক হ'তে সূর্যপথে প্রবেশ করে এবং ভিতর দিক থেকে সূর্যপথকে অতিক্রম করে তা হ'লে প্রথম স্পর্শ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হবে এবং শেষ স্পর্শ হবে উত্তর-পূর্ব দিকে। আর চন্দ্রপথ যদি ভিতর দিক হতে প্রবেশ করে এবং বাইরের দিক থেকে অতিক্রম করে, তা হলে ঠিক বিপরীত অবস্থা ঘটবে। সূর্য যদি পাতবিন্দুর পূবদিকে থাকে তা হলে

ভিতর দিক থেকে সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হবে ; আর যদি পশ্চিম দিকে থাকে, তা হলে বাহির দিক থেকে গ্রহণ আরম্ভ হবে। পূর্ণগ্রহণ পশ্চিম দিকে আরম্ভ হলে পূবদিকে শেষ হবে।

পাতবিন্দু প্রতি মাসে এক ডিগ্রীর বেশী পশ্চাদপসরণ করে ; এবং ৩৪৯ দিনে একটি আবর্তন (চি) পূর্ণ করে।"

সুং রাজত্বের শেষদিকে (১১৮০ খ্রীস্টাব্দ) 'শিহ্ চিং' গ্রন্থের একটি গানের আলোচনা করতে যেয়ে দার্শনিক চু হ্সি গ্রহণের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন।

"চান্দ্রমাসের শেষে, পূর্ব বা পশ্চিম (বিষুবাংশ) দিকে একই ডিগ্রীতে এবং উত্তর বা দক্ষিণ (নতি) দিকে একই রেখায় সংযোগ ঘটলে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। চন্দ্র তখন সূর্যকে ঢেকে ফেলে (ইয়েন), সেইজন্য সূর্য-গ্রহণ হয়। একইভাবে পূর্ণিমার সময় চন্দ্র যখন সূর্যের সঙ্গে একই ডিগ্রীতে এবং একই রেখায় প্রতিযোগ অবস্থায় (তুই) থাকে, চন্দ্র তখন সূর্য থেকে রক্ষিত হয় (থাং) এবং চন্দ্রগ্রহণ ঘটে।"

তাও দার্শনিক ছিউ ছ্যাং-ছুন যখন পিকিং থেকে সমরকন্দে চেঙ্গিজ খাঁর দরবারে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে দলবল সমেত তিনি পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ দেখতে পান। উত্তর মঙ্গোলিয়ার কেরুলেন নদীর তীরে ১২২১ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মে এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তাঁরা দেখতে পান। ১২২২ খ্রীস্টাব্দে সমরকন্দে পৌঁছার পর সমরকন্দের জ্যোতির্বিদগণের সঙ্গে ছিউ ছ্যাং ছুনের এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পথের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সূর্যগ্রহণের সময় এবং পরিমাণ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন, সেই অভি-যানের সেক্রেটারী লি চিহ্-ছ্যাং সেই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, "এ যেন পাখা দিয়ে একটা মোমবাতি ঢেকে রাখা। পাখার ছায়া যেখানে সোজাভাবে পড়ে, সেখানে বেশী আলো পড়ে না। কিন্তু যতই পাশে সরে যাওয়া যায়, ততই বেশী আলো দেখা যায়।" পৃথিবীর উপরে গ্রহণ-ছায়া কোন্ পথে ভ্রমণ করে, ইতিহাসে এই তার সর্ব-প্রথম অনুসন্ধান।

গ্রহণ সম্বন্ধে চীনদেশের প্রাচীন তালিকা

'ৎসো চুয়ান' গ্রন্থে খ্রীস্টপূর্ব ৭২০ অব্দ হ'তে মোট ৩৭টি গ্রহণের উল্লেখ আছে। আশ্চর্যের বিষয়, টলেমীর 'আলমাজেস্টে'ও খ্রীস্টপূর্ব ৭২১ অব্দ হ'তে চন্দ্রগ্রহণসমূহের একটি তালিকা দেওয়া আছে। হ্যান রাজবংশের পর হ'তে সমস্ত রাজবংশের ইতিহাসেই গ্রহণের ধারাবাহিক তালিকা দেখতে পাওয়া যায়। এই সময় থেকে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৯২৫টি সূর্যগ্রহণ এবং ৫৭৪টি চন্দ্রগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হ্যান রাজবংশের সময়ে গ্রহণ-তালিকা বিশেষ যত্নসহকারে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং প্রাচীন সরকারী জ্যোতির্বিদগণের গ্রহণ-তালিকা কতটা বিশ্বস্ত, সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণাও করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, এমন কতকগুলি গ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই সময়ে সে সমস্ত গ্রহণ ঘটা সম্ভব ছিল না। আবার এমনও দেখা গেছে যে, কয়েক বৎসর পরপর কোন গ্রহণের উল্লেখ করা হয় নাই। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, এইরূপ ব্যতিক্রমের কারণ রাজনীতি। যখন কোন রাজা অত্যাচারী হয়ে উঠতেন, অথবা কোন কারণে রাজ-জ্যোতির্বিদগণ রাজাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না, তখন স্বর্গের অশুভ ইঙ্গিত নির্দেশকারী গ্রহণের উল্লেখ করা হতো। আবার যখন কোন রাজার সময় রাজ্যে শান্তি বিরাজ করতো, অথবা রাজ-জ্যোতির্বিদগণ রাজার অনুগ্রহ চাইতেন, তখন গ্রহণ ঘটলেও সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হতো না। উদাহণস্বরূপ একটা সূর্যগ্রহণের উল্লেখ করা যেতে পারে। কাও ৎসু নামে একজন অত্যাচারী ও অপ্রিয় সম্রাজ্ঞী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে খ্রীস্টপূর্ব ১৮৬ অব্দে একটি বিশেষ সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু গণনা করে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে কোন সূর্যগ্রহণ হওয়া সম্ভব ছিল না। আবার খ্রীস্টপূর্ব ১৭৭ হতে ১৬০ অব্দ পর্যন্ত ১৭ বৎসর সময়ের মধ্যে কোন সূর্যগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে মনে হয়, জ্যোতির্বিদগণ ইচ্ছা করেই

এই সময়ের গ্রহণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। রাজার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রাজকর্মচারীগণ যে জ্যোতির্বিদগণের উপরে চাপ দিতেন, তার কিছুটা উল্লেখ পাওয়া যায় ১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে ইয়াং ইউ কর্তৃক লিখিত 'শ্যান্ চু হ্সিন্ হুয়া' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,

"আমি যখন জ্যোতির্বিদ্যা-সংঘের একজন স্বাক্ষরকারী পর্যবেক্ষক ছিলাম, তখন বিশেষ একটি স্বর্গীয় ইঙ্গিতের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবার জন্য মহামান্য সম্রাটের আদেশ পেলাম। চিহ্-ইউয়ান রাজত্ব-কালের ষষ্ঠ বর্ষের (১৩৪০ খ্রীস্টাব্দ) সপ্তম মাসের প্রথম দিনে, মিঃ চ্যাং নামে একজন উচ্চপদস্থ পর্যবেক্ষক আমার বাড়ীতে আসেন এবং অতিশীঘ্র আমাকে মানমন্দিরে যেতে বলেন। সেখানে যেয়ে দেখতে পেলাম যে, কমিশনার মিঃ লি আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত আছেন। তিনি সরকারী পোশাকে ভূষিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'গত রাত্রিতে চিং হ্সিং ঘটনাটি দেখা গেছে। এটি একটি অত্যন্ত শুভ ঘটনা। আমার মতে ঘটনাটি এখনই লিপিবদ্ধ করা উচিত। তা হলে আমাদের সবাইকে সম্রাট পুরস্কৃত করবেন।' তখন আমি পুরানো তালিকা আলোচনা ক'রে দেখলাম যে, ঐরূপ কোন ঘটনা তখন ঘটবার সম্ভাবনাই ছিল না। আমি বললাম, 'ঘটনাটি যদিও মাসের শেষদিনে, অর্থাৎ অমাবস্যায় ঘটেছে, কিন্তু এর আকার যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, ঠিক সেরূপ হয় নাই। সুতরাং চিং হ্সিং যদি ঘটেই থাকে, তা হলে মিষ্ট মদের ঝরণা, লাল ফিতা, সুখী মেঘ ইত্যাদি ইঙ্গিত নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। অন্যপক্ষে শোনসি প্রদেশে মড়ক আর দুর্ভিক্ষ লেগেছে, মধ্য-প্রদেশে চোর ডাকাত অত্যাচার করছে এবং ফুকিয়েন প্রদেশে বিদ্রোহীগণ তৎপর হয়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস, এমন ঘটনা ঘটতে পারে না। স্বর্গের তাও পৃথিবীর তাও-এর বিপরীত ইঙ্গিত দেবেন কেন? কিন্তু মিঃ লি কিছুতেই শুনবেন না এবং তাঁর মতে তিনি অটল থাকবেন। তখন আমি বললাম, এ পর্যন্ত মাত্র ছয়জন সরকারী পর্যবেক্ষক এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছে। দেশের অন্য কোন জায়গা থেকেই এ ঘটনা

দেখবার খবর পাওয়া যায় নাই। এখন সরকারীভাবে এই ঘটনা প্রকাশ করলে লোকে কি আমাদের অবিশ্বাস করবে না? তখন তিনি পরের রাত্রিতেও এই ঘটনা ঘটে কিনা পর্যবেক্ষণ ক'রে তারপরে তালিকাভুক্ত করা হবে, এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। কিন্তু পরের রাত্রিতে সেরূপ কোন ঘটনাই ঘটে নাই; বরং মাত্র নয়দিন পরেই শুক্রগ্রহ মধ্যরেখা অতিক্রম করে। চীনদেশে এই ঘটনাকে অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়।"

এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই সমস্ত সরকারী তালিকা বিনা দ্বিধায় সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। অবশ্য অনেকগুলি তালিকা অত্যন্ত নিখুঁত। ছুন ছিউ-তে তিনটি গ্রহণের ক্ষেত্রে চি কথাটির উল্লেখ আছে; অর্থাৎ ঐ সময়ে পূর্ণসূর্যগ্রহণ হয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৪৪২, ৩৮২ ও ৩০০ অব্দের গ্রহণ সম্বন্ধে 'শিহ্ চি'তে বলা হয়েছে যে, দিনের আলো নিভে এত অন্ধকার হয়েছিল যে, আকাশে তারা দেখা গিয়েছিল (চু হুই হ্সিং চিয়েন)। হ্যান রাজবংশীয় তালিকাতে এই শব্দগুলির উল্লেখ আছে। চি চিন—প্রায় পূর্ণগ্রহণ, পু চিন জো কু—অর্ধ চন্দ্রাকার। এ ছাড়া, চি—পূর্ণগ্রহণের উল্লেখ তো আছেই। তিন-দশমাংশ আংশিক গ্রহণের (স্থান ফেন) উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী যুগসমূহের সর্বত্র আংশিক গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখ আছে। তাং রাজবংশীয় তালিকাতে, তা হ্সিং চিযেন—সমস্ত তারা দেখা যায়, কথাটি পাওয়া যায়। হ্যান তালিকাতে গ্রহণ আরম্ভের ও মোক্ষের সময় দেওয়া আছে।

নবতারা, অতি নবতারা ও বিষমতারা

প্রাচীন চীনা বিবরণীতে কেবলমাত্র যে গ্রহণ-তালিকাই আছে, তা নয়। চীনা জ্যোতির্বিদগণ অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক ছিলেন। আকাশের সামান্যতম ঘটনাও তাঁদের দৃষ্টি এড়াতে পারে নাই। এই সমস্ত ঘটনাবলীর তালিকা জ্যোতির্বিদ্যা-জগতের অতুলনীয় সম্পদ বলে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতির্বিদ্যার অনেক তত্ত্ব নির্ণয়ে এই সমস্ত তালিকা যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

আকাশে তারার রাশি দেখা যায। খালিচোখে যত তারা দেখা যায, তাদেব সংখ্যা সব সময় ঠিক থাকে না। কোন কোন সময় নূতন তারা দেখা দেয়, আবাব কোন সময়ে কোন কোন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ছাড়া এমন অনেক তারা আছে, যাদেব উজ্জলতাব হ্রাসবৃদ্ধি হয। এই সমস্ত তারাকে বিষমপ্রভ তাবা বা বিষমতারা বলে। অনেক সময়, আগে যে তাবা খালিচোখে দেখা যেত না, পরে সেই তাবা হঠাৎ এত উজ্জল হয়ে ওঠে যে, অন্য সমস্ত তারার উপর দিয়ে তাকে দেখা যায়। মনে হয়, যেখানে কোন তাবা ছিল না, সেখানে নূতন তাবাব উদয হয়েছে। এইরূপ তাবাকে নবতাবা বলে। কোন কোন সময় এই সমস্ত নবতারা লক্ষ লক্ষ কোটিগুণ বেশী উজ্জল হয়ে ওঠে; তখন এদেরকে অত্যুজ্জল নবতাবা বা অতি নবতাবা বলা হয়। আধুনিক বিশ্বতত্ত্বে এই সমস্ত তাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

নবতাবা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় খ্রীস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দেব একটি হাড়-লিপি থেকে। তুং ৎস্থ-পিন এই হাড়খানা বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন। এই হাড়ে লেখা আছে যে, "মাসেব সপ্তম দিনে একটি চি-স্স্ দিনে, জ্যেষ্ঠাব কাছে একটি নূতন বড় তারা দেখা যায (হ্‌সিন তা হ্‌সিং পিং হও)"। একই সময়েব আব একটি হাড়ে লেখা আছে, "হ্‌সিয়েন ওয়াই দিনে এই নূতন তাবাটি নিভে যায (হ্‌সিয়েন ওয়াই ইউ হুই হ্‌সিন হ্‌সিং)"। পববর্তী ঘটনাটি খুব সম্ভব পূর্ববর্তী ঘটনা সম্বন্ধেই লেখা। কেননা পরের হাড়ের লিখিত দিনটি আগের দিনটির মাত্র দুইদিন পরে। হযতো একটি নবতারা দুইদিনেই অদৃশ্য হযে যায। হ্যান রাজবংশের রাজত্বেব মধ্যকাল পর্যন্ত হ্‌সিন হ্‌সিং শব্দটি নবতারাব পরিবর্তে ব্যবহাব করা হতো। পরে খো-হ্‌সিং—অতিথি তারা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ শব্দটি অবশ্য অনেক ভাল।

হ্যান রাজবংশের রাজত্বেব প্রথম থেকে যে সমস্ত অস্বাভাবিক তারা

আকাশে দেখা গেছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মা তুয়ান লিন তাঁর 'ওয়েন হ্সিয়েন থুও খাও' গ্রন্থে তার একটি তালিকা দিয়েছেন। 'থু শু চি ছেং' বিশ্বকোষে 'হ্সিং পিয়েন পু' (আকাশের অস্বাভাবিক ঘটনার তালিকা) অধ্যায়ে এইরূপ আর একটি তালিকা দেওয়া আছে। মা তুয়ান লিনের তালিকাতে অনেক জায়গায় ধূমকেতুকেও নবতারার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকাতে সাধারণতঃ তারাটির প্রথম আবির্ভাবের সময়, দৃশ্যকাল, আকাশে তারাটির অবস্থান, উজ্জ্বলতা, রং এবং অদৃশ্য হওয়ার সময় দেওয়া আছে। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

"চুং ফিং-এর শাসনকালের দ্বিতীয় বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৫ খ্রীস্টাব্দে, দশম মাসের একটি কুয়াই হ্যাই দিনে, নানমেন মণ্ডলের মাঝখানে (α, β সেণ্টরীর মাঝে) একটি খো-হ্সিং (অতিথি-তারা) দেখা যায়। তারাটি একটি বাঁশের মাদুরের অর্ধেকের মত বড় ছিল এবং এটি পর-পর পাঁচটি রং ধারণ করে। কোন সময়ে এর উজ্জ্বলতা বাড়ে, আবার কোন সময় কমে যায়। পরে এর উজ্জ্বলতা আস্তে আস্তে কমতে কমতে পরের বৎসর জুলাই মাসে তারাটি অদৃশ্য হয়ে যায়।"

একটি মজার ব্যাপার এই যে, খ্রীস্টপূর্ব ১৩৪ অব্দের যে নবতারা দিয়ে মা তুয়েন লিনের তালিকা আরম্ভ হয়েছে, সেই একই তারা দেখে হিপারকাস তাঁর তারা-তালিকা প্রণয়নে উদ্যোগী হন। হিপারকাস বলেছেন, এই নবতারাটি বৃশ্চিক মণ্ডলে ছিল; চীনা জ্যোতিবিদগণও ঠিক একই কথা বলেছেন যে, এই তারাটি ফ্যাং হ্সিউতে দেখা যায়।

আজকাল মনে করা হয় যে, যেরূপ বিরাট বিস্ফোরণে অতি-নবতারার সৃষ্টি হয়, আমাদের ছায়াপথে সেরূপ বিস্ফোরণ দুই-এক শতাব্দীতে একবার মাত্র ঘটে থাকে। অন্যান্য ছায়াপথেও ঠিক একইরূপ সময়ের দরকার হয়। ইতিহাসে এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি অতি-নবতারার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে টাইকো ব্রাহে একটি পর্যবেক্ষণ করেন; ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শিষ্য কেপলার আর একটি নবতারা পর্যবেক্ষণ করেন।

তৃতীয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় কেবলমাত্র চীনা বিবরণীতে। অবশ্য এই তারাটিই ইতিহাসের সর্বপ্রথম দৃষ্ট নবতারা। ১০৫৪ খ্রীস্টাব্দে চীনা জ্যোতির্বিদগণ এই তারাটি পর্যবেক্ষণ করেন। বর্তমানে আকারহীন, বিক্ষিপ্ত উজ্জ্বল মেঘের মত কাঁকড়া নীহারিকা নামে পরিচিত নীহারিকাটির সৃষ্টি এই নবতারাটি থেকে। চীনা বিবরণীতে বলা আছে যে, এই অতিথি-তারাটি শুক্রগ্রহের মত উজ্জ্বল ছিল। এই অতি নবতারাটি সম্বন্ধে পাঁচটি বিবরণী আছে। একটি বিবরণী নীচে দেওয়া গেল।

"চিহ্. হো রাজত্বকালের প্রথম বর্ষের পঞ্চম মাসে, প্রধান জ্যোতির্বিদ ইয়াং ওয়াই তে বলেন, 'সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে আমি অতিথি-তারা পর্যবেক্ষণ করলাম। তারাটির রং ছিল সামান্য হলদে, কিন্তু এটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী আমি এই সম্বন্ধে ভবিষ্যত গণনা করলাম। এই গণনাতে পাওয়া গেল যে, অতিথি-তারা রোহিণীর কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না। এতে জানা যায় যে, সম্রাটের রাজত্বকালে দেশ অত্যন্ত সম্পদশালী হবে এবং দেশের রাজা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। সরকারী ইতিহাসে এ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করবার আদেশ দিলাম।"

এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সম্রাটকে অভিনন্দন জানানো হয়। ১০৫৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে অতিথি-তারাটি অদৃশ্য হয়েছেন, অর্থাৎ অতিথি বিদায় নিয়েছেন। সুং বংশের রাজধানী খাই ফেং-এর পর্যবেক্ষণে বলা হয় যে,

"প্রথমে ১০৫৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে এই তারাটি পূব আকাশে থিয়েন কুয়ানে (ξ-টরি) দেখা যায়। এই তারাটি শুক্রগ্রহের মত দিনের বেলাতেও দেখা যায়। এর চারদিক থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এর রং অনেকটা লাল ও সাদা মেশানো। মোট ২৩ দিন তারাটি আকাশে দেখা যায়।"

পিকিংয়ের লিয়াও জ্যোতির্বিদগণ এবং জাপানের জ্যোতির্বিদগণও ঘটনাটি লক্ষ্য করেন।

ধূমকেতু

বাবিলনের কুনিফর্ম লেখাতেও ধূমকেতুর বিবরণ পাওয়া যায়। এতে খ্রীস্টপূর্ব ১১৪০ অব্দের ধূমকেতুর উল্লেখ আছে। মধ্যযুগ থেকেই যে ইউরোপে ধূমকেতু দেখা গেছে, তার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু চীনদেশের প্রাচীনকালের ধূমকেতুর যে সম্পূর্ণ তালিকা ও বিবরণ পাওয়া যায়, এমন বিশদ বিবরণ আর কোথাও নাই। মা তুয়ান লিন তাঁর 'ওয়েন হ্সিয়েন থুও খাও' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এতে খ্রীস্টপূর্ব ৬১৩ অব্দ থেকে মোট ৩৭২টি ধূমকেতুর উল্লেখ আছে।

চীনা জ্যোতির্বিদগণ যে কত যত্নসহকারে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করতেন, নীচের উদাহরণ থেকে সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাবে।

"ছেং হুয়া রাজত্বকালের সপ্তম বৎসরে (১৪৭২ খ্রীস্টাব্দ) দ্বাদশ মাসের একটি চিয়া হ্সু দিনে থিয়েন থিয়েন (σ, τ-ভার্জিনিস) তারা-দলের মধ্যে একটি ধূমকেতু দেখা যায়। এটি পশ্চিম দিকে ছিল। হঠাৎ উত্তরদিকে যেয়ে ধূমকেতুটি 'দক্ষিণ পরিচালক' তারাকে (ইউ-শে-থি, η, ι, τ বুটিস) স্পর্শ করে এবং থাই ওয়াই ইউয়ানের (কন্যা কোমা-বারোনিসিস ও সিংহের মধ্যের তারা-বেষ্টনী) ভিতর দিয়ে ঝাঁটিসে নিয়ে শাং চিয়াং (γ-কোমী-বারেনিসি), হ্সিন চেন (29-কোমী-বারোনিসি), থাই ৎজু (E-লিওনিস) এবং শুং কুয়ান (2507-লিওনিস)-কে স্পর্শ করে। এরপরে এর লেজ পশ্চিম দিকে যায় এবং ধূমকেতুটি আড়াআড়ি-ভাবে থাই ওয়াই ইউয়ানের লাং ওয়াই (a-k কোমী বারেনিসি)-কে ঢেকে রাখে। একটি চি মাও দিনে এর লেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আকাশের পূবদিক থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত এটি বিস্তৃত ছিল। এরপরে ধূমকেতুটি উত্তর দিকে যেতে থাকে এবং থিয়েন ছিয়াংকে (ι, θ, χ বুটিস) স্পর্শ করে। এই সময়ে ধূমকেতুটি ২৮ ডিগ্রী স্থান অধিকার করে। তারপরে ধূমকেতুটি পাইতু (সপ্তর্ষিমণ্ডল)-এর ভিতর দিয়ে, স্যান কুং (কেন্‌স্ ভেনাটিসির উত্তরের তিনটি ছোট তারা) এবং থাই ইয়াং (χ-উরসী মেজরিস)-এর নিকট দিয়ে অবশেষে ৎজু ওয়াই ইউয়ান (ধ্রুব- পরিক্রমণ)

অঞ্চলে প্রবেশ করে। এই সময়ে এই ধূমকেতুটি দিনের বেলাতেও স্পষ্ট দেখা যেত। কোন কোন সময়ে একে খুযাই (বাঘ, বৃহৎ ভল্লুকের দেহ)-এর ভিতরে দেখা যেত। ক্রমে ক্রমে থিয়েন তি হুসিং (β-উরসী মাইনরিস), শু ৎসু (5-উরসী মাইনরিস), হু ফাই (6-উরসী মাইনরিস), কু ছেন (ζ, ϵ, δ এবং উরসী মাইনরিসের অন্য কয়েকটি তারা), শ্যান শিহ, থিয়েন লাও, থিয়েন হুয়াং, তা তি (বর্তমান ধ্রুবতারা), শ্যাং ওযাই (γ-সেফি), কো তাও (ξ, o, π, θ, φ, ν ক্যাসিওপি), ওয়েন ছ্যাং (θ, ν, φ এবং উরসী মাইনরিসের অন্যান্য তারা), শ্যাং ফাই (ν, ϵ-উরসী মাইনরিস) প্রভৃতি তারার নিকট দিয়ে যেতে থাকে। একটি আই ইউ দিনে ধূমকেতুটি দক্ষিণে যেয়ে লু হুসিউ (অশ্বিনী)-কে স্পর্শ করে এবং থিয়েন আ (e-এরিটিস), থিয়েন ইয়িন (δ, ζ, τ-এরিটিস), ওযাই ফিং (α, δ, ϵ, ζ, μ, ν এবং ξ-পিসিস) এবং থিয়েন ইউয়ান (γ, δ, ϵ, ζ, η, π, τ-এরিডেনী) প্রভৃতি তারার নিকট দিয়ে যায়। অষ্টম বর্ষের প্রথম মাসের একটি পিং উও দিনে ধূমকেতুটিকে খুযাই হুসিউতে ওয়াই ফিং-এর দিকে যেতে দেখা যায়। আস্তে আস্তে এটি অস্পষ্ট হতে থাকে এবং অনেকদিন পরে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়।"

এ রকম বিবরণী থেকে সহজেই ধূমকেতুটির পথ আঁকা যেতে পারে। প্রথমে ধূমকেতুটিকে কন্যারাশিতে দেখা যায়; পরে উত্তরদিকে যেয়ে এটি ধ্রুবপরিক্রমণকারী তারাতে পরিণত হয় এবং প্রায় ধ্রুবতারাই হয়ে যায়। এরপর ক্যাসিওপিয়া ও সিফিয়াসের ভিতর দিয়ে দক্ষিণে নেমে যায় এবং মেষের দক্ষিণে এর যাত্রা শেষ হয়। 'ঝাঁটিয়ে নেওয়া' শব্দটি খুবই উপযুক্ত শব্দ; কেননা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধূমকেতুকে 'হুই হুসিং' বা 'সাও হুসিং' অর্থাৎ 'ঝাঁটা-তারা' বলা হতো। হ্যান বংশের সময়কার ধূমকেতুর উল্লেখ করতে যেয়ে জ্যোতিবিদ ছেন ৎসুন-কাই অনেকগুলি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, থিয়েন ছ্যান (ধারবিশিষ্ট তারা), ফেন হুসিং (পাল ওয়ালা তারা), ছ্যাং হুসিং (লম্বা তারা), চু হুসিং (শিখাযুক্ত তারা) ইত্যাদি। সব ধূমকেতুর

লেজ থাকে না ; সেজন্য নবতারাকে যাতে ধূমকেতু বলে ভুল না করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন ধূমকেতু যখন সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে একই রেখায় অবস্থিত থাকে, তখন এর লেজ থাকে না, এর আলো অনেকটা নীহারিকার মত দেখায়। প্রতিযোগ অবস্থায় ধূমকেতুকে চীনা ভাষায় পো হ্সিং বলে।

চীনা জ্যোতির্বিদগণই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, ধূমকেতুর লেজ সর্বদা সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে। 'ওয়েন হ্সিয়েন খুও খাও' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "সাধারণতঃ ধূমকেতু সকালে দেখা গেলে, তার লেজ পশ্চিম দিকে থাকে, আর সন্ধ্যায় দেখা গেলে তার লেজ পুবদিকে থাকে।"

ধূমকেতুর সৃষ্টি সম্বন্ধে চীনে নানা মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন যুগের জ্যোতির্বিদগণ মনে করতেন যে, ইয়িন এবং ইয়াং-এর বিশৃঙ্খলতার জন্যই ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তী যুগে মনে করা হতো যে, বিভিন্ন গ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন ধূমকেতুর সম্বন্ধ আছে। খ্রীস্টপূর্ব ৫০ অব্দে 'ফেং চিও শূ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি ধূমকেতু এক একটি বিশেষ গ্রহ হতে সৃষ্টি হয়েছে।

উল্কা

চীনা সাহিত্যে উল্কা সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। লিউ হ্সিং (খসে পড়া তারা), পেন হ্সিং (তেজী তারা), লিউ হ্সিং ইউ (উল্কা-বৃষ্টি) এবং হ্সিং ইউন (ভূ-পৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ড) সম্বন্ধে নানাপ্রকার উল্লেখ আছে। মা তুয়ান লিনের 'ওয়েন হ্সিয়েন খুও খাও' গ্রন্থে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এ সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া আছে। খ্রীস্টপূর্ব ৬৮৭ অব্দ হতে উল্কাপাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৯৩১ খ্রীস্টাব্দে সিংহরাশি থেকে প্রবল উল্কাবৃষ্টি হয়েছে, তার উল্লেখ আছে। সুং রাজবংশের পূর্বের ১৪৯টি, সুং রাজবংশের সময়ের ২৭২টি এবং ইউয়ান ও মিং রাজবংশের সময়ের ৭৫টি উল্কাপাতের বিবরণ পাওয়া যায়।

শেন কুয়ার 'মেং ছি পি থুয়ান' গ্রন্থে উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণী দেওয়া আছে।

"চিহ্ ফিং রাজত্বকালের প্রথম বর্ষে (১০৬৪ খ্রীস্টাব্দে) ছ্যাং চু তে দুপুরের সময় একটি ভয়ানক শব্দ শোনা যায়। দক্ষিণ-পূর্বদিকে চন্দ্রের মত বড় একটি জলন্ত তারা দেখা যায়। এক মুহূর্ত পরে বাজপড়ার মত আর একটি শব্দ শোনা যায় এবং তারাটি দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যায়। তারপরে আরো একটি বিকট শব্দে এই তারাটি আই হ্সিং জেলার হ্সু পরিবারের বাগানের মধ্যে পড়ে। বাগান থেকে চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল, বাগানের চারদিকের বেড়া সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। এই আগুন নিভে গেলে বাগানের মধ্যে বড় গামলার মত একটা গর্ত দেখা যায় এবং তারাটিকে সেই গর্তের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে জলতে দেখা যায়। নিভে গেলেও পিণ্ডটি এত গরম ছিল যে, তার কাছে যাওয়া যাচ্ছিল না। কয়েকদিন পরে মাটি খুঁড়ে হাতের মুঠির মত বড় একটা পাথর পাওয়া যায়। লম্বা আকারে পাথরটি তখনও বেশ গরম ছিল। এর রং এবং ওজন প্রায় লোহার মত। গভর্নর চেং শেন এই পাথরটিকে জুন-চু-এর চিন্ শান মন্দিরে পাঠিয়ে দেন। সেটিকে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে দর্শকদের দেখতে দেওয়া হ'তো।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চীনে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার অনুপ্রবেশ তার ফলাফল

মার্কো পোলোর বাবা নিকোলো পোলো এবং চাচা মাফিও পোলো ছিলেন সর্বপ্রথম ইউরোপীয়ান, যাঁরা চীনদেশে গিয়েছিলেন। এ হলো খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। মার্কো পোলো নিজে একবার তাঁর জন্মভূমি ভেনিসে এসে আবার চীনে ফিরে যান। তিনি কুবলাই খাঁর দরবারের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি তিন বৎসর ইয়াংচু প্রদেশের শাসনকর্তাও ছিলেন। মার্কো পোলো ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দে ভেনিসে ফিরে আসেন এবং তাঁর দেশের পক্ষ হয়ে জেনোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান এবং বন্দী হন। বন্দী অবস্থাতেই অন্য একজন বন্দীর নিকট তিনি নানা দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে চীনদেশ সম্বন্ধে নানা রকম গল্প করেন। সেই বন্দী তাঁর এই গল্প ও বর্ণনা লিখে রাখে এবং পরে এখানা বই আকারে প্রকাশ করা হয়। সেই বই-ই অনেকদিন পর্যন্ত চীন এবং পূর্বদেশ সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণ্য বই ছিল। কিন্তু এ সময়ে কোন পাদ্রী খ্রীস্টান-ধর্ম প্রচার করতে চীনদেশে যায় নাই।

চীনদেশে খ্রীস্টান পাদ্রীদের সর্বপ্রথম সন্ধান পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীতে। ১৫৫২ খ্রীস্টাব্দে চীনের প্রাচীরের বাইরে শ্যাং চুয়ানে ফ্রান্সিস জেভিয়ার নামে একজন পাদ্রী মারা যান। মার্কোপোলোর পরে ইনিই প্রথম ইউরোপীয়, যিনি চীনে গিয়েছিলেন। অবশ্য পর্তুগীজ নাবিকগণ মাঝে মধ্যে চীনের দক্ষিণ বন্দরে যেয়ে উপস্থিত হতো। অবশেষে ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে ম্যাকাওতে পর্তুগীজগণ একটি উপনিবেশও স্থাপন করে।

খ্রীস্টান প্রাদ্রীদের ভিতরে জেস্যুইট সম্প্রদায়ের ম্যাথু রিচি, তাঁর সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান কর্মকর্তা আলেকজাণ্ডার ভালিনানের আদেশে ধর্ম-প্রচার করবার জন্য চীনদেশে যান। ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কোয়াং তুযাং ও কোয়াংশির রাজধানী শিউ হং-এ উপস্থিত হন। সেখান থেকে ক্রমশঃ উত্তরদিকে যেতে যেতে চীনের রাজধানী পিকিংয়ে যেযে উপস্থিত হন। ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মে তিনি পিকিংয়েই মারা যান।

১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে রিচি, চীনে জ্যোতির্বিদ্যার নানাপ্রকার ভুল-ত্রুটির উল্লেখ ক'রে রোমে চিঠি দেন। চীনা জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি লিখে-ছিলেন যে, চীনা জ্যোতির্বিদগণ মনে করেন যে,

(১) পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং বর্গাকৃতির ; আকাশ চাঁদোয়ার মত।

(২) আকাশ দশটি নয়, একটি মাত্র। এই আকাশ শূন্য ; এতে কোন কঠিন বস্তু নাই। তারাসমূহ শূন্যপথে ভ্রমণ করে।

(৩) বাতাস বলে কিছু আছে, একথা চীনারা জানে না। সেজন্য যেখানে আমরা বলি বাতাস আছে, সেখানে চীনারা বলে কিছু নাই, শূন্য।

(৪) বাতাসকে বাদ দিয়ে তারা ধাতু ও কাঠকে মৌলিক পদার্থ বলে মনে করে। তাদের পাঁচটি মৌলিক পদার্থ হলো—ধাতু, কাঠ, আগুন, পানি এবং মাটি। আমাদের মত চারটি মৌলিক পদার্থে তা'রা বিশ্বাস করে না। তা'রা আরো মনে করে যে, মৌলিক পদার্থগুলির একটি অন্যগুলি থেকে সৃষ্টি হয়।

(৫) সূর্যগ্রহণের জন্য তা'রা সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়। তা'রা বলে যে, চন্দ্র সূর্যের নিকটে আসলে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যায়।

(৬) তা'রা মনে করে যে, রাত্রিবেলা সূর্য একটি পাহাড়ের পিছনে যেয়ে লুকিয়ে থাকে।

এই সময় মিং রাজবংশের পতনের সময়। চীনের সভ্যতা, কৃষ্টি, জ্ঞান, বিজ্ঞান কোন কিছুর দিকেই তাদের দৃষ্টি ছিল না। জেস্যুইট পাদ্রীগণ কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী না হলেও, প্রায় সর্বশাস্ত্রেই

তাদের কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। চীনের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে রিচি চীনের পঞ্জিকার নানাপ্রকার ভুল-ত্রুটি ও তার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতে লাগলেন।

১৬১০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর একটি সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। এই সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে চীনা জ্যোতির্বিদগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেন; আবার পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার গণনা অনুসারে (টলেমীর পদ্ধতিতে) জেসুইট পাদ্রী সাবাথিন স্ত উরসিসও একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। চীনা জ্যোতির্বিদগণ যে সময় গ্রহণ সংঘটিত হবে বলেছিলেন, প্রকৃত গ্রহণ তার ৫ ঘণ্টা পরে, জেসুইট পাদ্রীর গণনার ঠিক সময়ে সংঘটিত হয়। এতে পতনোন্মুখ চীন সম্রাটের জেসুইট পাদ্রীদের উপর দারুণ আস্থা আসে এবং তিনি উরসিসকে চীনা পঞ্জিকা সংস্কার করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উরসিসের অত বিদ্যা ছিল না। তিনি তখন রোমে তাঁর পাদ্রী কর্তাদের নিকট একজন ভাল জ্যোতির্বিদকে চীনে পাঠানোর তাগিদ দিয়ে চিঠি দেন। তা'তে তিনি স্পষ্ট করেই বলেন যে, এতে দুই হাত দিয়ে ঈশ্বরের কাজ করা যাবে। প্রকাশ্য ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের আস্থাভাজন হবে আরো সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যাবে। কিন্তু সে যুগে চীন থেকে রোমে চিঠি যেতে দুই তিন বৎসর লাগতো; ষোল বৎসরে চিঠি রোমে পৌঁছেছে, এমন নজিরও আছে।

এর পরেই চীনে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার বইসমূহ চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হতে থাকে। এই সমস্ত বই ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের উপর লিখিত ছিল। ঠিক এই সময়েই গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর জুপিটারের উপগ্রহসমূহ তখন যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। জেসুইট পাদ্রীগণ গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র চীনে আমদানী করেন বটে, কিন্তু তাঁর মতবাদ গ্রহণ করতে সাহস করেন নাই। ফলে যে চীনদেশে হুস্যান ইয়েহ তত্ত্বে অনন্ত বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছিল, এবং যে বিশ্বে খ-বস্তুসমূহকে শূন্যে ভাসমান বলে মনে করা হ'ত, অর্থাৎ যে তত্ত্ব

আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের অতি নিকটবর্তী এবং প্রকৃতপক্ষে আধুনিক অনন্ত-বিশ্বতত্ত্ব চীনের এই হুসুয়ান ইয়েহ তত্ত্ব হতেই গৃহীত, জেসুইট পাদ্রীগণের কৃপায় চীন সেই সত্য ত্যাগ ক'রে পচা পুরানো আরিস্টটলের নয় স্ফটিক-তত্ত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। পাশ্চাত্য দেশ যখন গ্যালিলিও, কেপলারের সাহায্যে আরিস্টটল, প্লেটো আর টলেমীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল, চীনকে তখনই তার আদিম ও প্রকৃত মতবাদকে অস্বীকার করিয়ে তিন হাজার বৎসর পিছনে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

প্রাচীন চীনা জ্যোতির্বিদ্যার আরো একটি পদ্ধতি আধুনিক জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। জেসুইট পাদ্রীগণ চীনের সেই সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি পরিত্যাগ ক'রে পাশ্চাত্য পুরানো পরিত্যাক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। বিষয়টি হ'লো খ-বস্তুসমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতি পাশ্চাত্যে, এমনকি ভারতবর্ষেও খ-বস্তুসমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতি ছিল সূর্যপথ-ভিত্তিক। সূর্যপথকে আদিবৃত্ত মনে করেই খ-বস্তুসমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা হতো। কিন্তু বর্তমানে খ-বিষুবকে আদিবৃত্ত স্বীকার ক'রে এই স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা হয়। বিষুবাংশ ও বিষুব-লম্ব এই দুইটি স্থানাঙ্ক। প্রাচীন চীনেও খ-বিষুবের ভিত্তিকে খ-বস্তুসমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা হতো। হুসিউ-এর আদিবিন্দু হতে খ-বিষুবের উপরের খ-বস্তুর প্রক্ষেপ-বিন্দুর দূরত্ব এবং খ-বিষুবলম্বের পূরক অর্থাৎ উত্তর খ-মেরু দূরত্ব দ্বারা চীনা স্থানাঙ্ক নির্দেশ করা হতো। বর্তমানে হুসিউ-এর আদিবিন্দু থেকে দূরত্ব পরিমাপ না ক'রে বিষুবন বিন্দু থেকে দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। এবং বর্তমান জ্যোতি-র্বিদগণ এ কথা স্বীকার করেন যে, খ-বিষুব-ভিত্তিক স্থানাঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতি চীনা জ্যোতির্বিদ্যা থেকে গৃহীত।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা অবশ্য চীনের কিছু কিছু ভ্রান্ত মতবাদের সংশোধনও করেছে। গ্রহণ গণনার প্রমাণহীন যে পদ্ধতি চীনে প্রচলিত ছিল, পাশ্চাত্য গণনা-পদ্ধতি ছিল তার চাইতে অনেক উন্নত। পূর্বেই

বলা হয়েছে, এই ছিদ্রপথেই চীনের পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। পাশ্চাত্য দেশে জ্যামিতিশাস্ত্র গড়ে উঠে এবং জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনায় জ্যামিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এরও অবশ্য ভালমন্দ দুই দিকই আছে। জ্যামিতির গুণেই আরিস্টটল বৃত্তকে 'Perfect' বলে ঘোষণা করেন। এই Perfect বৃত্ত বা গোলককে স্বীকার করতে যেয়ে, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা দুই হাজার বৎসর পিছিয়ে পড়ে। চীনে জ্যামিতির কোন স্থান ছিল না। জ্যামিতিহীন জ্যোতির্বিদ্যা গড়ে তোলা সম্ভব কিনা, সে চেষ্টা কেউ কোনদিন করে নাই। অতএব জ্যামিতি ছাড়া চীনা জ্যোতির্বিদ্যা কতটা উন্নত হতে পারতো, সে বিচার করা আজ আর সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য জেসুইটগণ চীনকে নিজেদের জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির সম্ভাবনাকে বিবেচনা করতে না দিয়ে, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন চীনের জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত শব্দাবলী

সংখ্যা

১	অ্যাই	০	লিং
২	এরহ্	১০০	প্যাই
৩	শ্যান	১০০০	ছিয়েন
৪	সস্থ	১০,০০০	ওয়ান
৫	উও		
৬	লিউ		
৭	ছি		
৮	পা		
৯	চিউ		
১০	শিহ্		

বারো মাস

নীচের বারোটি শব্দ কেবলমাত্র বারোটি মাসের জন্যই ব্যবহার করা হ'তো না। বৃহস্পতি প্রায় বারো বৎসরে (১১'৮৬ বৎসরে) আকাশ-পথে সম্পূর্ণ একবার পরিভ্রমণ করে। এই বারো বৎসরও এই শব্দগুলি দ্বারা নির্দেশ করা হতো। চন্দ্রনিবাসকে যেমন হ্সিউ বলা হতো, বৃহস্পতির এই বারোটি নিবাসকে তেমনি ৎস্যু বলা হতো। প্রত্যেকটি ৎস্যু-এর সঙ্গে যে সমস্ত হ্সিউ সম্বন্ধযুক্ত, সেগুলি নীচে দেওয়া গেল।

বারমাস বা বৃহস্পতিব বারো বৎসর		আকাশপথে বৃহস্পতি-নিবাস বা ৎস্ব	সংশ্লিষ্ট হ্সিউসমূহ
১	ৎজু	হ্সুয়ান-হ্সিয়াও	নু, হ্সু, ওযাই (১০,১১,১২)
২	ছু	হ্সিং-চি	তু, নিউ (৮, ৯)
৩	ইথিন	হ্সি-মু	ওয়াই, চি (৬, ৭)
৪	মাও	তা হুও	তি, ফ্যাং, হ্সিন (৩, ৪, ৫)
৫	ছেন	শু-হ্সিং	চিও, খাং (১, ২)
৬	স্সু	শুন-ওয়াই	আই, চেন (২৭, ২৮)
৭	উও	শুন-হুও	লিউ, হ্সিং, চাং (২৪,২৫,২৬)
৮	ওয়াই	শুন-শুও	চিং, কুযাই (২২, ২৩)
৯	শেন	শিহ্-ছেন	ৎশুই, শেন (২০, ২১)
১০	ইউ	তা লিয়াং	ওয়াই, মাও, পি (১৭, ১৮, ১৯)
১১	হ্সু	চিয়াং-লু	কুযাই, লু (১৫, ১৬)
১২	হাই	ছু-ৎজু	শিহ্, পি (১৩, ১৪)

দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার প্রতি ২ ঘণ্টাও এই নামে পরিচিত ছিল।

২৪ পক্ষ

প্রাচীন চীনে ১২ মাসকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো না। বরং বৎসরের ২৪টি পক্ষকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হতো। এই পক্ষগুলির বিভিন্ন নাম ছিল। নামগুলি নীচে দেওয়া গেল।

ক্রমিক সংখ্যা	পক্ষেব নাম	অর্থ	আরম্ভের সময়
১	লি ছুন	বসন্ত আরম্ভ	৫ই ফেব্রুয়ারী
২	ইউ শুই	বর্ষা	২০শে ফেব্রুয়ারী
৩	চিং চে	জীবজন্তুর জাগরণ	৭ই মার্চ
৪	ছুন ফেন	বসন্ত বিষুবন	২২শে মার্চ
৫	ছিং মিং	স্পষ্ট ও উজ্জ্বল	৬ই এপ্রিল

৬	কু উও	শস্যবৃষ্টি	২১শে এপ্রিল
৭	লি হ্সিবা	গ্রীষ্ম আরম্ভ	৬ই মে
৮	হ্সিবাও ম্যান	কম পবিপূর্ণতা (শস্যেব)	২২শে মে
৯	ম্যাং চুং	কাণেব মধ্যে শস্য	৭ই জুন
১০	হ্সিবা চিহ্	গ্রীষ্মাযন	২২শে জুন
১১	হ্সিবাও শু	কম গরম	৮ই জুলাই
১২	তা শু	বেশী গরম	২৪শে জুলাই
১৩	লি ছিউ	হেমন্ত আরম্ভ	৮ই আগস্ট
১৪	ছু শু	গ্রীষ্ম শেষ	২৪শে আগস্ট
১৫	পাই লু	সাদা শিশির	৮ই সেপ্টেম্বব
১৬	ছিউ ফেন	হেমন্ত বিষুবন	২৪শে সেপ্টেম্বর
১৭	হ্যান লু	ঠাণ্ডা শিশিব	৯ই অক্টোবব
১৮	শুষাং চিয়াং	কুষাশা অবতবণ	২৪শে অক্টোবর
১৯	লি তুং	শীত আবম্ভ	৮ই নভেম্বর
২০	হ্সিবাও হ্সুবেহ	কম ববফ	২৩শে নভেম্বর
২১	তা হ্সুবেহ	বেশী বরফ	৭ই ডিসেম্বর
২২	তুং চিহ	শীতাযন	২২শে ডিসেম্বব
২৩	হ্সিবাও হ্যান	কম শীত	৬ই জানুযাবী
২৪	তা হ্যান	বেশী শীত	২১শে জানুয়ারী

চার ঋতু

বসন্ত	ছুন	হেমন্ত	ছিউ
গ্রীষ্ম	হ্সিবা	শীত	তুং

দশদিন

প্রাচীন চীনে 'সাতদিনে সপ্তাহ' বলে কিছু ছিল না। দশদিনের একটি সময়কে হ্সুযান বলা হতো। এই দশদিনেব নাম নীচে দেওয়া

গেল। আমাদেব পরিচিত সাতদিনের সঙ্গে এই দশদিনের কোন সম্বন্ধ নাই।

১	চিযা	৬	চি
২	আই	৭	কেং
৩	পিং	৮	হ্সিন
৪	তিং	৯	জেন
৫	উও	১০	কুয়াই

বৎসর

সুই নিয়েন—Tropical year
সুই শিহ্—Sidereal year
হাব—Calendar year
মাস—ইউয়েহ্
দিন—ক্যান

জ্যোতিষ্কসমূহ

সুর্য	ছেন
চন্দ্র	ইউযেহ
তাবা	হ্সিং
গ্রহ	চিহ্
পৃথিবী	তি
উল্কা	লিউ হ্সিং
নবতাবা	খো হ্সিং (অতিথি-তারা)
"	হ্সিন হ্সিং

ধুমকেতু

শিহ্
হুই হ্সিং, সাও হ্সিং (ঝাঁটাতারা)
থিয়েন ছ্যান (ধারযুক্ত তারা)
ফেং হ্সিং (পাল তোলা তারা)
ছ্যাং হ্সিং (লম্বা তারা)
চু হ্সিং (শিখাযুক্ত তারা)

জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত শব্দ

জ্যোতির্বিদ্যা	থিয়েন ওয়েন
আকাশ	থিয়েন
মানমন্দির	লিং থাই
চারদিক	স্সু ফ্যাং
খ-বিষুব	ছিহ্ তাও, থিয়েন ছ্যাং
সূর্যপথ	হুয়াং তাও, জিহ্ তাও
উত্তর খ-বিষুব মেরু	পাই ছেন, পাই ছি
দক্ষিণ খ-বিষুব মেরু	নান্ চি
সূর্যপথ মেরু	—
বিষুবন	হ্সিয়াং
অয়ন বিন্দু	চিহ্
বসন্ত বিষুবন	ছি
হেমন্ত বিষুবন	পাই
গ্রীষ্মায়ন	?
শীতায়ন	?
উত্তর মেরু-দূরত্ব (N. P. D)	ছু চি
মধ্যরেখা	থিয়েন চিং
দিগন্ত	ইয়েন ওয়াই, তি হুন হুয়ান
উর্ধ্ব রেখা	থিয়েন তিং হুয়ান
নতিবৃত্ত	হেং চু
বিষুবন-বৃত্ত	স্সু হ্সিয়াং হুয়ান
অয়নবৃত্ত	স্যান ছেন আই, শূয়াং হুয়ান
খ-গোলক	হুন থিয়েন
কাল-কোণ বৃত্ত	স্সু ইউ হুয়ান
আকাশপথ	থিয়েন লু

গ্রহগতি সম্বন্ধীয় শব্দ

অগ্রগতি—শুন	উদয়—চু
বক্র গতি—নি	অস্ত—জু
স্থিতাবস্থা—চু, লিউ	

সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ

পর্যবেক্ষণ—ল্যান	আলোচনা—লুন
রেকর্ড—চি	ঘটনা—কু
নথ স্তব—চিউ চুং	খ-স্থানাঙ্ক—চিং ওয়াই
অবস্থান—ওয়াই	বাষ্প—ছি
সীমা—চি	পদার্থ—চিহ
বেষ্টনী—ওয়াই	শূন্যস্থান—ফু কাং চুং, হুসু খুং
বিশ্ব—ইউ চু	বিরাট শূন্যতা—হ্সু উও
অবয়বহীন—উও থি	ঘনীভূত বাষ্প—চি ছি
শক্ত বায়ু—কাং ছি	হীন—উও চি
শক্তবাষ্প—কাং ফেং	প্রান্তহীন—উও ছিয়াং
আদিম বাষ্প—ইউয়ান ছি	স্বাভাবিক তত্ত্ব—থিয়েন আই শুতু নং

মানমন্দিরে ব্যবহৃত শব্দাবলী

খ-গোলক—হুন থিয়েন হ্সিয়াং	আবর্মিল্লারী গোলক—লিং লুং আই
সহজ যন্ত্র—চিয়েন আই	উপরে দেখার যন্ত্র—ইয়াং আই
প্রমাণ করিবার যন্ত্র—চেং লি আই	উধ্বর্' আবর্তনশীল বস্তু—লি ইউন আই
উচু নমন—কাও পিয়াও	ছায়া নির্দেশক—চিং ফু
দিক নির্ণয়কারী টেবিল—চেং ফ্যাং আন	গ্রহণ দেখার যন্ত্র—জিহ ইউয়েহ, শিহ আই
তারা-তালিকা—হ্সিং কুয়াই	সময় নির্ণয় যন্ত্র—তিং শিহ আই
পর্যবেক্ষণ টেবিল—খুয়াই চি	মেরু দেখবার যন্ত্র—হ চি আই

সংশোধন যন্ত্র—চেং আই

স্ট্যাণ্ডে রাখা সংশোধন যন্ত্র—
ৎসো চেং আই

কতকগুলি তারার চীনা নাম

তারা			চীনা নাম	অর্থ
α-উরসী মেজরিস			থিয়েন শু	খ-অক্ষ
β	"	"	থিয়েন হ্সুয়ান	খ-ছাঁচ
γ	"	"	থিয়েন চি	খ-কঙ্কন
δ	"	"	থিয়েন চুয়ান	খ-তুলাদণ্ড
ε	"	"	উও হেং	দেখবার সবুজ নল
ζ	"	"	খাই ইয়াং	তাপ-প্রবর্তক
η	"	"	ইয়াও কুয়াং	মিটমিটে উজ্জ্বলতা
α উরসী মাইনরিস			থিয়েন হুয়াং তি	(বর্তমান ধ্রুবতারা)
β	"	"	থিয়েন তি হ্সিং	সম্রাট-তারা
γ	"	"	থাই ৎজু	যুবরাজ
a 3233	"	"	শু ৎজু	উপপত্নীর ছেলে
b 3162	"	"	হু কুং	সম্রাজ্ঞী বা সম্রাটের উপপত্নী
α-ড্রাকোনিস			ইউ শু	দক্ষিণ অক্ষ
10i	"		থিয়েন আই	খ-একক
12i	"		ৎসো শু	বাম অক্ষ
184	"		থাই আই	বৃহৎ একক
α-লাইব্রী			চিহ ন্যু	তাঁতী মেয়ে
β-লাইব্রী			চিয়েন থাই	জলঘড়ি প্রাসাদ
H-সেফি			থিয়েন হুয়াং তা-তি	স্বর্গের সম্রাট
α-ক্যারিনী (অগস্ত্য)			লাও জেন	বুড়া লোক
α-সেণ্টরী (জয়)			নান মেন	দক্ষিণ তোরণ
α-স্করপি (জ্যেষ্ঠা)			হুও হ্সিং	আগুন তারা

α-একিলী (শ্রবণা)	ছিয়েন ন্যু	রাখাল বালক
α-হাইড্রা (আলফার্দ)	চু ছিয়াও	লাল পাখী
φ-স্যাজিটারী	নান্ তু	×
ω-সারপেন্টিস	থিযেন জু	স্বর্গীয় দুধ
কৃত্তিকা	মাও	
রোহিণী	পি	

গ্রহসমূহ

গ্রহ	চীনা নাম	অর্থ
বুধ	ছেন হ্‌সিং	কাল-তারা
শুক্র	থাই পাই	মহান শ্বেত ব্যক্তি
মঙ্গল	ইযিং হুও	অস্থির জ্যোতিষ্ক
বৃহস্পতি	স্যুই হ্‌সিং	বর্ষতারা
শনি	চেন হ্‌সিং	অশুভ আত্মাদূরকারী

ডিগ্রীর অংশসমূহ

ডিগ্রী	তু	অর্থ
১/৮ ডিগ্রী	ছিয়াং	সবল
১/৪ "	শাও	ছোট
৩/৮ "	প্যান জো	অর্ধ দুর্বল
১/২ "	প্যান	অর্ধ
৫/৮ "	প্যান ছিয়াং	অর্ধ সবল
৩/৪ "	থাই	বড
৭/৮ "	জো	দুর্বল
৩/১৬ "	শাও জো	ছোট দুর্বল
৫/১৬ "	শাও ছিয়াং	ছোট সবল

গ্রন্থপঞ্জী

Babylonian Religion and Mythology—King.

Assyrian Discoveries—Smith.

Old and New Astronomy—Proctor.

Popular Astronomy—Newcomb.

Story of the Heavens—Ball.

History of Astronomy, from Thales to Kepler.—Dreyer

A Short History of Astronomy—Berry.

A History of Astronomy—Pannekoek

Aristarchus of Samos—Heath.

Greek Astronomy—Heath.

The History of Ancient Astronomy—Neugebawer.

Ptolemy's Catalogue of Stars, a Revision of Almagest —Petres.

Medieval Astronomy—Dreyer.

How Greek Science passed to the Arabs—O'Leary.

Ulug Beg's Star Catalogue—Knoble.

Galileo in China—D'Elia.

Science and Civilisation in China—Needham.

Cradle of Civilisation—Time-Life.

Ancient Egypt — " "

Epic of Man — " "

Mythologies of the Ancient World—Krammer.

Scientific American—কয়েক সংখ্যা

Al-Beruni's India—Sachau.

Indian Wisdom—Williams.

India : What can it teach us ?—Maxmuller.

The Orion—Bal Gangadhar Tilak.

Introduction of Pancha Samhita—Thibaut and Pandit Dvivedi.

Brihat Samhita—Kern.

Introduction to Aitareya Brahman—Haug.

Hindu Astronomy—Brennand.

বিজ্ঞানে মুসলমানের দান—এম. আকবর আলী

আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী—যোগেশচন্দ্র রায়

বায়ুপুরাণ—রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বিষ্ণুপুরাণ—বসুমতি সাহিত্য মন্দির

উষা—সত্যব্রত সামশ্রমী (vol. III No. 2)

বর্ণানুক্রমিক সূচী

আ

7865

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

ছ

জ

ত

থ

প

ম

ল

শ

হ

মহাকাশ গ্রন্থমালা

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

প্রথম গ্রন্থ-ঃ খগোল-পরিচয় দাম ঃ দশ

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক পুরস্কারপ্রাপ্ত

দ্বিতীয় গ্রন্থ ঃ তারা-পরিচিতি দাম ঃ বার

"মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বিজ্ঞানের রাজ্যে এমন একখানা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা করা পারে এমন বই উভয় বাংলায় পূর্বে বেরোয়নি, আগামী বৎসরের ভিতরে বেরুবে কিনা সন্দেহ। পণ্ডিত আবদুল জ রচিত এই 'তারা-পরিচিতি গ্রন্থখানিকে 'শতাব্দীর গ্রন্থ' তর্কাতীত দার্ঢ্যসহ পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়।"

সৈয়দ মুজতাবা আ

দেশ, ২৪শে চৈত্র, ১৩

তৃতীয় গ্রন্থ ঃ প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা

চতুর্থ গ্রন্থ ঃ তারা-কাহিনী (প্রকাশের অপেক্ষায়)

মহাকাশ গ্রন্থমালা

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

প্রথম গ্রন্থ-ঃ খগোল-পরিচয় দাম ঃ দশ টাকা

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক পুরস্কারপ্রাপ্ত

দ্বিতীয় গ্রন্থ ঃ তারা-পরিচিতি দাম ঃ বার টাকা

"মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বিজ্ঞানের রাজ্যে এমন একখানা পুস্তক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন বই উভয় বাংলায় পূর্বে বেরোয়নি, আগামী শত বৎসরের ভিতরে বেরুবে কিনা সন্দেহ। পণ্ডিত আবদুল জব্বার রচিত এই 'তারা-পরিচিতি গ্রন্থখানিকে 'শতাব্দীর গ্রন্থ' বলে তর্কাতীত দার্ঢ্যসহ পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়।"

সৈয়দ মুজতাবা আলী,
দেশ, ২৪শে চৈত্র, ১৩৭৯।

তৃতীয় গ্রন্থ ঃ প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা

চতুর্থ গ্রন্থ ঃ তারা-কাহিনী (প্রকাশের অপেক্ষায়)